১ম খণ্ড

P3028

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

২য় বর্ষ] ২২শে আষাঢ় শনিবার ১৩৩০, ইং ৭ই জুলাই। [১ম সংখ্যা

এই সংখ্যায় আছে :—

রমেশ বসু এম-এর :—এ যুগের বাঙ্গালা কবিতা
শৈলবালা ঘোষজায়ার :—শঠে শাঠ্যং (গল্প)
সরসীবালা বসুর :—স্নেহের ফাঁদ
গিরিজাকুমার বসুর :—আবরণ
যোগেশচন্দ্র রায়ের :—শিল্প মঞ্জুরী
নাট্যামোদীর :—কর্ণার্জ্জুন
বিজয়রত্ন মজুমদারের :—নর্ত্তকীরানীর নিজের কথা।
আলোচনা, দেশের কথা, ইয়োরোপের বনাম ভারতের জ্ঞানপন্থা।

হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের :—ত্রিবর্ণ চিত্র
বিনয়কৃষ্ণ বসুর :—লাফিং গ্যালারি।

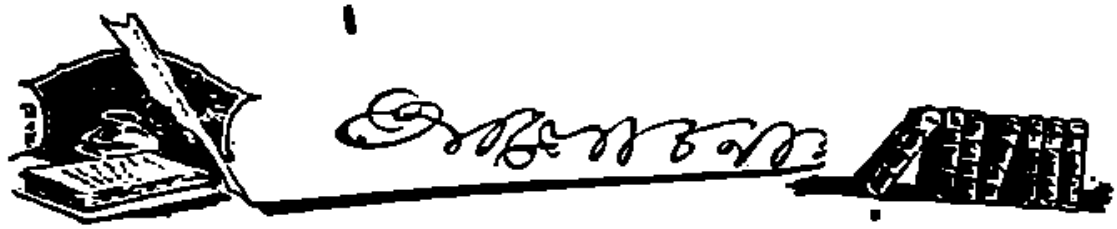

দ্বিতীয় বর্ষের প্রারম্ভে আমরা 'বাসন্তী'র লেখক লেখিকা, গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পাঠক বন্ধুজনদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইহাদিগের সহানুভূতি ভিন্ন 'বাসন্তী' চলিতে পারিত না। এরূপ একখানি চিত্র বহুল সাপ্তাহিক পত্র ঠিক আধুনিক যুগের মত উন্নত পর্য্যায়ে চালানো এ দেশের মত অভাবগ্রস্থ নিরক্ষর দেশে সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। পাশ্চাত্যের সাময়িক পত্রগুলির আদর্শে আমাদের দেশের পত্রিকাগুলি স্থাপিত হইলেও তাহাদের উচ্চভাবে চলিবার যে সমস্ত উপাদান আছে আমাদের দেশে তাহার একান্ত অভাব। পাশ্চাত্যের এক একখানি পত্রিকা ও পুস্তকের যে প্রচার তাহা দেখিয়া আমাদের বিস্ময় লাগে। আমাদের দেশীয় কোন পত্রিকা বা পুস্তকের তেমন প্রচার আশা স্বপ্নেরও অগোচর। তারপর তাহাদের দেশের সাময়িক পত্র গুলিতে যেরূপ বিজ্ঞাপন থাকে আমাদের দেশে তাহার শতাংশের একাংশও বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির আশা করা যায় না। এগুলি আমাদের দেশে যোগ্যভাবে কাগজ চালাইবার প্রধান অন্তরায়। দেশে শিক্ষার বহুল প্রচার হইয়া শিক্ষিত পাঠানুরাগী লোকের সংখ্যা যদি কোন দিন বেশী হয় তবে সাময়িক পত্র ভালভাবে কথঞ্চিৎ চলিতে পারে। তারপর দেশীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি হইলে দেশের অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হইতে পারে ও দেশীয় কারবার বাণিজ্যের বিজ্ঞাপন আদি পাইয়াও কাগজের অবস্থা স্বচ্ছল হইতে পারে।

• • • •

আমাদের দেশীয় কাগজে আমরা নূতন নূতন ভাব ও চিন্তার কথা—এত কম দেখিতে পাই কেন? এ প্রশ্ন অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। ইহার কারণ আমাদের দেশীয় লেখকেরা অনেকেই পেটে খাইতে না পাইয়া শুধু মাত্র প্রাণের ঐকান্তিক সখের আবেগে এই সাহিত্য চর্চ্চা করিতেছেন। বিনি পয়সায়—পেটে খাইতে না পাইয়া শুধু সখে কোন স্থায়ী জিনিস খুব কমই গড়িয়া ওঠে। বুভুক্ষিতের প্রাণের দুয়ারে উচ্চ আশা কল্পনা বার বার আসিয়াও তাহা রসের অভাবে প্রতিহত হইয়া শুষ্ক ম্লান অবস্থায় ফিরিয়া যায়। তাই দেশীয় বিনি পয়সার সাহিত্যসেবকদের নিকট দেশের লোক কি এমন একটা রসাল জিনিসের আশা করিতে পারেন? তবু বাংলা দেশের সাহিত্যিকেরা এরূপ অবস্থায় থাকিয়াও দেশের সাহিত্য ভাণ্ডারে যাহা দান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা সামান্য নহে।

• • • •

কবিবন্ধুরা নানা বিচিত্র রসেভরা সুফলা সুকলা এই দেশ নূতন সৃষ্টির জন্য যেন ব্যাকুল হইয়া আছে। তাই শত অভাব যাতনার মধ্যেও এদেশের সাহিত্যরস শুকাইয়া যায় নাই। তাই বাংলার সাহিত্য সৃষ্টি বিশ্ববাসীকে আনন্দ দিতে পারিয়াছে। কিন্তু বাংলার এই রস সাহিত্যের স্রষ্টা যাঁহারা, তাঁহাদের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। বাংলায় বছর বছর বহু গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রাদির প্রকাশ হইতেছে সত্য। কিন্তু গ্রন্থ ও পত্রাদির স্রষ্টা যাঁহারা—যাঁহারা বুকের রক্ত জল করিয়া মস্তিষ্ক চালনা দ্বারা দেশের সাহিত্যকে বাঁচাইয়া রাখিতেছেন, তাঁহাদের অবস্থা ভাল নয়। জীবন ধারণের উপযোগী আহারও তাঁহারা তাঁহাদের সাহিত্যসেবা হইতে অর্জ্জন করিতে পারিতেছেন না।

• • • •

বাংলার সাহিত্যিকেরা পত্র পত্রিকায়, পুস্তকে আধুনিক ধনী ও শ্রমিকের সমস্যার উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। দেশের মঙ্গলামঙ্গলের কথা ভাবিয়া দেশকে কর্ম্মে প্রবুদ্ধ করিতেছেন সত্য—কিন্তু বাংলার সাহিত্যের উপর ধনীদের যা প্রভাব চলিয়াছে ইহা ধনী ও শ্রমিকের

সমস্যার চেয়েও ভীষণ—গুরুতর। সাহিত্য ও পাঠকের মধ্যে এমন কতকগুলি ব্যবসায়ী দাঁড়াইয়া গিয়াছে যাহাদের অত্যাচারে সাহিত্য স্রষ্টা যাঁহারা তাঁহারা অতি সামান্যই পাইয়া থাকেন। পুস্তক প্রকাশের ছাপাখানা, কাগজওয়ালা, দপ্তরীরা যাহা পায় পুস্তকের লেখকেরা অনেক সময় তাহাও পান না। বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের এরূপ শোচনীয় অবস্থা আর কতদিন থাকিবে জানি না। দেশবাসীর শিক্ষা ও পাঠানুরাগ বর্দ্ধিত হইলে—সাহিত্যের আদর যখন আরো ভালভাবে করিতে পারিবেন তখন সাহিত্যিকের এ দুর্দ্দশা ঘুচিতে পারে।

• • • •

দেশীয় ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির কথা কহিতে গেলে সর্ব্বাগ্রেই সাহিত্যিকদের কথা কহিতে হয়। কারণ সাহিত্যিক ছাড়া সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নহে। সাহিত্য জাতির গৌরব, দেশের গৌরব। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের বাঁচিবার উপায় দেশের জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া দেশের ধনশালীগণ। দেশের ধনশালীদিগের কর্ত্তব্য নানারূপ কার্য্যকরী অনুষ্ঠান স্থাপন করিয়া দেশে স্বল্পমূল্যে সাহিত্যের প্রচারের উপায় করিয়া দেওয়া। তাহাতে দেশের লোকের পাঠস্পৃহা জাগিয়া উঠিবে। নিরক্ষরতা কমিবে। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি, চরিত্রগঠন, নিজের দেশকে জানিবার ও চিনিবার উপায়, দেশের কৃষিসম্পদ, খনিজ সম্পদ, বন সম্পদ, জল সম্পদ, পর্ব্বত সম্পদ কি ভাবে আহরণ করিয়া আমরা কার্য্যে লাগাইতে পারি কি ভাবে আমরা আপনাদের পায়ের জোর দিয়া স্বচ্ছন্দে দাঁড়াইতে পারি, অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারি, সাধারণ সাহিত্য—এই সব সাহিত্য অতি অল্প মূল্যে প্রচার ব্যবস্থা হইলে দেশের লোকেও উপকৃত হইবে—দেশের সাহিত্যিকেরাও তাঁহাদের ক্ষমতা ও দক্ষতা নানাভাবে দেখাইবার অবকাশ পাইবেন। জনসাধারণের মধ্যেও পাঠের স্পৃহা বাড়িবে—অল্প মূল্যে কিনিবারও ইচ্ছা হইবে। দেশের মঙ্গলের জন্য এইরূপ কার্য্য ও অনুষ্ঠান আমাদের দেশে একদিন অনেকগুলি স্থাপিত হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু তাহা একটিও হয় নাই। দেশীয় লোকের গড়িবার শক্তি যেন নাই।

• • • •

সম্প্রতি সাহিত্যের শুচি অশুচি লইয়া আবার একটা দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে। ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কোন কোন লোক নাকি বলিয়াছেন যে তাঁহার রচিত উপন্যাস অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট তাই অপাংক্তেয়। বিমুর ছেলে, রামের সুমতি, পল্লীসমাজ প্রভৃতির লেখক ইহাতে ক্ষুব্ধ—তাই কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে প্রায় এক ঘণ্টাকাল সান্ত্বনা দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ শরচ্চন্দ্রকে এসব কথায় কাণ দিতে মানা করিয়া যে সাহিত্য সৃষ্টি তাঁহাকে আনন্দ দিয়াছে যাহা দেশবাসীকেও আনন্দ দিয়াছে সেই সাহিত্য যতটা আসে তাহাই আনন্দে রচনা করিয়া যাইতে বলিলেন। সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক শরচ্চন্দ্রকে সান্ত্বনাচ্ছলে দেশের অবস্থা, লোকের মনের অবস্থা, সাহিত্যের স্বরূপ তাহার বিচিত্র অনুভূতির কথা কহিতেছিলেন—সাহিত্যিকেরা এক-মনে শুনিয়া এমন শ্লীল বাণীটি অশ্লীল শরচ্চন্দ্রের গায় কোন শ্লীল সাহিত্যিকেরা নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহাই ভাবিয়া অবাক্ হইতে লাগিলেন।

আগামী সংখ্যায়—
বহুবর্ণ চিত্র—শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা অঙ্কিত
গল্প—বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায় এম-এ,
উপন্যাস, আলোচনা, রঙ্গালয়, কবিতা—
বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-কথা,—সমস্তই থাকিবে।

• • • •

অনেক ভাগ্যের কথা এ দেশে এমন শ্লীলবাদী সংখ্যায় বোধ হয় অতি সামান্যই আছেন যাঁহারা এমন সাহিত্যিকদের শ্লীলতা সম্বন্ধে তর্ক তুলিয়া হাস্যের কারণ হইবেন। ইহাদের সংজ্ঞায় পড়িলে, মহাভারতের বেদব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া কালিদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস—আর পাশ্চাত্যদেশের পুরাণ যুগের সাহিত্যিকদের কথা ছাড়িয়া দিয়া আধুনিক যাঁহারা তাঁহাদের তো একেবারে সব বহিই ভস্মরাশি করিয়া ছাড়িতে হয়।

• •

এ কথা অনেকেই জানেন—দেশের জীবনের চিত্র সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। আমাদের দেশে তাহা আজ পর্য্যন্তও অত্যন্ত রাখিয়া ঢাকিয়াই চালানো হয়। আমাদের দেশে ও সমাজে সহস্র অবিচার, অত্যাচার, নির্ম্মম-বীভৎসতা, জঘন্যবৃত্তি সব কাজে অনেক সংসারে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। প্রেম ও প্রণয়ের ব্যভিচার, প্রেমিক-প্রেমিকার নির্লজ্জ ছলনা, ভালবাসিয়া প্রতিদান না পাওয়া আমাদের সমাজে এগুলির অত্যন্ত অভাব কি! আমাদের দেশে লোকে না খাইয়া সহস্র পাপ কল্পনা করিয়া মরিতেছে নিত্য শত শত। না খাইয়াও মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে—মেয়ে বিধবা হইয়া আসিল তো মা বাপ কি করিয়া রক্ষা হইবে তাহাই ভাবিয়া বুকে শেল লইয়া বসিয়া রহিলেন,—এই সব আরো কত শত কেলেঙ্কারী যে সমাজে প্রকাশ পাইয়াছে এগুলির সত্য স্বরূপ আজ পর্য্যন্ত কোন সাহিত্যিক দিবার চেষ্টা করেন নাই। তত সাহস ও শক্তি এখনো আসে নাই। বিদেশী সাহিত্যে ইহা আসিয়াছে, সমাজে ভাঙ্গাগড়া চলিয়াছে। আর এ দেশী সমাজ আপনার মধ্যে আপনাকে গুড়াইয়া যাইতেছে। আদর্শ যাহা তাহার কিছুই মানিব না—অথচ আদর্শ ঝাঁকড়াইয়া মিছে পড়িয়া থাকিব! সাহিত্যে বাংলার নূতন বর্ত্তমান সমাজের সঠিক ছবি যদি ফোটে—তবে তাহা বিপ্লবের পূর্ব্ব সময়ে রুশ সাহিত্যে যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তেমনি গোর্কি, লেনিন, ট্রোজকির লেখার মত ফুটিয়া ওঠা উচিত। তলষ্টোয়েভ্‌স্কি, টুর্গেনিভের মত টলষ্টয়ের মত নির্ভীক বিশ্বাস চাই। এতটুকুতেই বিচলিত হইলে এমন শ্লীলবাদীদের চলিবে কেন?

* * * * *

আজ শ্লীলবাদীদের বঙ্কিম-প্রীতি দেখিয়া আনন্দ হয়। বঙ্কিম প্রতিভার প্রথম বিকাশ সময় একদল এমনি শ্লীল-বাদীরা বঙ্কিম প্রতিভার অশ্লীল বিকাশ দেখিয়া কড়ারাস হইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে তত্ত্বাবাসে বঙ্কিম প্রতিভা ধরে নাই। আজ বঙ্কিমবাবু শ্লীলতার সীমায় আসিয়াছেন কি? যদি তাহা আসিয়া থাকেন তবে তাহারা ধরিয়া নিন একদিন এইসব দেশের প্রাণের পরিচয় যাহারা দিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারাও এ দলের বিচারে অব্যাহতি পাইয়া ওরে দাঁড়াইবেন। সাহিত্য—স্কুলের নীতি-বোধ নহে। ইহা পাঠেরও যোগ্যতা আছে। নীতিবোধের সীমা ছাড়াইয়া পরে সাহিত্যে আসিতে হয়। তাঁহা আসিলেই আর অভি-যোগের কিছু থাকিবে না।—আর সত্য দুর্নীতি যাচা তাহা ধরিয়াই পড়ে টিঁকিয়া থাকে না। সংসারের সত্য চিত্র, মানুষের মনের বিচিত্র বিকাশ দেখাইতে গেলে তাহাতে রক্ত মাংসের খেলা, পাপপুণ্যের সংঘাত সবই দেখাইতে হইবে। শুধু সুশীল সুবোধ বালক বালিকার ছবিতে সাহিত্য হয় না। সাহিত্য সত্যের সন্ধানে চলে—বিশ্বের নানা রসের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া সাহিত্যিককে সত্যের রাজ্যে যাইবার প্রয়াস করিতে হয়। তবে অশ্লীলতা ও কুরুচির বিকাশের প্রশ্রয় যে সাহিত্যের উদ্ভব তাহার গতি বেগ সব দিক হইতেই সংযত করিবার চেষ্টা করা উচিত। তেমন সাহিত্য আনন্দের সৃষ্টি করিতে পারে না। সাময়িক জঘন্যবৃত্তির যৌরাক জোগাইলেও দু'দিনেই তাহা ঘৃণ্য অস্পৃশ্য হইয়া যায়।

* * * *

স্ফূর্ত্তি আনন্দ, বিলাস ব্যসন পূর্ব্বেও আমাদের দেশে ছিল—এখনও আছে। তবে তাহার ধারা বদলাইয়া গিয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য বিলাসিতার স্বরিৎ-স্ফূর্তি লাভের জন্য আমাদের দেশের ধনী সম্প্রদায় চঞ্চল। কিন্তু এই স্বরিৎ-স্ফূর্তি চালাইতে হইলে অর্থোপার্জ্জনের যেমন স্বরিৎ উপায় দেশে চালানো প্রয়োজন তাহা আমাদের দেশে হয় নাই। সে দিকে কাহারও দৃষ্টিও নাই। আমাদের দেশের অর্থশালী, জমিদার, রাজা মহারাজারা পূর্ব্বে বিলাস ব্যসনে যথেষ্ট খরচ করিতেন। কিন্তু সে বিলাস ব্যসন করিতে গিয়া তাঁহাদের দেশের বাড়ী ঘর শৃগাল কুকুরের বাসভবন হইত না, যাঁহাদের পয়সার উপর তাঁহাদের স্ফূর্তি আনন্দ নির্ভর করে তাহারা অনাহারে, অর্দ্ধাহারে মারা যাইত না। পূর্ব্ব-পুরুষ-দের কীর্ত্তিকলাপ লোপ করিয়া দিয়া তাঁহারা আত্মসুখের স্বরিৎ প্রবাহের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন না। দেশের অধিকাংশ ধনী সন্তান আজ কলিকাতার মোটর-বিলাসী হইয়া

পড়িয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের স্থাপিত ধাত্রবা চিকিৎসালয়, বিদ্যামন্দির, জলসত্র, অন্নসত্র প্রভৃতি অর্দ্ধ-ভাবে উঠিয়া গিয়াছে। দেশবাসী জনসাধারণের অর্থে তাঁহাদের এই যে বিলাসী চলিয়াছে উহাতে দেশবাসী কোন উপকারই পাইতেছে না; এই আধুনিক ধরিত্র-বিলাসে ইহারা পূর্ব্বপুরুষের প্রাপ্ত সম্পত্তি ও অর্থ খোয়াইয়া কপর্দ্দকে অঙ্কিত হইয়া ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে যাইতেছেন। অথচ ইহারা ইচ্ছা করিলে এখনও দেশের অনেক কার্য্যই করিতে পারেন।

• • • •

কৌন্সিল প্রবেশের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে দেশে যথেষ্ট আন্দোলন হইয়াছে। কৌন্সিল প্রবেশে ভাল কি মন্দ হইবে তাহা ভবিতব্য জানে। কিন্তু কৌন্সিলে যাহাতে দেশের সত্য হিতৈষী লোক প্রবেশ করে দেশবাসীর তাহা দেখা কর্ত্তব্য। দেশের অনেক অর্থশালী লোক, রাজা মহারাজা যাঁহারা এক মাত্র দেশবাসীর কষ্টার্জ্জিত ধন শোষণ করিবার জন্যই দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন তাঁহারাও দেশের স্নেহাই দিয়া দেশবাসীর নিকট হইতে ভোট সংগ্রহ করিয়া কৌন্সিলে প্রবেশের চেষ্টা করিবেন। কিন্তু এই শ্রেণীর দেশ-ত্যাগী সহর-বিলাসী লোকদের দেশবাসীর কিছুতেই ভোট দিয়া কাউন্সিল প্রবেশের সুযোগ করিয়া দেওয়া উচিত নহে। এই ভোট যুদ্ধের সময়ই তাঁহারা শুধু লোকজন মারফৎ দেশবাসীর সম্মুখে আবেদনের থালা ধরিয়া উপস্থিত হন। এসময়ে তাঁহারা যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন, এমন কি ভোট যুদ্ধে হারিলে তাহা লইয়া হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বড় বড় ব্যারিষ্টার পর্য্যন্ত লাগাইয়া মোকর্দ্দমা চালান। এভাবে অর্থব্যয় করিয়া কৌন্সিলে প্রবেশের সার্থকতা কি! যে অর্থ ক্যানভাসিং বা মোকদ্দমায় যায় তার চেয়ে কম অর্থব্যয়েও তাহারা দেশের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট কার্য্য করিতে পারেন। তাহাতে দেশবাসীর মধ্যেও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু তাহা হইবার নয়—তাঁকতালে চেক্কা মারিবার আকাঙ্ক্ষাই আমাদের মধ্যে অত্যন্ত বেশী। ভোটারদের উচিত তাহারা নির্ব্বাচনকামী লোকদের কার্য্যকলাপ, উদ্দেশ্য বিচার করিবেন। তাঁহাদের স্বাধীন-চিন্ততা ও ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান কতটা প্রখর তাহাও দেখিতে হইবে। কৌন্সিলী হইয়া এক একজন এমন কার্য্য করেন যাহা দেখিয়া আমাদের লজ্জায় হেঁটমুখ হইতে হয়। কিন্তু এজন্য দায়ী শুধু মাত্র সেই শ্রেণীর কৌন্সিলীই নন—দায়ী দেশের ভোটদাতারাও। কারণ তাহাদের অজ্ঞাতে মনো-নয়নেই এমন লোক কৌন্সিলে স্থান পাইয়া থাকে।

• • • •

বিদেশী শ্বেতাঙ্গেরা এ-দেশী কৃষ্ণাঙ্গদের গ্রীহা যাকে যাকে ফাটাইয়া থাকে—এবং এরূপ গ্রীহা ফাটা ব্যাপারে প্রায়ই শোনা যায় ইহা ইচ্ছাকৃত নহে। ইচ্ছা না থাকিলে একটা লোকের ঠিক যায়গায় স্থানটাই পদাঘাত লাগিয়া কি করিয়া লোকটা মরিতে পারে তাহা বোঝা যায় না। দেশে আইনের বিচার আছে। কিন্তু সেই বিচারে এরূপ শ্বেতাঙ্গ খুনীরা প্রায়ই অতি সহজ অব্যাহতি পায়। তাই দেশের লোকে এরূপ কার্য্যের প্রতিবাদ দু'দিন কাগজে করে—তারপর আবার কোন কৃষ্ণাঙ্গকে নিয়তি যখন তাকে তখন সে শ্বেতাঙ্গের পায়ের আঘাতে গ্রীহা ফাটিয়া মরে। দেশের ইহা যেন একটা চিরন্তন নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

• • • •

এ দেশের জেল রক্ষীদের উপর এখনও অত্যন্ত অন্যায় জবর ব্যবহার হইয়া থাকে এইরূপ অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। বিশেষতঃ এই প্রকার অভিযোগ বেশী মাত্রায় জেলের নীতি সম্বন্ধে শোনা যাইতেছে যখন হইতে দেশের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মাননীয়েরা দেশকে ভালবাসিবার দায়ে রাজনৈতিক অপরাধীর বেশে জেলে যাইতেছেন। জেলের এই ব্যবহার সম্বন্ধে দেশের মুক্তিকা গুলি তীব্র প্রতিবাদ করিলেও জেল সংস্কারের কোন ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত হইয়াছে কিনা আমরা জানি না। কিন্তু সরকার পক্ষ হইতে সম্প্রতি ইহার একটা জবাব বাহির হইয়াছে। জবাবটি এই—দেশী খবরের কাগজওয়ালারাই নাকি এসব রটনা করিয়া বহুল সৃষ্টি করে। হবেও-বা তাই—কারণ সরকারী বাচনিকে যখন এবম্প্রকার প্রকাশ। তবে কি দেশবাসী এখন হইতে বিশ্বাস করিয়া লইবে যে এদেশের জেলের সংস্কার সম্পূর্ণ হইয়া ইহা একেবারে

আদর্শ করেদখানা হইয়া দাঁড়াইয়াছে? এমন আদর্শ জিনিস লইয়াও যে কেন দেশী কাগজগুলা হাহাবা করে —সেইটাই সমস্যা!

* * * * *

ফরিদপুরের চরমাইনারের পুলিশের উপদ্রব কাহিনী পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি। হাতে ক্ষমতা পাইয়া—পুলিশ গ্রামকে গ্রাম কিভাবে বিধ্বস্ত করিয়াছে —নারীর সতীত্ব ব্যর্থায়, কিভাবে পুলিসের ক্ষমতার দুপ্ততায় দাহিতে হইয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয়—পুলিসের কি উপরওয়ালা 'মাই—সে বেলা কি জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিসসাহেব শূন্য হইয়াছিল? দেশে কি মানুষ নাই—যে এই উপদ্রব সহিয়াও সব অবিচলিত চিত্তে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে ছুটিল। বাংলাদেশে না খাইতে পাইয়া নানা রোগে লক্ষ লক্ষ লোক মরে। নিজের সম্মান—মা, বোন, স্ত্রী কন্যার সম্মান রক্ষায় জন্য কি একটা গ্রামের লোকেও মানুষের মত দাঁড়াইয়া মরিতে পারিল না? অত্যাচারের অবসানে কর্তৃপক্ষের বিচার বসিয়াছে। ক্ষমতামুগ্ধের যথেষ্ট অত্যাচার শেষে—বিচার! কিন্তু কেন—কোন সাহসে এমন অত্যাচার সম্ভব হয়? আর কোথায় কোন দেশে জীবন্ত মানুষ বলিয়া পরিচিত পালকে পাল লোকের উপর এমন অমানুষিক ব্যবহার চলিতে পারে?

আবরণ

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

হইতাম অপরাধী
শতবার নিজে সাধি
চাহিতাম ক্ষমা

ক্ষোভে করি দাঁতে কুটি
আনাতাম মাথা কুটি'
ত্রুটি, মনোরমা

ভেবেছ কি ম্লানমুখে
ফিতাম রহিতে দুখে
দূরে দূরে সরি'

ফেলিয়া নয়ন জল
রাখিতাম পদতল
ছুঁয়ি মাথে ধরি;

ক্ষেম দিয়া, মান দিয়া
প্রেম দিয়া, প্রাণ দিয়া
মুছি সব দাগ

নয়নে মিনতি ভরি'
চাহিতাম মুখোপরি
রহিত কি রাগ?

'আজ তুমি দোষী; কই
বলিছ আসিয়া সই,
"হও অনুকূল

না জেনে ক'রেছি যাহা
তোমার শপথ তাহা
নিমেষের ভুল

ঘোর ঘোর হোক্ শুরু
আর বাঁকায়োনা ভুরু
এস' কথা কও

জ্বালায়ে মানের চিতা
প্রেমকে পোড়ায়ে, বৃথা
কেন ব্যথা দাও?"

আমি কি জানিনা বঁধু
মরমের তিল বঁধু
হারনিক' কারো

সব বুঝে তবু হেন
হৃদয়েরে মিছে কেন
দহা চোখ ঠারো

কিসুকেরে অবহেলি
স্বপনে যেওনা ফেলি
বুকে মুক্তা তার

খুলে যেন আবরণ
হারে তাহে আভরণ
তোমার মালার।

বিচারের নমুনা। কেপ্‌এর ফিং জং এষ্টেটের এক-জন ভারতীয় কুলী অসাবধানতা বশতঃ কার্ণ গাছ ছিঁড়িয়া ফেলায় বাগানের কর্ত্রী তাহাকে পদাঘাত করেন। বেচারা ভারতীয় কুলী গ্রীহা ফাটিয়া মরিয়া গিয়াছে। সেখানকার করোণার রায় দিয়াছেন—লোকটির গ্রীহা এমন অবস্থায় ছিল যে তাহাতে সামান্য আঘাত লাগিলেই তাহা ফাটিয়া মৃত্যু হইতে পারে। মিসেস এথোর্ণের ইচ্ছা ছিল না যে তাহাকে মারেন। অতএব আমার মতে মিসেস এথোর্ণের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আসিতে পারে না। আমরাও ত তাই বলি! আবলুষ কাঠ মরিয়াছে শ্বেত-কমল-সদৃশ চরণের ঘায়ে, তাহাতেই ভারতীয় কুলী স্বর্গে গিয়াছে, আবার মোকদ্দমা!

• • • •

সাহিত্য ও স্বদেশ। মৈহাটিতে সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছিল। বাঙ্গলা দেশের নামজাদা ও নাম লোলুপ প্রায় সমস্ত সমস্ত সাহিত্যিকই সঙ্ঘের সম্মিলনে হাজির হইয়াছিলেন। বাবুদের মাথায় তেড়ী, চক্ষে চশমা, মুখে সিগারেট, গায়ে বিলাতী আদ্ধির, অভাবে সংস্কৃতের পাঞ্জাবী, পরণে ফিন্‌ফিনে পাতলা ধুতি (ভিতরে আণ্ডার ওয়ার-ও ছিল) পায়ে রং বে-রংয়ের জুতা। ইঁহাদের অনেকে আবার লেখার মধ্যে "মা মা" রবে গগণ বিদীর্ণ করিয়া থাকেন, দেখা গিয়াছে। স্বদেশের প্রতি মমতায় ইহারা জনে-জনে দিগ্বিজয়ী বীর—কিন্তু স্বদেশের সাহিত্য সম্মিলনে বিদেশী বেনজুয়ার নটবর সাজে সজ্জিত হইয়া যাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না।

আমাদের স্বদেশ ও সাহিত্যের সম্প্রীতি বিশ্ব-বাসীর অন্নধাবন-যোগ্য নহে কি?

• • • • •

মহাপুরুষ-সৃষ্টি। বোলশেভিকদের রাগ লর্ড কার্জনের উপর খুবই অবর দেখিতেছি। বোলশেভিকদের কবি না-কি বলিয়াছেন, কার্জনের লর্ড শিপ্‌-টি মুখোস মাত্র, আসলে ইনি একটী বস্তু পশু। বোলশেভিকরা এই মহাপুরুষকে পশু আখ্যা দিয়াই নিরস্ত হয় নাই, তাহারা তাঁহার মূর্ত্তি গড়িয়া খোচাইয়াছে, পদদলিত করিয়াছে, সে-সময়ে যাও সাজাইয়াছে, ধনু কিড়মিড়ও বোধ হয় করিয়াছে। আরও তাহারা না-কি একটা কার্জ্জন-মূর্ত্তি গড়িয়া ফাঁসীকাষ্ঠে লট্‌কাইয়া দিয়াছিল! ভাগ্যে তাহারা ভারতের লোক নয়, তাই রক্ষা নতুবা এতদিনে আর একটা চৌরীচৌরার বৃহত্তম সংস্করণ দেখা দিত!

• • • •

পুলিশ-বিভাগ। পুলিস কিরূপ কর্ম্মদক্ষ আমরা বিগত (১৫, ৪৬, ৪৭শ) তিন সংখ্যা বাসন্তীতে "কেরামতি" নামক চিত্র-উপন্যাসে তাহার কতকটা পরিচয় দিয়াছি। তবু এই ধরণের পুলিসের জন্য রক্ত জল-করা পয়সা ঢালিতে হয়, ইহাই অতি-বড় দুঃখের কথা। সে দুঃখে যে কি সান্ত্বনা তাহা আমরা জানি না, জানিতে পারি নাই, ভবিষ্যতে কখনও জানিতে পারিব বলিয়া আশা-ও রাখি না। তবে ঘাটের কড়ি দিয়া ডুবিয়া মরিতেছি বলিয়াই কখন-কখন আর্ত্তনাদ ছাড়িতে হয়, তাই ছাড়ি।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে

সেতার শিক্ষা

৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ১৷৷০

সেতারের অতিরিক্ত গত ৷৷০

প্রকাশক :—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

৪।১এ সেন লেন, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা

এবং গুরুদাস লাইব্রেরী ও,

ডোয়ারকিন কোংর নিকট প্রাপ্তব্য।

ব্রহ্মদেশে সম্প্রতি হত্যা, চুরী, ডাকাতি, গুণ্ডামী রাহাজানীর সংখ্যা ভয়ানক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এই সকলের কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য চিরাচরিত তদন্ত কমিটিও বসিয়াছে। এই তদন্ত কমিটিতে সাক্ষ্য-দানকালে ব্রহ্মের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সোয়া-প-তে ভারি এক মজার কথা বলিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, এই সকল ব্যাপার বন্ধ করিতে হইলে পুলিস-বিভাগই তুলিয়া দিতে হইবে। একেবারে তুলিয়া দেওয়া যদি অসম্ভব হয়, তবে সংখ্যা কমাইয়া অর্দ্ধেক করা উচিৎ। কারণ অধিকাংশ অপরাধের মূল পুলিসই দেখাইয়া দেয়।—ব্রহ্মদেশে মস্তিষ্ক হাসপাতাল্ আছে কি-না জানি, যদি থাকে এই সভ্যটিকে সেখানে পাঠাইবার আশু ব্যবস্থা করা পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষদের উচিত, হাসপাতালের অভাব থাকিলে ভারতবর্ষের রাঁচী বা বহরমপুরে পুলিস তাহার জন্য স্থান দিবার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে পারেন।

• • • • •

সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গণের মুখে ভারতীয় দর্শনের নব মুক্তি ব্যাখ্যান শুনিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিতেছি। একদিকে রঘুনাথ, রঘুনন্দন ন্যায় ও স্মৃতির নূতন বিধান দিয়াছিলেন। আধুনিক মহামহোপাধ্যায়েরাই বা দর্শনের নূতন বিধান দিবেন না কেন? নূতন বিধান কি না—ভারতীয় দর্শন চিরদিন মুক্তির সন্ধান করিয়াছে ইহা বিদেশীয় দর্শনের মত অধিমূর্খীন নহে—ইহাতে অনুসন্ধিৎসা নাই—আছে শুধু মুক্তি—শুধু মুক্তি।' শ্রীমান্ মহামহোপাধ্যায়দের হাতে পড়িয়া ভারতীয় দর্শনও সত্যই আজ মুক্তির মোক্ষ দশায়ই আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

• • • •

অনুসন্ধিৎসা ছাড়া দর্শন করে কে—দর্শনের বিধান দিতে পারে কে? এতকাল আমরা জানিতাম আত্ম-অনুসন্ধান্ হইতেই দর্শনের উৎপত্তি। আজ মহা-মোহরা মূল ভাঙ্গিতেছেন না আরও মূলের ঘোরে ফেলিতেছেন!

• • • •

তবে মহামহোপাধ্যায় বক্তৃতা-শেষে সমাগত শ্রোতৃ-মণ্ডলির সাধু সাধু উচ্চারণের সঙ্গে বলিয়াছিলেন—জানি আমার কথা শুনিয়া অনেকেই হাসিবেন—তবু ইহাই ভারতীয় দর্শনের সার কথা।' সাধু!

সমালোচনা

শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ। এগানি ছবির এলবাম। শ্রীযুক্ত প্রেমেশচন্দ্র সোম বি-এ সম্পাদিত, ২৪ নং বিডন ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান একাডেমী অফ্ আর্ট ভবন হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷০ ইহাতে স্বপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী হেমেন্দ্র নাথের কয়েকখানি চিত্রের প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর নিকট হেমেন্দ্রনাথের চিত্রের পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র, আমরা সে পরিচয় দিবার বাসনা রাখি না। বঙ্গদেশের সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর সাময়িক পত্রাদি যাঁহার অঙ্কিত চিত্রের প্রতি লিপি ছাপিয়া বঙ্গদেশ বাসীকে উপহার দিতেছেন, বঙ্গের বাহিরে ভারতের সর্ব্ব প্রদেশে যে চিত্রকরের চিত্রের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলি যাহাতে লোকে অল্পমূল্যে ও অল্প আয়াসে সংগ্রহ করিয়া স্থায়ীভাবে রাখিতে পারে, তাহারই সুবিধা এই শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ করিয়া দিয়াছে। হেমেন্দ্রবাবুর অঙ্কিত মূল্যবান মূল চিত্রগুলি গৃহে সম্পূর্ণ রূপে রক্ষা করা সাধারণের পক্ষে সহজ নহে, অথচ প্রতিষ্ঠাবান্ শিল্পীর মনমুগ্ধকর চিত্রগুলি গৃহে রাখিতে না পারিলেও যেন সহজই হইতে পারা যায় না। "শিল্পী হেমেন্দ্র নাথ" শিল্পানুরাগী ললিত-কলার সৌন্দর্য্য পিপাসু সুধী জন মণ্ডলীকে অনুষ্ঠ সেবার অধিকার দিয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। হেমেন্দ্রনাথের অন্যান্য চিত্রগুলিও ক্রমশঃ খণ্ড খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। এলবাম-খানিতে শিল্পীর সর্ব্বজন-বিদিত চিত্র সমূহ হইতে বাছিয়া বারখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। চিত্র-পরিচয়ও অতি সুষ্ঠুই ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে।

এ যুগের বাংলা কবিতা

[শ্রীরমেশ বসু এম্-এ]

এ যুগের বাংলা কবিতা সম্বন্ধে এদেশে ও বিদেশে বিশেষ আলোচনা হয় নাই। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারার বিচার করিতে গেলে এ যুগের কবিতার স্থান কোথায় নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহার জন্য কোনও আসরে বাদী ও প্রতিবাদীর যুক্তিতর্কের ফলে কোন সিদ্ধান্তই স্থির হয় নাই। অথচ এ কালের কোন কোন সমালোচক বিনা বিচারে এ কালের কবিতাকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিতে চান। অন্ত অন্ত সব যুগের বাংলা কবিতা নাকি বাঙ্গালীর হৃদয় হইতে উৎসারিত হইয়াছিল—তাই তাহার মধ্যে জাতীয়তার ছাপ আছে; আর এযুগের কবিতা নাকি সহরে বসিয়া লেখা হইয়াছে বলিয়া এবং শিক্ষিত পাঠকের জন্য রচিত বলিয়া তাহার মধ্যে বাঙ্গালীর নিজস্ব কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই রূপ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে প্রাচীন ও আধুনিক এই দুই যুগেরই কবিতা বেশ ভাল করিয়া পড়া দরকার। অথচ আমরা জানি যে বাংলা দেশেরই খুব কম লোকে বাংলা কবিতা মন ও প্রাণ দিয়া পড়িয়া থাকে। মাসিকের পৃষ্ঠা উল্টাইতে উল্টাইতে দুই এক লাইন দেখিয়া অনেকে কবিতা পড়া শেষ করে। কিন্তু রাশি রাশি অসার ও প্রাণহীন কবিতার জন্ম হওয়া সত্ত্বেও বাণী বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারে এ যুগের যত কবিতা জমা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সংখ্যা খুব কম নহে। নানা বিচিত্র ছন্দের, নানা বিচিত্র রূপের, ও নানা বিচিত্র প্রাণের প্রকাশ হওয়াতে এ যুগের বাংলা কবিতা প্রাণপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ও বাঙ্গালীর প্রাণে সাড়া জাগাইয়াছে।

এই যে আমাদের বাঙ্গালী জাতি কত যুগ হইতে এই দেশের মাটির উপরে মানুষ হইয়াছে—সে কোনদিন এই অনন্ত রূপের ও সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডারের সন্ধান পায় নাই; নানা দেশ হইতে নানা জাতি আসিয়া এদেশে বাস করিয়াছে—শত বিভিন্নতা সত্ত্বেও একই দেশের আব হাওয়ার মানুষ হইয়াছে বলিয়া দেশকে মা বলিয়া ডাকে নাই। কিন্তু যে দিন সে এই দেশকে মা বলিয়াছে সে দিন সে সমস্ত জাতিকে ভাই বলিয়া বুকের কাছে টানিয়া লইয়াছে এবং সেই দিন হইতেই তাহার প্রাণে এক নূতন বাণী জাগিয়া উঠিয়াছে ও তাহার প্রাণকে আকুল করিয়াছে। এই যে মন্ত্র, এই যে মহাত্মা তাহা এ কালেরই বাণী সাধনা হইতে বাঙ্গালী লাভ করিয়াছে। কতকাল হইতে কত শাস্ত্র, কত আচার, কত ব্রত, কত তপস্যা, কত বিদ্যা, কত সমস্যা জাতিকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে—কিন্তু গড়িতে পারে নাই—গোঁড়ামিরই সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এ যুগের সাহিত্য যেই তাহার সোনার কাঠি স্পর্শ করিয়াছে অমনি সকল চেষ্টার ফল এক জাতীয়তা ও এক প্রাণতার বলে বাঙ্গালী এক মহাজাতিতে পরিণত হইয়াছে। এই যে মৃত সঞ্জীবন মন্ত্র—ইহার দর্শনই ঋষিত্বের পরিচয়। এইরূপ মন্ত্রদ্রষ্টার জন্ম এই যুগেই বঙ্গদেশে সম্ভব হইয়াছে। যেদিন হইতে বাঙ্গালী এই মন্ত্রের সাধক হইয়াছে সেই দিনই সে নূতন মৃন্ময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—সে পূজার অবশ্য এখনও বহু উপকরণ উপস্থিত হয় নাই। কে বলিতে পারে যে বাঙ্গালীর প্রাণশক্তির বলে সে সব উপকরণের উদ্ভব হইবে না? এই সন্ধান বাঙ্গালী সাহিত্য সাধনা হইতে পাইয়াছে। শুধু তাহাই নহে। নিজের মধ্যে আপনার সাড়া পাইবার সে কাল হয় নাই। এই সাহিত্য সাধনাই তাহাকে বিশ্বের দুয়ারে লইয়া গিয়াছে—যেখানে বাহিরের শত বাধা ও বিবাদ সত্ত্বেও মানুষের অন্তরের মিল ও মিলন সাধিত হয়। এ যুগের বাংলা কবিতা যদি এই দুইটি করিয়া থাকে তবে বাঙ্গালীর হৃদয় হইতে উদ্ভূত নহে কে জোর করিয়া তাহা বলিতে পারে?

শঠে শাঠ্যং

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

১

সেদিন রবিবার। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মনে পড়িল আজ হাতে কোন কাজকর্মই নাই। ভাবিলাম আপদ চুকিয়াছে, সপ্তাহের ছয়টা দিন নিজের শ্রাদ্ধোৎসব লইয়া খাটিয়া মরি, আজ সে হাঙ্গামা নাই। বিছানায় গড়াগড়ি দিয়া, খোস মেজাজে আজ দুনিয়ার খবরে মনোযোগ দেওয়া যাক।

কয়দিনের সঞ্চিত,—দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের বোঝা টানিয়া লইয়া শয়ন করিলাম।

দেশ বিদেশের খবর শেষ করিয়া, শেষে নিজেদের খবরে আসিয়া পৌঁছিলাম। অর্থাৎ আমাদের সামাজিক অবস্থা ব্যবস্থার সম্বন্ধে যত খবর,—এবং যত নবানূতন বিধি-বিধান সৃষ্টির ব্যবস্থা হইতেছে, তার সংবাদ! নবানূতন বিধি-বিধান বলিতেছি এইজন্য যে,—প্রচলিত বিধি বন্ধনের যেখানটা কালের ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং শাসন-কসন যেখানটায় ঢিলা হইয়া পড়িবার যো হইয়াছে, সেখানে নূতন লাগাম কসিবার বন্দোবস্ত-উৎসব।

পড়িতে পড়িতে দেখিলাম, উৎসবটা বেশ গুরুতর উৎসাহেই নাথা ঝাড়া দিয়াছে। বিশেষ করিয়া সমাজের সব চেয়ে বড় রকমের বেওয়ারিশ সম্পত্তি—ওই নারী সমস্যাটা লইয়া বেশ জাঁক জমকের মীমাংসাই বাধিয়াছে। বেওয়ারিশ বলিতেছি এই জন্য, যে—এ সমস্যাটার বিচারে যার যেমন খুশী তিনি তেমনি কর্তৃত্ব করিতে পারেন,—বাধা দিবার কেহ নাই। শুধু যাহাদের লইয়া এই সমস্যা, তাহাদের বিশেষ কিছু কর্তৃত্বের অধিকার—এখানে নাই। যাক সে কথা। কেননা ও সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া সত্য কথা কিছু বলাই পাপ।

পড়িতে লাগিলাম,—নারীজাতির উন্নতির বিরুদ্ধে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু উন্নতিটার উপায় কি,—গোল বাধিয়াছে তাহা লইয়া। একদলের মতে—যে ব্যবস্থা নারীজাতির উন্নতির অনুকূল পথ, অন্যদলের মতে সেই ব্যবস্থাটাই নারীজাতির অধঃপতনের প্রকৃষ্টতম পন্থা। তাঁহাদের মতে, নারীজাতিটা প্রভু জগন্নাথের মত হস্তপদহীন অবস্থায় যেমন আছে,—ঠিক তেমনিই থাক। উন্নতিটা আপনিই কুঁইকোঁড় হইয়া উঠুক্। উন্নতি প্রচেষ্টায় যদি কেহ হস্তপদের অস্তিত্ব-প্রমাণের চেষ্টা করে, তবে সেটা পবিত্রতা-বিরোধী, গর্হিত দুষ্কর্ম! সে-হেন পাষণ্ডোচিত ধৃষ্টতা একান্তই অমার্জনীয়। এবং এহেন অস্তিত্ব-প্রমাণ সচেষ্ট হাত পা গুলার ধৃষ্টতা দমনের জন্য হোমিওপেথী চিকিৎসা প্রয়োগই অবশ্য কর্তব্য।

কথাগুলা শুনিতে বেশ ভাল, এবং এ ব্যবস্থা দ্বারা—সমস্যাটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি খুব সহজেই হয়। প্রভু জগন্নাথের স্বাতন্ত্র্য লাভ—এমন ত কিছু দুর্ভাবনার কথা নয়। ভ্রমকুণ্ঠাতুর, অলেজ চর্চ্চা প্রিয় মেয়ে—শুধু মেয়েরা কেন, পুরুষ মাত্রেই ত এরূপ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া থাকেন। সব মেয়ে সেই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিলেই ত ল্যাঠা চুকিয়া যায়। তবে পার্থক্য এই,—জগন্নাথ-দেহ দারুময়। কিন্তু ওই মেয়েগুলির দেহ রক্ত মাংসে গঠিত। জগন্নাথের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তন্দ্রা, নিদ্রা, বাস, বসন ইত্যাদি পার্থিব প্রয়োজনের অভাবে যন্ত্রণা-দুঃখ কিছু আছে কিনা জানা যায় না। কিন্তু ওই পরাগ্রহ নির্ভরশীলা মেয়েদের অনেকের ভাগ্যেই যে সেটা আছে,—এবং সেই অভাবের পীড়নে অনেক শোচনীয় দুরূহ বিদারক দৃশ্যই যে ইহ সংসারে ঘটিতে দেখা যায়,—একথা ধ্রুব সত্য। জগন্নাথের জন্য একবার একটিমাত্র কালাপাহাড় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই রক্তমাংসের দেহগুলাকে মেয়েলিসংস্কারে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য অনেক কালাপাহাড়ী

ব্যবস্থাই যে গৃহে গৃহে বিদ্যমান। তার প্রতিকার ত লোকাস্তরে জগন্নাথ স্বামীর পক্ষে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

খবরের কাগজের বহু নির্য্যাতন ব্রতকথাগুলা না হয় অবজ্ঞার তুড়িতে উড়াইয়া দিলাম। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখিয়াছি যে,—আমার ঐ প্রতিবেশীদের গৃহে—

কিন্তু যাক সে কথা। শত্রু বাড়াইয়া লাভ নাই। কুবুদ্ধি-ঘোরে, একটা প্রাণঘাতী অন্যায়ের বিরুদ্ধে একবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম বলিয়া যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছি সে ত জীবনে ভুলিবার নয়। কাণ মলিয়া শপথ করিয়াছি, যারা দুর্ব্বল, যারা অত্যাচার পীড়িত,—আর কখনও তাহাদের উপকার করিব না। অন্ততঃ সজ্ঞানে ত নয়ই!

পুরাতন কথা মনে পড়িতেই মনটা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। খানিকটা হতবুদ্ধির মত বসিয়া ভাবিলাম। বাস্তবিক, এ দুনিয়াটা নির্জ্জলা জুলুমের রাজত্ব। এখানে যার জোর আছে,—মুল্লুকের মালিক হইবার অধিকার, মাত্র—তারই!

দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া আবার পড়ায় মন দিলাম। একটা নূতন লেখা চোখে ঠেকিল। নারীজাতির নিরুপায় অত্যাচার পীড়িত অবস্থার সংস্কার-প্রয়াসিনী, একজন মহিলা লেখিকার উদ্দেশে অযত্ন শ্লেষ বর্ষণ করিয়া প্রবন্ধটি রচিত। খুব উপাদেয় প্রবন্ধ সন্দেহ নাই! বিদ্বেষাক্ত ইংরাজীর সৌরভে মন মোহিত হইয়া গেল!

সমস্ত প্রবন্ধটি পড়া শেষ করিয়া নীচে নাম স্বাক্ষর দেখিলাম "সুনীলা দেবী!"

নূতন নাম! কে ইনি? যাঁহার উদ্দেশে এই ঈর্ষাপঙ্ক ছিটানো হইয়াছে, তাঁহাকে যে কার্য্যোপলক্ষ্যে আমিও চিনি! বেশ জানি, তিনি এ পঙ্ক-উৎসব অভিষেকের সম্পূর্ণ উপযুক্তা। কেননা দুর্ব্বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া,—আমার সেই একবারের লাঞ্ছনার মত বহু লাঞ্ছনাই তিনি ম্লানবদনে বহুবার গ্রহণ করিয়াছেন। আর বহু অত্যাচারকেই বহুবার আঘাত করিয়াছেন,—সুতরাং বহু অত্যাচারীকেই নিজের শত্রু করিয়া রাখিয়াছেন! অতএব এ অভিনন্দন তাঁহার একান্ত উপযুক্ত, আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই!—

কিন্তু এই একান্ত কল্যাণময়ী পরম কল্যাণীয়া সুনীলা দেবীটি কে?···প্রবন্ধটা আবার আগাগোড়া পড়িতে লাগিলাম। বা! বা! সমস্তই যে পরিচিত কণ্ঠের বাণী বলিয়া মনে হইতেছে! এই ঈর্ষাক্ত ক্রূর-কুটিল খলতা, কোথায় যে শুনিয়াছি, কোথায় যে দেখিয়াছি···!

কিন্তু সে কোথায়?...

২

চাকর আসিয়া খবর দিল, ভৈরববাবু দর্শনাকাঙ্ক্ষী।

বলিলাম "এখানে নিয়ে এস।"

ভৈরববাবু আমার প্রতিবেশী। তিনি শিক্ষিত—তথা বড়ঘরের চাকুরে ভদ্রলোক। অতএব আমরা কলম-পেশা কেরাণীর দল তাঁহাকে খাতির করি।

ভৈরব বাবু স্বভাবতঃ খুব নিরীহ ভদ্রলোক। চাল-চলন পল্লীগ্রামের ন্যাকা-মেয়ে-সুলভ। সোজা কথায় বেহেলি ন্যাকামি পূর্ণ। প্রাণপণ চেষ্টায় মেয়েলি ধরণের মিহি সুরের বোল, সেই ধরণের চেষ্টা-বিকৃত,—অদ্ভুত সাইজের হুঁ হুঁ হাসি, বক্র কুটিল কটাক্ষ—পায়ে পায়ে জড়াইয়া সোপিনীদের ঘমুনা-গমন ধরণের চলন,—সমস্তই ঠিকঠাক্! অবশ্য আমি এ সকল রুচি বৈচিত্র্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিই না। ভৈরব বাবুর বন্ধুরা ওই ব্যাপারটা লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন এবং এই অধম বৃদ্ধের উপর অনুযোগের শর বর্ষণ করিয়া বলিতেন "দাদা, কেরাণীর নকল নবিশি করে চুল পাকালে, কিন্তু এমন মধুরতম ন্যাকামির নকল নবিশি কিছুই আয়ত্ত কর্‌তে পারলে না?"

কি জবাব দিতাম বলিয়া কাজ নাই। তবে নিজের কৃতিত্ব হীনতায় আমি যে আদৌ দুঃখিত ছিলাম না, এটা ধ্রুব সত্য।

ভৈরব বাবু ঘরে ঢুকিয়া স্বভাব সিদ্ধ বক্র কটাক্ষে একবার চারিদিক চাহিলেন। তারপর মুখ তুলিয়া মিহিতম আওয়াজে বলিলেন "কি হচ্ছে দাদা?"

সংক্ষেপেই বলিলাম "বিষবার্ত্তা পড়ছি ভায়া, বসুন।"

ভায়া বসিলেন। হুঁ হুঁ করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন

"ও কাগজখানা আজকাল প্রথম শ্রেণীর কাগজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চমৎকার চলছে নয়?"

অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। ভায়া একজন তৃতীয় শ্রেণীর বি-এ। সাহিত্যেও একজন মস্ত বড় বিদ্যা-দুরন্ধর না-কি একটি চিজ্ বটে। তাঁহার অভিমত অবহেলা করিবার সাহস হইল না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া ভয়ে ভয়ে বলিলাম "কেমন চলছে তা ঠিক জানি নে। কিন্তু মেয়েদের কথা নিয়ে এরা নিতান্তই অনধিকার-চর্চ্চা করে চলছে বলে মনে হয়।"

জানিতাম, ভায়া প্রথম জীবনে আধুনিকতার উগ্র উপাসক ছিলেন। তারপর গুটিকতক ধার পরিগ্রহ ও গুটিকতক সন্তান লাভের পর, আধুনিকতার উপর একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। নিজের কন্যার বিবাহ প্রসঙ্গে পণপ্রথার বিরোধী। কিন্তু পরের কন্যাদের বিবাহ করিয়া গৃহে আনিবার সময় তিনি পণপ্রথার উপর প্রসাঢ় শ্রদ্ধাবান। তাছাড়া দোল দুর্গোৎসবে শ্বশুরবাড়ী যাত্রা স্ত্রীর ও সন্তানদের চিকিৎসা খরচ—ইত্যাদির ট্যাক্স তিনি শ্বশুরবর্গের শিরে যথা-অযথা নির্দ্বিধেই চাপাইয়া থাকেন। এ লইয়া পারিবারিক অশান্তি বিবাদ মন কষাকষি চলিতেও শুনিয়া থাকি। তত্রাচ তিনি—নিরীহ ভাল-মানুষ! অতএব অতি সাধু সজ্জন ব্যক্তি!

ভায়া আমার কথা শুনিয়া গুম্ হইয়া গেলেন। মনের ভাব খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করিবার পাত্র তিনি নন্। অত মন-খোলা হইলে—নাকি ব্যাকামির মাধুর্য্য ও নিরীহত্বের সৌকুমার্য্য টেকে না। অতএব তিনি অতি সৌখীন শ্রেণীর ঘর ভাবী! একটু নীরব থাকিয়া স্নেহের স্বরে বলিলেন "কেন? সকলেই ত ঐ কাগজখানার খুব সুখ্যাতি করছে। কালকের কাগজে সুনীলা দেবীর একখানা প্রবন্ধ বেরিয়েছে, সেটা পড়ে দেখুন দেখি। সকলেই বলছে কাগজখানা খুব উচ্চশ্রেণীর মূল্যবান মৈনিক পত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

বটে! সেই অমূল্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটি অত কাগজখানির মূল্য এত বাড়িয়াছে? চমৎকৃত চিত্তে একটা কথা বলিতে যাইতেছিলাম। কিন্তু সামলাইয়া লইয়া বলিলাম "হাঁ, সুনীলা দেবীর লেখা পড়েছি, ইনি কে বলুন দেখি?"

অস্বাভাবিক উৎসাহে ভায়ার মুখ হঠাৎ আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল! সোৎসাহে তিনি বলিলেন "কেমন পড়লেন বলুন দেখি?...কে' আচ্ছা জুতো দিয়েছে নয়? খাসা লিখেছে নয়?"

ভায়ার এতখানি আহ্লাদের কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম "এই নতুন লেখিকাটির পরিচয় জানেন?"

হুঁ হুঁ করিয়া হাসিয়া আধ আধ স্বরে ভায়া বলিলেন "জানি বই কি। না জানলে কি চলে? লেখাটা কার্ক্লাস হয়েছে কি না বলুন?"

বলিলাম "লেখিকা আপনার পরিচিতা? ও! তাহলে লেখাটা ফার্ক্লাস হওয়াই উচিত বই কি! বলুন ত উনি কে?"

ভায়া যেন কি একটা অপরিসীম গৌরবের আতিশয্যে এদিক ওদিকে হেলিয়া দুলিয়া পরম পরিতৃপ্তির হাসি হাসিলেন। তারপর পায়ের উপর পা তুলিয়া বসিয়া মোলায়েম সুরে বলিলেন "কাউকে বলবেন না। আমার মেয়ে চেঁপির নাম সুনীলা দেবী।"

বিস্ময়ের আধিক্যে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। বলিলাম "চেঁপি! সেকি! তার বয়স তো মোটে আড়াই বছর! —সে লিখলে কি করে? তা হলে এ লেখা—"

গোঁফে তা দিয়া, মুখ টিপিয়া হুঁ হুঁ করিয়া হাসিয়া ভৈরব বাবু বলিলেন "আমিই তার হয়ে লিখে দিয়েছি। মেয়েদের গালাগালি দিতে হলে মেয়েদের নামের আড়ালে আশ্রয় নেওয়াই নিরাপদ। নইলে পুরুষদের কেউ আবার পাল্টা জবাব দিয়ে বসতে পারেন! বুঝলেন দাদা, এ হচ্ছে একটা বেষ্ট্ পলিসি!"

বাহিরে দুই ঠোঁট একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। অন্তরের অন্তস্থলে দীর্ঘশ্বাসের সহিত ধ্বনিত হইল "এতদূর কাপুরুষ!"

৫

দুয়ারের নিকট হইতে আমার ভাগিনের নিরুপম বলিল "মামা, কালকের বিষবার্ত্তা কাগজখানা আপনার এখানে আছে?"

"আছে। কেন?"

"আমার বন্ধু অমূল্য ওই অফিসের ঠিকানাটা নেবে।"

ভৈরববাবু উৎসাহ চঞ্চল হইয়া বলিলেন "কেন কেন? ওদের অফিসের ঠিকানায় অমূল্যর কি দরকার?"

নিরুপম বিশ্ববার্ত্তা খানা তুলিয়া লইতে লইতে অন্যমনস্কভাবে বলিল "অমূল্য কি একখানা প্রবন্ধ পাঠাবে বুঝি।"

ভৈরববাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অবজ্ঞা ও স্নেহ মিশ্রিত স্বরে বলিলেন "প্রবন্ধ পাঠাবে অমূল্য? অমূল্য আবার প্রবন্ধ লিখতে শিখেছে না কি? নিয়ে এস তো দেখি।"

নিরুপম বলিল "সে যে প্যাকেট বন্ধ করে ফেলেছে।"

নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া ভৈরববাবু বলিলেন "হলেই-বা! দেখে আবার বন্ধ করে দেব। ভাল হয়তো এক কলম সার্টিফিকেট লিখেও দিতে পারি, অবশ্য যদি মন্দ। অমূল্যকে বল ওদের অফিসে আমার মত অথারিটি আছে।"

নিরুপম হতবুদ্ধি হইয়া গেল! ভৈরববাবু চঞ্চল হইয়া বলিলেন "ডাক, ডাক, অমূল্যকে এইখানেই ডাক।"

নিরুপম ত্যাবাচাকা খাইয়া—অগত্যা অমূল্যকে ডাক দিল। সভেজ অথচ প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি তরুণ অমূল্যচন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিল। অমূল্য গরীবের ছেলে, টিউশনি করিয়া নিজের লেখাপড়ার খরচ চালায়। খুব উৎসাহী কর্ম্মঠ প্রকৃতির ছেলে। সমাজ সংস্কারের চেষ্টার ইতিমধ্যেই বার কয়েক লাঞ্ছনা লাঞ্ছিত। বর্ত্তমানে সে কোনও বিখ্যাত কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে।

অমূল্য ঘরে ঢুকিতেই, ভৈরববাবু চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন "কে হে? তোমরাও সবাই "লিখিয়ে" হয়ে উঠলে? নয়া হুয়া যে খুশী সেই আজকাল লিখছে! বাংলা সাহিত্যটার আর জাত রাখলে না দেখছি।"

নিরুপমের হাত হইতে বিশ্ববার্ত্তাখানা লইয়া অমূল্য ঠিকানা দেখিতে দেখিতে বলিল "সাহিত্য সাধারণের সম্পত্তি।" তারপর পকেট হইতে একটা কাগজের প্যাকেট বাহির করিয়া টেবিলে ফেলিল। বিশ্ববার্ত্তার ঠিকানার দিকে চোখ রাখিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে ঠিকানা লিখিতে লাগিল।

ভৈরববাবু উষ্ণ হইয়া উঠিলেন। ত্যাংচাইয়া বলিলেন "সাহিত্য সাধারণের সম্পত্তি! তা বলে যে সে লিখবে? বা!—তাহলে আমি একজন বি-এ, গ্র্যাজুয়েট—সরস্বতীর বরপুত্র, আমিও সাহিত্য চর্চ্চা করব, আমিও লিখব, আর ওই রাস্তার কলাওলাটা—ও ও লিখুক! আর যে তোমার জুতো সেলাই করে দেয়, সেই মুচিটাও লিখুক!—

ঈষৎ হাসিয়া অমূল্য বলিল "ক্ষমতা থাকলে লিখতে পারে বই কি? রাশিয়ার কাউণ্ট টলষ্টয়—"

ক্রুদ্ধ হইয়া ভৈরববাবু তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিলেন "বৈদেশিক আদর্শ আমদানি,—চাই না। আমাদের দেশের আদর্শের পক্ষে কোনটা স্বাস্থ্যকর, সেটা বিচার কর। এই যে আমাদের দেশের মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়ছে, এটা কি ভাল হচ্ছে? না,—এই যে তারা সাহিত্যে অনধিকার চর্চ্চা করতে আসছে, এইটে উচিত হচ্ছে?"

অমূল্য প্যাকেটটি হাতে লইয়া বাহিরে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল "আসছি।"

ভৈরববাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনিও বুড়ো মানুষ, আপনারও মাথার চুল পেকেছে। আপনি বলুন দেখি, মেয়েদের এই সব লেখা পড়া চর্চ্চা—এর ফল কতদূর খারাপ দাঁড়ায়? মেয়েদের নাম জাঁকান ভাল?"

আমি ঠোঁট-কাটা বুড়া, সুতরাং জিভ্ চুলকাইয়া উঠিল! ইচ্ছা হইল, পাল্টা প্রশ্ন করি,—ভৈরববাবুর মনে যদি এতখানিই তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইয়াছে, তবে নিজের নিরপরাধ নিরক্ষর কচি মেয়েটির নামের উপর এমন ঘৃণ্য অত্যাচার করিলেন কেন? যাত্রাদলের পুরুষেরা গোঁফ কামাইয়া বৃন্দাদূতী সাজে, রাধারাণী সাজে, মহারাণী মেথরাণী সাজে, মেয়েলি হাবভাব অনুকরণ করে, নাকি সুরে টানিয়া বলিয়া কথা কয়,—সেগুলা কৌতুকের খাতিরে না হয় সহ্য করিতে পারি, কিন্তু ভৈরববাবুর মত একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের—এই সন্তর্পণ—অবগুণ্ঠন-মণ্ডিত, পাড়া-কুঁদুলি ঝিন্দি-বাউরিনী জনোচিত নৃত্য এটা শোভনীয় মনে হইতেছে না। হয়েইই শোচনীয় বোধ হইতেছে।

কিন্তু স্পষ্ট করিয়া সত্য কথা বলাই পাপ। বলিতে গেলে কথাগুলাও অত্যন্ত রূঢ়-কর্কশ শোনায়। তাছাড়া স্ত্রী কন্যা লইয়া আমাকেও সমাজে বাস করিতে হইতেছে। ভৈরববাবুর কবরাস মত আদর্শ প্যাটার্ণের ছাকানিতে তাঁহারা হয়ত পরিপক্ক না-ও হইতে পারে, এবং সে ত্রুটির জন্য তাহাদের আস্তাবোড়া বেতপেটা করিয়া, কেরোসিন ঢালিয়া পুড়াইয়া মারিবার সংসাহস সম্ভবতঃ আমার নাই। অতএব এতগুলা দুর্ব্বলতা বুকে থাকিতে ভৈরববাবুর মত প্রচণ্ড-পৌরুষ প্রতাপশীল,—রুদ্র ভৈরবকে ভয় করাই উচিত! সুতরাং নিরুত্তর রহিলাম।

৪

অমূল্য ধৃষ্ট হস্তে ঘরে ঢুকিল। বলিল "আপনি কি বলছিলেন মেয়েরা স্কুল কলেজে আর সাহিত্যে অনধিকার চর্চ্চা করছেন?"

ভৈরববাবু নিদারুণ শোকাহত হইলেন! অনেকগুলা পদ্য আওড়াইয়া বিস্তর মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া, তিনি এক লম্বা শোকোচ্ছ্বাস উদ্গার করিলেন। তার মোট অর্থ, মেয়েদের বিদ্যাচর্চ্চা শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপ। সত্যযুগে ঋষিকন্যা ও ঋষিপত্নীরা কেহ কেহ সে পাপটা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেটা সত্যযুগ বলিয়া— পাপটা ক্ষমার্হ। এ কলিযুগে সে স্পর্দ্ধা একান্তই অমার্জনীয়।

অমূল্য কিছুমাত্র বিচলিত হইল না! খুব গম্ভীরভাবে বলিল, "সম্ভব।"

"শুধু সম্ভব? একান্তই···" ভৈরববাবুর নাকি সুর অধিকতর তীক্ষ্ণ সমুন্নাসিক হইয়া উঠিল। পৃথিবীর সমস্ত ক্রেদ নিঙড়াইয়া নিঙড়াইয়া মেয়েদের শিক্ষা দীক্ষার উপর বর্ষণ করিতে করিতে তিনি শোকাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শেখা আর সমাজের সর্ব্বনাশ করা,—একই কথা। অবশ্য একটু আধটু বাংলা শেখা মন্দ নয়, কিন্তু নাটক নবেল বা অন্য কিছু তাদের হাতে ছোঁওয়া মোটে উচিত নয়। ভাল ভাল কবিতার বই পড়া তাদের একান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতা এতই বেড়ে উঠেছে, যে এসব তারা পছন্দই করেন না! অধঃপতনের বাকী কি?"

মনে পড়িল ভৈরববাবু কতকগুলি কবিতার বই ছাপাইয়াছেন, কিন্তু—থাক সে কথা। তাঁহার উৎসাহ প্রশংসনীয় এই কথাই বলা ভাল। কিন্তু তাঁহার বোধশক্তির অনুপম সূক্ষ্মতা,—তাঁহার সমস্ত অঙ্গের নাকিসুরের তীক্ষ্ণতারই অনুরূপ! দম্ভ, আত্মম্ভরিতা, এবং পরমুৎসাময়ী, দ্বেষ, ঈর্ষাকে যতই শানাইয়া চক্‌চকে করা যাক, ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই। তাঁহার মূল্যবান কবিত্ব প্রতিভা জন সমাজে আদৃত না হওয়ায়, তিনি একদিকে যেমন অপরিসীম ক্ষোভে আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চ্চার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, এই পাপিষ্ঠাদের প্রভাব ঘোচেই তাঁহার প্রতিভা মাথা তুলিয়া দশদিক উজ্জ্বল করিতে পারিল না এবং তাঁহার অবশ্য প্রাপ্য জয়মাল্যটা, ইহাঁরাই জুয়াচুরি করিয়া আত্মসাৎ করিল!

সুতরাং ভৈরববাবুর মনোবেদনার অর্থ বুঝিলাম। মেয়েদের সম্বন্ধে কবিতা পাঠ করিবার বিল পাশ হইল দেখিয়া,—অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও স্বস্তিবোধ করিলাম। বহুল কৃপণের হাত হইতে সিকি মুঠা সুদ ভিক্ষা পাওয়াও সুধার্ত্ত ভিখারীর পক্ষে পরম লাভ! বাংলাদেশের সাহিত্য-মাতৃশক্তি ভৈরববাবুর মত মহাপুরুষের দয়াশক্তির এই দমকা খরচে—আশা করি কৃতার্থ হইয়া যাইবে।

ভৈরববাবুর বক্তৃতা শেষ হইলে অমূল্য গম্ভীরভাবে বলিল, "স্বীকার করছি, মেয়েরা কবিত্ব-মাধুর্য্য উপলব্ধি করেন না,—অন্ততঃ আপনার কবিত্ব মহিমায় যে অভিভূত হয়ে পড়েন নি, এটা তাঁদের ঘোরতর ধৃষ্টতা! এ অপরাধের জন্য তাঁদের সাইবেরিয়ার মত কোন একটা স্থানে নির্ব্বাসন দেওয়া উচিত,—এটাও আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। কিন্তু—"

বাধা দিয়া কর্কশস্বরে ভৈরববাবু বলিলেন, "তারো অমূল্য তোমার চেয়ে আমি ঢের বেশী শিক্ষালাভ করেছি—"

অমূল্য বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। শিক্ষায় আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী অগ্রসর, সেজন্য আপনাকে সম্মান করি। কিন্তু বুদ্ধি,—যেকোনো কর্ম্মের কর্ম্মতা, কাণ্ডজ্ঞান,—সেগুলো

আলাদা জিনিস। অন্ধ বিদ্বেষভরে, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে, মিথ্যা কুৎসা গ্লানি প্রচার করলে, সেটা অন্ধ ভক্তিভরে স্বীকার করি,—এতটা সততা আমার মধ্যে নাই।"

ভৈরববাবু মুখ ভ্যাংচাইয়া নাকি সুরে বলিলেন, "বুদ্ধিটা তোমাদেরই খুব বেশী! তোমাদের এই সব আস্কারাতেই মেয়েরা অহঙ্কারে ধরাকে সরা দেখছে! তোমাদের জন্যেই তারা উচ্ছন্নে যাচ্ছে! মেয়েদের অবস্থা যারা বোঝে, সেই সব বিজ্ঞ লোকরা কি বলে জান? আচ্ছা দেখি এই সুনীলা দেবীর লেখা পড়ে,—ইনি একজন ধুরন্ধর মত শিক্ষিতা মেয়ে, ইনি মেয়েদের স্বাধীনতার সম্বন্ধে কি বলছেন, পড় দেখি!"

অমূল্য বলিল "পড়েছি, এবং এঁর প্রবন্ধ আমাদের কতকগুলা নূতন চিন্তার খোরাকও দিয়াছে। ইনি শিক্ষিতা হোন, চাই না হোন, কিছু এসে যায় না। ক্ষুর সর্প মণির দ্বারা ভূষিত হলেও,—ক্রূরতায় ভয়ঙ্কর! ইনি যতই মোলায়েম নাকি সুরে ন্যাকামি প্রকাশের চেষ্টা করুন, এঁর নির্লজ্জ মিথ্যাবাদিতার ভেতর দিয়ে কেবল এঁর নীচাশয়তা ছাড়া কোন মহত্বই প্রকাশ পায় নি। যাঁর উদ্দেশে এই নীচ আক্রমণ চলেছে, তাঁকে আমি—আপনাদের চেয়েও ভাল জানি। জানি, ভণ্ডামিকে যে আঘাত করে, তার ওপর ভণ্ডের দল খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে! কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি,—এই নতুন সুনীলা দেবীটি অত ভণ্ডামিতে পরিপক্ক হলেন কি করে?"

ভৈরববাবুর সমস্ত-অভ্যন্ত নাকি সুর অকস্মাৎ বীভৎস রবে গর্জ্জিয়া উঠিল! ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া তিনি বলিলেন "তুমি ছোট্ট লোক! অত্যন্ত ছোট লোক! তোমার আর খেতে কাল নেই, তুমি কোন্ সাহসে এত চুলচেরা করছ? তুমি জানো, এই সুনীলাদেবী বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞানে বয়সে তোমার চেয়ে ঢের বড়। ইনি একজন এম-এ, পাশ মেয়ে মানুষ!"

অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইল! উঠিয়া দাঁড়াইয়া যোড়-হাতে বলিলাম "ভৈরববাবু অনেকগুলোই মিথ্যে বললেন! আর নয়, মাপ করুন এবার! আপনার এই এম-এ, পাশ সুনীলাদেবী পুরুষ মানুষ না হতে পারেন, কিন্তু ইনি যে মেয়ে মানুষ নন, সেটা আপনি ভালই জানেন। কেন আর আপনার পোষাকের বাহারের মর্য্যাদাটা নষ্ট করছেন? অনুগ্রহ করে বাড়ী যান। এ ভাকা-হাকা বজ্জাতের পাল্লায়, 'মিষ্টিমিটে ভাল্ ছেলে খাবার রাক্ষসদের' বেশী কিছু সুবিধার আশা নেই। আস্তে আস্তে গাত্রোত্থান করুন।"—

ভৈরববাবু মুখ গোঁজ করিয়া উঠিলেন। অমূল্যের দিকে না চাহিয়াই বলিলেন, "কই দেখি তোমার সেই প্রবন্ধটা। একবার পড়ে ফেরৎ দেব।"

অমূল্য সংক্ষেপে বলিল, "সেটা তাঁকে ফেলে দিতে পাঠিয়েছি। আসছে সংখ্যার বিশ্ববার্ত্তায় সেটা দেখতে পাবেন।"

ভৈরববাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "কি সম্বন্ধে সেটা লিখেছ? রাজনীতি?"

অমূল্য বলিল "আজ্ঞে না। সাধারণ মনুষ্য-নীতি সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। আপনার পরিচিতা —এই মাননীয়া সুনীলা দেবী অনেকগুলি নূতন কথা ভাববার সুযোগ দিয়েছেন, তাঁকে ধন্যবাদ। তাঁরি প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু—"

বিস্ময়ে—এবং সম্ভবতঃ অন্য কোন অব্যক্ত কারণে—ভৈরব বাবুর মুখ হঠাৎ—হাঁ হইয়া গেল! অমূল্যের কথায় বাধা দিয়া বিপুল ব্যগ্রতাভরে তিনি বলিলেন "তাঁরি প্রবন্ধ সম্বন্ধে? তাঁর সম্বন্ধে?...কি.. কি লিখেছ তুমি?"

অমূল্য বলিল "কপিত্ব বিকাশক ন্যাকামি প্রকাশের দুশ্চেষ্টা ছেড়ে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করতে, এবং ব্যক্তিগত ঈর্ষা বিদ্বেষ ছেড়ে তাঁকে মনুষ্য জনোচিত কাণ্ডজ্ঞান স্মরণ রেখে চলতে অনুরোধ করেছি। অপরের শক্তি-মত্তায় হিংসা করে, তিনি নিজে যে সকলের অশ্রদ্ধেয় হচ্ছেন, সে কথাটা তাঁর কাণ্ডজ্ঞানের এলেকায় আসে নি, —বন্ধুভাবে তাই একটু সৎপরামর্শও দিয়েছি।—"

ভৈরববাবুর চোখ দুটি অতিরিক্ত মাত্রায় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল!

নিয়তি

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

আমি একলাটি এক মুক্ত মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ মনে হল, কে যেন ধীরে ধীরে—অতি সাবধানে আমার পিছু পিছু আসছে। ঘুরেই দেখি—এক জরাজীর্ণা বৃদ্ধা। দূরের কথলে তার সারা গা ঢাকা, শুধু মুখখানা দেখা যাচ্ছে।

উঃ কি ভীষণ চেহারা! গায়ের চামড়া তার কুঞ্চিত,—রংটা একেবারে ছ্যাকাসে হলদে হয়ে গেছে,—নাকটা অসম্ভব রকমের তীক্ষ্ণ,—দাঁতের চিহ্নও নেই! আমি তার কাছে এগুতেই সে কাছে এসে দাঁড়াল।

'তুমি কে? কি চাও? ভিক্ষুক? ভিক্ষা নেবে?' বুড়ী একটি কথারও জবাব দিলে না। আমি তার দিকে মোয়াতেই দেখি, তার চোখ দুটি একটা স্বচ্ছ আবরণ—না—চামড়া দিয়ে ঢাকা। কোন কোন পাখীরও এমনি আবরণ দেখেছি। এ দিয়ে তারা আলোর ঝলক থেকে চোখ দুটিকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু বৃদ্ধার এই আবরণ মোটেই নড়ে না,—চোখও যে মেলে না! আমি ভাবলুম—এ অন্ধ!

আবার জিজ্ঞেস করলুম—'তুমি কি ভিক্ষা নেবে? আমার পিছু নিয়েছ কেন?' পূর্বের মত এবারেও সে আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না,—কেবল একটু কেঁপে উঠল।

আমি আবার আমার নিজের পথে চল্লুম। এবারও আমার পেছনে তেম্‌নি সাবধানী—চোরা-পা ফেলার শব্দ শুনতে পেলুম।—'আবার সেই বুড়ী!'

আমি নিজ মনেই ভাবতে লাগলুম—'সে আমার অনুসরণ করছে কেন? অন্ধ কি না, তাই বুঝি আমার পা ফেলার শব্দ শুনে চলছে,—তরুও যে এইভাবে সে লোকালয়ে যেতে পারবে! ও, তাই হবে!'

কিন্তু কেমন একটা অস্বস্তিভাব এসে আমাকে ঘিরে ফেলল! আমার মনে হতে লাগল, সে শুধু আমার পিছু নেয়নি,—আমাকে যেন তার খুসী মত জানে, যাকে ঘুরাচ্ছে—আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও কলের পুতুলের মত তার আদেশ মেনে চলছি!

আমি আবার চলতে সুরু করলুম। কিছুদূর যেতেই দেখি, পথের মাঝখানে এক বিরাট কালো গর্ত্ত। অম্‌নি আমার মস্তকে জেগে উঠল—এ যেন কবর! বুড়ী আমাকে এ দিকেই টেনে আনছে!' আমি তাড়াতাড়ি পিছে সরে পড়লুম। বুড়ী আমার দিকে তাকিয়ে রইল। হাঁ তাই ত, সে যে দেখতে পায়। পাখী যেমন শিকারের দিকে তাকিয়ে থাকে, তেম্‌নি করে সে তার বড় বড় হিংসাভরা চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল! আবার মুহূর্ত্ত পরেই দেখি—চোখ নিশ্চল। এ কি ধাঁধায় পড়লুম!

'এ বুড়ী কি তবে আমার নিয়তি! নিয়তি!—যার হাত থেকে কারুরই মুক্তি নেই!'

আমি পাগলের মত ও পথ ছেড়ে আর একদিকে ছুটলুম...তবু সেই সন্তর্পিত পদশব্দ আমার পিছু ছুটে আসছে। আমার সাম্‌নেও দেখি আবার কালো গর্ত্ত। আবার আর এক পথে ছুটলুম···তেমনি পদ শব্দ আমার পিছনে এবং তেমনি অন্ধকার গুহা আমার সম্মুখে! যে দিকে যাচ্ছি সেদিকেই এরূপ। উপায় নেই। উপায় নেই!

'থাক, আমি তোমায় ফাঁকি দেব,—কোথাও যাচ্ছি না,—এই বলে তক্ষুণি সেখানে বসে পড়লুম। আমার বোধ হল যেন সেই বুড়ী আমার দু'হাত পিছনে চুপ্ করে দাঁড়িয়ে আছে! তারপর দেখি, কি একটা অন্ধকার ভেসে ভেসে আমার দিকে আসছে!

ভগবান্! যে দিকে তাকাই সে দিকেই যে এই বুড়ী!

মুক্তি নেই—মুক্তি নেই—এ যে আমার নিয়তি, এর হাত থেকে এ জীবনে মুক্তি নেই।

(টুর্গেনিভ হইতে)

নর্ত্তকীরাণীর নিজের কথা

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

লোপোকোভা

(Lydia Lopokova)

"আমার প্রথম ক্রীষ্টমাস! কি মধুর সে উৎসব। তখন আমি খুব ছোট, তখন আমি ব্লাডিভোষ্টকে থাকতুম! সেখানে থাকতেই আমার এক খুল্লতাত পত্নী ব্লাগোভেস্নেস্কে নিমন্ত্রণ করে' পাঠালেন। তখন রেল পুল হয়নি কাজেই আমাদের একটা গাড়ীতে করে' যেতে হয়েছিল।

বিশ মাইল পথ গেছি, তখন একদল নেকড়ে আমাদের তাড়া করে। আমার বাবা, আমার ভাই, এঁরা ছিলেন শিকারী, আমাদের গাড়ীর রক্ষকরাও বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো কিন্তু আমার সে সময় ভয়ে প্রাণ বায়ুমুখে পাতার মত কাঁপছিল। আমাদের গাড়ীর চালকটি ছিল খুব চালাক, সে তার ঘর তাড়াতে ছুটা ঘোড়াকে এমনি জোরে হাঁকাতে লাগল যে আমরা আধ ঘণ্টার মধ্যেই একটা সরাইয়ে এসে পৌঁছে গেলুম।

সরাইটি খাঁটি রাশিয়ান। সেখানে সব পেলুম কেবল একটি বিছানা ছাড়া। পান ভোজনের কোন অসুবিধাই আমাদের হয় নি, কেবল শোবার সময় গাধা আর ভেড়ার মাঝে শুয়ে পড়েই কোন গতিকে রাতটা কাটিয়ে দিতে হল। তবে নেকড়ের মুখ থেকে গলাটা বেঁচে গেছল, সেই ভাগ্য। গাধা ভেড়া, এরা নেকড়ের চেয়ে অনেক ভাল।

আজ আমার সে ক্রীষ্টমাসের কথা মনে হলে হাসি আসে। কিন্তু সেদিন হাসি আসে নি, কি এসেছিল তা তোমরাই জান! তারপর অনেক ক্রীষ্টমাস এসেছে ও গেছে, কত হাসি, কত আনন্দ এসেছে সে সকলের কথা তেমন মনে করতে পারিনে। প্রথম ক্রীষ্টমাসের কথা যেমন মনে আছে, আর এক ক্রীষ্টমাসের কথা তেমনি মনে করতে আজো আমি পুলক বিহ্বলা হয়ে পড়ি, সে অনেক দিনের কথা, আমি তখন মাদ্রিদের থিয়েটার রয়েলে।

Les Sylphides অভিনয় হচ্ছিল। সখীদের নৃত্য শেষে দর্শক একেবারে চুপচাপ! আমার বুক কাঁপছিল। ভারি অসাড় ও অস্বস্তি চিত্তে উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবছি যে এমন কেন হল? কেন দর্শক এমন নীরব হয়ে রইলো—ভেবে মরছি, এমন সময় কয়েকজন সাহিত্যিক ও সংবাদপত্র-সেবী ষ্টেজের মধ্যে এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। সাহিত্যিকদের চোখ কি-না, একেবারে যেন আমার ভিতরটা অবধি দেখবার খোঁজে এগিয়ে আসছিল! নিঃশব্দে তাঁরা কয়েক মিনিট ধরে আমার আপাদ মস্তক পরীক্ষা করে' চলে গেলেন। বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখনও আমার ঘাড়, আমার পা—গুলোর দিকে চোখ,—চাইতে চাইতে গেলেন।

তখনও আমার হাত পা কাঁপছিল। সত্যি কথা বলতে কি আমার গলা যেন শুকিয়ে কাঠকাটা হয়ে গেছলো? এ সবের মানে কি? সাহিত্যিকদের কাছে কি এমন অপরাধ আমি করেছি, ভাবতে আরও আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ অসংখ্য দর্শকের পুনঃপুনঃ কর শব্দের সঙ্গে আমার নাম শুনে চমকে উঠলুম। আমার নাম! কেন? কেন?

কারণ আমি পরে বুঝেছিলুম। সাহিত্যিকবৃন্দ কি-না, সাহিত্যিকরা ভেবেছিলেন, আমি একটা পুতুল, আমাকে তাঁরা নাচান হচ্ছে! বলিহারি বুদ্ধি! না, না, তাঁদের দোষ তত নেই। দর্শকরাই নাকি বলে যে ওটা

পুতুল, তারে নাচ্‌ছে, তারাই সাহিত্যিক ক'জনকে প্রতিনিধি করে ষ্টেজের ভিতর গিয়ে দেখে আসতে বলে। দর্শকদের কোন মতেই বিশ্বাস হয় নি যে আমি যেমন নেচেছিলুম, তেমন নাচ নাকি রক্ত মাংসের দেহ নিয়ে কেউ নাচতে পারে! তারা ঠিকই করে নিয়েছিল যে তারের দ্বারাই নাচ হচ্ছে। তারপর সাহিত্যিকরা যখন ফিরে গিয়ে জানিয়ে দিলেন যে পুতুল নাচ নয়, একটা আস্ত রক্ত মাংসের মানুষই নাচছে বটে, তখন দর্শকদল সমস্বরে আমার নাম ধরে চিৎকার করে উঠ্‌লো, সে হাততালি আজও আমার কাণে মধু বৃষ্টি করছে। সেও এক মধুর ক্রীষ্টমাস!

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, সবচেয়ে মধুর ক্রীষ্টমাস আমার কোথায় কেটেছে—এ কথা বলা বড় শক্ত। পৃথিবীর যে ভাগে যখন গেছি সেইখানেই সময় আমার মধুর হয়ে উঠেছে। মনে পড়ে আমার সাইবিরিয়ার কথা, মনে পড়ে আমার, আর্জেন টাইনের কথা, মনে পড়ে আমেরিকা, স্পেন, ইংলণ্ড সর্ব্বত্রই আমার সুখে কেটেছে। তবে এও মনে হয় গত বৎসর—১৯২১ সালে লণ্ডনের এালাম্ব্রার "মৃত্ত রাত্রকন্যায়" আমরা যখন সদলবলে নেচেছি, তখন আমার সর্বোত্তম ক্রীষ্টমাস অতিবাহিত হয়েছে বলেই মনে হয়।

প্রাণপাত পরিশ্রম করেছি, করে তার পুরস্কার পেয়েছি লণ্ডনের এবং সমস্ত দেশের লোকের সময়, সানুগ্রহ সম্ভাষণ! পেয়ে ধন্য হয়েছি। তাই মনে হয়, আমার জীবনের সুখের ক্রীষ্টমাস—গত বছরে লণ্ডনে কেটেছে।

পরিশ্রম করতে কখনই আমি কাতর ছিলুম না। বেশ মনে আছে ছেলেবেলায় পেট্রোগ্রাডের মারিয়েনস্কি থিয়েটারে যখন নাচ শিখতুম কি কঠোর শ্রমই না আমাদের করতে হত, তবু সে কি সুখের দিন ছিল!

থিয়েটারে আমরা যে শুধু নাচই শিখতুম তা নয়, সাধারণ লেখাপড়া শিখতে আমাদের বাধ্য করা হোত! যে বাড়ীটায় আমরা থাকতুম, সেটা থিয়েটারেরই বাড়ী; থিয়েটারের আফিস, রিহার্সাল ঘর সবই সেই বাড়ীতে! নীচের তলায় আফিস, দোতালায় থিয়েটার, তেতালায় আমরা—মেয়েরা; চারতলায় থাকতেন বড়রা অর্থাৎ কর্ত্তারা, প্রত্যেক তলাতেই নাচঘর থাকতো!

কি উদ্দেশ্যে প্রতি তলায় নাচঘর ছিলো, আমি জানি না, তবে আমার যা মনে হয় তা বলতে কোন দোষ নেই যে এরকম তলায় তলায় নাচঘর রাখবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যে তলায় থিয়েই তুমি যাও, যে কাজেই যাও, নেচে যেতে পার! অর্থাৎ এ বাড়ীতে থাকার মানেই নাচা!

নেচে এত সুখ পেয়েছি, আর সেই নাচ দেখে যে এত লোক সুখী হয়েছে, তার কারণই, আমাদের সেই ছেলেবেলার চারতলা বাড়ীর নাচ ঘরগুলোর ছড়াছড়ি!"

ষ্টারে "কর্ণার্জ্জুন"

(শ্রীনাট্যামোদী)

আমরা বিগত শনিবারদিন সন্ধ্যার সময় ষ্টার থিয়েটার অর্থাৎ আর্ট থিয়েটার লিমিটেড কর্ত্তৃক নবীন ভাবেও নবীন সাজ সজ্জায় গঠিত নবজীবন প্রাপ্ত ষ্টার থিয়েটারের প্রথম অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। সেদিন জনসমাগম যথেষ্ট হইয়াছিল। দর্শকবৃন্দ ব্যতীত নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও অনেক ছিল, পরিচিত অপরিচিত বহুলোককেই দেখিলাম। নূতন সাজ সজ্জা, বসিবার আসন এই বলিলেই হইবে যে দুই টাকা ব্যয় করিয়া-ও পূর্ব্বেকার গ্যালারি অর্থাৎ ছবির নিম্নে বসিতে হয়। আর কেদার গুলিতে বসিয়া উঠিবার কালে দেহ অর্দ্ধ-পিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা অধিক। তবে ধনহীন লোকের পক্ষে অন্য কথা। রঙ্গেলান, এ সকল দিক্ দিয়াও যে বহু উন্নতি করা হইয়াছে,

সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কর্ণার্জ্জুন অভিনয়ের যে অভাবনীয় সাজ সজ্জা ও অভিনেতাগণের অভিনয় কৌশল দেখিব ভাবিয়াছিলাম, সে বিষয়ে আমরা অত্যন্ত নিরাশ হইয়া আসিয়াছি। কর্ণার্জ্জুন নাট্যকার মহাভারতের এই দুই জন শ্রেষ্ঠ নায়কের বিচিত্র চরিত্র অবলম্বন করিয়া নাটকখানা রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর, পাণ্ডবদের বনবাস, রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভের ফল—কর্ণবধ পর্য্যন্ত নাটকের পরিসমাপ্তি। গ্রন্থকার এতবড় একটা বিরাট বিষয় অঙ্কিত করিতে যাইয়া সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থকাম হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, অপরেশবাবুর ন্যায় প্রবীন নাট্যকার এই নাটক রচনায় কোন দিক দিয়াই কোনরূপ নাট্য রচনার আর্ট বিনিময়টা বজায় রাখিতে পারেন নাই। বক্তৃতা ও গানগুলির কোথাও কবিত্বের লেশ মাত্র নাই। নাটকের দিক দিয়া ইহা ব্যর্থ রচনা। অপরেশ বাবু তাঁহার পাকাঘুঁটি কর্ণার্জ্জুনে একেবারে কাঁচাইয়া ফেলিয়াছেন। দুঃখের বিষয় দেখিবার শিখিবার ও বলিবার মত কিছুই নাটকটিতে পাইলাম না। সেই বাঁধুলি বক্তৃতা, সেই তীর বন্ধক (অবশেষে গাছপালা) ছোড়াছুড়ী ছাড়া আর কিছুই দেখিলাম না, একথা অত্যন্ত দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে।

এইবার অভিনয়ের আলোচনা করা যাক্। প্রতি দৃশ্যে যবনিকা ফেলিবার ব্যবস্থা বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম দেখিলাম। দৃশ্যপট গুলির মধ্য দিয়া আমরা শিল্পীর হস্তের গুণপণা দেখিতে পাইয়াছি। দৃশ্যপটগুলি দেখিয়া মনে হইল যে চিত্রকর আমাদের দেশীয় প্রাচীন শিল্পকলার সহিত অনেকটা পরিচিত, অঙ্কন পদ্ধতির মধ্যে বেশ একটু বিশেষত্ব আছে। তারপর সাজ পোষাকের দিয়া ও বেশ নূতনত্ব দেখিলাম। প্রাচীন চিত্র ও ভাস্কর্য্যের আদর্শ অনুকরণ করিয়া সাজ পোষাক প্রস্তুত করায় সকলেরই চিত্ত রঞ্জন করিয়াছিল এবং অভিনেতাদেরও বেশ দেখাইতেছিল! এইরূপ চেষ্টার জন্য আমরা ষ্টার থিয়েটারের পরিচালকগণকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সাজ পোষাকের মধ্যে যে ত্রুটি বিচ্যুতি আছে তাহা সহজেই সংশোধিত হইয়া যাইতে পারিবে।

মহাভারতে পড়া যায় কর্ণ ও অর্জ্জুন দুটিই ক্ষত্রিয় বীর। নাটক লেখা পর্য্যন্ত নাট্যকারেরও হয়ত সেই ধারণাই ছিল। কিন্তু অভিনয় দেখিয়া তাঁহার সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—নিশ্চয়। কর্ণ মহাশয় একটু অতিমাত্রায় বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠ নিষ্কাশিত (!) স্বর শুনিবার প্রত্যাশা করা কাহারো উচিৎ নহে, তবে তিনি যে ভাবে লম্ফ ঝম্ফ সহ যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিয়াছেন; তাহার জন্য এই স্বভাব সিদ্ধ অভিনেতাকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি। রাস্তার প্লাকার্ডে ইঁহাকে একটা খুব অদ্ভুত রকমের কিছু বলা হইয়াছিল, এই খেতাবটি তাঁহাকে যে অর্পণ করিয়াছে তিনিও ধন্যবাদার্হ! আর অর্জ্জুন মহোদয়ের ওরিএণ্টাল ষ্টাইল্ অফ্ এ্যাক্টিং দেখিয়া দর্শককে মুহুর্মুহু বিস্ময় সাগরে ভাসিতে হইতেছিল, পল্লবিত হস্ত পদে বক্তৃতা, পায়তাড়া কসিয়া সমরায়োজন —বিচিত্র বটে! বড় ভাইয়ের পিঠে থাবড়া মারিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করা, ঘন ঘন, হাত-পা ছোঁড়া যদি ওরিএণ্টাল ষ্টাইল্ হয়, তবে থিয়েটারে না গিয়া নীলু অধিকারীর দলে এ্যাক্টো করিলে বোধ হয় অধিকতর শোভন হইত।

অভিনয় দেখিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি নিরাশ হইয়াছি। কর্ণ ও অর্জ্জুন কেহই আসর জমাইতে পারেন নাই, দু' জনেই মেরেলি চংএ মেরেলি সুরে, অভিনয় করিয়াছেন, প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্যে পুরুষোচিত ভাব দেখিতে পাওয়া গেল না। অর্জ্জুন হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর ন্যায় নানা বিচিত্র ভঙ্গী করিয়াছেন। কর্ণ-কুন্তী-সংবাদে কর্ণের অভিনয় অত্যন্ত বিশ্রী রকমের হইয়াছিল।

একমাত্র উল্লেখযোগ্য অভিনয় দেখিলাম, শকুনির ভূমিকায় নরেশবাবু করিয়াছেন। তবে দুঃখের বিষয় এই যে যাহারা নরেশবাবুর চাণক্য ও কাত্যায়নের অভিনয় দেখিয়াছেন তাহারা একবাক্যে বলিবেন যে শকুনির ভূমিকা ঐ দুই চরিত্রের সংমিশ্রণ ব্যতীত কিছুই নহে। তবে সে দোষ নাটকের অথবা নটের, তাহাই বিচার্য্য।

দুঃশাসন, বিকর্ণ ইহাদের ভূমিকা বেশ স্বাভাবিক ও সুন্দর হইয়াছে এবং সকলেই আপনাদের পদোচিত গাম্ভীর্য্য (dignity) রক্ষা করিয়া অভিনয় করিয়াছেন।

কি দ্রৌপদী, কি নিয়তি, কি কুন্তী—ইহাদের কাহারও অভিনয়ই দেখিবার মত হয় নাই। পল্লবতীর উচ্চারণ এতঅস্পষ্ট যে আমরা বিশেষ মনঃ সংযোগ করিয়াও অনেক সময় অনেক কথাই বুঝিতে পারি নাই। অপরেশবাবু নাটকে নিয়তির অবতারণাই বা কেন করিলেন এবং এইরূপ অযোগ্য অভিনেত্রীর উপরই বা তাহা অর্পিত হইল কেন বাস্তবিকই ইহা সমস্যা! তাহার সঙ্গীত দর্শকগণকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। পল্লবতী তবু অভিনয় যথাসাধ্য সুন্দর ও স্বভাবিক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আমাদের বাঙ্গালার রঙ্গালয়ের make up ব্যাপারটা ও নৃত্য, এ দুইটীর উন্নতি যে কবে হইবে তাহা বলা অসম্ভব! এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে একটা গল্প বলিতেছি। বিলাতের কোনও প্রসিদ্ধ অভিনেতা একবার বৃদ্ধের ভূমিকা লইয়া make up করিতেছিলেন। এমন

সময়ে জগদ্বিখ্যাত অভিনেতা সার হেনরি আর্ভিং তথায় প্রবেশ করিলেন। অভিনেতা make up শেষ করিয়া আর্ভিংকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন মহাশয়, ঠিক্ হইয়াছে ত?" সার হেনরী নিমেষ কাল তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন "You have not painted your eye lids!" আর আমাদের দেশের রঙ্গালয়ের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ বড়ি মাখিয়া, ও সিন্দূর দিয়াই কোনরূপে make up সারিয়া ফেলেন, কোন চেষ্টা বড়ই নাই। আর নৃত্য? সে ত সার্কাসের কসরত।

সকলের চেয়ে হাস্যাস্পদ হইয়াছিল, ভীমসেনের বৃদ্ধা মাতা সহ আসরে প্রবেশ! যাত্রা দলের ভীম এবং হনুমানকেও এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার করিতে আজকাল খুব কমই দেখা যায়! আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার মত ছিল। কৃষ্ণ যখন সখী দ্রৌপদীর নিকট বিদায় লইয়া দ্বারকায় যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, তখন অনেকেরই ভ্রম হইয়াছিল, বুঝি কৃষ্ণ রুক্মিণীর সহিত অর্গলবদ্ধ দ্বারের মধ্যে নিভৃতালাপে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আশ্চর্য্য যে এই কৃষ্ণই কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সারথী হইয়াছিলেন! প্রোগ্রামে নাম-ছাপা থাকা সত্ত্বেও বলিতে হইতেছে, কোনরূপ ভুল হয় নাই ত? কোন অভিনেত্রী এই ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নামেন নাই ত?

আমরা যেরূপ দেখিয়াছি তাহাই বলিলাম। বাঙ্গালার যৌথ কারবার কিছুই টেঁকেনা। আশাকরি আর্ট থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া ভবিষ্যতে পুস্তক নির্ব্বাচন এবং অভিনয়ে মনযোগী হইবেন আমরা এই থিয়েটারের কল্যাণকামী বলিয়াই এই কথা কয়টি বলিলাম। আর পরিচালকগণের প্রতি আমাদের সানুনয় নিবেদন তাঁহারা নাটক নির্ব্বাচনে এবং ভূমিকা বণ্টনে অতঃপর সাবধানতা অবলম্বন করিবেন, কারণ এই শ্রেণীর নাটক ও নট লইয়া এযুগে থিয়েটার চালানো সম্ভব হইতে পারে না। আর্ট থিয়েটারের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাবৃত করাই যদি পরিচালকগণের উদ্দেশ্য না হয়, তাঁহারা এ বিষয়ে মনযোগী হইবেন, বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

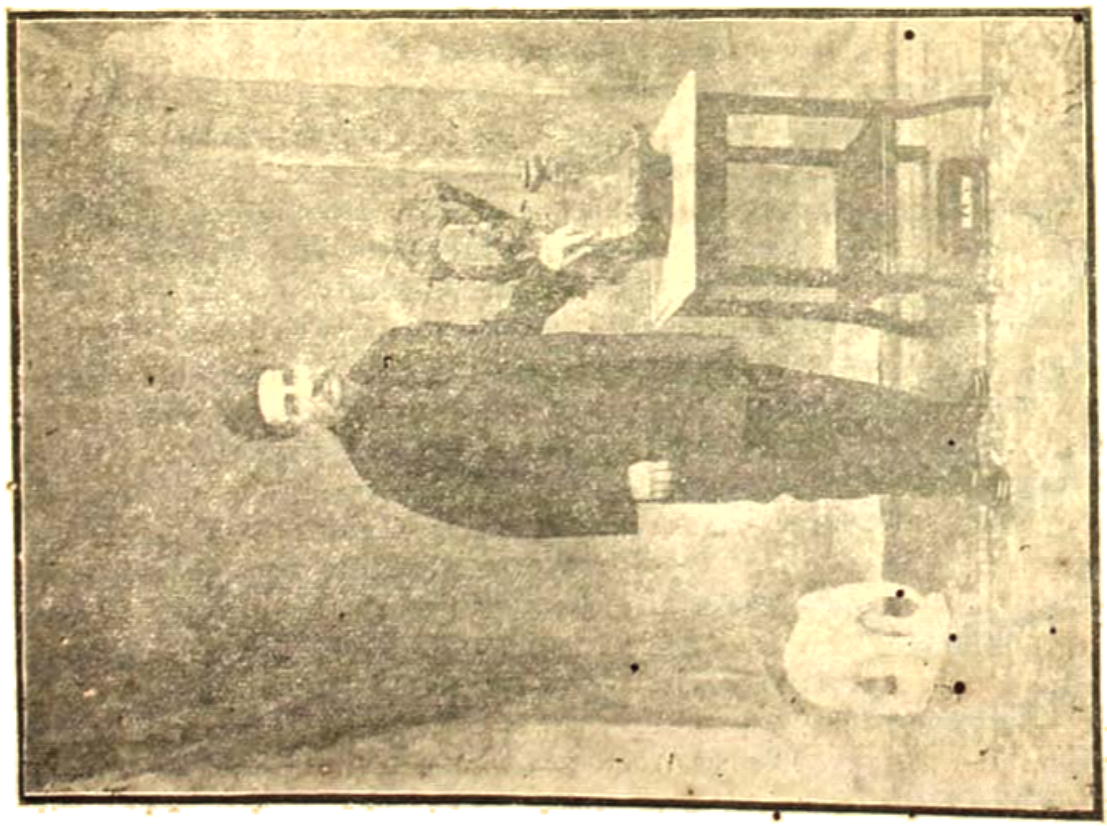

পরলোকগত স্থানীয় ও কর্ম্মবীর
মিঃ জে এন্ মুখার্জ্জি

P 30280

আকাশে
আকাশে মেঘও ওঠে.

চালকুমড়ো—ঝরে না পড়ে

অদৃষ্টের পরিহাস—আঁখি মুদে আসে

"কোন্ স্বপনের পাছে—আঁখি পাখী ধায়।"

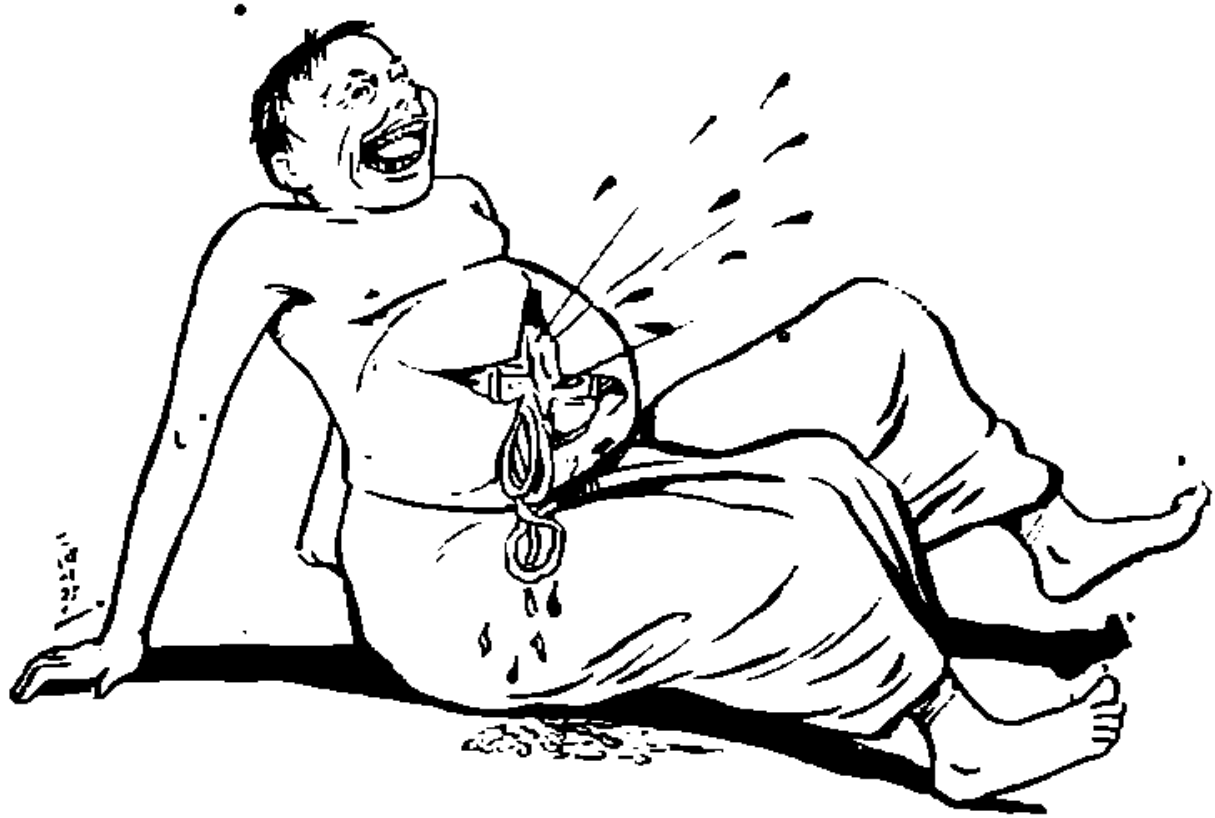

'ফষ্টনাষ্ট'—বত্রিশ নাড়ীতে টান পড়লে যা হয়।

বন্ধের আনন্দ

"হ্যাঁ ভাই, এক টি ছেলে মরেছে, তাতে একদিন বন্ধ,
মাষ্টার মরলে ক'দিন হবে ভাই ?"

হাসি না কান্না

নৃত্যরত—"মারিব, মারিবশশী নিশ্চয় মারিব।"

সঙ্কলন

ইউরোপের বনাম ভারতের জ্ঞানপন্থা

[শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত]

ইউরোপের মন হইতেছে সামান্য অর্থাৎ বিশ্বের গতি সম্বন্ধে জ্ঞান, কার্য্যকারণ-পরম্পরার জ্ঞান। কোন বিশ্বি লইয়া বিজ্ঞানী উঠিলে ইউরোপীয় মনীষারা তাহাকে দুই রকমে দেখিবার, তাহার মধ্যে দুইটি দিক্ পৃথক্ করিয়া লইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন—একটা হইতেছে চলন (process) যা তাহার কর্ম্মের ধারা, আর একটা হইতেছে গঠন (content) যা তাহার আধারের উপাদান বিশ্লেষণ ; একটা হইতেছে তাহার "কি রকমে" (how), আর একটা হইতেছে তাহার "কি" (what)। বিশ্বের এই দুইটি দিকের কথা বলিলেও, ইউরোপ তাহার প্রতিষ্ঠা দেখাইয়াছে বিশ্লেষণের "কি রকমের", কর্ম্মপ্রণালীর আলোচনায়,—"কি"র উত্তর ; বস্তু-সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান যাহা তাহা আসিয়াছে ঐ আলোচনার অনুসরণী হিসাবে। জড় (matter) কি, বিদ্যুৎ (electricity) কি, ইউরোপীয় বিজ্ঞান তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারে না, তবে যে বিশ্বিটা সে পায় তাহা হইতেছে ইহাদের কার্য্য-প্রণালীর কথা। আর সেইজন্যই, ইউরোপের তত্ত্বশাস্ত্রে (meta-physics)—যে শাস্ত্রের বিশেষ উদ্দেশ্য হইতেছে বিশ্বের মূল সত্তা বা গঠন (content) সম্বন্ধে জ্ঞান, তাহা খুব উচ্চস্তরের নয়, সেখানে —ইউরোপের মন কেমন ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু ভৌতশাস্ত্রে (physics)—যেখানে পায় বিশ্বের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা সেখানে ইউরোপ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

ভারতের প্রতিষ্ঠা ইহার ঠিক উল্টা রকমের। বিশ্বিটা কি, অর্থাৎ মধ্যে বস্তু কি, তাহারই মন বিশেষভাবে এই দিকটাই লইয়া বসে—আমরা চাহি "তত্ত্বজ্ঞান", কিন্তু বিশ্বিটা কি রকমে আসিল, কেমন করিয়া চলিয়াছে, সেই কর্ম্মশৃঙ্খলার পরম্পরার উপর আমাদের মনের তেমন পড়ে নাই। তাই ভারতে তত্ত্বজ্ঞান যতখানি মেলি, তত্ত্বজ্ঞান সেই অনুপাতে পাই না। ইউরোপ দেখিতেছে বিশ্বিদের ক্রমাভিব্যক্তি, যাহার মধ্যে রহিয়াছে তাহার কর্ম্মের—তাহার জাতির রহস্য ; ভারতবর্ষ দেখিতেছে কি উপাদান বা বাস্তু দিয়া বিশ্বি গঠিত, সে যেন চাহিতেছে বিশ্বিদের যে সত্তা বা স্থিতি তাহার রহস্য। কি করিলে কি হয় তাহার ধরণটি (Science বা Mechanism) সম্বন্ধে ভারতের মন উদাসীন ; এই করিলে এই হয়, ইহাতেই ভারতবর্ষ সন্তুষ্ট—সে তার কি করিতে হইবে, তার ফল কি হইবে ; যাহার মাঝের খুঁটিনাটি তাহাকে বড় স্তম্ভিত করে না।

* * * * *

আজ-কাজই যেখানে প্রধান প্রমাণ, প্রমাণের হেতুস্বরূপটা যেখানে তেমন গণ্য করা হয় না, সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবস্থায় দুটি লক্ষণ আমরা দেখি। প্রথমতঃ সে জ্ঞান-বিজ্ঞানে খুঁটির উপর একটা স্থিতি-স্থিতির ভাব (static)—নূতন নূতন আবিষ্কার, প্রতিদিন নব নব রহস্যের উদ্ঘাটন আর সম্ভব হয় না ; যে সত্য একবার পাইয়াছি তাহারই প্রয়োগে চর্চ্চার চর্ব্বণে, তাহার যে সম্পদ্-উপলব্ধি এমন কি যে-সব সত্যাভাস তাহাদের মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া চলি—অভিনব পথ একটা কাটিয়া আর সহজে বাহির হওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ যেখি জ্ঞান-বিজ্ঞান সর্ব্বসাধারণে ছড়াইয়া পড়ে না, তাহা আবদ্ধ থাকে একটা বিশেষ শ্রেণীর বা সঙ্ঘের মধ্যে গুপ্তবিদ্যাচক্রে—ফলে মনে হয় সেটা লুপ্ত বিদ্যা হইয়া পড়ে। তাহাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস কতটা যে এই রকম ঘটিয়াছিল, তাহার হিসাব প্রত্নতাত্ত্বিকেরা দিতে পারিবেন। ইউরোপও তাহার মধ্য যুগে এই অবস্থার ভিতর দিয়া আসিয়াছে—তখন সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল অধিকতরের বাক্যের অনুসরণে টীকা ভাষ্য, আর জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চা আবদ্ধ ছিল গুরুর চতুষ্পাঠীর মধ্যে। কিন্তু ইউরোপের মনের উপায় এই আত্মোপধী রেনেসেন্স আন্দোলন আসিয়া এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিল—ইউরোপ পাইল তাহার নিজের প্রকৃতি। ইউরোপে যেটা ছিল ব্যতিক্রম, ভারতবর্ষে সেটি সেইটাই যেন নিয়ম।

ইউরোপের স্বভাব এই যে কোন সত্যকে বস্তু হিসাবে চিরন্তন বলিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে না। আমরা একটা সত্যকে পাইলে, তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে চাই, তাহাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই বাস্তবক্ষেত্র-বিষয়কে ; ইউরোপ কিন্তু তাহাকে মানিয়া লয় আপাততঃ সাময়িক ভাবে working hypothesis হিসাবে। কোন সত্যকে পাকাপাকি করিয়া লইবার অবস্থা ইউরোপের নাই ; সে আনন্দ পায় কেবল যেন experiment করিতে, সত্যকে বিদ্ধ করিতে চুরিতে, সে চাহিতেছে সত্যের রূপ নয়, কিন্তু সত্যের ভঙ্গীটি। গীতার ভাষা "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" ভারত অপেক্ষা ইউরোপই যেন সম্যক্ পালন করিয়া আসিতেছে। আমাদের লোভ ফলের দিকে, একটা ধরাবাঁধা সত্যের দিকে, একটা কিছু সুস্পষ্ট বা নিরেট বস্তুর দিকে,যাহাকে জয় করিয়া চলা-ফেরা যায়—সে সত্য বিস্তৃত হইলেও কথাই নাই, বিস্তৃত না হইলেও একেবারে বিফল প্রয়াস নয়। হইলেই আমরা সেটিকে যথেষ্ট বলিয়া মানিয়া লই। বাহিরে হয়ার pragmatic হইলেও ইউরোপের মন কিন্তু ঠিক সে রকমের নয়, ফল-সম্বন্ধে পরিণাম সম্বন্ধে নিত্য সত্য সম্বন্ধে, ইউরোপের মন সম্পূর্ণ খোলা, ফলে পরিণামে নিত্য সত্যে কি করিয়া পৌঁছান যায় সেই যাবের কথাটা, উপায়ের, কর্ম্মের কথাটাই তাহার পক্ষে আসল। এই যেমন আমাদের তীর্থস্থান-সম্বন্ধে—কি দুর্গম দুরারোহ স্থানে সে-সকল প্রতিষ্ঠিত—তীর্থস্থান আমরা করিয়াছি কিন্তু সেখানে পৌঁছিবার রাস্তাটা সম্বন্ধে আমরা একেবারে উদাসীন, রাস্তাটা কিছুই নয়, যেন তেন প্রকারেণ একবার লক্ষ্যে পৌঁছিলেই সব গোল চুকিয়া গেল। ইউরোপের ধরণ কিন্তু অন্যরকম, সে দেখে আগে রাস্তাটা, বেছিয়া গুছিয়া জরীপ করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া আগে সে তৈয়ার করিয়া লয় পাকা সড়ক—গতিবিধির সুবিধা করিয়া লইয়া তবে সে পছন্দের জায়গাটির দিকে নজর দেয়। যে দিকে ভাল রাস্তা চলে না, সে দিক্ হইতে বরং সে পিছন টানিয়া লইবে, কিন্তু ভাল রাস্তা বিনা সফর করাইবে না। জ্ঞান-সম্বন্ধে, সত্য সম্বন্ধেও তাহার সেই এক কথা

—তাহাতে পৌঁছিবার রাস্তাটা যেন আঁকাবাঁকা কি, যা সেখানে কখন কিরূপে পৌঁছিতে হয়? যে জানে যে সত্যে চলিবার বিধিবদ্ধ নিয়মে কার্য্য করিলে যায়। নাই বা সেখানে হয় যাই, সে জানে সে সত্য যত বড় জ্ঞান যত বড় সত্য হউক না কেন—তাহা প্রত্যেকই হউক আর অন্যেরই হউক সে জানে সে সত্য জ্ঞানের জ্ঞান জ্ঞানের সত্য হইতে পারে, কিন্তু ইউরোপের জ্ঞান ইউরোপের সত্য নয়।

* * * *

মনের যে একটা ধর্ম্ম আছে, পথের যথাযথ সংযোজনের অভাবে যথাযথ উপায়ের যে একটা সুফলের জন্য-গড়নের সামর্থ্য আছে সে তত্ত্ব আমাদের প্রাচীনেরা পাইয়াছিলেন,এ তথ্যটি সম্বন্ধে অনেক বাধ্যা বিশ্লেষণ তাঁহারা করিয়াছেন, ইহা। প্রত্যেক অনেক দেখাইয়াছেন, কিন্তু উহাকে পরতঃসিদ্ধ সত্যরূপে ধরিয়া ; মোদ্দার গুটিকে কেন যাহিয়া লইয়া তবে উহার চলনপাল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এ তথ্যটি যে সত্য, ইহার প্রমাণ স্বরূপ যে একটা অবার্থ কার্য্য-কারণ-পরম্পরার ধারা তাহার প্রমাণটি আমরা আজকাল প্যাইতেছি ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান (Accounts) হইতে ; ইহার সমস্ত বাজুল উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া ইউরোপই জগতের এই উপলব্ধির মূল ও বাধারা যাতাইয়া দিতেছে।

ইউরোপ বিশ্বের বিভিন্নটি খুঁজিতেছে বলিয়া বিশ্বের একটি সম্বন্ধে অন্বেষণ আর তাহার শেষ হইতেছেনা ; তাই সে বিশ্বের তথ্য খুঁজিতে খুঁজিতে কেমিষ্ট্রির সূক্ষ্মবিশ্লেষণ যন্ত্রের মধ্যে ঢুকাইয়া যাইতেছে। বিশ্বের মূল পদার্থের হিসাব আমরা পরস্পর লইয়াই সবাই, ইউরোপেরও আগে ছিল পঞ্চ বা চারিটি ভূত মাত্র। কিন্তু কিন্তু এই চারিভূত ভাঙ্গিয়া তাহারা বাহির করিল যাহাদেরই মৌলিক পদার্থ (chemical elements) ; এখন আবার এই মৌলিক পদার্থের পরমাণুকেও (atom) ভাঙ্গিয়া সে বাহির করিয়াছে ইলেক-ট্রন্। আমরা হতে এই পর্য্যন্তই আসিয়া থামিয়া গইতাম, বলিতাম ইহাই সত্য ; ইউরোপে কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত মেনি না, সে আরও চলিয়াছে। ইলেক্ট্রন্ জিনিষ কত, তিনিসের কি রকমে সংগঠন, তাহাদের গতিবেগ কত—তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধের যে অবস্থায় তাহাই ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার আধুনিকতম সমস্যা। জগতের বিশ্বের অন্তরতীয় রহস্য বুঝিতে ইউরোপ যে আরও কোথায় কতদূর চলিবে তাহার ঠিক ঠিকানা কি?

ইউরোপের সাফল্য বুঝিতে আমাদের বুঝার মনের বুদ্ধির এই ধরণটা, যাহার বলে সে চলে বিশ্বের ঐক্যসূত্রের ধারণা হইতে অবৈজ্ঞানিক অনুসরণ করিয়া। ইউরোপের সত্যলাভের বিশেষত্ব কেবল জ্ঞান নয়, নূতন নূতন পদার্থের আবিষ্কার নয়—ইউরোপের সাফল্যের বিশেষত্ব হইতেছে Scientific method—বৈজ্ঞানিক প্রণালী। এই প্রণালীর দুইটি মোটা কথা—প্রথম এই যে, facts বা বস্তু সংগ্রহ করিতে হইবে বস্তুর যথাযথের পার হয়—আর দ্বিতীয় এই যে, বস্তুতে বস্তুতে বিভিন্ন সম্বন্ধের সূত্রটি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্তু এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে সাধারণের যোঁক বিশেষভাবে হইতেছে পেষোক্তটির উপর। ইউরোপ বহু পেষণ করিয়াছে, ঐ সম্বন্ধের নীতাবলী খুঁজিবার জন্য, ঐ সম্বন্ধেই নীতাবলী উদ্ঘাটনের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া বলিবার জন্যই সে পন্থা আমরা এখন করিয়াছে।

তবে ইউরোপীয় সাধনার অন্যতম Scientific method-এর সার্থকতা এইখানে যে সে বিশ্বের সম্বন্ধের খোঁজ করে বেহেতেই মধ্যে। মূল সম্বন্ধে সন্ধান না হইয়া হওয়ে সে সূক্ষ্ম সম্বন্ধের খোঁজে চলিয়াছে তবেই সে শুধু হেতেই কাটিয়া কাটিয়া হেতেই অণু হইতে অণুর দিকে চলিয়াছে। নূতনতর বিশিষ্টতর সম্বন্ধ আবিষ্কারের জন্য সে যে-সব যন্ত্র নাড়িতেছে চাড়িতেছে তাহা সবই হেতাবক যন্ত্র। এই হেতাবজাত ইউরোপীয় সাধনা ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতে পারিতেছেও না, চাহিতেছেও না। সাধনার দৃষ্টি চলিয়াছে বাহিরের দিকে, ভিতরের দিকে ডুবিতে ডুবিতেও তাই আবার ভাসিয়া উঠিয়া পড়িয়াছে। হেতেকে কাটিয়া কাটিয়া সে এখন একটা জায়গায় পৌঁছিয়াছে যে সেখান হইতে আরও চলিলে তাহাকে হেতাতিরিক্ত আর-একটু কিছু বস্তুসম্বন্ধের মধ্যে যাইয়া পড়িতে হয়—কিন্তু এতদূর লইয়া ইউরোপীয় সাধনা সে বাধ আজু পায় হইতে পারিতেছে না, ঘুরিয়া হেতাতিরিক্ত প্রতিষ্ঠানের নীমাংখেলা অনুসরণে বাহিরে চাহিতেছে, বৈজ্ঞানিক সত্যের ছাঁচে সেগুলিকে ঢালাই করিতেছে।

জ্ঞানের পথে ইউরোপ চলিয়াছে দুইটি আলোকবর্ত্তিকা লইয়া—দুইটি বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া (১) মূল ইন্দ্রিয় জ্ঞান (২) তর্কবুদ্ধি। মূল ইন্দ্রিয় বিশেষে বস্তু বা facts আর তর্কবুদ্ধি বিশেষে বস্তুশৃঙ্খলার সূত্র। কিন্তু মূল ইন্দ্রিয় যে বস্তুরাশি আহরণ করিয়া ধরে তাহা একদিকে সসীম সঙ্কীর্ণ, আর একদিকে কাটা-কাটা ছাড়া-ছাড়া। স্বভাবতই ও সহজেই তাই ইউরোপ সেগুলির শৃঙ্খলার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের দিকে খোঁজ দিতে পারিয়াছে।

জগতের বস্তুর শৃঙ্খলা-সূত্রের, কার্য্য-কারণ-পরম্পরার সূত্রের দিকে তেমন মনোযোগ দিতে পারে নাই, তাহার কারণ এই যে—জ্ঞানের জন্য সে এমন একটা বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়াছে, যাহার সম্মুখে বস্তু অসংখ্য অজস্র ধারায় কেবলই ছুটিয়া উঠিয়াছে। এই যে বস্তু বৈচিত্র্যের আশ্রয়ে সে এত বলিয়া বস্তু হইয়া গিয়াছে যে তার দিকে তেমন দৃষ্টি মেলা তাহার পক্ষে ঘটিয়া উঠে নাই। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি ভারত জ্ঞানের পথে চলিয়াছে যেন কি একটা সূক্ষ্ম সহজাত অনুভবের প্রেরণায় এখনি বলিয়ে।

* * * *

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পন্থা হইতে ভারতের এইটুকু শিখিবার, আছে করিবার আছে। ইউরোপের বিজ্ঞানের মত বহুমুখী ইন্দ্রিয়াকর্ষণী হইয়া ভারতের কোন লাভ নাই। ভারতের সেই প্রাচীন সূক্ষ্ম অনুভূতি সমাধি রক্ষিত হইবে—কিন্তু তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সেই কার্য্য-কারণ-পরম্পরা বিচারের—প্রকট করিবার—প্রণালী। বৈশ্বিক অনিত্য যাহাকে বলে অর্থাৎ বিশ্বের সাধারণ নয়, এমন কি তাহার সত্যটিও নয়, কিন্তু সাধনের দিকে সে সত্যের যে সত্য রূপ, যে বিচিত্র গতিভঙ্গী তাহাকে বিশ্লেষণের মধ্যে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে সেইখানেই রহিয়াছে, বলার উপর বলার। এই দিক বলার অধিকার করিতে হইলে তাই ভারতের অন্তর্দৃষ্টি আর সেই অন্তর্দৃষ্টির সাথে চাই ইউরোপের বৈজ্ঞানিক শুদ্ধি।

—প্রবাসী

গ্রহের ফাঁদ

(উপন্যাস)

[শ্রীসরসীবালা বসু]

ক

মণিমালা রোগশয্যায় শুইয়া যখন শুনিল তাহার প্রাণাধিক স্বামী, তাহার এ রোগে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়া এক সুন্দরী কিশোরীর পাণি গ্রহণ করিয়া আগে ভাগে বিরহের তোগটি সামলাইয়া লইয়াছেন তখন বেচারী মণির চখের জলে বাণ ডাকিল। হায় হায় সে যাঁহারে জীবন পণ করিয়া ভাল বাসিয়া আসিতেছে, রমণী হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা, প্রীতি, প্রেমের পুষ্পাঞ্জলী যাঁহার পায়ে উপহার দিয়া সে নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছে, বিবাহের পর এই পাঁচ বৎসরকাল কায়মনে যাঁর সেবা করিয়া অপার সুখে সুখী হইয়াছে, সেই স্বামী কি স্ত্রীর মৃত্যু কালটি পর্য্যন্ত ও অপেক্ষা করিতে পারিলেন না? ধনী পিতার আদরের দুহিতা হইয়াও সে স্বেচ্ছায় স্বামীর কর্ম্মস্থলে গিয়া বাস করিত, নিজের হাতে সংসারের সব কাজ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া স্বামীর সুখ সচ্ছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তৃপ্ত হইত, এমন কি, পীড়ার প্রথম অবস্থায় সে নিজের রোগের কথা প্রাণপণে চাপিয়াই গিয়াছিল, পাছে স্নেহশীল পিতা জানিতে পারিলে চিকিৎসার জন্য কন্যাকে নিজের কাছে লইয়া যান, আর তেজেশকে একাকী অসার ঠাকুরের হাতের অখাদ্য রান্না অতৃপ্তির সহিত খাইয়া প্রায় অভুক্তই থাকিয়া যাইতে হয়—যার জন্য এই ত্যাগ স্বীকার—সেই স্বামীর এ কি নিষ্ঠুর আচরণ? মণি প্রথমে এ সংবাদ বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু মণির মা যখন পা ছড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে—"ননিবিা নয় সে কসাই" এই উপাদের বিশেষণে নাতজামাইকে বিভূষিত করিলেন, মণির ছোটখাট পুরবাসী জামাই বাবুর উদ্দেশে কটূক্তি করিয়া বাড়ী কাঁপাইয়া তুলিল, তখন সে বেচারী বিশ্বাস না করিয়া আর করে কি?

মণির পিতা ভাবসুন্দর বাবু মেয়েদের কান্না ও চীৎকারে বিরক্ত হইয়া রায় প্রকাশ করিলেন, "মেয়ে তো আগে বাঁচুক, তারপর তার সতীনের কথা ভেবো, হা ভাতের ঘরে মণিকে আর পাঠাবেই বা কে—পাঁচবছরে মেয়েটার পাঁচ হাল করে ছেড়েছে, কোনো রকমে মেয়েটাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি তো সেই ঢের—ইত্যাদি।

কথাটার সার মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করায় ফলে বাড়ীতে আন্দোলনের প্রভাব কমিল বটে, কিন্তু মণির বুকের ভিতর বজ্র যেন তোলপাড় করিতে লাগিল। রাত্রে মেয়েকে পথ্য খাওয়াইয়া মা নিজের শয়ন গৃহে চলিয়া গেলেন, পাশের বিছানায় বৃদ্ধা ঝিঝিয়া ও পুরবালাও ঘুমাইয়া পড়িল, মণির রোগক্লিষ্ট চক্ষে সে রাত্রে আর মোটেই ঘুম আসিল না; কত কথাই একে একে তার মনে পড়িল আর কোঁটা কোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়া বালিশ ভিজিতে লাগিল! হায় হায় দারুণ রোগ যন্ত্রণায় মুহ্যমান হইয়াও যে স্বামীর প্রণয় সোহাগের কথা স্মরণ করিয়া সে রোগের সহিত যুঝিবার জন্য দ্বিগুণ বল সঞ্চয় করিয়াছে, মৃত্যুর নামে স্বামীর বিচ্ছেদাশঙ্কায় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছে, সেই স্বামী নিজে চইতেই মণিকে দূরে ঠেলিয়া দিয়ের আর মণির মধ্যে একটা এমন ব্যবধান গড়িয়া তুলিলেন? তবে আর কেন? যে মৃত্যু ভয় এতোদিন মণিমালার সব সুখ স্মৃতিকে মলীমান করিয়া দিত আজ আসুক সে,—স্বামীর ক্রোড় বিচ্যুতা অভাগিনী নারী আজ মৃত্যুরই প্রেমালিঙ্গনে সব জ্বালা জুড়াইবে। ওগো মৃত্যু, দেখা দাও, দেখা দাও, তোমার শঙ্খাহরণ মূর্ত্তিতে মণিতরূপে তুমি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও, মণি আজ তোমাকে দেখিয়া দৃষ্টি ফিরাইবে না, তোমার গলায় বরমালা দিবার জন্য সে আজ উৎকণ্ঠার সহিত পথ চাহিয়া—তবে তোমার আসিবার আর বিলম্ব কেন গো, কেন এ অযথা দীর্ঘসূত্রতা? মণির চিন্তার গতি থামিল

প্রাণ ভরিয়া সে কিছুক্ষণ কাঁদিয়া লইল, তারপর ভাবিতে লাগিল, এখন তো তার মরা হইবে না, কিছুতেই নয়! সে অকৃতজ্ঞ স্বামীর সঙ্গে একবার শেষ দেখা না হইলে মরিয়া ও যে তার শান্তি নাই! একবার অন্ততঃ তাঁর পায়ের উপর মুখ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই হইবে যে মণিমালার কোন্ অপরাধে, কোন্ ত্রুটিতে অন্তিম শয্যায় তাহাকে তিনি এ দাগা দিয়া বসিলেন?

তিনি প্রভু তিনি স্বামী, দাসী মরিলে, অন্য সেবিকা তিনি আনিতেনই—কিন্তু মণির মরিবার সময় কেন মণিকে দাসীর সেই শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য লইয়াই মরিতে দিলেন না যে মণি মরিবার সময় জানিয়া যাইত, তার স্থান তারই আছে—ওগো নিষ্ঠুর অকরুণ দেবতা, ভক্তের প্রতি এ কি তোমার নির্মম অবিচার?

হায়! মণি আজ কাহার নিকট তার এই মর্ম্মন্তুদ বেদনার কথা জানাইবে? তার এ বুক ফাটা কান্নার কারণ কেহ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে কি? রোগের নিদারুণ যন্ত্রণা কালে কালে তার জীবনী শক্তি শোষণ করিয়াও তাকে এতোটা কাতর করিতে পারে নাই, স্বামীর আচরণ আজ তাহাকে যেমন করিয়া আকুল করিয়াছে! এইরূপ চিন্তায় মণির বিনিদ্র রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল, ঐ আলোকের দূত দেবতার আশীর্ব্বাদ লইয়া রুদ্ধ বাতায়ন আসিয়া ঘা দিতেছে,—কয়বাস যাবৎ রোগ শয্যায় শয়ন করিয়া, সমস্ত রাত্রি অর্দ্ধ ঘুম অর্দ্ধজাগরণে কাটাইয়া, মণি যখন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িত, রজনীর নীরব তমসার গুরুভার তার শ্রান্ত নিঃশ্বাসকে পর্য্যন্ত চাপিয়া ধরিত তখন সে—তৃষ্ণার্ত্ত চাতক যেমন করিয়া বারিদকে কামনা করে,—তেমনি করিয়া উষার আলোকে কামনা করিত, তার পর ভোরের আলো রুদ্ধ জানালার ফাঁকে উঁকি দিবামাত্র সে ঘরের কাহাকেও ডাকিয়া অবিলম্বে জানালা খুলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিত। জানালা খুলিয়া মাত্র অমনি স্বচ্ছ নীলাকাশের দিকে চাহিয়া আলোকের পুলক ধারায় তার নিদ্রাহীন শ্রান্ত চক্ষু দুটি স্নাত হইয়া আনন্দে ভরিয়া উঠিত; নিঃশ্বাস তার লঘু হইয়া যাইত, শুভ্র দিগন্ত তখন সদ্য জাগ্রত বিহগ কণ্ঠের প্রথম গানে মুখরিত হইতেছে, সে গান সে কয় ছত্র মন দিয়াও সম্পূর্ণরূপে অভিনন্দিত করিতে পারিত, কিন্তু আজ তার কি পরিবর্ত্তন! ঐ তো আলোক শিশু দেব লোক হইতে নামিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কোথায় আজ তার সে অম্লান দিব্য জ্যোতিঃ? ও কিসের কালোছায়া ধীরে ধীরে দিক দিগন্ত আঁধার করিয়া নামিয়া আসে গো, বর্ণ হীন রূপহীন সীমাহীন ঐ ঘনান্ধকারে অভাগিনী মণিমালার দৃষ্টি বুঝি চিরতরে ডুবিয়া গেল রে!

২য়

সংসারে যত কিছু আপদ, বিপদ, অশান্তি উপদ্রব ঘটিয়া থাকে সবই না কি গ্রহের ফের, তা ঐ নিষ্ঠুর গ্রহ গুলার উৎসাহকে দমন করিবার কি কোনো উপায় নাই গো? কোন্ শত সহস্র লক্ষ কোটী যোজন দূরে উহারা ঘোরা ফেরা করিতেছে, অথচ অতি দূরে এই নিরীহ মর্ত্ত্যবাসীদের উপরে কি না তাহাদের আবর্ত্তন গতির প্রভাব মানুষকে সুখ সৌভাগ্য দানে কখনও বা সুখী করিতেছে কখন ও বা চোখের জলে নাহানাবুধ করিয়া মারিতেছে, এ কি কম উপদ্রবের কথা? কোন্ বিচার বুদ্ধি হীন, বিধাতা সৃষ্টি শৃঙ্খলাকে নিয়মিত করিবার জন্য এই এক মহা অনিয়ম সৃষ্টি করিয়াছে যে মানুষ বেচারীরা তাদের সুখ দুঃখ ভোগের জন্য এমন করিয়া ঐ গ্রহগুলার অধীন—মানুষ যদি একবার সেই সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিয়া এ বিষয়ে বোঝা পড়া করিয়া তার জন্য জন্মান্তরের আপ সোষ মিটাইতে পারিত!

তেজেশ বেচারী একে তো স্ত্রীর অসুখ হইয়া পর্য্যন্ত নিতান্ত ম্রিয়মান ভাবে দিন কাটাইতেছিল, কাছারীতে নিয়মিত উপস্থিত হইতে পারিত না, যোকর্দ্দমা গুলি ভালরূপ তদ্বির না করার ত্রুটিতে প্রায়ই অপর অকের দিকে হেলিয়া পড়িত, মক্কেলও যথেষ্ট অভিপ্রস্ত হইয়া উকীল বাবুকে দুপাচ কথা শুনাইতে ছাড়ে না; অগত্যা তেজেশ তখন নিজের ত্রুটি সারিতে মুহুরী বাবুকে ধমক চমক করিয়া বেড়ায়,—তার এখন মনের অবস্থা যে কিরূপ মক্কেলরা তো আর সে খোঁজ রাখে না, গৃহলক্ষ্মী মণি বিহনে তার গৃহস্থালীর যে দুর্দ্দশা হইয়াছে অভিবড় শত্রুরও যেন তাহা না হয়; মণি আজ কয়মাস হইতে শয্যাগত অবস্থায় পিত্রালয়ে গিয়া রহিয়াছে, ঠিক্ বি ও রাঁধুনী

বামুনের হেঁশেলেতে ঘর করার কাজ আর কতো সুশৃঙ্খলায় চলে? তেজেশের ছোটভাই যতীশ যতো দিন বাড়ী বসিয়াছিল অবশ্য ঘরকন্নার কাজ একরকম গুছাইয়াই চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু বি, এ পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী সুতরাং গৃহস্থালীর অবস্থাও শোচনীয় হইয়া দাঁড় ইয়াছে, গৃহিনী বিহনে গৃহের এই অবস্থা, এবং ততোধিক শোচনীয় মানসিক অবস্থা লইয়া কি মানুষ লোকদমার জটিল ব্যাপারে মাথা ঘামাইতে পারে? সংসারের লোকগুলা নিতান্তই হৃদয়হীন বিচারক, এ যেন যারা মমতাহীন নিষ্ঠুর সংসার একদিনের অসাবধানে বা অল্প বয়সের ভুলে ধ্বংস হইয়া যায় না কেন? গ্রহ গ্রহ গ্রহ! এই গ্রহগুলা কি সংসারে এক তেজেশকেই চিনিয়া রাখিয়াছে? নহিলে জন্মাবধি এক তারই পিছনে অবিশ্রান্ত ভাবে এমন করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে কেন, শৈশবে উহারা তাহাকে পিতৃমাতৃ-অন্নচ্ছাত করিয়া দূর সম্পর্কীয় কাকা কাকীর ঘাড়ে চাপাইয়া দেয়; নানা অভাব অনটন, দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়া সে নিজের শৈশব কৈশোর জীবন টানিয়া লইয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিল, দিন রাত্রি তার অক্লান্ত করিয়া খুঁটি, ক্লান্ত হইয়াই এইবার দিনকতকের জন্ত গ্রহগুলা তেজেশকে ছাড়িয়া গেল, তাই তেজেশ ওকালতী পড়িতে পড়িতে মণির মত পত্নী পাইয়া নিজেকে ধন্ত মনে করিল, তার পর কি সুখেই না তার সেই পত্নী-প্রেম-পরিপূর্ণ দিনগুলি কাটিয়াছে! কে জানিত তাহাই তাহার পাখা মেলিয়া, এমন করিয়া উড়িয়া পলাইবে? হায়, হায়, জানা থাকিলেও তাহাদের বাঁধিয়া রাখিতে শক্তিতে কারও কুলায় কি?

তেজেশ কাছারি হইতে ফিরিয়া বাড়ীতে ঢুকিবা মাত্রই তার পঞ্জর ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস আপনা হইতেই বাহির হইয়া শূন্যে মিলাইত, আহা মণিমালা এই সময় গৃহকাজ সারিয়া সযত্নে বেশ-বিন্যাস করিয়া, জরিপাড় নীলাম্বরী পরিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া তেজেশের প্রত্যাগমন পথ চাহিয়া থাকিত, তেজেশ রাস্তায় থাকিতেই উভয়ের চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। তেজেশ ঘরে ঢুকিয়াই প্রিয়ার প্রাত্যহিক পাওনা চুম্বন দুটি সুদ সমেত শোধ দিত, মণিমালা লজ্জারুণ মুখে চকল চরণে নিজের হাতে প্রস্তুত স্বামীর জলখাবার আনিবার জন্ত অন্ত ঘরে চলিয়া যাইত, নইলে মণি সম্মুখে থাকিতে তেজেশের আফিসের পোষাক ছাড়া সহজে সম্ভব ছিল না, হায় কোথায় গেল সেই সুখের দিন! গৃহ আজ শ্রী হীন, মণির সাধের বাড়ী যাই—যে প্রত্যহ পাঁচসের দুধ যোগাইয়াছে সে এখন একসের যোগাইতে নারাজ, তেমন সুপুষ্ট নধর দেহ তার আজ অস্থিচর্ম্ম সার, ফুলগাছ গুলি যত্নাভাবে পত্রশাখা অবস্থা মাত্র, না আছে ফুল, না আছে শোভা। আর তেজেশের মনের অবস্থা? তার পরিচয় হৃদয়হীন সংসারের লোকগুলা কি বুঝিবে, তাহারা শুধু টিপ্পনী কাটিতেই জানে, "স্ত্রীর অসুখ বিশ্ব সংসারে কার না হয়, তার জন্তে অতো মন খারা হয়ে থাকা কি ভালো দেখায়?" এই তো তাদের মন্তব্য, শ্বশুর বাড়ীতে মণিকে দেখিতে গিয়া তার রোগশীর্ণ মলিন মুখখানি দেখিলেই তেজেশের দুইচক্ষু জলে ভাসিয়া যায়, তাহাতেও ছাই পরিত্রাণ নাই। পুরবালা তৎক্ষণাৎ সে সংবাদটি দিদিমার কাণে পৌঁছাইয়া দেয়, দিদিমা হাত নাড়িয়া উপদেশ দেন, পুরুষমানুষের কি ছিঁচ কাঁদুনী কান্না সাজে ভাই! তোদের কি হল, এক যাবে আর হবে, যেতে আমাদেরই যাবে ইত্যাদি—হায় মানুষ, তোমরা যদি স্ত্রীকে কেউ অন্ততঃ তেজেশের মতো প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতে, আর তোমাদের স্ত্রী যদি এমনি মণিমালারই মতো রূপবতী, গুণবতী ও সর্ব্ব সুলক্ষণা প্রেমময়ী নারী

গ্রীষ্মের দিনে

স্নানের আরাম পাইতে, শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে, আমাদের আইডিয়াল্ গ্লীসেরিন্ এবং মেসিনে প্রস্তুত :—চন্দন, রজোবকুল মাখ ও ভায়লেট সাবান ব্যবহার করুন।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানী

৩৪।১এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন ২৪৯৬

হইত-তাহা হইলে সেই স্ত্রীর এমনি সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময় কেমন না তেজেশের স্থায় অধীর হইয়া চোখের জলে কৈফিয়ৎ খুঁটে ফিরাইতে? কান্না কি শুধু নারীরই এক চেটিয়া অধিকার যো? কখনই নয়, অথচ এই চোখের জল কেলা দেখিয়া তেজেশের শ্বশুর বাড়ীতে মেয়ের জন্য এমন একটি হাস্যকর রহস্যের ব্যাপার গড়িয়া তুলিল যে অবশ্য তেজেশ শ্বশুরবাড়ীও যাওয়া বন্ধ করিল। সে শ্বশুরকে মণির যে অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছে তাহাতে যেন বুঝিয়াছে যে মণি আর এ যাত্রা রক্ষা পাইবে না, তার অভাবে হতভাগার গৃহে আর সে গৃহলক্ষ্মীর চারু মুখের হাসি ফুটিয়া উঠিবে না, তবে আর মিছিমা প্রভৃতির বাক্যজ্বালা সহ্য করিবার জন্য সেখানে যাইবার আবশ্যকতা কি? নীরবে আপনার গৃহে অশ্রুধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া সে মনের বেদনা লাঘব করিবে! মণি যখন তাহাকে চির অশ্রু সাগরে ভাসাইয়া চলিল, তখন সেই ভাসাতেই তার আনন্দ, এই জন্য ছ'দিন তার ইচ্ছা হইত আড়ালে গিয়া মোকদ্দমার তদ্বির করিত, সেদিন ছেলেদের অত্যধিক অবসর বোধ হইত, সেদিন ঠাকুরের রান্না মাছের ঝোল ভাত খাইয়া বিছানায় হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া কড়িকাঠ গণিয়া চাহিয়া মণিমালার পাণ্ডুর মুখ খানির কথা ভাবিত, আর বুঝি বা কোঁচায় খুটে চোখ মুছিত। ঠিক এই সময় দুই প্রহরের বেলে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া বসিল।

(ক্রমশঃ)

অথ স্ত্রী-পুরুষ সংবাদ

[শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু]

সেই হ'ল ঠিক পুরুষ বটে
খোঁজখবর যার নেইক' মোটে—
কোথায় জুতো, কোথায় জামা, চশমা, সাবান, তেল!
হারিয়ে যাবে ব্যাগের চাবি,
স্ত্রীর কাছে সব কসুরে দাবি,
নাম হবে যার কে-হিসেবী, বেহেঁস, কে-আক্কেল!
তাড়বে ধোবাত, ছিঁড়বে চাদর,
শিশিভরা গন্ধ আতর
চাট লেগে তার উল্টে যাবে, অকর্ম্মণ্যের শেষ।
নিখলে চিঠি যাবে ভুলে,
পাঁচ দিয়ে তার মুখটা ছুলে,
ঠেসে ব'সে দেখবে পরে, আঁটল কিনা বেশ!

আর, সেই হল ঠিক মেয়ে!—
যে, এর চিঠি ওর খামে দিয়ে,
টিকিট মারতে ভুলে গিয়ে,
ফেরতে মেথে 'ফেরৎ ডাকে জবাব'টুকু চেয়ে!
এমন পুরুষ কোথায় পাবে,
ঠিক কাজটি, সঠিক ভাবে,
ঠিক সময়ে, করবে যে জন ভুল হবেনা যার!
পাও ত তাকে ঘরে এনো,
কিন্তু কোন মেয়েই জেনো,
কোনদিনই তেমন লোকের বুঝবেনা দরকার।

শিল্প মঞ্জুরী

[শিল্পী—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়]

প্রথম পর্য্যায়

ছেলে ও মেয়েদের সীবন সম্বন্ধীয় জামাগুলি যতদূর সম্ভব মেয়েদের শিক্ষা করা উচিত। সীবন সম্বন্ধীয় কার্য্য যেমন আমোদ প্রিয় তেমন অভ্যাস সাধ্য। কার্য্যারম্ভে একটু বিরক্তির ভাব আসে বটে কিন্তু পর পর শিক্ষা-করিলে বড়ই সহজ হইয়া আসিবে। এই শিল্প মঞ্জরীতে থাকিবে শুধু মেয়েদের ও ছোট ছেলের যত রকম জামা আছে। আমার এত দিনের অভিজ্ঞতার ফলে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, মেয়েরা সেলায়ের বিষয় অতি সহজেই বুঝিতে পারে। তাই আজ কয়েকটী আশ্রমের ছাত্রিদের কাজে উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আজ শিল্প মঞ্জরী নীরব প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে বাহির করিবার মানসে লেখনী ধরিলাম। যদি মেয়েদের নব জাগরণের সাড়া পাই পুস্তকাকারে বাহির করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভারতবর্ষের "সীবনাঞ্জলি" প্রবন্ধের জন্য অনেক জায়গা থেকে অনেক উৎসাহ পাইয়াছি। এই সীবনাঞ্জলি প্রবন্ধে সূচি বিষয় ও সেলাইয়ের বিষয় নানাভাবে নানা দিক দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন মাসিক পত্রিকাদিতে পুরুষদের জামার চিত্রসহ দিব স্থির করিয়াছি। পরে এইটি পুস্তকাকারে বাহির করিব।

এইখানে একটী কথা বলে রাখা দরকার। ছেলে ও মেয়েদের জামাগুলিতে সেলাইয়ের বিষয় বিষদভাবে বুঝান যাইবে না। কারণ এই জিনিষগুলির বাঁধা ধরির কোন নিয়ম নাই। যে যেমন ভাবে কাজের দিক দিয়া সুন্দর করিয়া নিতে পারে। এই মেয়ে ও ছেলেদের জামা গুলিতে যতবড় চিত্র সৌন্দর্য্য (Art) রহিয়াছে যে যেভাবে সুন্দরের দিক দিয়া আনন্দ পাইবে সে তেমন "সূচিশিল্পী" গড়িয়া গৌরব করিতে পারিবে। মনে করুন একটী ফ্রক বা সেমিজ অথবা জ্যাকেট যেমন লেস্ দেওয়া যায় তেমন চিকন জিনিষটীও দেওয়া যায়। চিকনদিলে খরচের দিক দিয়া কম পড়ে কিন্তু লেস্ দিলে বিশেষ সুন্দর হয়। তাই বলে চিকন দিলে খারাপ বলা চলে না। আবার দেখুন অনেক জায়গায় কুঁচানো বেশী দিলে ভাল হয় কিন্তু সেখানে খরচ বেশী পড়ে বলে সম্ভব মত দিতে হইবে অথচ দেখতে ভাল লাগায়। এইটী সেলস্ অভিজ্ঞতা থেকে হয়। এখানে আমার বিশেষত্ব এই থাকিবে কাঁট ছাট (Cutting) এর বিষয় এই প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে বুঝানো হইবে। যথা সম্ভব সেলাইয়ের বিস্তর ও বিশেষ বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

এইখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটী কথা বলিব :—

পর পর যে চিত্রগুলি দেওয়া হইবে সেগুলি প্রথমতঃ বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। স্লেটে বা বোর্ডে অথবা মিলটন কাপড়ের উপর খড়ির দ্বারা চিত্র অনুযায়ী চিত্র আঁকিয়া বুঝিতে হইবে। তারপর কাগজ কাটিয়া ঠিক হইল কি না দেখিতে হইবে। পরে কাপড় কাটিবে। প্রত্যেক কাজ প্রথমতঃ বিলাইয়া লইবে। পরে বখেয়া করিবে। "কাজ আরম্ভে ভাবিয়া করিবে, করিয়া ভাবিবে না।" ছোট ছেলে ও মেয়েদের জামিয়ার মাপ।

লম্বা—১২″ কোমর—২৪″ পাছা—৩″

প্রথমতঃ কাপড়কে লম্বা দিক দিয়া ভবল ভাঁজ করিয়া তারপর চওড়া দিকে পুনরায় ভবল ভাঁজ করিয়া লইতে হইবে।

ক ও খ লম্বা ১২″ ইঞ্চি খ হইতে গ ৪ আনা সুতরাং ৩″ ইঞ্চি ক হইতে ঘ ১৪″ ইঞ্চি কোমরের ঢিলা পরাইবার জন্য অতিরিক্ত কাপড় রাখিতে হইবে। ক খ ও খ নিয়া যে বিন্দু করা হইয়াছে তাহা সমান্তরালে রেখা টানিতে

১২নং চিত্র

হইবে। তা'হলে ক বিন্দু হইতে কোমরের ¼ ভাগ নিয়া তার সঙ্গে ১" ইঞ্চি বেশী দিতে হইবে। (তা'হলে ২৪" ইঞ্চি কোমরের ¼ ভাগ+১" ইঞ্চি,) ৬" ইঞ্চি +১" মোট ক ও ঘ পর্য্যন্ত ৭" ইঞ্চি হইল। গ হইতে চ পর্য্যন্ত পাছা ¼+২" ইঞ্চি মোট গ চ পর্য্যন্ত ৯" ইঞ্চি। ঘ হইতে ছ পর্য্যন্ত কোমরের ¼ অংশ সুতরাং ৬" ইঞ্চি কোমরের কিস্তা পরাইবার জন্য যে ১½" ইঞ্চি অতিরিক্ত কাপড় রাখা হইয়াছে ছ হইতে ঝ পর্য্যন্ত কোমরের ¼ মাপ+১" ইঞ্চি কাপড় হইতেও আরও ১" ইঞ্চি কাপড় বেশী রাখিতে হইবে। এখন ঙ, ঝ, ঘ, চ ও ছ প্রথম চিত্রের অনুকরণে মাপিতে হইবে। চ ও ছ পায়ের মোহরার ভাল দেখাইবার (Shape) জন্য ভিতর দিক একটু বাঁকা করিয়া চিত্রের অনুকরণে মাপিতে হইবে। তারপর কাঁচির সাহায্যে ঙ, ঝ, ঘ, চ ও ছ লাইনের উপর দিয়া কাটিয়া লইলেই "আদিয়া" কাটা শেষ হইল।

আদিয়া সেলাই :—

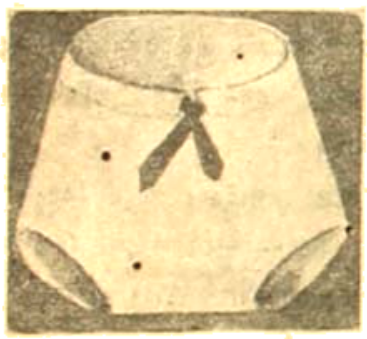

সেলাইয়ের দঃ - ২নং চিত্র

প্রথমতঃ এই কাটা অংশ খুলিয়া ফেলিয়া দুই অংশ কাপড় জোড়া ঘ ও ছ অংশ জোড়া অবস্থায় রেখাইবে। এখন ঙ ও ঝকে ভিতর দিকে ক ও ঘ লাইনে ঠিক রাখিয়া ভাঁজ করিয়া সেলাই করিতে হইবে। পেছন ও সামনা যখন ঠিক সেলাই হইয়া যাইবে তখন ঘ ও চ অংশ এক সেলাই যাবাট সেলাই করিয়া লইতে হইবে, চ ও ছ অংশ অর্থাৎ পায়ের মোহড়ার অংশ এখন ১½" ইঞ্চি কাপড় চওড়া নিয়া মোহাড়ার আলাদা পট্টি লাগাইয়া সেলাই করিয়া দিতে হইবে। এইখানেই আদিয়ার সম্পূর্ণতা।

পায়জামা :—সেলাইয়ের মাপ—

নাভির ২½" ইঞ্চি উপরে হইতে হাটুর ১" ইঞ্চি নীচে পর্য্যন্ত অথবা গ্রাহকের পছন্দ অনুযায়ী নীচের লম্বা মাপ লইতে হইবে।

লম্বা—১৬" ইঞ্চি কোমর—২০" ইঞ্চি সেকম—৭" ইঞ্চি মোহরী—৮" ইঞ্চি পাছা—২৪" ইঞ্চি

যে কাপড়ের পায়জামা হইবে সেই কাপড়কে লম্বা মাপ হইতে ৩" ইঞ্চি কাপড় বেশী লইয়া পাড় দিক উপর ভাঁজ করিলে ৪ ভাঁজ কাপড় হইল। সেই কাপড়কে মাপানুযায়ী দাগ করিয়া লইতে হইবে।

পায়জামা—৩২নং চিত্র

ক ও ঘ ১৬" ইঞ্চি লম্বা মাপ ঘ ও গ ৭" ইঞ্চি সেকম মাপ ঘ হইতে ঙ পর্য্যন্ত ২½" ইঞ্চি অতিরিক্ত কাপড় মোহরীর জন্য রাখিতে হইবে। ক, গ, ঘ ও ঙ বিন্দু যে স্থানে করা হইয়াছে তাহাকে সমান্তরালে রেখা টানিয়া লইতে হইবে। তারপর কোমরের যত ইঞ্চি আছে তার ¼" ভাগ+৩½" ইঞ্চি বেশী রাখিয়া ক হইতে ঘ চিহ্ন করিতে হইবে। অর্থাৎ কোমরের ¼ ভাগ=৫" ইঞ্চি+৩½" ইঞ্চি মোট ৮½" ইঞ্চি। গ হইতে পাছার ¼ ভাগ+৪" ইঞ্চি বেশী চ চিহ্ন করিতে হইবে। অর্থাৎ পাছার ¼ ভাগ ৮"+৪" মোট ১২" ইঞ্চি হইল। ঘ হইতে মোহরীর মাপের ছ পর্য্যন্ত ৮" ইঞ্চি+½" ইঞ্চি=৮½ ইঞ্চি, মাপ রাখিয়া পরে ঙ ও ঝ চিহ্ন ১½ ঘ, ছ মাপ হইতে বেশী রাখিতে হইবে। তারপর ঘ, চ চিহ্ন সংযোগ করিয়া চ ও ছ চিহ্ন চিত্রানুযায়ী একটু বাঁকাভাবে সংযোগ করিয়া ছ ও ঝ অংশ একটু কোণাকোণীভাবে সংযোগ করিলে পায়জামা চিত্র শেষ হইল। তারপর কাঁচির সাহায্যে ক, ঘ, চ, ছ, ঝ ও ঙ কাটিয়া লইলে পায়জামা কাটা হইল।

পায়জামা সেলাই—

পায়ের মোহরী অনেক রকম কাজ হয় সহজ হচ্ছে পায়ের অতিরিক্ত খ, ঘ ও ছ, ঝ অংশ কাপড় রাখা হইয়াছে—

কোমরের বেন

৪নং চিত্র

তাহাকে ভিতর দিক উল্টাইয়া বিলনী করিয়া কলে বকেয়া দিয়া নেওয়া। আর যদি সুন্দর করিবার দরকার হয় তা'হলে ঘ ও ঝ অংশে চিকণ্ড লেস্ বসাইয়া সেলাই দিয়া খ, ছ অংশে ১" ইঞ্চি চওড়া মোহরীর মাপ হইতে ৩" ইঞ্চি বেশী লম্বা ২টী কাপড়ের পটী অর্থাৎ ৮" ইঞ্চি+৩" মোট ১১" ইঞ্চি (৪নং চিত্রের) লম্বা একখানি মোহরীর বেন কাটিয়া—প্রথমতঃ খ, ছ অংশে নম দিয়া

মোহরীর বেন

৪নং চিত্র

অর্থাৎ কুঁচি দিয়া পটীর সমান কাপড় জমাইয়া লইয়া বিলনী দিয়া পটীর দুই পাশে বকেয়া সেলাই করিয়া লইলে মোহরীর কাজ শেষ হইল। তাপর ঘ, চ ও ছ, ঝ ভিতর দিক ডবল সেলাই দিয়া অপর দিক তেমন করিয়া ডবল সেলাই দিয়া নিলে পায়জামা জোড়ার কাজ শেষ হইল। এই জোড়ার কাজ শেষ হইলে কোমরের ৪নং চিত্রের যে বেন কাটা হইয়াছে কোমরের বেনের জন্য ৩" ইঞ্চি চওড়া কোমরের যত মাপ তা' হইতে ৩" ইঞ্চি বেশী একটী কাপড়ের পটী কাটিয়া লইতে হইবে। এই বেনকে ঠিক রাখিয়া পায়জামার কোমরের অংশকে কুঁচি দিয়া ঐ বেন ডবল ভাজ করিয়া বসাইতে হয়; পরে বকেয়া সেলাই হইলে তারপর কোমরের বেনের ভিতর একখানি চওড়া ফিতা পরাইয়া দিলে পায়জামার কাজ শেষ হইবে।

পায়জামা

৬নং চিত্র

এরপর 'নিকার বোকার'—ও অন্যান্য বিষয় থাকিবে।

গান

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

কানেতে বাঁশী বাজ্‌ছে নিতি
উঁচে নব তান,
তার সনে মোর মিশিয়ে গলা
একটি ছুটি গান।
ফুরাবে তা'ও সন্ধ্যা হ'লে
সুরের খেলা একটি পলে,
কাঁদ্‌বে নানান সুরের ছলে
একটি বিরাট প্রাণ।

ছোট কথায় যাই যে গেয়ে
চাই যা আমি বলি,
বড়র পাশে ছোট গানের
একটি ছুটি কলি;
বৃহৎ কিছুই নাই এ গানে,
সবার-ছোট এর যা মানে,
মহৎ গানের সুরের পানে
রেখেছি মোর কাণ।

রেল লাইনে শস্য নাশ

যাহা নিরাপদ্ রেল লাইনে এখনও জল নিকাশের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। যে একটি পুল নির্ম্মাণের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে তাহা সম্পন্ন হইলে সেদ বিভাগের ঐ বিরাট জলরাশি নির্ব্বিঘ্নে ইহা কোন সহায়তা করিতে পারিবে না। অবশ্য পাকার নির্ম্মাণচিত্র প্রতিবিধান এ সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় কোন কথা সাহস করিয়া উত্থাপন করিতে পারেন নাই তবে দেশের লোক একটু আন্দোলন আলোচনা করিতেছে —গবর্ণমেণ্টের তাহা গ্রাহ্য না করিবারই কথা। এই রেল লাইনের যে পার্শ্ব উনুরী। সৈদপুর যাওয়ার বাহুলি প্রভৃতি গ্রাম পর্য্যন্তের সেই পার্শ্বের সমুদয় ধান এই মাসের প্রথম সপ্তাহেই ডুবিয়া গিয়াছে। লাইনের আর পার্শ্বের জল এক পার্শ্বের জল অপেক্ষা সময় সময় এক হাত দেড় হাত পরিমাণ উঁচু হইয়া থাকে। ইহাতে ঐ অঞ্চলে আবার এরূপ অসুবিধা হইয়া পড়িয়াছে। গত বৎসর হইতে এ সব অঞ্চলে ক্রমাগত অজন্মা চলিতেছে। পাকার জেলার এই অঞ্চলই এখন শস্য ভাণ্ডার—অন্য ইহাই একেবারে শস্য হীন হইয়া গেল। এই ভয়াবহ অবস্থার কি প্রতিকার হইতে পারে দেশের লোক তাহা চিন্তা করুন। ধন্যবাদ

সতীর সাহস

বরিশাল জেলার্গত্ত খন্ডার মুলহোগ্রা গ্রামে ছুই বিবির ঘরে। সুখ স্বচ্ছন্দ সহ সে ঘর ছিল। গ্রামে কতু যাদব জনৈক গাড়ি ঘরের বেড়া কাটিয়া ছুই বিবির ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার সতীত্ব নষ্ট করার চেষ্টা করে। তখন মাতা ও পুত্র উভয়ে একখানি দা দিয়া কতুকে প্রহার করিয়া তাড়া করে। পোলিশ চলিতেছে।

মাদ্রাজের পার শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ৫১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। গত ১৯শে জুলাই সন্ধ্যাকালে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়া গিয়াছে। ইনি মৃত্যুর ৩ দিন পূর্ব্বে জাতিসঙ্ঘের কর্তৃত্বে আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতি পদে মনোনীত হইয়া, সেই পদগ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন।

মধ্যপ্রদেশের গবর্ণর স্যার ফ্রাঙ্ক নাই সিমলা আসিয়াছেন। শুনিলাম শ্রীযুক্ত সুভাষের সহিত নাগপুরের জাতীয় পতাকা আন্দোলন সম্বন্ধে পরামর্শ করাই তাঁহার সিমলা আগমনের উদ্দেশ্য।

শ্রীযুক্ত গোপাল দাস জেলাই আসিয়াছেন, মধ্যপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট নাগপুরে পতাকা সংগ্রামের মিটমাটের জন্য একটী গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট যদি জাতীয় পতাকার সহিত ইউনিয়ন-জ্যাক পতাকা তুলিতে সম্মত হন তবে সত্যাগ্রহ বন্ধ করা হইবে এবং বৈঠকেরও বিশেষ দরকার হইবে না। শ্রীযুক্ত গান্ধীজি ইহাতে অসম্মতি জানাইয়া বলিয়াছেন যে মিটমাটের কোন কথার পূর্ব্বে বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

চরকাবাইরে ডাকাতি এবং তাহার সঙ্গে পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যে এত সংবাদ বাহির হইয়াছিল সে সম্বন্ধে আজ সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে, অধিকাংশই একেবারেই মিথ্যা। পুলিস কোথাও কোন অত্যাচার করে নাই। বেচারীদের নামে বৃথা কলঙ্ক আরোপ করার চেষ্টা করা হইয়াছে। অনেকগুলি মহিলা সভায় যাইয়া পুলিসের বিরুদ্ধে ধর্ষণাদির অভিযোগ করিয়াছিল, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের কথা বিশ্বাস করেন নাই। গবর্ণমেণ্ট এই ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, যাহারা তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের চরিত্র সম্বন্ধে এই হীন গুজব রটাইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করা হইবে। বৃথাকাদুর ব্যাপারের কি হইল?

শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায় "আরুক" সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যে মামলা আনিয়াছিলেন তাহা উঠাইয়া লইয়াছেন। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উকীল আদালতে বলিয়াছেন যে, পাঁচকড়ি বাবু অত্যন্ত অসুস্থ, বোধ হয় তিনি আর আদালতে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। পৃথ্বীশ বাবু যখন পুনঃ আবার মামলা করিতে পারিবেন এই সর্ত্তে মামলা উঠাইয়াছেন। পৃথ্বীশচন্দ্র আরও কথার মামলা রুজু করিয়াছেন, তাহাদের অপরাধ নাই, কিন্তু পাঁচকড়ি বাবুর অবস্থা শুনিয়া তাঁহারা বিচলিত হইয়াছি। অচিরেই তিনি নিরাময় হউন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

বর্দ্ধমান প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে ঘরোয়া বৈঠক হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে আগামী অধিবেশনে সভাপতি করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। মহাত্মাজী "আইন অমান্য" করার ভার কাহাকে দিবেন, কিন্তু নাগপুরে নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকরী সমিতির যে অধিবেশন হইয়াছে সে অধিবেশনে বোধহয় ব্যবস্থা যদি উল্টাইয়া যায় তখন আবার আপোষ। কীরূপ দাঁড়াইবে—বরাদ্দ হল আবার, একটা বৈঠক তখন করিবেন কী? কেবল এই বৈঠকের ঠেকাটাই চাহিবে, আর কাজ।—কবীর উদ্দেশ পণ্ডিত মহাশয়ের কথায় ইহাকে গেলে—ঘটায় যা পরমাণু।

গত জুলাই নাগপুরে আট জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গত ১৯শে এবং ২০শে জুলাই তাঁহাদের বন্দী হইয়াছিলেন, তাঁহারে তাঁহাদের প্রত্যেকের ছয়মাস সশ্রম এবং একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গালার মহারাজা তীন বৎসর ধ্রুবী বীর-বীরাঙ্গনের বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকা করিয়া অর্থ সাহায্য করিবেন এবং ইংলণ্ডের বীর এডওয়ার্ড রাজপাটের বৎসরে এক হাজার পাউণ্ড টাকা সাহায্য করিবেন বলিয়াছেন।

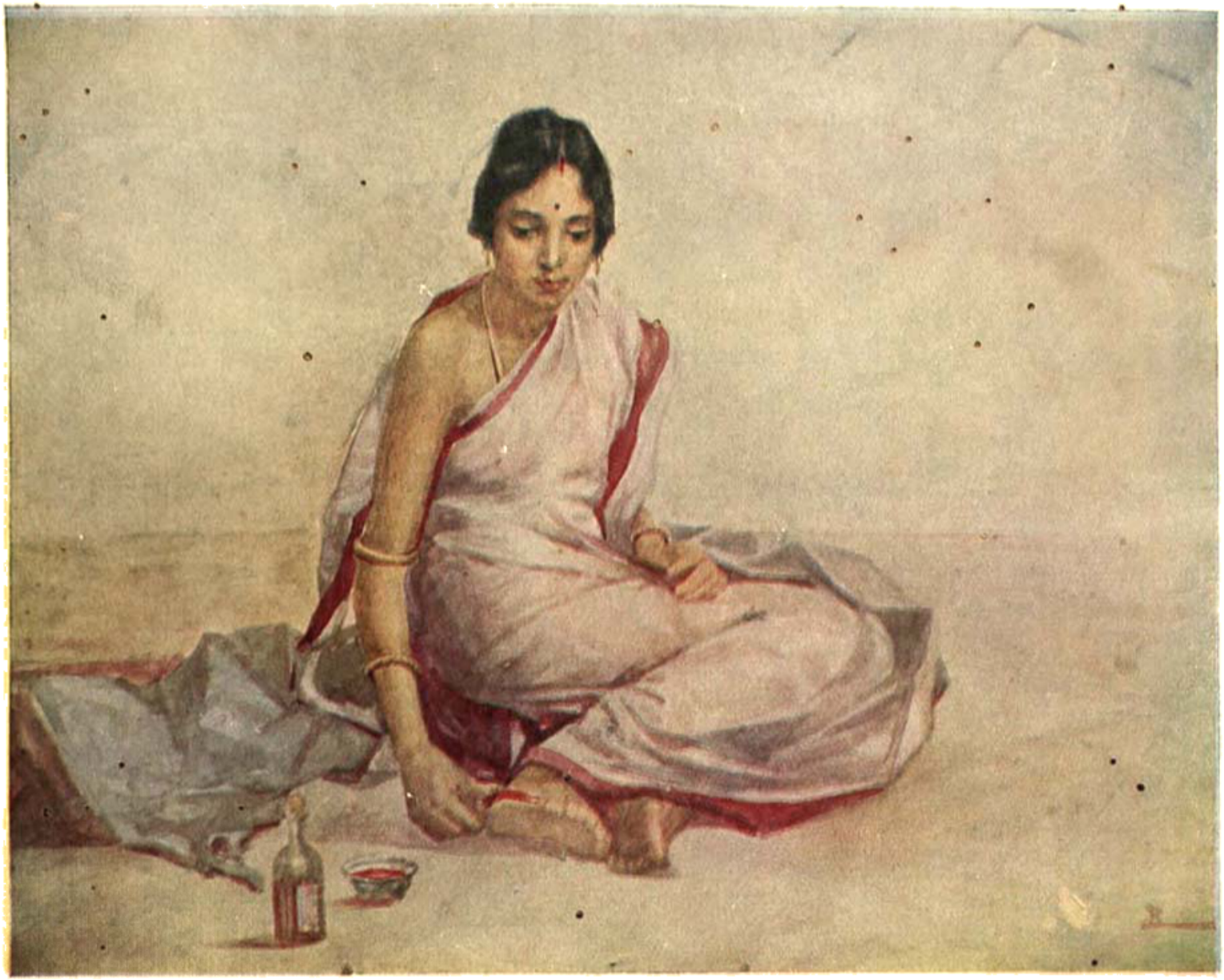

শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা।

অলঙ্কৃত।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

২য় বর্ষ] ২৯শে আষাঢ় শনিবার ১৩৩০, ইং ১৪ই জুলাই। [২য় সংখ্যা

"বুড়ো বুড়া মনের মিলে—"

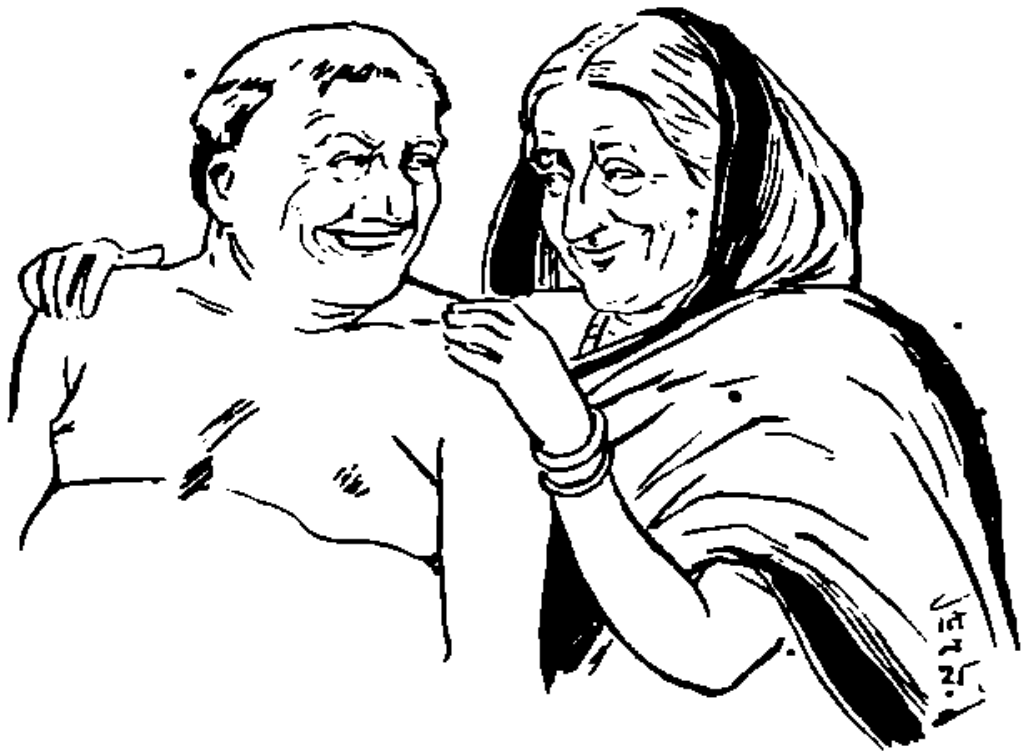

* রাফিং গ্যালারিতে 'বুড়ো-বুড়ী' স্থান পান নি বলে' তাঁরা না-কি ভারি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ভুল-চুক মানুষের আছেই, বুড়ো-বুড়ীরা আশা করি এবার আমাদের মার্জ্জনা করবেন।

বাসন্তী সম্মিলন

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার)

"বাসন্তীর" নব-পর্য্যায়ের প্রথম বর্ষের অবসানে, দ্বিতীয় বর্ষারম্ভে গত শনিবার "বাসন্তীর" কর্ত্তৃপক্ষগণ এক সাহিত্যিক সম্মিলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই সম্মিলনে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, সাহিত্যিকগণের পরস্পরের সহিত আলাপ-পরিচয়, মেলা-মেশা, এবং গান-বাজনা ও হাস্যকৌতুকের মধ্য দিয়া কতকটা সময় অতিবাহিত করা। আমাদের উদ্দেশ্য "বাসন্তীর" বন্ধু-জনের অনুগ্রহে সিদ্ধ হইয়াছিল। লক্ষ্মীবিলাসের স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সুপ্রশস্ত বৈঠকখানা গৃহে সেদিন কলিকাতার বহু সাহিত্যিক সংবাদপত্রসেবীর শুভাগমন হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ রাখাল বাবু, তাঁহার পাঁচ পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র সকলে মিলিয়া এই সাহিত্যিক-সম্মিলন সম্পূর্ণ করিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কমলার কৃপায় দেশের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল, তাঁহাদের সাহিত্যের প্রতি যত্ন দেখিলে আনন্দই হয়। সাহিত্যিকগণ, রাখালবাবু ও তাঁহার পুত্রপৌত্রের আদর আপ্যায়নে প্রীত হইয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি।

সেদিনের উৎসব সম্পূর্ণ করিতে আর-আর যাঁহাদের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছি আমরা তাঁহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে ধন্যবাদ দিবার এই সুযোগ গ্রহণ করিতেছি। কুমারী রেণু, মুক্তিকা, এবি—তিনটি বালিকার কণ্ঠ সঙ্গীত সেদিন সকলকেই আনন্দ দিয়াছিল। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মিহির কিরণ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গীত উপভোগ্য। শ্রীযুক্ত তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণের দ্বারা যে যন্ত্র-সঙ্গীত-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, তাহা আজও আমাদের কাণে বাজিতেছে। অন্যান্য সিনেমা কোম্পানীর অন্যান্য অনেকে বাবুকে ধন্যবাদ, তাঁহারা সম্মিলনে যাদুযন্ত্র দেখাইয়াছিলেন; তাছাড়া ছিন্ন কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণকেও আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি, তাঁহাদের "যানভঞ্জন" আমাদের যান রক্ষা করিয়াছিল। ছায়া চিত্রের সঙ্গে রসার ব্যঙ্গ-অধ্যক্ষগণ সুন্দর-সুন্দর গৎ বাজাইয়া দর্শকদের আনন্দ দিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও ধন্যবাদ!

যে সকল সাহিত্যিক, সংবাদপত্র সেবী আমাদের ক্ষুদ্র আয়োজনে যোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের যে কি বলিব, তাহা ত ভাবিয়াই পাই না। সাহিত্যের আহ্বান, সাহিত্যিক সম্মিলন, তাঁহাদের দ্বারা উপেক্ষিত হইতেই পারে না। তাঁহাদের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে আর একজনকে ধন্যবাদ না দিয়া পারিলাম না। তিনি আমাদের দেবতা মহাশয়! শনিবার অপরাহ্ণে আকাশ-মার্গে তাঁহার যে ভ্রূকুটি ছায়া দেখিয়াছিলাম তাহাতে সকলের প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। শতসহস্র ধন্যবাদ! এটা-ওটার ভিতরেই দেবতা তাঁহার দুর্জ্জয় ভূতগুলিকে ফিরাইয়া লইয়াছিলেন!

মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে কাগজে কলমে ধন্যবাদ না দিলেও চলিতে পারে, অতএব অলমিতি বিস্তরেণ—

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে

সেতার শিক্ষা

৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ১৷৷০

সেতারের অতিরিক্ত গত ... ৷৷০

প্রকাশক :—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

৪।১এ সেন লেন, শোঃ হাটখোলা, কলিকাতা

এবং গুরুদাস লাইব্রেরী ও

ডোয়ারকিন কোং নিকট প্রাপ্তব্য।

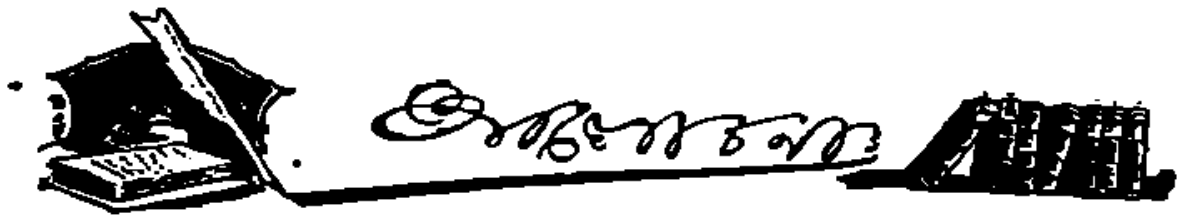

দেশের সত্য কর্মী যাঁহারা, দেশকে ভালবাসেন বলিয়া—দেশের মুক্তির চেষ্টা তাঁহারা করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের অনেকেই রাজরোষে কারারুদ্ধ। তাই মহাত্মা গান্ধীর মত লোকের লালা লাজপত রায়ের মত লোকের মৌলানা মহম্মদআলী, সৌকৎ আলীর মত লোকের মৃত্যি দেশবাসী শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে, কর্মক্ষেত্রে ইহাদের অভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করে—আর এমন লোকদের কর্ম প্রভাব হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে বলিয়া দেশবাসী মর্ম-বেদনায় জ্বলিয়া মরে! দেশবাসী ইহাদের মুক্তির জন্য বদ্ধ করিবার কর্তা যাঁহারা তাঁহাদের কাছে আবেদন নিবেদন করে—তাহা বিফল হয়। কিন্তু যাঁহাদের মুক্তির জন্য দেশবাসী আবেদন নিবেদন করে তাঁহারা মুক্ত থাকার চেয়ে কারাগারই ভালবাসেন। তাই কারাগারের বাহিরে আসিয়াও তাঁহারা আবার কারা-গারের জন্যই ব্যাকুল হইয়া উঠেন। আমাদের প্রার্থিত আবেদন নিবেদনের মুক্তি ইহারা নিশ্চই চাহেন না, তাহা চাহিলে তেমন মুক্ত স্বচ্ছন্দে ইহারা থাকিতে পারিতেন। তাঁহারা চাহেন দেশবাসীও তাঁহাদের আচরিত পন্থা অনুসরণ করিবে। তাহা যদি দেশবাসী করিতে পারে তবে ইহাদের প্রার্থিত মুক্তি আসিবে।

• • • •

তাই বহুবার কারামুক্তির প্রাপ্ত লালা লাজপতরায় কারাগারে স্বাস্থ্য অবস্থায় ফিরিতে বসিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর মত লোক দুইবৎসরের জন্য কারাগারে মুক্তি সাধনা করিতেছেন। ভারতের ভরাট্ট সচিব সার ম্যালকম হেলী সত্যই বলিয়াছেন—ইহাদের মুক্তির জন্য দেশে আন্দোলন কৈ? কথাটি অতি সত্য কথা—তেমন মুক্তি আন্দোলন দেশে হইলে ইহারা কারারুদ্ধ থাকিতেন না। কর্মভোগ ইহাদের তাই ভুগিতেছেন—দেশের লাইনা মূর্খ হইয়া ইহাদের মধ্যেই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।

• • • •

মহাত্মার নিকট লালা লাজপত রায়ের লিখিত একখানি পত্রের অনুবাদ সহযোগী 'আনন্দবাজার' প্রকাশ করিয়াছেন। লালাজীর মতে সর্বাপেক্ষা দেশের অধিক প্রয়োজন এখন বালকগণের জন্য দুগ্ধ, পূর্ণ বয়স্কগণের জন্য খাদ্য, সকলের জন্য শিক্ষা। এ দেশবাসীরা এই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির কোনটিই পাইতেছে না। তাই দেশের সকল দিকের সমস্যাই এখন গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। দেশের এই সমস্যা মিটাইতে গেলে সব দিকের সমস্যাই আসিয়া উঠিবে—অনধিকারীর অধিকার বেশ সঙ্কুচিত করিতে হইবে। ন্যায় সত্য এ গুলির স্থান দিতে হইবে। ইহাতে বিক্ষোভ আসিবে—কিন্তু ইহা না পাইলে দেশ ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাই যেরূপেই হউক দেশবাসীকে এগুলি অধিকার করিতে হইবে। লালাজী বলিয়াছেন—ধনী ও বড়লোকদের লইয়া মাথা ঘামাইও না, তাহাদের ইচ্ছামত কাজ করিতে দাও। তোমরা কেবল শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী ও নিরক্ষর কৃষক শ্রমজীবি লইয়া কাজে লাগিয়া যাও। তাহাদিগকে ঘৃণা, প্রতিহিংসা পশুবল প্রয়োগের উপদেশ দিওনা—তাহাদের শিখাও আত্মনির্ভরতা, পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা, কর্তব্য, অধিকার, দায়িত্ব, সঙ্ঘের আবশ্যকতা ও শিক্ষার প্রয়োজন। তাহাদের শিখাও সমাজের স্বার্থের জন্য ব্যক্তির স্বার্থ বলি দিতে, জাতির স্বার্থের জন্য সমাজের স্বার্থ বলি দিতে। এর চেয়ে বড় কথা ভারতীয়দের আর নাই। ইহা করিতে পারিলে দেশের শোষণ বন্ধ হইবে, জাতির মোহ টুটিবে। আবার দেশ আপন গৌরবে দাঁড়াইতে পারিবে।

• দেশ সব দিক দিয়া মরিতে বসিয়াও কি করিয়া যে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিতেছে না ইহাই এ দেশের চরম দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালী খাইতে না পাইয়া মরিতেছে অথচ গত চার বৎসরে বিদেশী মিলিকেরা ৪১টি পাটের কল বাংলা দেশে চলাইয়া ৬২ কোটি টাকা লাভ করিয়াছে। পাট বাংলার জন্মে—অথচ বাংলার দারিদ্র্য ঘোচে না। শুধু পাটেই নয় বাংলার অন্যান্য দ্রব্য লেন দেন করিয়া সকলেই কোটি কোটি টাকা পাইতেছে—অথচ যে দেশের ও দেশবাসীর দৌলতে সব সেই দেশই মরিতেছে। বিধাতার আশ্চর্য্য বিধান—জগতের অষ্টম আশ্চর্য্য!

• • • •

এমন দুরবস্থা যে দেশের সে দেশের লোকেরও কিন্তু নিজেদের নিজেদের মধ্যে কলহের প্রবৃত্তি—একে অপরকে ঠকান, লাঞ্ছিত করা, নির্য্যাতিত করিবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ মাত্রায়ই বজায় আছে বরঞ্চ দিনের দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। হিন্দু মুসলমানে কতকগুলি কৃত্রিম বাধা বিঘ্ন, বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া কাজরবৃত্তি সজাগ রাখিতেছে। হিন্দু হিন্দুকে লাঞ্ছিত করিতেছে—যাহার পুত্র আছে সে কন্যাদায়গ্রস্তের বুকে পাষাণ চাপাইতেছে, আবার নিজে সেই পাষাণ চাপেই পিষ্ট হইতেছে। এতটুকু ক্ষমতা যার হাতে পড়িল সেই ক্ষমতাহীনকে লাঞ্ছিত করিল—শক্তির এমনি হীন খেলা আমাদের দেশে চলিতেছে।—দেশের সব রসাতলে যাক কাকের মাংস কাকে খাইয়া বাঁচিয়া থাকি—এভাবে দেশের লোকের এমনি স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন না হইলে কি আর দেশের এ দুর্গতি হয়?

আগামী সংখ্যায়—
হেমন্তকুমার সরকার,
শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, যোগেশচন্দ্র রায়,
সরলাবালা বসু প্রভৃতি
লিখিবেন।

• • • •

সম্প্রতি বাংলার এ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীযুক্ত সত্যেনরঞ্জন দাশ হিন্দু মুসলমান মিলন সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দুরা সরকারী চাকরীর প্রলোভন ত্যাগ করিলেই যদি মুসলমান ভ্রাতারা সুখী হন তবে আপত্তি করিবার কিছু নাই। হিন্দুরা এ চাকরীর সুখ হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে—বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির মোহেও তাহারা ঢের ডুবিয়াছে। এখন মুসলমানেরা তৎপর হইয়া যদি ও গুলির রসে বিশেষ ভাবে মজিলেই—হিন্দু মুসলমান ভেদ মিটে তবে আপত্তির কিছু নাই। কিন্তু ইহাতেই কি সব সমস্যা মিটিবে? দেশগত সমস্যা উভয়েরই যে সমান, হিন্দু মুসলমান উভয়েই একই বাংলার অধিবাসী, মূলে বাংলা দেশটাই যদি অন্তঃসার শূন্য হইয়া যায় তবে দেশবাসী বাঁচিবে কি করিয়া? আর বৃটিশ বিদ্বেষ হইতেই যে হিন্দু মুসলমান মিলন সুদৃঢ় করিবার চেষ্টার ব্যর্থ প্রয়াসের কথা বলা হইয়াছে ইহা একান্ত ভুল। শ্রীযুক্ত দাসের মত লোকে এমন মত প্রকাশ করিলেন কি করিয়া আমরা তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই। দেশবাসী বলিতে শুধু হিন্দু বা শুধু মুসলমানকেই বোঝায় না। উভয়কেই বোঝায়। দেশের স্বার্থে উভয়েরই স্বার্থ। এ স্থলে সম্প্রদায়িক স্বার্থকে উচ্চ আসন দিলে দেশের স্বার্থ ডুবিবে—উভয়েরই তাহাতে ক্ষতি। বৃটিশ বিদ্বেষে ইহাদের মিলন—মহাত্মার অভিপ্রেত ছিল না। তবে দেশের অখণ্ড স্বার্থ অব্যাহত রাখিতে দেশের লোক যাহারা মোটেই নয় তাহাদের মিলিত চেষ্টার প্রতিঘাত করিবার ব্যবস্থা ছিল বটে। ইহা না করিলে আমাদের দেশের মত মরণ দশা সকলেরই আসিবে। দেশকে বাঁচাইবার জন্য দেশের স্বার্থ অব্যাহত রাখিয়া উভয় সম্প্রদায়ের বাঁচিবার জন্যই মিলন আবশ্যক—বিদেশী বিদ্বেষ এখানে মোটেই বড় কথা নহে।

• • •

বাংলাদেশের নানা দিক হইতে প্রায়ই খবর পাওয়া যাইতেছে যে দুর্বৃত্তদের হাতে নারীরা লাঞ্ছিত হইতেছে। একটা চাষার মেড়হাজার লোকের বসতি গ্রামের ভিতরে পাঁচ সাত দশটা বদমাইস লোক লাঠি সোটা হাতে লইয়া আসিয়া গৃহস্থের বন্ধ ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া নারীদের হরণ করিয়া লইয়া তাহাদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতেছে। শত শত গ্রামবাসী এই দুর্বৃত্তদের

বাধা দিতে সাহস পায় না। তেমন সাহস দেশবাসীর থাকিলে এমন কাজ ঘটিতে পারিত না। তারপর শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ আছে তাহারাও যদি তেমন তৎপরতার সহিত কাজ করিত তবে ইহা নিবারিত হইতে পারিত। দেশের লোকের নারীর ইজ্জৎ দেশের আহত সেখায় শুধু পুলিসের উপর ভারার্পণ না রাখিয়া জেলা বা মহকুমার হাকিমদেরও নিজ হস্তে ইহার তদন্ত করিবার ভার লওয়া উচিত। দেশের এমন কলঙ্ক বাড়িতে না দিয়া দৃঢ় হস্তে উপযুক্ত কঠোর শাস্তি বিধান করিয়া ইহার দমন করা কর্ত্তব্য। দেশের উপর দেশের লোকেই এ অত্যাচার করিতেছে—সুতরাং দোষ দেশবাসীরই সব সন্দেহ নাই। আর অত্যাচারী বদমাইস্ হিন্দু বা মুসলমান যে সম্প্রদায়েরই লোক হোক না কেন দেশের গ্লানিকর জীব হিসাবে ইহাদের তীব্র সমাজ শাসন ও সাম্প্রদায়িক শাসন করা উচিত। সকলের বড় কথা—দেশের সরকার দেশবাসীর লাঠি, তরবারি, বন্দুক, সকল রকম পুরুষের আত্মরক্ষার উপযোগী অস্ত্র শস্ত্র হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। নিরীহ দেশবাসীরা এ গুলির অভাবে পুরুষত্বহীন হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এ গুলির অভাব ঘটাইয়া যাহারা দেশের শান্তি শৃঙ্খলার ভার গ্রহণ করিয়া আছেন তাহাদের এমন গুরুতর বিষয়ে প্রতিকারের বিলম্ব উচিত কি? দেশে নিত্য চুরী ডাকাতী বাড়িতেছে, লোকের ধন প্রাণ আজো নিরাপদ নয়। তার উপর নারীর মান মর্য্যাদাও এ ভাবে যদি যাইতে থাকে—তবে দেশের সব দিকেই শান্তি-শৃঙ্খলার নমুনা যে বেশ প্রাণান্তকর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

• • • •

কোটিপতি ধনী শেঠ যমুনলাল বাজাজ প্রভৃতি জাতীয় পতাকা সংরক্ষিণী আন্দোলনে যুক্ত হইয়া বিচারে দেড় বৎসরের জন্য জেলে প্রেরিত হইয়াছেন। জাতীয় পতাকার আন্দোলনকারীরা যার পিট, হাতায় হুজ্জত কিছু করেন নাই। আপনার দেশের দশজনের চলিত পথের উপর দিয়া জাতীয় পতাকা হস্তে গমন করিয়াছেন—এই দোষ, এই অপরাধ! এই অপরাধের এই দণ্ড! তবে কি নিজের দেশে নিজের দেশী পতাকা লইয়া চলিবার অধিকারও দেশবাসীর নাই?

• • • •

দেশের চারিদিকে—ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে একটা ভীষণ বিক্ষোভ চলিয়াছে। অভাবের তাড়নায়, পেটের জ্বালায় দেশের লোক জন সব অতৃপ্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। দেশবাসীর জীবনে শান্তি নাই—সুখ নাই স্বস্তি নাই। দেশে খাইবার, পরিবার জিনিষ, উপভোগের উপাদান সবই আছে অথচ দেশের লোকেই খাইতে পাইতেছে না, জীবনকে কোন দিক দিয়াই উপভোগ করিতে পারিতেছে না।

• • •

আজ এই অভাবই দেশবাসীর জীবনে সব চেয়ে বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশে সব আছে, খাইবার পরিবার, উপভোগের সব জিনিস উৎপাদন করিবে দেশবাসীরা, অথচ তাহারাই না খাইয়া মরিবে। জীবনকে কোন দিক দিয়াই উপভোগ করিতে না পারিয়া সর্ব্বক্ষণ অসহ্য মর্ম্মবেদনায় জ্বলিবে—এমন যে দেশের অবস্থা, সে দেশবাসীর জীবনে শান্তি আসিবে কোথা হইতে? অভাবের পেষণে জাতি মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে—আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ, সব রকম মহৎ আদর্শ জীবন হইতে দূর করিয়া দিতেছে—এমন যে দেশের ভিতরের অবস্থা সে দেশে বাহিরের শান্তি জোর করিয়া আনিতে চাহিলেই কি তাহা আসে? ভিতর যেখায় অমানুষের গ্লানিতে জ্বলিয়া যাইতেছে বাহিরাবরণ সেখায় হাতে তৈরা চাকচিক্যময় দেখাইতে পারে কি?

• • •

নানা বাহিরের দেশের ভোগবিলাসের, আহারের পর্য্যাপ্ত উপকরণের ব্যবস্থা করিয়াও এ দেশের অধিবাসীগণের দিন কোন রকমে কাটিয়া যাইতেছিল। সুখে হোক দুঃখে হোক দিন কাটিতেছে—দু'বেলা দু'মুঠো শাক ভাত খাইয়া সাধারণ লোকের অতি সাধারণ ভাবেও দিন যতদিন যাইতেছিল ততদিনও দেশের লোকে এক ভাবে দিন চালাইতেছিল। কিন্তু দেশের আজ এমনি ভীষণ দুর্দ্দিন আসিয়াছে যে দেশবাসীর কোন

রকমে শাক ভাত খাইয়াও বাঁচিয়া থাকিবার, দিন গুজরাণ করিবার উপায় ক্রমশই লোপ পাইয়া গিয়াছে।

•

বাহিরের শোষণ ভিতরকে শূন্যগর্ভ করিয়া ফেলিয়াছে। দেশে আজ তাই মানুষের মেলাই দেখা যায় মনুষ্যত্ব সম্পন্ন মানুষ দেখা যায় না। দেশের লোকের ত্রুটি ভিন্ন দেশের এমন অবস্থা হইতে পারিত না ইহা সত্য কথা। কিন্তু এখনো যদি এ ত্রুটি ও মরণ-ভুল দেশবাসীর না ভাঙে তবে ইহার ধ্বংস সুনিশ্চিত। অবস্থা শোচনীয় যত দূর হইবার তাহা হইয়াছে—এর পরে যে দেশবাসীর হাহাকার ও আর্ত্তনাদ আরও কতদূর গড়াইবে কে জানে!

• •

সদাশয়তা, সজ্জনতা, ভ্রাতৃভাব কিম্বা কর্ম্মে কুণ্ঠা ও অপারগতা ইহার যে কোন কারণ বা সর্ব্ববিধ কারণগুলির সমবায়েই সোণার বাংলা নানা দেশীয় জাতির ক্রীড়া ভূমি হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মোহে বাঙ্গালী যত ডুবিয়াছে ও মজিয়াছে এমন বোধ হয় আর কোন দেশের অধিবাসী ডোবে নাই। সেই শিক্ষা ও সভ্যতার গুণে বাঙ্গালী আজ নিজস্ব সকল সম্পদ হারাইয়া অত্যন্ত হীন ও পরানুগ্রহের কাঙ্গাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার দেশের ফলিত স্বর্ণরাশি অপরে আহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে দেশের লোকে সেই স্বর্ণরাশি নিজ হাতে দেশের বুক হইতে তুলিয়া পরের হাতে অর্পণ করিতেছে—আর নিজেরা নাই নাই করিয়া হাহাকার করিয়া মরিতেছে।

•

ভারতের বাহিরের অপরাপর দেশে ভারতবাসী তথা বাঙ্গালীর কি অবস্থা সে ভাবনা পরের কথা। কিন্তু বর্ত্তমানে সব চেয়ে ভাবনার কথা হইতেছে এই যে নিজের দেশ বাংলায় বাঙ্গালীর অবস্থা কি? বাংলার রাজধানী কলিকাতা সহরে বাঙ্গালীর স্থান সকলের নীচে, অপর সকল দেশের অধিবাসীর কাছে বাঙ্গালী হেয় ও কাবু। বাংলার সুদূর পল্লীতে একটা কাবুলী গিয়া যে ভাবে অত্যাচার করিবার সাহস পায় বাংলার বাহিরে অপর কোন স্থানে তাহা পারে না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বাঙ্গালী শিক্ষা ও সরকারী চাকুরী হইতে স্বচ্ছন্দে অপসৃত—তাড়িত হইতেছে! অথচ বাঙ্গালী এমন উদার যে অপর দেশের অধিবাসীরা তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইলেও তাহারা তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিতেছে না! বাংলার অবাঙ্গালীরা বাংলার উচ্চশিক্ষা পদ্ধতির স্থান লইতে কিম্বা সরকারী চাকুরীর উমেদারী করিতে আসিতেছে না। তাহারা আসিতেছে বাঙ্গালীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে—তাহারা আসিতেছে বাংলার অর্থ সম্পদ আহরণ করিয়া জীবন উপভোগ করিতে।

• • •

এই ভাবে বাংলায় অবাঙ্গালীর আধিপত্য এমন বিকট গাড়িয়া বসিয়াছে যে এভাবে আরো কিছুদিন চলিলে বাংলাদেশে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব থাকিবে কি না সন্দেহ। ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইলে বাংলার অজস্র স্বার্থত্যাগী কর্ম্মী প্রয়োজন। বাংলার গ্রামে গ্রামে, সহরে, সর্ব্বত্র এজন্য তুমুল আন্দোলন চালাইতে হইবে। বাংলা দেশের উৎপন্ন শস্য সম্ভার রক্ষা—পণ্য হিসাবে তাহা চালাইবার অধিকার বাঙ্গালীকেই করিতে হইবে। বিদেশী বেশ ভূষা কাঁচের খেলনা যাহার মৌলতে আজ বাংলার অবাঙ্গালীর ধনাগমের সহায়তা করিতেছে এগুলি বর্জ্জন কিম্বা বাঙ্গালীর হাতে চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলার কংগ্রেসী দল স্বরাজ্য দল সব দলই কাজ নাই বলিয়া কথার কচ্‌কচিতে সময়ক্ষেপ করিতেছেন। তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এই দিকে দৃষ্টি দিবার আয়োজন করুন। বাংলার কৌন্সিলে বাংলাদেশে অবাঙ্গালীর প্রতিপত্তি হ্রাসের ব্যবস্থা হউক যথা সম্ভব। বাঙ্গালী চেম্বার অব কমার্স এ দিকে দৃষ্টি দিন। বাংলার অভাব মিটিবার ব্যবস্থা আগে না করিতে পারিলে বাঙ্গালী কোন দিকেই অগ্রসর হইতে পারিবে না। মরিতে বসিয়া কি আর কোন কার্য্যে উৎসাহ থাকে?

চিরযৌবনা

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী]

চোখ দুটি ছিল তার উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, ঠোঁট দুখানি যেন চুম্বনের জন্যই রসে ভরে আছে, রং যেন দেহে ফুটে পড়ছে—এমনি সুন্দরী ছিলেন নিনন ডি এনক্লস্। অনন্ত যৌবন ছিল নিননের। এই চিরযৌবনা সুন্দরী ২৭৭ বৎসর বয়সেও তাঁর ধনুকের মত বাঁকা ভ্রূ ভঙ্গীতে ও হাসিভরা কালো নয়নের চাহনিতে যে কোন পুরুষের মন হরণ করেছেন। প্রথম যৌবনেও এই সুন্দরীর সৌন্দর্য্য জ্যোতি যেমন অম্লান মাধুর্য্যে ভরা ছিল জীবনের শেষ ভাগেও সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য তেমনি অটুট ছিল।

এই অপূর্ব্ব রূপসী সুন্দরীর বয়স যখন মাত্র ষোল বৎসর তখন প্রিন্স ডি মার্সিলাক এঁর সঙ্গে প্রেমে পড়ে যান ও দু'জনে মিলে পলায়ন করেন। দু'জনকেই আবার ধরে আনা হলে প্রিন্সকে শাস্তি স্বরূপ দেশান্তরে প্রেরণ করা হোল, নিননের বাবা কিন্তু তার বড় ভাল-বাসার সুন্দরী মেয়েটিকে এ জন্যে কিছুই বললেন না, একটা তিরস্কার বাক্য পর্য্যন্ত নয়। এর এক বৎসর পরেই নিননের পিতা বহু অর্থ কন্যার জন্য রেখে মারা যান। মরবার সময় তিনি মেয়েকে বলে গেলেন যে তাঁর বড় দুঃখ রইল তিনি জীবনটাকে পূর্ণভাবে উপভোগ করে যেতে পারলেন না—মেয়েকে অনুরোধ করে গেলেন তিনি যেন ভাল করে তাঁর জীবন উপভোগ করে নেন।

নিনন পিতার উপদেশ গ্রহণ করলেন, তিনি জীবনের আনন্দ পূর্ণভাবে উপভোগ করবার জন্য প্যারী সহরে নিজে সম্পূর্ণ একখানি বাড়ী নিয়ে সেখায় বাস করতে লাগলেন। নিনন যখন প্রথম প্যারীতে যান তখন তাঁর বয়স ষোল বৎসর। এক মাসের মধ্যেই প্যারী সহর তাঁর রূপে পাগল হয়ে উঠল—এক জনের পর আর একজন পাগলের মত সুন্দরীর প্রেম সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল।

নিনন সুন্দর বীণ বাজাতে পারতেন, ভাল নাচতে গাইতে জানতেন কিন্তু এই জন্যই যে প্রেমিকের দল তাঁর পাশে ছুটে আসতো, তা নয়। এ নারীর কেমন যেন একটা চুম্বকের আকর্ষণ, কেমন যেন নারী সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব বিকাশ ছিল—তাই পুরুষেরা এই নারীর চরণ-কমলে তাদের সর্ব্বস্ব সঁপে দিত।

প্যারীতে চার বৎসর বাস করার পর একদিন অনেক রাত্রে নিনন্ বলনাচ থেকে ফিরে এসে দাসীকে বিদায় দিয়ে আয়নার কাছে সজ্জিত বেশে দাঁড়িয়ে নিজ সৌন্দর্য্য দেখছিলেন। এইভাবে মুগ্ধ হয়ে আয়নার দিকে চেয়ে আছেন এমন সময় আয়নার মধ্যে কিসের একটা ছায়া দেখে তিনি চমকে উঠলেন। ছায়াটা একজন মানুষের, কালো পোষাকে তার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত—টুপিটা চোখ পর্য্যন্ত টানা। দেখে কে যে সে তা চেনবার কোন উপায় নাই। নিনন এই অপরিচিত ছায়ামূর্ত্তি দেখে ভয়ে চীৎকার না করে বা মূর্চ্ছিত হয়ে না পড়ে তার দিকে ফিরে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কে সে কি চায়? উত্তরে ছায়ামূর্ত্তি তার কালো পোষাকের নীচ থেকে একটা লাল তরল দ্রব্য ভরা বোতল বের করে বললেন, সেই বোতলের তরল পদার্থ রোজ স্নানের জলের সঙ্গে মিশিয়ে স্নান করলে সৌন্দর্য্য তাঁর চিরকাল অটুট থাকবে। যতদিন চিরযৌবনের এই গুপ্ত রহস্য তাঁর থাকবে ততদিন পুরুষেরা আপনা থেকে তাঁকে পূজো করবে। ছায়ামূর্ত্তি সুন্দরীর কাছে কোন মূল্য না চেয়ে বোতলটি টেবিলের উপর রাখলেন।

ছায়ামূর্ত্তি বললেন—বয়সের তিন দিন পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে—তা ছাড়া আর দেখা হবে না।

সুন্দরী নিনন কেমন একটা মোহে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। মোহ ভাঙতে দেখলেন সে অপূর্ব্ব ছায়া-মূর্ত্তি আর নেই—কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। কি করে ছায়া মূর্ত্তি বাড়ীর ভেতর ঢুকল, কোথা দিয়ে কি ভাবেই বা বের হয়ে গেল তার কোন সন্ধান মিলল না।

কে জানে—সেই বোতলেই চিরযৌবনের সঞ্জীবনী সুধা ছিল কি না। কিন্তু সত্য কথা যে কারণেই

হোক নিননের সৌন্দর্য্য আজীবন একই, ভাবে ছিল। সুন্দরীর নব্বই বৎসর বয়সের সময়েও প্রেমিকেরা তাঁর অনুগ্রহের ভিখারী হয়েছিলেন।

সুন্দরী নিননের বহু প্রণয়ী ছিলেন। নিনন কিন্তু প্রেমের খাতিরেই প্রেম করতেন। অর্থ সম্মান এমন কি সিংহাসনের খাতিরেও তিনি প্রেম করেন নাই। সেকালে এমন সুন্দরী অনেক ছিলেন যাঁরা অর্থ সম্মান ও মর্য্যাদার লোভেই প্রেম করতেন, প্রতিদানে প্রেমিকের কাছ থেকে এই সব আদায় করে নিতেন। নিনন কিন্তু তাঁর প্রেমিকদের কাছ থেকে শুধু পুষ্প ভিন্ন আর কিছুই নেন নি। তিনি প্রেমই চাইতেন সেই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বহু প্রকারের লোক ছিলেন নিননের প্রণয়ভাজন। ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ ম্যাজনামা মন্ত্রী রিসলু এই সুন্দরীর পায়ে তাঁর হৃদয় সমর্পণ করেছিলেন—অত বড় ক্ষমতাশালী প্রণয়ী ছিল যাঁর তিনি ইচ্ছা করলেই নিজের জন্য যা খুসী করে নিতে পারতেন। কিন্তু রিসলুর কাছে তিনি নিজের জন্য কিছুই প্রার্থনা করেন নাই—শুধু রিসলু তাঁর অপ্রীতিভাজনদের উপর যাতে কঠিন দণ্ড বিধান না করেন এই জন্য তিনি তাঁকে অনুরোধ করতেন।

সুন্দরী নিনন

তাঁর অপর একজন প্রণয়ী ছিলেন সমগ্র ইওরোপের মধ্যে অতি ক্ষমতাশালী ভিউক্ অব্ সেণ্ট এভারবও। সুন্দরী নিনন যদিও এঁকে বিবাহ করতে সম্মত হন নাই তবু আজীবন এঁরা দু'জনে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

নিননের বয়স যখন বাট বৎসর তখন সুন্দরী একদিন আয়নায় নিজের মুখ দেখতে দেখলেন মুখের উপর যেন একটা সুকঠিন রেখা পড়েছে—সুন্দরী চমকে উঠে তখনি ছুটে ভিউকের কাছে গেলেন। ভিউক হেসে বললেন—প্রিয়তমে সুকঠিন রেখা তো নয় ওটা—ও শুধু প্রেম ওইখানে বাস করবে বলে একটা রেখাপাত করেছে।

সুন্দরীর আর একজন প্রেমিক ছিলেন কাউণ্ট ডি কায়েস্। ইনি প্রথমে সুন্দরীর লোহিতবর্ণের তরঙ্গায়িত কেশদাম দেখেই মুগ্ধ হন—পরে নিননের সঙ্গে এঁর ভাব হয়। পরে এদের মধ্যে মনোভঙ্গ হয়—জীবনে প্রথম নিননকে উপেক্ষা করে এই পুরুষই সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

নিনন তাঁকে কত অনুনয় করে চিঠি লিখলেন—কাউণ্ট তার কোন উত্তরও দিলেন না। জীবনে নিনন কখনো উপেক্ষা পান নাই—তাই আজ উপেক্ষিতা হয়ে তিনি হতাশ হয়ে গেলেন—প্রেমিকের গর্ব্বে আত্মাহুতি দেবার জন্য নিনন তাঁর তরঙ্গায়িত কেশদাম কেটে তাই কাউণ্টকে উপহার পাঠিয়ে দিলেন।

কাউণ্ট তখন বুঝলেন যাঁকে তিনি গর্ব্বিতা আত্মসুখ-পরায়ণা নারী বলে ভেবেছিলেন—সে তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য সম্পদ তারই জন্যেই বিলিয়ে দিয়েছে। কাউণ্ট তখনই উন্মাদের মত, টুপি ফেলে প্যারীর রাজপথ দিয়ে সুন্দরীর আবাস অভিমুখে ছুটলেন। কাউণ্ট্ এসে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে সুন্দরীর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

সুন্দরী নিননের কেশদাম কাটা দেখে প্যারীর অর্দ্ধেক সুন্দরীই আপন আপন কেশ কেটে ফেলে বাবরি রাখতে লাগল। প্যারীর সুন্দরীদের সেই ফ্যাশান হয়ে দাঁড়াল।

চতুর্দ্দশ লুই তখন ফ্রান্সের রাজা। ইচ্ছা করলে নিনন তাঁকেই প্রেমিক বলে ফেলতে পারতেন। কিন্তু রাজাদের উপর সুন্দরীর বড় শ্রদ্ধা ছিল না, তিনি বার বার রাজাকে অস্বীকার করেছেন।

ঊন আশী বৎসর বয়সেও প্রেমিকের পর প্রেমিক এসে নিত্য নব প্রণয় ব্যক্ত করেছেন সুন্দরীর কাছে। চির যৌবনের গুপ্ত রহস্যই যদিও বা সুন্দরী পেয়েছিলেন কিন্তু তাতে কত যৌবন রহস্যই বা ছিল। তা এত কালেও কি ফুরোয় নাই।

মৃত্যুর পূর্ব্ব দিনেও নিননের অম্লান যৌবনশ্রী মাধুর্য্য এতটুকু ম্লান হয় নাই। নিনন জানতেন কখন তাঁর মৃত্যু হবে। মৃত্যুর পূর্ব্বে একখানি চিঠি লিখে তিনি তাঁর মরণের সংবাদ তাঁর কোন বন্ধুকে জানিয়েছিলেন—বন্ধু চিঠি খুলে যখন পড়লেন—সুন্দরী তখন মৃতা। সাল বোতলটিও শূন্য পড়েছিল।

অনন্ত যৌবনা নিননের নাম আজও চিরযৌবনের রহস্যে সমাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী-দের নাম করতে গেলে নিননের নামই আগে করতে হয়।

হিমাচল-প্রাত।

সুপ্রসিদ্ধা নর্ত্তকী শ্রীমতী মৌরকা একখানি ভারতীয় ঘটনা সম্বলিত নাটকে ভারতীয় হাব-ভাবপূর্ণ নৃত্য দেখাইয়াছিলেন। নাটকখানির নাম The Goddess শ্রীমতীর পোষাক পরিচ্ছদ ও অঙ্গের ভূষণাদি সমস্তই ভারতীয় আদর্শে প্রস্তুত। শ্রীমতী মৌরকা সাংসারিক জীবনে শ্রীমতী কুরীলো। এঁর স্বামী ওয়ারনা সরকারী নৃত্যমঞ্চের প্রধান পরিচালক; শ্রীমতী আমেরিকার সভ্য সমাজে বিশেষ আদৃত।

নর্ত্তকী শ্রীমতী কোচুবা নূতন ধরণের নৃত্য দেখাইয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এঁর নাচের বিশেষত্বই এই যে এক নাচের হাব-ভাবের সহিত অন্যটির হাব-ভাব এক হইয়া যায় না।

সুন্দরী নর্ত্তকী শ্রীমতী রথ ফ্রেক—"হিপো ড্রোমে"র "আলাদীন" নাটকে প্রধানা নর্ত্তকীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন; যাহারা নৃত্যে অভিনবত্ব দেখাইয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মিস্ ফ্রেক একজন।

শ্রীমতী লিলিয়ান গিলবার্ট হিপোড্রোমের আর একটি নর্ত্তকী। ইনিও নৃত্য-পটুত্বে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

লালা লাজপৎ রায়।

শেঠ যমুনালাল।

অ-বাঙ্গালীর দেশে বাঙ্গালী প্রধান।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস্‌চ্যান্সার মাননীয় শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ বসু, কে-টি, কে-সি-আই-ই।
স্যার বিপিনকৃষ্ণ আমাদের কলিকাতারই অধিবাসী, হরি ঘোষ ষ্ট্রীটে তাঁহার কলিকাতার বাসভবন।

বিন্ধ্যভিয়াস আগ্নেয়গিরি সম্প্রতি উদ্গমুখী হইয়াছিলেন। উপরে অগ্নি ও ধূমের প্রস্রবণ ছুটিতেছে, নিম্নে গলিত ধাতুস্রাব প্রবাহিত।

হেমন্ত

শীতের মাঝে প্রকৃতি সুপ্ত ছিলেন। শীত-অন্তে ধীরে ধীরে প্রকৃতি জাগিয়া উঠিয়া আবরণ মুক্ত করিতেছেন। ফরাসী দেশীয় ভাস্কর এম্‌ বারিয়াস এই মনোরম চিত্রের শিল্পী।

পণ্ডিত মশাই

[ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়]

জলধর পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন এক অদ্ভুত লোক,—আমরা প্রায়ই বোলতাম যে তাঁর হেডমাষ্টার কিংবা, দারোগা হওয়া উচিত ছিল। স্বভাবটি মোটেই কোমল ছিল না, হাতের কাছে টেবিলের উপর সর্ব্বদাই বেত-গাছটী থাকত। সেই বেতের সান্নিধ্যহেতু ক্লাসের কোন ছেলেই টুঁ-শব্দ কোরতে পারত না। বেতের ব্যবহার অবশ্য বেশী হত না, কিন্তু ব্যবহার হবার সম্ভাবনাই প্রাণে আতঙ্ক এনে দিত। বেত পড়ত মাত্র তিনবার,—বেশ জোরে এবং দৃঢ়ভাবে—চতুর্থভাগ কৌমুদীর সূত্রগুলির মতন। ক্লাসে কেউ পা তুলে বস্‌তে পেতনা, দু'মিনিট দেরীতে আসতে পেতনা, নস্য নিতে পেতনা,—কেননা পণ্ডিতমশাই নিজে পা ঝুলিয়ে বোসতেন, ঘণ্টা বাজলেই ক্লাসে ঢুকতেন আর নস্যও নিতেন না। পণ্ডিত মশায় কথা কইতেন বড়ই কম আর সে কথাগুলি প্রায়ই বোর্ডে সংস্কৃতে লিখতেন, সেইজন্যই তাঁকে আমরা একটু ভয় করতুম, অশ্রদ্ধাও করতুম না ভালোও বাসতুম না। তিনি নিজে ছিলেন বিগ্‌গ্রন্থ পণ্ডিত সেইজন্য শ্রুতিতে কিংবা বিভক্তিতে ভুল হলে এমন ধমকের চাইতেন যে তাইতেই লজ্জা আসত। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকেই তিনি মুখে মুখে মুগ্ধবোধ পড়াতেন, প্রথম শ্রেণীতে সংস্কৃতে কথা কইতেন—সেইজন্য আমাদের স্কুলের পরীক্ষার ফল অতি উৎকৃষ্ট হত। কলকাতায় অনেক বিদ্যালয়েই আমাদের সংস্কৃত প্রশ্নগুলি হুবহু নকল করে দেওয়া হত সেইজন্য আমাদের গ্রামে বড়লোক না থাকলেও পণ্ডিত মশায়ের মাইনে ছিল ৪০৲ টাকা।

সেবার অসহযোগের হুজুগ হল। স্কুলের মিস্‌ট্রাষ্টিক মাষ্টার মহাশয় নিজের কাজ ছেড়ে দিলেন। তিনি ছিলেন ফুটবলের কাপ্তেন, rowing clubএর পরিচালক, স্কুলের হাতেলেখা সাহিত্য পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং পণ্ডিতমহাশয়ের যম। তিনি খেলার মাঠে এমন এক বক্তৃতা দিলেন যে, তার পর দিন ২৫ জন ছেলে স্কুলে গেল না। ইতিমধ্যে কোলকাতার নেতারা গ্রামে এলেন চরকা নিয়ে, তাঁরা কালীবাড়ীতে সভা কোরলেন, পরের দিন প্রায় ১৫০ ছেলে গেল না। সভাতে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা নবীন বাবু মহাশয় নেতাদের হাতে ধরে অনুরোধ করলেন ছেলেদের স্কুল ছাড়া বারণ কোরতে। মিস্‌ট্রাষ্টিক মাষ্টার মশায় আপত্তি কোরলেন, "দেশ-হিতৈষিতা কি কেবে রাখবার জিনিষ?" অনেকদিন পণ্ডিতের পরামর্শে নবীন বাবুর মতন স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তিরও কি শেষে মস্তিষ্ক বিকৃত হল? এ প্রকার ওজস্বিনী বক্তৃতার পর বাকী যে কয়জন স্কুলে গেল তারা কেউ পণ্ডিত মশায়ের ক্লাসে গেল না। আমার বাবা আমাকে চাবুকের ভয় দেখিয়ে স্কুলে পাঠালেন, আমি আর একজন পণ্ডিত মশায়ের ক্লাসে গেলুম—সকলে ঠাট্টা কোরলে, রেগে যাবার ওপর রাগ করা সত্ত্বেও তাঁর কথা উদ্ধৃত ক'রে বল্লুম, "ঘরের জানা আছে,—দুদিন পরে স্কুলস্কুড় ক্লাস্ গুটিয়ে ঢুকতে হবে, আর সূত্র আওড়াতে হবে তখন দেখব।" ক্লাসে ঢুকে দেখি পণ্ডিত মশায় গম্ভীরভাবে ব্যাখ্যা কোরে যাচ্ছেন একটী ছেলের সামনে—দেরী হয়েছে দেখে চোখ যেন জোর কোরে নাবিয়ে নিলেন। ক্রমে দুটী একটী কোরে ছেলে আসতে লাগল; কিন্তু পণ্ডিত মশায়ের ভ্রূক্ষেপ নেই। অন্য শিক্ষকেরা ২০ জন ছেলে থাকলেও পড়াতেন না। শোনা গেল পণ্ডিত মশায়কে একঘরে করা হয়েছে। এই রকম প্রায় তিন মাস গেল, ৫০ জন ছেলে রইল,—যেতাম চলে গেল জাতীয় বিদ্যাপীঠে—৩ ক্রোশ দূরে এক গ্রামে। তারা সকালে সাতটার সময় মাঠের উপর দিয়ে পড়তে যেত আর সন্ধ্যার পর গান্ধীজীর জয় বোলতে বোলতে ফিরত। এক একবার জয়ধ্বনি

হত আর মনে হত "বাবা আমার পাপিষ্ঠ!" নবীন বাবু ক্রমে হতাশ হোয়ে পড়ে একদিন নোটিস্ দিলেন যে তাঁর স্কুলটী জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করা হবে যদি ছাত্র সংখ্যা তিন শতের অধিক হয়। এই নোটিস্খানি পড়ে ছেলেরা হৈ হৈ কোরে স্কুল বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল—একজন Cyclist ছুটে বিদ্যাপীঠে খবর দিতে গেল। বেলা ৪টার সময় প্রায় ৪০০ ছেলে গান্ধীজীর জয় বোলতে বোলতে স্কুলের কম্পাউণ্ডে বন্যার মতন এসে পড়ল—জিমন্যাষ্টিক্ মাষ্টার মহাশয় তাদের নেতা। ছেলেরা নবীন বাবুকে ঘিরে জয়ধ্বনি করতে লাগল। নবীনবাবু গোলপোষ্টের ভিতর দাঁড়িয়ে নোটিস্খানি পড়লেন। জিমন্যাষ্টিক্ মাষ্টার মশায় উঠে নবীনবাবুকে ধন্যবাদ দিয়ে বল্লেন, যে "দেশের সন্তান মার বুকে ফিরে এসেছে, যে কুসঙ্গীর দল তাঁকে সত্যপথ হতে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সেই নরাধমদের বিষদাঁত অঙ্গুলির মতন পরিহার কোরতে হবে। সেইজন্য আমি প্রস্তাব করি—যে দেশদ্রোহিদের স্কুল হতে তাড়িয়ে দেওয়া হোক্।" নবীনবাবু বল্লেন, "সে কি মশায়,—জাতীয় বিদ্যালয়ে কি ইতিহাস শিক্ষা হবে না, সংস্কৃত হবে না?" জিমন্যাষ্টিক মাষ্টার বল্লেন, "না ইতিহাস হতে পারে, ইটালী কি কোরে ঐক্যলাভ কোরেছিল; রুষদেশে কি কোরে Tolstoy একজন কসাব্ গোরা নিয়ে জারকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—এ সব শুধু পড়ান যেতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত নয় একেবারেই—কেননা Englishman পত্রিকা গালাগালি দিয়েছে আমাদের এই বোলে যে আমরা অনহযোগীরা আবার বনে গিয়ে সংস্কৃত কথা বোলতে চাচ্ছি। আমরা সংস্কৃত চাই না চাই Vocational Education, দেশের ব্যবসা আমাদের হাতে আন্তে হবে, সেই মত শিক্ষা—ছুতোরের কাজ শিখব, তাঁত বুনতে শিখব চরকা ঘুরাতে। নবীনবাবু যদি Vocational Class খুলতে চান তবে আবার তাঁর ছেলেরা তাঁর ঘরে ফিরবে, অন্য স্কুল ভেঙে আরও ছেলে নিয়ে আসা যাবে, কিন্তু আবার সেই পুরাতন শিক্ষা আর বিভক্তিপ্রত্যয় কস্মিনে আর কেউ যাবে না। কি বল তোমরা?" ছেলেরা তারস্বরে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই।' নবীনবাবু দেখলেন মহা বিপদ, বোল্লেন "ভেবে দেখি, কাল বোল্ব।" 'জয় নবীন বাবুর জয়', 'জয় গান্ধীজীর জয়' রবে চারধার মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল।

তার পর দিন বিকেলবেলাটে মহা জনতা. নবীনবাবু উঠে বল্লেন, "দেখুন, সংস্কৃত শিক্ষা দেশে দরকার"—'নাঃ নাঃ, আমরা চাই Vocational Education'—"সত্যকারের জাতীয় শিক্ষা হচ্ছে সংস্কৃত শিক্ষা"—'নাঃ নাঃ নাঃ'—"আর পণ্ডিত মশাই আমাদের স্কুলের জন্য ছিলেন—। তাঁর জন্য"—জিমন্যাষ্টিক মাষ্টার লাফিয়ে উঠে বোল্লেন, "হাঁ, তাঁর জন্য আপনার স্কুল, আপনার কৃতিত্ব যায় যায়, তিনি একজন পুলিসের গুপ্তচর Police Spy —তাঁর শ্যালক দারোগা, সেই শ্যালকের জামাইও দারোগা। আপনি এতদিন ধরে বিষধরকে দুধকলা দিয়ে পুষে রেখেছেন;—৪০৲ টাকা মাইনে দিয়ে এনেছেন।" নবীনবাবু আশ্চর্য্য হয়ে বোল্লেন, "বলেন কি?" "নিশ্চয়ই সত্য কথা, জিজ্ঞাসা করুন।" সেযখনে নবীনবাবু বোল্লেন, "বেশ যদি Vocational Education দরকার তাই হবে, ।" "শুধু তাহলে, হবে না, বিষধর জলধরকে পরিত্যাগ করতে হবে, তা না হলে কেউ যাবে না, এগুলি চাই।" নবীন বাবু ছেলেদের দিকে ফিরে বোল্লেন, "তোমরা কি চাও, পণ্ডিত মশাই চলে যান্, তিনি তোমাদের জন্য কি করই না নিয়েছেন।" ছেলেরা ক্ষীণস্বরে বোলে উঠ্‌লো, আমরা সংস্কৃত পড়তে চাই না।" নবীন বাবু বোল্লেন, "তাহলে তাই হোক্, পরে আর কেউ সংস্কৃত পড়তে চেয়োনা, যে ভাষায় গীতা উপনিষদ্ ছিঃ ছিঃ।"

পরের দিন ছেলেরা স্কুলে গেল বল বেঁধে, ধরওয়ান, এরি মধ্যে খদ্দরের পাগড়ী বেঁধে ছিল, স্কুলের দেওয়ালে এবং বোর্ডে ছেলেরা চরকা এঁকে দিলে, গান্ধীজীর জয় লিখে দিলে। প্রথম ঘণ্টা শেষ না হতেই পণ্ডিত মশায় ক্লাসে ঢুকে পড়লেন, ছেলেরা একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল, মুখ ফুটে কেউ কিছু বোলতে পারলে না। আশ্চর্য্য হবার কথাই, কেননা পণ্ডিত মশায়ের হাতে বেত নেই, তার বদলে নক্সাদানী, পাঞ্জাবী এবং উড়ানীর বদলে শুধু উড়ানী। মাথা, গোঁফদাড়ী কামান মাথায় দীর্ঘ শিখা এবং

ঠিকি bayonetএর মতন উঁচু, চক্ চক্ কোরছে—যেন নতুন শান্ দেওয়া হয়েছে। পণ্ডিত মশায় রোল্ ডাকার পর ধীরে ধীরে খড়ি নিয়ে এগিয়ে গেলেন,—ক্লাসবোর্ডে চরকার ছবি পুঁছে বড় বড় অক্ষরে কয়েকটী শ্লোক লিখলেন, আমরা প্রত্যেক অক্ষরটী পড়ে যেতে লাগলুম, শ্লোকগুলি এই,—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥
শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞান বিজ্ঞান-মাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্॥
শৌর্য্য তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥
কৃষিগোরক্ষ্য-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

শ্লোক লেখাইবার পর পণ্ডিত মহাশয় খুব গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "ব্যাখ্যাহি শ্লোকান্, মনসি বিচারয়।" আমরা গম্ভীরভাবে খাতার দিকে চেয়ে বোসে রইলুম, মনে একটা শঙ্কা এবং বিষাদের ছায়া প্রতিভাত হচ্ছিল। পণ্ডিতমশাইও চুপ করে বসে নস্য নিচ্ছিলেন। কোথা দিয়ে ঘণ্টা বেজে গেল, পণ্ডিত মহাশয় বোর্ডের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন। আমরাও নিঃশ্বাস ফেল্লুম।

তারপরদিন আর পণ্ডিতমশাইকে দেখা গেল না। তিনি চলে গেছেন শোনা গেল। বিকেলে মাঠে ড্রিলমাষ্টার মাষ্টার বল্লেন, "তোরা সব জয়ধ্বনি কর্, একেই বলে জনশক্তি, যা চাইবে তাই পা'বে—Vox populi, Vox Dei—তোরাই ভগবান্।" মাষ্টারকে সে দিন খেলতে খেলতে একজন ল্যাং মেরে ফেলে দেয়, আমরা সকলে হেঁসে উঠেছিলুম্, Refree foul ও দেয়নি। সেই হাসার কি জোরালো প্রতিশোধই তিনি নিয়েছিলেন, কেননা তিনি Vocational Department এর চার্জ্জে ছিলেন, যখন তিন ঘণ্টা ধরে রাঁধা ধরতে হত, আর দুঘণ্টা চরকা ঘুরুতে হত, তখন পণ্ডিতমশাই কত নিরীহ ছিলেন বুঝেছিলুম।

চাটনি

সাহায্য প্রার্থনা

আচার্য্য। আমাদের 'সমাজে'র ছাদটা ফেটে গেছে, একটু বৃষ্টি হলেই বড্ড জল পড়ে।

ব্রাহ্মিকা। তাগ্যিস্ বললেন, এবার থেকে আস্বার সময়ে সঙ্গে একটা ছাতা নিয়ে আস্ব।

কাজের স্বামী

স্ত্রী। তুমি আমায় এখন মোটেই ভালবাস না, নইলে আমাকে দিয়ে পাখা টানাও!

স্বামী। আহা, পাখা টানো বলেই ত তোমায় বেশী ভালবাসি।

পুত্র বাৎসল্য

রায় বাহাদুর। আমার ছেলেটিকে আপনার আপিসে নেবেন? সে এবারি পাশ করেছে। স্বভাব চরিত্র খুব ভালো, মনে এতটুকু গুমোর নেই।

ম্যানেজার। গুমোর করবার মতন বড় কাজ সে কি করেছে শুনি।

বয়সের হিসাব

ইন্সিওরেন্সের দালাল। আপনার বয়স কত?

কবি-প্রকৃতি বয়স্ক যুবক। মোটে, বাইশটা বসন্ত আমি দেখেছি।

দালাল। তারপর কোন্ বছর থেকে আপনি অন্ধ হয়েছেন?

উল্টো-উৎপত্তি

[শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু]

অনেক লোকে গোবিন্দকে মাথাপাগ্‌লা বলত। কিন্তু সে মাথাপাগ্‌লা মোটেই নয়। সে ছিল একটু অতিরিক্ত রকমের বাধ্য। সে বাধ্যতা কি রকম জান? তার মার্কা হচ্ছে "যা কিছু লেখা থাকবে তাই মেনে চলো।"

মুখে যদি তাকে কিছু করতে বলা হল, তা সে তোমার আমার মতন হয়ত করলে, নয়ত করলে না। কিন্তু ছাপা কি লেখা যদি কোন হুকুম নজরে পড়ল,—বাস্, আর তার না বলবার যো-টি নেই! তখনি তা তামিল করবার চেষ্টা করবে।

গোবিন্দ একটা কাজে বেরিয়েছে, হঠাৎ চোখে পড়ল, রাস্তার মাঝখানটা খোয়া ফেলে মেরামৎ করা হচ্ছে, সেখানেই লেখা রয়েছে No Thoroughfare. অর্থাৎ 'পথ নেই।'—সেটা কেবল গাড়ীর জন্যে, মানুষের জন্যে নয়। কিন্তু গোবিন্দ ততক্ষণে অন্যদিকে ফিরে গেছে। বড়রাস্তার মোড়ে দোকানের গায়ে সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে—'এই যে আসুন!' গোবিন্দ দোকানে ঢুকল। যখন জিগেস করা হল, 'কি চান মশাই?' তখন জবাব খুঁজে না পেয়ে ও ফুটপাথের দিকে চেয়ে রইল। সেখানে একটা বাড়ীর গায়ে মারা থিয়েটারের প্ল্যাকার্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল, 'পূর্ব্বাহ্নে স্থান সংগ্রহ করুন!'—কাজেই গোবিন্দ থিয়েটারের সন্ধানে চল্‌ল। ওদিকে একখানায় প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন দেখ্‌তে পেয়েছে, তাতে ছিল—Drink Lipton's Tea 'লিপ্টনের চা পান করুন!' অগত্যা সে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌ল।

একদিন তার স্ত্রী তাকে ৬টীন পনম কিন্‌তে একটা টাকা দিয়েছে, সে তাইতে একশিশি লক্ষ্মীবিলাস কিনে নিয়ে এল, কেননা, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের মোড়ে ছবির গায়ে বিজ্ঞাপন ছিল—'প্রিয়জনে ছুরমনে দাও উপহার ৭'

সুতরাং ব্যাপারটা ক্রমশঃ গুরুতর হ'য়ে উঠ্‌ছিল। এইজন্যে এক বিখ্যাত ডাক্তার তার চিকিৎসার ভার নিলেন। সুদক্ষ চিকিৎসক তার মাথায় অনেক পরিশ্রমে এইটে ঢুকিয়ে দিলেন,—পথে ঘাটে যে সব লেখা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সেই অনুসারে কাজ করা হচ্ছে, পাগলামি।

সেটা নাকি সে খুব ভালো হৃদয়ঙ্গম করেছিল! অতএব, তার সেরে যাওয়া উচিত!· কিন্তু হিতে বিপরীত হল; কি ক'রে হল, বলি শোন! যেখানে লেখা আছে, 'যেখানে বিজ্ঞাপন মারিওনা,' সেখানে সে কাগজ আর আটা যোগাড় ক'রে এনে মার্‌তে লাগ্‌ল। এমনি, 'ট্রেণে 'জানালা দিয়া মুঁকিও না' ট্রামে 'থুতু ফেলিও না' গলির মোড়ে 'প্রস্রাব করিও না' ইত্যাদি বড় বড় নিষেধ বাক্যগুলার বিরুদ্ধ আচরণ সুরু কর্‌ল। 'বিপদ্' (Danger), 'প্রবেশ নিষেধ' এ সব নোটিশ্ সুবিধা পেলেই অবাধ্য করতে লাগ্‌ল।

কিন্তু, অন্ততঃ আমার পক্ষে সবচেয়ে শোচনীয় কাণ্ডটা হচ্ছে এই যে, আমি তাকে একবার আমার একখানা মূল্যবান্ কবিতার খাতা দিয়েছিলুম। সেখানাকে সে কি ভেবেছে জানিনা, পড়া হয়ে গেলে, নিয়ে গিয়ে এমন একটা বাড়ীর পাশে ফেলে রেখে এসেছে, যেখানে লেখা ছিল—'এখানে আবর্জ্জনা ফেলিও না!' হায়, হায় আমার বুকের রক্ত জল করা, আমার কত শ্রমের কত আদরের অমূল্য কবিতার খাতাটি সেইখান থেকেই হারিয়ে গেল।

গ্রীষ্মের দিনে

স্নানের আরাম পাইতে, শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে, আমাদের অরিজিন্যাল্ গ্রীসেরিন্ এবং মেসিনে প্রস্তুত :—চন্দন, রয়েলবকুল মাখ ও ভায়লেট সাবান ব্যবহার করুন।

ইণ্ডিয়ান্ সোপ্ কোম্পানী

৬৪।১।এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন ২৪৯৬

সংগ্রহ

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত]

মিশরের সম্পত্তি :—

মিশর-দেশের মাটী খুঁড়তে খুঁড়তে যে মহা-আবিষ্কার হয়ে গেছে, তার ফলে অনেক দামী দামী জিনিষ বেরিয়েছে। অন্যান্য দামী জিনিষের মধ্যে একখানা চেয়ারও বেরিয়েছে। চেয়ার-খানার জন্ম হয়েছিল প্রায় খৃঃ পূঃ একহাজার অব্দে। চেয়ারটাতে বসবার আসন নেই বটে, কিন্তু দেখ্‌লেই বোঝা যায় যে একসময়ে খুব দামী আর নরম-জিনিষই আসনের স্থান অধিকার করেছিল।

চেয়ার ছাড়া আর একটা খুব গ্রন্‌গ্রনে-নীল কাপ্‌ও পাওয়া গিয়াছে। কাপ্‌টা উচ্চে মোটে ছয় ইঞ্চি। এটার বয়সও প্রায় পনেরশত বৎসর। এসব ছাড়া মিশর দেশের রাজ-বংশের স্বাদশ-রাজার যে একটী প্রতিমূর্ত্তি বেরিয়েছে দেখ্‌লেই প্রাচীন মিশরীয়দের স্থাপত্য-বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া-যায়।

অলঙ্কারের যে রাশি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে একটী necklace বা কণ্ঠ-হারই উল্লেখ-যোগ্য। হাজার হাজার বছর আগে এটা যে কোন্ সুন্দরীর কণ্ঠ-হার ছিল কে-জানে? হার-গাছির চারপাশে আবার হুমীর, সিংহ, বিড়াল, ছুছুর, ইত্যাদি কত রকম-কে-রকমের ছবি আঁকা আছে।

হীরের খনি :—

দক্ষিণ ভূভাগে সম্প্রতি একটা হীরের খনি আবিষ্কার করা হয়েছে। আবিষ্কারক হচ্ছেন—Shackleton rowett-রিসার্চের সভ্যেরা। খনিটা দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার কাছে একটা ছোট দ্বীপে অবস্থিত। উপস্থিত তা'র মধ্যে কত পরিমাণ হীরে পাওয়া যাবে ঠিক জানা যায় নি। তবে ঐ সভ্যেরা যে সত্যতার খাতিরে দুদিনের মধ্যেই 'হীরেমাল' হয়ে দাঁড়াবেন, সেটা বোধ হয় সহজেই অনুমেয়।

ঐ-সভ্যেরাই আবার আর একটা আবিষ্কার কিছুদিন আগে করেছিলেন। সমুদ্রের তলায় বড় বড় বন-জঙ্গল-পূর্ণ স্থলভূমি পাওয়া গিয়াছে। সমুদ্র থেকে 'ভূমি' টা প্রায় ১০,৮,০০ হাত নীচে। একবার দেখে এলে হয় না?

(Tit-Bits)

মমথের বংশ :—

Monmouthshire এর অধিবাসী একজন ডাক্তার লিখেছেন যে তাঁর চিকিৎসাধীন একটী প্রসূতি সম্প্রতি পঞ্চমবার যমজ-সন্তান প্রসব করেছেন। প্রসূতিটী নিজেই যমজের একজন। এবং তাঁর মা-ও নাকি যমজ-সন্তানের একজন হয়ে জন্মেছিলেন। তিনি নিজেও বাইশটী যমজ সন্তান প্রসব করেছিলেন। ঘোটামুটী ধরতে গেলে ব্যাপারটা মন্দ নয়। ভবল-প্রোমোশন, গোছের।

খুচরা খবর :—

নরওয়েতে একটী আইন আছে যে রন্ধন, বুনন ইত্যাদি কাজের প্রশংসা-পত্র দেখাতে না পারলে মেয়েদের মেটেই বিয়ে হয় না।

• • • •

হস্তির শুঁড়ে সবশুদ্ধ ৪০,০০০ হাজার মাংসপেশী আছে কিন্তু মানুষের সমস্ত দেহে মাত্র ৫২৭ খানা আছে।

• • • •

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব-বৃহৎ সংবাদপত্রখানা Aix-la chapple এর মিউজিয়মে রেখে দেওয়া হয়েছে। কাগজখানা লম্বে দাড়ে আট ফিট, এবং প্রস্থে ছ' ফিট।

• • • • •

লণ্ডনে প্রতি বৎসর ৪০০,০০০ হাজার টন মাংস ব্যবহৃত হয়।

জানা দরকার :—

মাটিতে দুই চারি সেকেণ্ডের জন্য পুঁতিয়া রাখিলে ছুরী হইতে পেয়াজের গন্ধ উঠিয়া যায়।

• • • •

কিঞ্চিৎ পরিমাণ চিনি মিশাইয়া দিলে মাংস শীঘ্র নষ্ট হয় না।

•

আলু-সিদ্ধ জলে রৌপ্য-পাত্রের দাগ অতি শীঘ্রই উঠিয়া যায়।

• • • •

প্রতি এক পাইন্ট দুধে এক টিপ্ লবণ মিশাইয়া রাখিলে, গ্রীষ্মের সময় আর দুধ নষ্ট হইবার ভয় থাকে না।

• • • •

মাথার বুরুশ ও জামা-কাপড় বুরুশ পরিষ্কার করিবার সময় গরমজলের সহিত অল্প পরিমাণে অমোনিয়া মিশাইয়া দিতে হইবে। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া এইরূপ পরিষ্কার করিতে হয়।

• • •

রৌপ্য পাত্র হইতে মৎসের গন্ধ উঠাইতে হইলে ধুইবার জলের সহিত এক চামচ সরিষা মিশাইতে হইবে।

• • • •

পেঁয়াজের রস লাগাইলে ছুরী হইতে মরিচা উঠিয়া যায়।

• • • •

কাপড় হইতে চায়ের দাগ উঠাইতে হইলে—প্রথমে চিহ্নিত স্থানটিকে অল্প ভিজাইয়া সাঁৎ-সেঁতে করিতে হইবে, পরে তাহাতে কিঞ্চিৎ গুঁড়া সাড় দিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিতে হইবে। শুকাইয়া যাইবার পর উত্তম-রূপে ঝাড়িয়া ফেলিলে দাগ উঠিয়া যায়।

• • • •

বালিশে তুলা পূরিবার সময়ে তুলার সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে কর্পূর মিশাইয়া রাখিলে তুলা শীঘ্র নষ্ট হয় না। অধিকন্তু বালিশ মাথায় দিবার সময় অত্যন্ত আরাম-প্রদ হয়।

• • • •

এমোনিয়া ঘষিলে চীনামাটী ও বাসন-পত্রাদি হইতে দাগ উঠিয়া যায়।

আষাঢ় সন্ধ্যায়

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় কবিগুণাকর বি-এ,]

আজ বাদল ঘেরা আকাশখানি
বইছে বাদল বায়—
এস সখা, এস কাছে,
মনের ব্যথা মনেই আছে,
তোমায় আমায় মুখোমুখি
বস্‌ব দুজনায়—
সকল কথা ঘুরে ফেরে
তোমার মুখটী দেখে' দেখে'
ভেসে যাব অকূল পানে
কোন্ সাগরের নায়!—
আজ বাদল ঘেরা আকাশ খানি
বইছে বাদল বায়।

আঁধার ঘিরে আস্‌ছে ধীরে
বন্ধ সকল কাজ
বারেক তুমি এস বঁধু,
তুমি আমার পরাণ মধু—
তোমার পায়ে দিলাম আমার
সঁপে দিব আজ,
আপনারে সব ভুলে
বিলিয়ে দিব তোমার মূলে—
নয় বেলে বাহিরিব
ফেলে সকল সাজ্।
ঐ আঁধার ঘিরে আস্‌বে ধীরে
বন্ধ সকল কাজ!

পথের মাঝে নাইক কেহ
সন্ধ্যা হয়ে আসে,
সাঁঝের ছায়ায় মেঘের মায়ায়
মিলি আমি আমার হিয়ায়
শুধু তোমার নামটী জাগায়
সকল নভকাশে—
হবে যবে গভীর রাতি
নিবে যাবে ঘরের বাতি
লুকিয়ে তুমি এসো প্রিয়
বস' আমার পাশে—
আমায় হরণ করে নিয়ে যেও
তোমার নিজ বাসে!

সঙ্কলন

বাঙ্গালীজাতির শারীরিক অবনতি ও তাহার প্রতিকার

[কাপ্তেন বসন্তকুমার গুপ্ত, আই, এম, এস্]

বাঙ্গালী জাতির শারীরিক অবস্থা জগতের প্রায় সকল জাতি অপেক্ষা হীন। জগতের যে স্থানের লোকেরা আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করে তাহাদের শারীরিক উৎকর্ষ ঠিক তাহারই অনুরূপ। পর্ব্বতবাসী কঠোর মূর্ত্তিবিশিষ্ট বা আফগান (Frontier) ক্রন্টীয়র নিবাসী জাতিসমূহ স্বভাবের কঠোর কশাঘাতের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনাদের দিনের রুটীর উপায় করে; ফলে তাহারা সুদৃঢ় মাংস-পেশী ও সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। বাঙ্গালী তাহার দেশের তুলার মত নরম মাটি—লাঙ্গলের ফলায় আরে ভিজা ও মুড়কীর ফলার পাকাবার মত উল্টাইয়া, ধানের বীজ রোপণ করিয়া সময় মত তার ফসল কাটিয়া লয়। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে আবার ফুলকুল মাটীর দুই পাড়ে ও চরে ধান্ ওড়াইয়া দেয় এবং বন্যার জলের সঙ্গে যখন ঐ ধান আপনার মাপ মত বাড়িয়া পাকিয়া উঠে, তখন ডোঙ্গায় চড়িয়া সুপক্ক ধানগুলি কাটিয়া আপনারা খোলাঘরে করে; বৎসরের বাকী সময় ঘরের বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইয়া, পরনিন্দা ও পরচর্চ্চায় সময়টা কাটাইয়া সমাজের সদ্ব্যবহার করে। আমরা কি আশা করি যে এইজাতি কখনও এরূপভাবে বলবান হইবে? অসম্ভব! তাহার উপর বাঙ্গালার আবহাওয়া সংক্রামক (Infectious) রোগগুলির এমন সুন্দর culture medium যে, Cholera, Smallpox ও Malaria যেন এদেশে রীতিমত পত্তনী লইয়া আছে। প্রত্যেক বৎসর Health Statistics এ (গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য-বিবরণীতে) তাহার প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া যায়।

কৃষক অপেক্ষা ধনী ও মধ্যবিৎ লোকের অবস্থা আরও শোচনীয়। অধিকাংশ ধনীর পত্নীর স্ফীত,ধনী, ছানা চিনি ইত্যাদি সুখাদ্যে গঠিত। পূর্ব্বে মেয়ে অভিভাবকগণ পৌরুষিক শিকার যাহাতাহাতে কিছু কিছু চর্চ্চা রাখিতেন; আজকাল সে সকল চর্চ্চা কিছুই নাই। অধিকাংশ জমীদার অভিমাত্রায়ী; বিদ্যের পত্নীর ব্রহ্মার্থে তাঁহাদের কোন চেষ্টাই নাই। ৩০।৩৫ বৎসর পার হইবার পূর্ব্বেই হয় বহুমূত্র না হয় বাত অথবা পুরাণ অজীর্ণতা (Chronic Dyspepsia) ইত্যাদি কোনও না কোনও দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়া জীবনটা ভারবহ করিয়া তুলেন। মধ্যবিত্তের সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া অধিকাংশ যুবকেরাই পরিণামে দেয় চাকরী; যাহা ডাক্তারী, ওকালতী, ব্যারিষ্টারী, এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি মোটামুটি স্বাধীন জীবনের অবলম্বন করেন। বাল্যে ও প্রথম যৌবনে প্রত্যহ রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জেগে পোড়াইয়া, দেহের অর্দ্ধ আহারে কোনও রকমে জীবন ধারণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদাসত্বগুলি একে একে উত্তীর্ণ হইবামাত্রই সংসারের ভার যেন আপনা আপনিই ঘাড়ে আসিয়া পড়ে; জীবনসংগ্রামে অস্ত্রবিক্ষত হইয়া ৪০বর্ষীয় পার হইবার পূর্ব্বেই অনেকের কাল কবলিত হইতে দেখা যায়।

স্বাস্থ্যভঙ্গ ও দুর্ব্বলতার সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির কি ভয়ঙ্কর ঘনিষ্ঠতা! আমি ছেলে মানুষ করিবার কালে অনেক শিক্ষিত ভদ্র বাঙ্গালীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, "মহাশয়, আপনার স্বাস্থ্যবান সন্তান রাখিবার প্রয়োজন কি? আপনার যৎকিঞ্চিৎ ধনসম্পত্তি বিষয় সামলাইয়া পথ চলিতে পারেন না কি?" উত্তরে অনেকেই বলেন, "কি জানেন, সঙ্গে একজন বলবান লোক থাকিলে পথে ঘাটে অনেক সাহস থাকে। কি জানেন আমরা ভেতো বাঙ্গালী!" আশ্চর্য্য জমীদার ঐ বস্তুটি ও তাহার পশ্চিম দেশীয় ধারবান্টি, উভয়েই দুই হাত ও দুই পা বিশিষ্ট। এখন উক্ত বাবুকে তাঁহার সেই বলবান ধারবান্টিকে তাহার বলিষ্ঠ দুই হাত ও দুই পায়ের উৎকর্ষ সাধন করিতে (অর্থাৎ তাহার দ্বারা আহার একটী দুইহাত দুইপা বিশিষ্ট দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য জীবের দেহ ও প্রাণ-ইন্দ্রিয় রক্ষার্থে) দেখে হয় জগদীশ এ জগতে পাঠাইয়াছেন। এই দুটী জীবে কি প্রভেদ! যদি ঐ বাবুটিকে বলা যায়, "মহাশয়! আপনি কেন নিজেও দু-হাত দু পা ওয়ালা জীব হইয়া অনুরূপ আর একটী জীবের বৃথা ভরণ পোষণ করেন?" তখনই উত্তর পাইবেন, "আরে রাম, দুই শরীরকে ব্যস্ত করিবার প্রয়োজন কি?" কি ভয়ানক উত্তর!—ধন্য ভাগ্য মোর! তাঁর ঐ অতি স্থূল বা অতি কৃশ দুর্ব্বল দেহটি যে অত্যন্ত সুস্থ তাহা বোধ হয় প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালীই জানেন; ডাক্তার বাবুদের Digestive Mixture ও Nerve Tonic এবং কবিরাজ মহাশয়দের অব্যর্থেষী ঘৃতিকা, মকরধ্বজ মোদক ও বড়জল বলিজারিত বকরক্তের প্রচুর ব্যবহার তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই কলিকাতা সহরে প্রত্যহ বেলা দশটার সময় হইতে দেখা যায়, প্রায় সমস্ত শ্রেণীর বাঙ্গালীই আপনাপন কর্ম্মস্থলের দিকে ধাইতে থাকেন। আমি বহুকাল ধরিয়া লক্ষ্য করিয়াছি, বড় বড় আফিসের বা ব্যবসায়ীগণ তাঁহাদের ঘোড়ার গাড়ী বা মোটর গাড়ীর মধ্যে নিমজ্জিত অবস্থায় যেন,—সম্মুখে কোচবাক্সে বা মোটর ড্রাইভারের পার্শ্বে অবস্থিত শরীর-রক্ষকের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া চলিয়াছেন। গঙ্গাতীরস্থ সব মধ্যবিৎ কর্ম্মচারীগণ (অধিকাংশই কেরাণী) এক একখানি ট্রামবাড়ী পূর্ণ করিয়া চলিয়াছেন। ইহাদের কেহ সকলের বুক বাবুল দ্বারা দুটী গরম জল দিয়া পেটের খোল্ ঠাসিয়া, কাঁচা কোঁচা বা কোট পাণ্ট খাঁটীয়া আপনাপন ইয়ারের মনিবের প্রত্যেক কথায় "ইয়েস ইয়েস...Yes Sir" বলিয়া হুজুর তামিল করিতে যাইতেছেন। এই একখানি ট্রামবাড়ী পূর্ণ বাবুদের মধ্যে—কোনও ফিরিঙ্গী ছুলোর বাচ্চা, কোনও পশ্চিম দেশীয় সবলকায় ব্যক্তি বসিবার স্থান লইয়া জবরদস্তি করিলে সে ব্যক্তির প্রতিরোধ করিতে একটী বাবুরও সামর্থ্য কুলায় না; ইহার মধ্যে শতকরা ১৫ জন প্রায় বিবাহিত, বিদ্যুৎ, কেবল বংশ বৃদ্ধিকারী অনুভবহীন বাঙ্গালী নাকরাণী বিশেষ অন্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে।

দেহের দাড়ীতে ভিন্ন কথায় স্থান অধিকার করিয়া একজন ফিরিঙ্গী ও কথাই নাই (শত হস্তের বাঙ্গালীঃ), একজন পশ্চিম দেশীয় নির্ব্বিবাদে বসিয়া থাকিবে, কিন্তু স্ত্রী, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা লইয়া বিব্রত বাঙ্গালীর যে কি বিড়ম্বনা, তাহার অধিক বর্ণনার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক বাঙ্গালীই তাহা জানেন ও হয় ও শতকরা ৭৫ জন সে সম্বন্ধে নিজের জীবনকালে একবার না একবার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন বোধ

চড়িয়া সাহেবের কুলীন হাতের মধুর পান অনুভব করিয়াছেন বা হয়ের সম্মুখে তাঁহী স্ত্রীর প্রাণিপ্রদক অপরূপ বিলেয়ারভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—এমন উদার চরিত্র অনেক বাঙ্গালীই আমাদের দেশে এখনও জীবিত আছেন।

আমার মনে হয়, যে জাতি আপনার স্ত্রীর মর্য্যাদা নিজের বাহুবলে রক্ষা করিতে অপারগ হইয়া, পশ্চিম দেশীয় বা ফেরতার পুলিসের সাহায্য লয়, এবং কি আপনার এই ক্ষুদ্র দেহ রক্ষা করিবার জন্য তাহার দ্বারস্থানের প্রয়োজন, এমন অবল দেহধারী জাতির লোপ পাওয়াই ভাল।

অধীন জাতি মাত্রেরই এইরূপ পরাধীন উৎকর্ষের অভাব স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু স্বাধীনতার প্রতি এরূপ উৎকট উদাসীনতা ও অবজ্ঞা বাঙ্গালী জাতির ন্যায় ভারতে ও-ভূমণ্ডল পৃথিবীর অন্য কোন পরাধীন জাতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। শিশু মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই তাহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করা হয় যে, সে যেন এই পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণান্তর তাহার বাপ, ঠাকুরদাদার মত কোনও প্রকারে প্রাণ ধারণ করিয়া অর্থাৎ কন্যা বয়সের মত বিস্তর ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ জীবনক্ষয় বহন করিয়া ও নিষ্পেষিত বা পিষ্টপিলিকার মত আপনার পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায় পরাক্রমের স্বাভাবিক propagation of species—কার্য্যটুকু এই স্বাভাবিক কর্ত্তব্য পালন করিয়া দেহ ত্যাগ করে। এই পশুবৃত্তির বেহের আর অধিক কি প্রয়োজন?—কেবল পেটের সেবা আর পেটের ধন!!

জগতের ইতিহাসে চাহিয়া দেখ, জাতিমাত্রেরই আপনার প্রাধান্য রক্ষার জন্য কিরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছে। বংশোদ্ভবের প্রসিদ্ধ কৈ মৎস্যের মত ক্ষীণ দেহে কেবল কেতাব পাঠ করিয়া বৃহৎ বপুষ্মান্ হইয়া জন্মিতে কখনও কোনও জাতিই কখনও বড় হয় নাই, মানুষের মত মানুষ হইতে পারে নাই।

এই সকলের মূলে একটী জিনিষের সম্পূর্ণ অভাব; সেটী হইতেছে শারীরিক পরিশ্রম (ব্যায়াম চর্চ্চা)। বিশুদ্ধ এবং প্রচুর অক্সিজেনযুক্ত রক্তের সঞ্চালনে দেহের মাংসপেশী (muscles) সকল হয়; Liver, Heart Stomach প্রভৃতি সকল যন্ত্রগুলিই আপনার কার্য্য উৎসাহের সহিত ঠিক ভাবে সম্পন্ন করে। দেহের যে সকল অঙ্গ যে পরিমাণ চালনা করা হয় তাহার সেই পরিমাণ বৃদ্ধি ও কষ্ট সহিষ্ণুতা শক্তি হয়, অর্থাৎ তথায় অস্থিসকল সবল পুষ্ট ও দৃঢ় হয়। ইতিমধ্যে নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চা আজকাল সকল সভ্য ও স্বাধীন জাতির Natural Development এর (আভাবিক উৎকর্ষতার) প্রধান উপকরণ।

আগে এই দুর্ব্বল প্রজন্য দেশ যখন স্বাধীন ছিল এবং তারপর ক্রমান্বয়ে এক এক করিয়া অনেকগুলি বিদেশী জাতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অল্পদিনের কাহার কাহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল তখনও বাঙ্গালী নিজের বাঁচিবার জন্য ও নারীদের সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য ব্যায়াম ও ও কসরৎ, সড়কী, বল্লম ও লাঠি খেলার চর্চ্চা রাখিত। এখন ইংরেজ রাজের প্রবল আধিপত্যে দেশের লোকে (জীবন ও সম্পত্তি) Life and property অনেকটা নিরাপদ মনে করে, সুতরাং অনেকে নিজেদের স্বাস্থ্যরক্ষার দেহ, যত্ন করিবার কর্ত্তব্য ভুলিয়া বিলাসিতা ও অলসতার অনুকরণ-প্রিয় হইয়া বাঁদরামী একেবারে আত্ম-বিস্মৃত জাতিতে পরিণত হইয়াছে; রাজসরকার আপনাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখিবার জন্য দেশের লোকের শারীরিক অবনতির প্রতি কোন লক্ষ্যই করেন না, বরং সভ্যবদ্ধভাবে শরীরচর্চ্চা করিতে গেলে অনেক ক্ষুদ্র ঘটনাতে সন্দেহ করেন।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে Gymnastic খেলার প্রচলন ছিল,—অবশ্য এই ইংরাজের অনুকরণে। অনেক স্কুলে তাহার জন্য একজন করিয়া Gymnastic master নিযুক্ত থাকিতেন। Gymnastic করিলে চোয়াড় হয়, এই ধারণায় স্কুলের ছাত্রদের অভিভাবকগণ তাহাদের ঐ সকল মূল্য ব্যায়াম চর্চ্চার বিরোধী ছিলেন; ফলে এক এক স্কুলের ৮০০।১০০০ ছাত্রের মধ্যে মোটে ২০।২৫ জন ঐ চর্চ্চা করিত; বাকী সকলে কেবল কোন বিশেষ উৎসবে যখন ঐ খেলার Performance হইত, তখন তাহা উৎসুক নেত্রে পর্য্যবেক্ষণ করিত। এখন সে পাঠও প্রায় উঠিয়া গিয়াছে; কোথও Schoolat Gymnastic clubs Trapeseএ চড়া আর নাই, parallel barsএ ঝুলা একটি হুজুক বর্ত্তমান, তাহাদের একজোড়াও নাই—তাহার দুই একটি হাতল সমেত নুড়ু যারা এখনও কোন কোন মাষ্টারের খুদে দেহের পুষ্টিসাধন কার্য্য চলিতেছে; মুগুর ও মালী যন্ত্র কাঠের অভাবে পোড়াইয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে।

এখন ছেলেরা প্রায় Foot ball, Bat ball বা Badminton খেলে; তাহাও পূর্ব্বের মত ১০০র মধ্যে হয়ত মোটে ৩০।৪০ জন বিরিঞ্চি খেলে ও ১৫০ জন পর্য্যবেক্ষণ করে, বাকী ৪০০ হয়ত কখনও আপন বাড়ী হইতে বিচ্যুত হয় না; সেই সময়টুকু হয়ত তাদের পিতা "হর গুরুচরণ" বা অন্য কোন অধীন অভিভাবক মনের পড়ে; কিম্বা ডিরেক্টার বা ম্যাজেস্টেরূপে গিন্নী অবতীর্ণ হইবার যথাভিরুচি চেষ্টা করে; ভূলিয়াও তাহারা পরীক্ষার খাতা একবার তাকায় না। সেই যে পাঠের জন্য একবার schoolএ যায়, ব্যস!

বিলাতে একদিন এক সময়ে Foot Ball খেলা হইতেছিল, তথায় Field Marshal Lord Kitchener উপস্থিত ছিলেন; খেলার পর তিনি তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিবার সময় বলিয়াছিলেন, "আমি দেখিলাম, ২২ জন লোক খেলিতেছে আর ২২০০০ লোক তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতেছে; আমার ইচ্ছা হয় যে আমার মনে ২২০০০ লোক খেলিবে এবং ২২ জন লোক তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবে।" এই মহাবাক্যের তাৎপর্য্য কি? সেই মহা বীরপুরুষ কেন এই কথা বলিয়াছিলেন? দেশে দুটার জন শিক্ষিত ও সবল হউক আর বাকী হাজার হাজার লোক কাষ্ঠপুত্তলিকা মত তাহাদিগের উৎকর্ষ দর্শনে শুধু আনন্দে ঢুলুক—এ ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সমস্ত ইংরাজ জাতি ঐ সর্ব্বসাধারণের Foot ball প্রভৃতি খেলা খেলে।

আসল কথা, দেশের পুরুষ মাত্রেরই সবল শিক্ষিত ও সুস্থ দেহ পাওয়া চাই। পল্লীর পাশে উপযুক্ত খেলার স্থান চাই; মানসিক উৎকর্ষের সহিত শারীরিক উন্নতি চাই; নচেৎ আমাদের মুক্তি সুদূর পরাহত।

(ক্রমশঃ)

গ্রহের ফাঁদ

(উপন্যাস)

[শ্রীসরসীবালা বসু]

৭

কাকার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া তেজেশ আসিল সোনপুরে ঠাকুরমার বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধপর্ব্বের ঘটা পটা দেখিতে—মণির পীড়ার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া,—তার উপর মণির বাঁচিবার আশায় সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া সে অত্যন্ত অবসাদ-গ্রস্তভাবে দিন কাটাইতেছিল। এই সময় কাকা তাহাকে শ্রাদ্ধবাটীতে আহ্বান করিলেন। কাকার বাড়ীতে অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হইয়াছিল বলিয়া কাকার মাতৃ-শ্রাদ্ধে তেজেশ অনুপস্থিত থাকিতে পারিল না, কিছু লৌকিকতা গোটা রকমের লইয়া সে কাকার গৃহে উপস্থিত হইল। কাকা-কাকী তেজেশের শারীরিক ও মানসিক শোচনীয় অবস্থার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইলেন, কিন্তু রামগতি ঘটক যে সহানুভূতি দেখাইল তার বুঝি আর এ সংসারে তুলনা নাই। হরিহর চাটুয্যের কন্যা-দায়, তা তেজেশ কি করিবে? দেশে কি আর পাত্র নাই, দেখিয়া শুনিয়া কাহাকে কন্যাদান করিলেই ত ল্যাঠা চুকিয়া যায়! তা কি-না ঘটক ঠাকুর লোকের মত তেজেশকেই কামড়াইয়া বসিল। এরই মধ্যে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে যে তেজেশের গৃহলক্ষ্মী "যব হব", আরে তা ঘটিবেই আগে কিন্তু সে কথা কাণে তোলে কে? তেজেশের শারীরিক অবস্থা দেখিয়া এবং তার মলিন মুখের ছায়ায় হৃদয়ের দৈন্যটিকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া রামগতি ঘটক অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। সংসারে যাহার যা নাই, ভগ্নী নাই, ভার্য্যা নাই, সে তো অরণ্যবাসী, প্রবীণের মতে এহেন অরণ্যতুল্য গৃহে বাস করিয়া পরলোকের চিন্তা করা কল্যাণকর হইলেও যুবা বয়সে এ পথ অবলম্বন নিতান্তই অলৌকিক ব্যাপার,—এবং শারীরিক মানসিক উভয় পথেরই নিতান্ত হানি-জনক, সুতরাং এহেন অরণ্যকে গৃহে পরিণত করিতে হইলে অবিলম্বে বয়স্থা কুমারীর পাণিগ্রহণ আবশ্যক এবং এ অবস্থা সর্ব্বপ্রকারেই কল্যাণকর! কন্যা স্ত্রী থাকিল আর না থাকিল সে একই কথা, তার উপর কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান যদি একটার স্থানে দুইটারই পাণিগ্রহণ করিল তাহাতেই বা কি আসিয়া যায়? প্রপিতামহ পিতামহের দল তো মুক্তার মুক্তা গাঁথার ন্যায় এই নারীরত্নগুলি একত্রে গাঁথিয়া কণ্ঠে ধারণ করিতেন? কিন্তু রামগতি ঘটকের এ সারবান যুক্তিগুলি তেজেশের ন্যায় ইংরাজী নবীশ যুবক কি সহজে কাণে লইতে চায়, পিতামহ, প্রপিতামহের দিন এখন চলিয়া গিয়াছে, সে নজীর দেখাইয়া কোন ফল নাই, আজিকার দিনে সে আদর্শ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, তবে কিনা রামগতির হাত এড়ান বড় কঠিন ব্যাপার, প্রথমে সে তেজেশের ছোট ভগীটিকেই পাকড়াও করিয়াছিল, ভগীর কিছু কঠমঠ রকমের স্বভাব, শিক্ষা শেষ করিয়া উপার্জ্জনক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই সে বিবাহ করিবে না, একথা অবিচলিতকণ্ঠে বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ রামগতিকে বুঝাইয়া দিল, চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া সুরূপা কিশোরী শাস্ত্রীকে দেখিয়াও তার এ মতের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না, অগত্যা রামগতি ভগীকে ছাড়িয়া তেজেশকেই ধরিয়া বসিল; কন্যাদায় গ্রস্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দায়মুক্ত করা যে কত বড় পুণ্যকাজ,—আজ-কালেকার ছেলে ছোকরারা এসকল ধর্ম্মানুষ্ঠানকে নিতান্ত লঘুচক্ষে দেখে বলিয়া সংসারের আর তেমন শ্রীবৃদ্ধি নাই এ তত্ত্বও বুঝাইল, তারপর সে কাকা-কাকীর হয়রাণেও এ আর্জ্জি পেশ করিল। কাকা বলিলেন, "ছেলে বিয়েতে একরাটি পড়ে থাকুক, দেখতে শুনতে কেউ নেই, বউটিরও এখন বাঁচবার দশা নয়, তখন বিয়ে করলে ক্ষতি কি, তবে আজকালকার ছেলেদের মতামতের ওপর জোর চলে না, বিবাহ করুক না করুক, গায়ীটিকে একবার

চোখে দেখিতে কতি কি এই প্রস্তাব তুলিল, তেজেশ যখন বিবাহই করিবে না তখন পাত্রী দেখিতে যাওয়ার আড়ম্বরটা নিতান্তই হাস্যাস্পদ একথা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিল; কিন্তু তার মতো মুখচোরা যুবকের সাধ্য কি যে ঘটকচূড়ামণি রামগতিকে বাক্‌যুদ্ধে পরাস্ত করে? নিজে না হয় বিবাহ নাই করিল, পাত্রীটিকে স্বচক্ষে দেখিয়া রাখিলে কর্ম্মস্থলে কোনো বন্ধুবান্ধবের সহিতও তো বিবাহ ঘটাইয়া দিতে পারে; এভাবে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কন্যাদায়মুক্ত করিয়া দিলে কতবড় পুণ্যকাজ করা হয় তাহা ধর্ম্মজ্ঞানহীন ইংরাজী নবীশের দল কি জানিবে? অগত্যা প্রাতঃবাড়ীর অনুষ্ঠান সেরে আড়ম্বরহীন বেশে তেজেশ এক দিন রামগতির সহিত পাত্রী দেখিতে গেল। ডাগর মেয়ে, বেশ কর্সা, মুখচম্পকদাম তুল্য না হইলেও, যাঁহা ঘষা করিলে উহার কাছাকাছি পৌঁছিবার স্পর্দ্ধা রাখে, মুখের ডৌলটি অতি সুকুমার, সর্ব্বাঙ্গে নবীন যাদবী লতার শ্রী লীলায়িত, আর চোখদুটি? কবি বর্ণিত ভ্রমর কৃষ্ণতার চঞ্চু সত্যই শুধু কল্পনার খেলা নয়, মিথ্যাভাষণে পাপ থাকিলে বলিতেই হয় মণিমালা অপেক্ষা কিশোরী সৌন্দর্য্যে অনেক শ্রেষ্ঠ, তেজেশ একথা একবার স্মরণ না করিয়া পারিল না যে ঐটি অভাবে তার যে গৃহের জ্যোতিঃ অন্ধকারলীন হইয়া আছে, তাহার সুপ্ত শ্রী যদি ফিরাইতে হয়, তবে এমনি সুন্দরী বধূরই নয়নরশ্মিপাতে —রামগতির ইঙ্গিতে কন্যার পিতা তেজেশের দুটি হাত ধরিয়া তাহাতে এই বিষম কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা জানাইল, পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের অধোগতির ভয়েই তিনি কৌলীন্যের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া অকুলীনের হস্তে সুন্দরী দুহিতাকে সমর্পণ করিতে পারিতেছেন না তাহাও জানাইলেন। কুলীনশ্রেষ্ঠ তেজেশ এখন কি করিয়া এ সাধুজনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে, তবু সে বিনীতভাবে জানাইল যে সে কৃতদার, ব্রাহ্মণ কহিলেন "হানি নাই, নিজে আমি তিনটি বিবাহ করিয়াছিলাম, আমার স্ত্রী চিরকাল সপত্নী সেবা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁর গর্ভজাত কন্যাও যার ব্রত অক্ষুণ্ণ রাখিতে—" অনন্তোপায় তেজেশ দিক্‌বিদিগন্তে চাহিল, সূর্য্য তখন পাটে বসিয়াছেন, তাঁর রাঙা রশ্মি সমস্ত আকাশ কুসুম আভা মাখাইয়া তারই খানিকটা কিশোরী পাত্রীর মুখে ছুঁড়িয়া দিল, তেজেশ পাত্রীর মুখের দিকে চাহিতেই কি দেখিল? দুটি ভ্রমর-কৃষ্ণ-তার নয়নের সুধা নিস্যন্দী দৃষ্টি,—সে দৃষ্টি কি বলিতে চায়, সে কি আত্মনিবেদনের ভাষা নহে? তেজেশ কবি না হউক, অপ্রেমিক নয়, একটি গানের দুটি ছত্র তার মনে পড়িয়া গেল,—

তুমি এবার লহ হে নাথ, আমার লহ,
এবার তুমি ফিরো নাহে, হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহ"

নিশ্চয়ই এ গান সেই কুমারীর তৃষার শুভ্র হৃদয়ের অনাবিল পবিত্র প্রেমের উৎস; কত দিন কত জন তো তাহার কাছে আসিয়াছে, তাহাদের দেখিয়া তো তার আঁখিতে এ "আত্মনিবেদন" বাণী মূর্ত্ত হইয়া ফোটে নাই, এখন ব্যাপার দেখিয়া তোমরা পাঁচজনেই বিচার করিয়া বল দেখি, তেজেশের কি করা উচিত। কাপুরুষের ন্যায় পাছু হটিয়া যাওয়া, না সাহসে বুক বাঁধিয়া কন্যাটির পাণিগ্রহণ করা? না,—তেজেশ অসদাশয় নয়, অমানুষ হৃদয়হীন নয়, পৌরুষত্বের দাবী সে, রাখে—বেশী বলিয়া আর কাজ নাই, অতঃপর অবিলম্বে একদিন বিনা ঘটা-পটায়, শুভ গোধূলিলগ্নে, শুধু শঙ্খ হুলুধ্বনির মধ্যে—মাত্র শাঁখা সাড়ী পরিহিতা পার্ব্বতীকে সে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া,কুমারীর শুভ্র সিঁথি রেখা সিন্দুরের রক্তরাগে চিহ্নিত করিয়া নিজের স্বামীত্বের ধ্বজপতাকা উড়াইয়া দিল।

৯

পাঁচটা বাজিতে না বাজিতেই ফীণ আয়ু শীতের দিন ফুরাইয়া আসিল, আসন্ন সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ধীরে ধীরে কুহেলিকার মায়া লইয়া ধরা বক্ষে নামিয়া আসিতেছে, কাছারী প্রত্যাগত তেজেশ ম্লানমুখে জানালার কাছে মাথায় হাত দিয়া চিন্তিতভাবে বসিয়া আছে, দৃষ্টি তার সুদূর দিগন্তের কোলে নিবদ্ধ; সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া নিকটেই যে সৌন্দর্য্যে পূর্ণ পুষ্করিণীটি ধন্য নরনারীর কলকোলাহলে মুখর—তাহা আজ আর তার চোখে পড়িতেছে না; হাঁসের দল পাখার জল পড়িতে পড়িতে অস্ফুট ভাষায় সঙ্গীদের বিষাদসম্ভাষণ জানাইয়া

সে দিনের মত নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরতেছে ; দু একটি দুষ্ট হাঁসগুলির অধিকারিণী দুটি বালিকা, পাড়ে দাঁড়াইয়া ঢিল ছুঁড়িয়া সে হাঁসদের ফিরিয়া আসিবার জন্য সঙ্কেত করিতেছে, অন্যদিন তেজেশ এই সব প্রাত্যহিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলিও চাহিয়া চাহিয়া উপভোগ করে, নিজের একটানা নীরস জীবনে ইহারই বৈচিত্র্যে একটু সৌন্দর্য্য বোধ করিতে চায়, আজ কিন্তু সে সম্পূর্ণ উদাসীন—মনের মধ্যে আজ তার একটা বিষম বিপ্লব হলুস্থুল বাধাইয়াছে, যেহেতু সে আজ তার শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে একখানি চারি পৃষ্ঠা ব্যাপী চিঠি পাইয়াছে, আর সেই চারি পৃষ্ঠায় যে উপায়ের বিশ্লেষণে তিনি জামাতাকে ভূষিত করিয়াছেন তাহা মোটেই প্রতিমধুর নয়, তোমরা কেহ শুনিতে চাও সেই বিশেষণ গুলি ? "Brute, Selfish, Idiot, Heart less" কত নাম করিব, তবে একথা সত্য যে ভদ্রসন্তান হইয়া এসব বিশেষণে সম্ভাষিত হইলেও, শ্বশুরের বিরুদ্ধে "মানহানি" অভিযোগের কল্পনা তেজেশের মনে মোটেই উদয় হয় নাই। তবে বেচারী বারবার এই কথাটাই ভাবিয়া সারা হইতেছে যে কেমন করিয়া সে এই সব বিশেষণের অধিকারী হইল ? সত্যই কিন্তু সে মণিমালাকে ভাল বাসে না তাহা নয়, মণিকে কিছু সে ত্যাগও করে নাই, বরং মণিই আজ কয়মাস যাবত তাহার ঘরদার অপমান করিয়া পিত্রালয়ে গিয়া রোগশয্যাশীন হইয়া আছে। অতঃপর তেজেশকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া পরপারে যাত্রা করিবার জন্যও প্রস্তুত হইয়াছে, এ অবস্থায় সেই অকূল শোকসাগরে কূল পাইবার আশায় মজ্জমান তেজেশ যদি সামান্য কিছু অবলম্বন করিয়া বারিধিবক্ষে ভাসিতেই থাকে তাহা কি একেবারেই অমার্জ্জনীয় বলিয়া গণ্য ?

শ্বশুর একস্থানে লিখিতেছেন, "চিকিৎসকের মুখে চিকিৎসার শুনে, আর আমাদের অদৃষ্টবলে যদি বা মণির অবস্থা একটু আশাপ্রদ হইয়াছিল তোমার নৃশংস আচরণে পুনরায় তাহা ঘুচিয়া গেল। বিবেকহীন পাষণ্ড তুমি, তবে স্ত্রী রোগশয্যায় শুইতেছে আর তুমি কি না স্বচ্ছন্দে বর সাজিয়া বিবাহ করিয়া আসিলে—ইত্যাদি। হায়, হায়, তেজেশ যে বড় আশায় নিরাশ হইয়াই এ কাজ করিয়াছে গো ! সে যদি ঘুণাক্ষরেও জানিত যে মণি তার এ যাত্রা রক্ষা পাইতে পারে, তাহা হইলে তাহা হইলে স্বর্গের অপ্সরা যাচিয়া তাহাকে বরমাল্য দান করিতে আসিলেও সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিত। চকিতে এই সময় তার মনের মধ্যে পার্ব্বতীর লজ্জারুণ সুন্দর মুখখানি স্মরণ হইল। আর স্মরণ হইল বিদায় দিনের ঘটনা,—মাথার ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া সে ঘরে ঢুকিয়াই কোমল হাত দুটি দ্বারা স্বামীর পাদস্পর্শ করিয়া সেই হাত নিজের মাথায় বুলাইল, তেজেশ লজ্জাবনতা নববধূকে সাদরে তুলিয়া ধরিয়া বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া সোহাগভরা কণ্ঠে কহিল, "ভয় নেই, যখন বিয়েই করলাম, তখন তোমায় বেশী দিন ছেড়ে থাকব না, নিয়েই যাব।" বধূ উত্তর দিল না, কিন্তু মুক্তাবিন্দুর ন্যায় কয়েকটি অশ্রু তার ভ্রমরবিনির্ন্দিত চক্ষু বাহিয়া রাঙ্গা গালে ঝরিয়া পড়িল, ভাষাহীন অধর যেন বলিতে চাহিল,

"চরণে রাখ না রাখ আমি যে তোমারি সখা,
এ অধিনী প্রেমাধিনী ঘৃণা হয় কিগো দেখা"—

তেজেশ হৃদয়হীন নয়, সস্নেহচুম্বনে সে অশ্রুবিন্দুগুলি মুছিয়া লইয়াছিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, মণি যদি মরিতেই বসিয়াছিল, তবে মরিলেই বুঝি ভাল ছিল, নতুবা পার্ব্বতীর দশা এখন কি দাঁড়ায় ? তখনই সে দুর্ব্বল চিত্তকে চোখ রাঙ্গাইয়া প্রকৃতিস্থ করিয়া লইল। এইবার তার রাগ হইল সেই হতভাগা ঘটক রামগতির উপর,—সে যদি মাঝে হইতে এ হাঙ্গামা না বাধায় তো তেজেশকে কি এলাহে ঠেকিতে হয় ? পার্ব্বতীর নিরীহ বাপের উপর ও তার রাগ কিছু কম হইল না। সেই না পারেপ্রকারে তেজেশকেই বেগার ধরিয়া কন্যাদায় হইতে পার হইয়া গেল, এই সব "আহম্মক" গুলার নামে কি কোন ধারায় অভিযোগ রুজু করার আইন কানুন কিছুই নাই ? নাঃ সমস্ত কোডবহি খুঁজিলেও নাই, নূতন কিছু করা উচিত বটে, নতুবা কন্যাদায়গ্রস্ত বাপগুলার হাত হইতে যুবকদের আর পরিত্রাণ নাই, স্ত্রী হউক না কেন তাহারা বিবাহিত।

তেজেশ এখন করে কি, শ্বশুর লিখিতেছেন, "যদি

কাঁদিয়া কাটিয়া ওষুধপত্র সমস্তই খাওয়া বন্ধ করিয়াছে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় তেজেশ মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল, "উপায় এখন উপায়" এ পোড়ামুখ লইয়া সেখানে গিয়া মণির পায়ে ধরিয়া মান ভাঙ্গানও চলিবে না. দিদি-শাশুড়ীর বাক্যবাণ আর তাঁর সুযোগ্যা নাতিনী পুরবালার বাক্যদংশন জ্বালা নীরবে সহিবার মত গাত্রচর্ম্ম তেজেশের নাই. প্রাণীবিশেষের গাত্রচর্ম্ম গায়ে দিয়াও পরিত্রাণ ঘটিবে না, যেহেতু অস্ত্রগুলি আকারহীন অথচ মর্ম্মভেদী। মণি, মণি, প্রেমের প্রতিমা, সরলতার আধার, স্নেহের জীবন্ত মূর্ত্তি মণি! মণিকে সে খুবই জানে, এমনি যদি সে "মণি ক্ষমা কর" বলিয়া মণির চরণতলে গিয়া উপস্থিত হয় তো মণি স্বামীর অনুশোচনা-দগ্ধ মুখের দিকে চাহিয়া সব ভুলিয়া যাইবে, স্বামীকে সে কখনই প্রত্যাখ্যান করিবে না, কিন্তু সে সাহোপায় দ্বারা সে অহোরাত্রি পরিবেষ্টিতা —কি সিঁদুরস্তোদের ব্যবহার, কে বলে নারীকে "অবলা" হাতে অস্ত্র না লইয়াও এই প্রবলা কুলের অস্ত্রধারিণী শক্তি—থাক্ বাপু উহাদের আলোচনায় শুধু সময়েরই অপব্যবহারমাত্র, উহাদের তো এক চুলও ক্ষতি নাই।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল, একটি দেশলাই হাতে লইয়া ঝিশবে যতীশ আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপরের ল্যাম্পটিকে জ্বালিয়া দিল। সে আজ দুপুরের ট্রেণে কলিকাতা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দাদার আকস্মিক বিবাহের ব্যাপার সে দাদারই শ্বশুরের পত্রে অবগত হইয়া ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে। দাদার সহিত এখনও তার কোনো কথা হয় নাই, যেহেতু দাদা ছিলেন অফিসে, সে বাসায় পৌঁছিয়া ক্ষুধার তাড়নায় রান্নাঘরের হাঁড়ী উঠকাইয়া শূন্যহাঁড়ী দেখিয়া পাশের বাড়ী ক্ষুধা নিবারণ করিতে গিয়াছিল। সে বাড়ীর বধূ উর্ম্মিলা মণিমালারই বিশেষ বন্ধু এবং যতীশকে সে নিজেরই দেবরের ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিত. তেজেশের বিবাহের কথা এখনও রাষ্ট্র হয় নাই, অথচ তেজেশের শ্বশুরের কাছে কেমন করিয়া তড়িৎ বেগে যে সে সংবাদ গিয়া পৌঁছিয়াছিল ইহাই আশ্চর্য্য। যতীশের মুখে দাদার বিবাহের কথা শুনিয়া উর্ম্মিলার বিস্ময় যাওয়া ছাড়াইয়া গেল, অথচ কেন তেজেশ বিবাহ করিয়াছে এ প্রশ্নের উত্তর সে যতীশের কাছে আদৌ পাইতে পারিল না; কৌতূহলও অদম্য হইয়া উঠিল, অবশ্য যতীশ আশ্বাস দিল যে কাল নাগাইদ দাদার নিকট হইতে এ "কেন"র উত্তর জানিয়া আসিয়া উর্ম্মিলা বউদিদির কাছে সে উত্তর পৌঁছিয়া দিবেই। (ক্রমশঃ)

টোটকা

[শ্রীসজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ]

ভাত হজম।

যা বিছানায় শুইয়া ঢেঁকুর তুলে, হজম হয় না, ডাকার করে, মাথা ধরে—ছেলে দেখিয়া শুনিয়া একদিন জিজ্ঞাসিল—কি হয়েছে মা?

মা বলিল—ভাত হজম হয় না বাবা!

ছেলে বলিল—পরনিন্দে কর না মা, এখুনি সব ভাত হজম হয়ে যাবে। বাবা বলেন, পরনিন্দা, ভাত হজমের মত ওষুধ!

গা ম্যাজ ম্যাজ।

দিনরাত গা ম্যাজ-ম্যাজ করে, কিছু ভাল লাগে না, মা'র মেজাজ তিরিক্ষি হইয়া থাকে। ছেলে বলিল—তোর-কি হয় মা, তা যে আমি বুঝতে পারি না।

মা বলিল—গা ম্যাজ-ম্যাজ করে বাবা।

পিতৃভক্ত সন্তান, বাপ যা কিছু বলে, সব মনে করে রাখে, বলিল—গায়চর্চ্চা কর, এখনি ইক চন্-চন্ করে উঠবে, গা-ম্যাজ-ম্যাজানি সেরে যাবে।

—টোটা পরীক্ষিত মহৌষধ।

সমালোচনা

'ফুলের ব্যথা' শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায় রচিত কবিতা গ্রন্থ। ৪১৩, মেছুয়াবাজার, বিচিত্রা প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলালের নানা কবিতা যাহা এ পর্য্যন্ত বহুসাময়িকে প্রকাশ হইয়াছে তাহারই ভিতর হইতে ফুলের ব্যথার এই কবিতাগুলি নির্ব্বাচিত করিয়া দিয়াছেন—শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। নির্ব্বাচন যোগ্য ও সুন্দর হইয়াছে। প্রথম কবিতা 'ফুলের ব্যথার' এই কাব্যগ্রন্থের আরম্ভ—'দুঃসাহসে গর্ব্ব'। 'ফুলের ব্যথা' পাঠ করিয়া আমরা ইহার তরুণ যৌবনের রস সম্ভার দেখিয়া আনন্দিত, মুগ্ধ হইয়াছি। ভাষা ও ভাবের সম্পদে সবগুলি খণ্ড কবিতাই সমৃদ্ধ উজ্জ্বল। বাংলা দেশের কাব্যামোদী পাঠক পাঠিকারা এই সুন্দর কবিতাগুচ্ছ পাঠ করিয়া প্রীত হইবেন—এই পরিচয় শুধু আমরা দিতে পারি।—পুস্তকখানির কাগজ ছাপা সুন্দর মনোলোভা। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটিও সুন্দর। 'ফুলের ব্যথার' অনেক গুলি কবিতা যথা—ফুলের ব্যথা, মনের বসন্ত, মজুঠাকুর, অবুঝ, মানা, আদিকথা, চুম্বন, আলিঙ্গন, পতিব্রতা, চিঠি, প্রভৃতির নানা স্থান উদ্ধৃত করিবার একান্ত প্রলোভন সত্ত্বেও তাহা করা গেল না। কারণ স্থান সংকোচ তার উপর এমন করিলে কবি ও পাঠক পাঠিকার প্রতি অন্যায় করা হইবে—রসভঙ্গ হইবে। ফুলের ব্যথার অন্তঃসৌন্দর্য্যের পরিচয় 'ফুলের ব্যথাই' দিবে—সেই ভাল।

'সালোমে' প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য লেখক ওস্কার ওয়াইল্ড রচিত বিখ্যাত একাঙ্ক নাট্য। শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশী এই নাটকখানি বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন। নাট্যখানি প্রকাশিত হইয়াছে ৪৩এ কলেজ স্কোয়ার, বুক কোম্পানী হইতে। মূল্যের উল্লেখ নাই। সালোমের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী অসরাপর কথা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, Oscar Wilde তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বয়ং এই বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন যে I was a lord of words এবং একথা সম্পূর্ণ সত্য যে তিনি ছিলেন একজন ভাষার রাজা। সুতরাং মূলের ভাষার ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য কোন অনুবাদে রক্ষিত হওয়া অসম্ভব। তবে বাঙ্গালী পাঠকেরা এই অনুবাদ থেকে বিদেশের একজন স্টাইল লেখকের আর্টের সম্পূর্ণ পরিচয় পাবেন। এই ট্রাজেডীর অন্তরে যে করাল সৌন্দর্য্য আছে এই অনুবাদে পাঠক সমাজ সেই সৌন্দর্য্যের পরিচয় লাভ করবেন। ওস্কার ওয়াইল্ডের মূল গ্রন্থ সালোমে জগত জোড়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। সালোমে নৃত্যে নানা অভিনেত্রী নৃত্য জগতে নূতনত্ব আনিয়াছেন।—অনুবাদে কথ্য ভাষার সঙ্গে সঙ্গে লেখ্য ভাষা মিশিয়া সৌন্দর্য্যের হানি ঘটিয়াছে। এতটুকু বহির মধ্যে ছাপার ভুলও রহিয়া গিয়াছে অজস্র। বহি খানির বাঁধাই ও কাগজ ভালই। ছাপা খুব ঝরঝরে নয়। বিদেশী সাহিত্যের উৎকৃষ্ট রত্নরাজি বাংলা সাহিত্যে যত প্রকাশিত হয় ততই ভাল।

'জনসেবক' মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশী সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ প্রতি সংখ্যা ৵০। কলিকাতা বুক কোম্পানি হইতে প্রকাশিত। বর্ত্তমান আষাঢ় হইতে বর্ষারম্ভ হইয়াছে। পত্রিকাখানির বিশেষত্ব এই—ইহাতে সবই বিলেতী বিখ্যাত পুস্তক ও প্রবন্ধের অনুবাদ বাহির হইতেছে। স্বদেশী ঘটনাবলীও চিত্রে কার্টুণে প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্র ও কার্টুণগুলি উপভোগ্য, লেখাগুলিও প্রয়োজনীয়। কাগজখানিতে আরও দু'এক কর্ম্মা বাড়াইয়া বিদেশী সাহিত্যের ভাল ভাল জিনিস যাহা আমাদের সাহিত্যে একান্ত অভাব যদি দেওয়া যায়—বিদেশী নূতন ভাব ও চিন্তা প্রণালীর সহিত যদি বাঙ্গালী পাঠক সমাজের পরিচয় জনসেবক করিতে পারেন তবে নামের সার্থকতা হইবে।

'বাঙ্গলার কথা' ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এই নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত বাংলার কথা সাহিত্যের একটা নির্ভীক স্পষ্ট ও সত্য আলোচনা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন 'বর্ত্তমান যুগের কথা সাহিত্যিক সম্ভব অসম্ভবের ভিতর অসাধারণ ও অলৌকিককে যথাসম্ভব ফুটাইয়া তুলিতে চান; সহজ জীবনের ভিতর রোমান্সের রোমাঞ্চ ঘটাইতে চান, সাধারণ জীবনে অসাধারণের উপাদান আহরণ করিয়া। তার জন্য তাঁরা নিত্য নৈমিত্তিক

জীবনকে গভীর ও নিবিড়ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। জীবনের ক্ষেত্র তাঁরা অণুবীক্ষণের দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছেন অন্তরের গভীরতম তলদেশে তাঁহারা ডুবুরী নামাইয়া দিয়াছেন, অন্ধকার মণিকোঠার আলো জ্বালিয়া দিয়াছেন। আলোকে যারা অনভ্যস্ত তন্দ্রার ঘোরে যারা মগ্নগুল হইয়া আছে, অন্ধকারে যাহারা বাণিজ্য করে, সবার মধ্যে চেঁচামেচীর সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।.. কিন্তু এমনতো চির দিনই হইয়াছে। সত্য যখন আসে সে কোন দিনই নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে আসিতে পায় না। অন্ধকারের রাজ্যে আলোর রেখা যখন দেখা দেয় তখন যে চারিদিকে চেঁচামেচী লাগিয়া যায় সে যে কেবল আনন্দেরই কলরব এমন নয়, তার ভিতর বেদনারও আর্ত্তনাদ আছে। আজ যে বাঙ্গালা সাহিত্যের চারিধারে কতক সম্প্রতির কতক প্রতিবাদের কলরব শোনা যাইতেছে ইহাতেই প্রমাণ করে যে সত্য আসিতেছে। যে আলোতে অনেকের চোখ ধাঁধিয়া উঠিয়াছে সে আলো সত্য শিব সুন্দরেরই অপূর্ব্ব দ্যুতি—আর্টের আত্মপ্রকাশ, জীবনের নব বিকাশ।' নরেশবাবুর এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পাঠ করিলে কথা সাহিত্য সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা ও আমাদের দেশের কথা সাহিত্য কি ভাবে চলিয়াছে সে সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা পাঠে অনেকেই আনন্দিত হইবেন।

শ্যাম্‌লা মেয়ে

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়]

খঞ্জন-পাড়ার শ্যাম্‌লা মেয়ের
কাজ্‌লা চোখে দুই চাওয়া!
বিকেল হ'লে কল্‌সী কাঁকে
এই পথে তার নিত্যি যাওয়া!
ভোম্‌রা-পেড়ে আঁচলখানি,
কের্ত্তা ঘিরে মাথার টানি,
'মাথা-ঘষা'র গন্ধেতে যার
উদ্‌খুসিয়ে খঞ্জন-হাওয়া—
দুই চোখে তার দুই চাওয়া!

আড়াত, ও ভাই আড়াত! আমার
বাঁতের ভেতর হচ্ছে কি যে!
কেমন ক'রে বুঝিয়ে বলি,
বুঝ্‌চি কি ছাই আমিই নিজে!
কলাইশুটি-ক্ষেতের কোণে,
লুকিয়ে থাকি বাব্‌লা-বনে,
একদিন তার কাবাই হ'লে
চোখের জলে যাই যে ভিজে,
—বাঁতের ভেতর হচ্ছে কি যে!

চুং ক'রে সে যায় চ'লে আর
মুচ্‌কে হাসে, কয়না কিছু—
আমি কি তাই নই খঞ্জনিয়া,
আমি কি তাই এতই নীচু?
কোমর-ভাঙা চলনে তার
ঘাড় গুঁজিয়ে বুকটা আবার,
সাধ যায় হায় ধর্ণা দিতে
দৌড়ে গিয়ে পিছু-পিছু!
—মুচ্‌কে হাসে, কয়না কিছু!

বলয় বাতাস ফুঁ দিয়ে এই
প্রাণের ভেতর আগুন জ্বালায়,
মৌমাছিরা ফুলের ঠোঁটে
চুমু খেয়ে উড়ে পালায়।
'বৌ কথা কও' বল্‌চে পাখী,
কাঁদ্‌চে তারও আতুর আঁখি,
হোলীখেলার আবির অঙ্গে
দুধিয়াবাবার সোনার থালায়,
—আগুন-বাতাস আগুন জ্বালায়।

আজ্‌কে আমি গাঁথ্‌চি মালা,
বুক বেঁধে তাই-ভাব্‌না ভুলে।
যা-হয় হবে!—কইব কথা
আস্‌বে যখন নদীর কূলে।
মুখ তুলে তার চোখে চেয়ে
বল্‌ব আমি—"শ্যাম্‌লা মেয়ে!
মোর মালাটি নেবে কি ভাই,
রাখ্‌বে তোমার খোঁপায় তুলে?"
—গাঁথ্‌চি মালা বনের ফুলে।

সেদিন "বাসন্তী" সম্মিলনে সুখ্যাত ছায়া-চিত্র ব্যবসায়ী অরোরা সিনেমা কোম্পানী তাজমহল কিম্বা কোম্পানীর "মানভঞ্জন" চিত্র-টি দেখাইয়াছিলেন। এই চিত্র-টি প্রথম যখন 'রঙ্গালয়ে' প্রদর্শিত হয়, উপর্য্যুপরি কয়েকবার আমরা ইহার অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছিলাম। আমাদের এ-দেশে যে কয়টি চিত্র উঠিয়াছে, তন্মধ্যে এইটি যে সে-সকলের চেয়ে ভাল, তাহা ইতিপূর্ব্বেও আমরা বলিয়াছি।

• • • •

এই চিত্র-টিতে যাঁহারা অভিনয় করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের অভিনয় সুন্দর হইয়াছে, ইহাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ নট শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র বি-এল ও তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নরেশ বাবু তাজমহল কিম্বা কোম্পানীর প্রথম চিত্র "আঁধারে আলো"তে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন, ইনি রঙ্গমঞ্চেও স্বীয় কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, বর্ত্তমানে ইনি ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় করিতেছেন, "কর্ণার্জ্জুন" নাটকে তাঁহার শকুনির ভূমিকা দেখিয়া দর্শক সন্তুষ্টই হইয়াছে।

• • • •

কিন্তু এরূপ সম্মিলন প্রায়ই হয় না। রঙ্গমঞ্চের নট বা নটী যে বায়স্কোপের অভিনয়ে সকল সময়ে কৃতিত্ব ফুটাইতে পারেন না, ইহা একরূপ সর্ব্ববাদী-সম্মত। তবে এই বিচিত্র-দেশে সব-থাকা, জিনিষও অনেকে মানিতে চায় না। প্রমাণ, "মান-ভঞ্জন" চিত্রের দাওয়ান ও কর্ণার্জ্জুনের কর্ণের ভূমিকায় তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী মহাশয়। দাওয়ানের ভূমিকা দেখিয়া লোকের যে একটি প্রস্তাব ভাব আসিয়াছিল, যে-টুকুর উপর ভর করিয়া থিয়েটার কোম্পানী প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন-যুক্ত করিয়া ইহার কলা-নৈপুণ্য দেখিতে লোকদে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহা বিফল হইয়াছে। দাওয়ান, দাওয়ানী গদিতে অধিরূঢ় থাকিলেই ভাল করিতেন!

কোন এক অভিনেতার নিকট শুনিতেছিলাম, বৃদ্ধের ভূমিকা গ্রহণ করিলেও যৌবন-সুলভ লম্ফ ঝম্ফ না করিলে নাকি অভিনয় সুন্দর হয় না। অভিনেতা কহিলেন, আজকাল থিয়েটারের শিক্ষকেরা এইরূপ শিক্ষাই দিয়া আসিতেছেন।" কোন দিন যে বৃদ্ধকে জরাজীর্ণ বাবরী চুল পরিয়া নামিতে দেখা যাইবে, আমরা তাহারই প্রত্যাশা করিতেছি!

• • • •

কোন একখানি নাটকে বৃদ্ধ ব্রোণ অভিনয়ে মার্কাস ব্রোডারের বার্ষিক বালক-ক্রীড়ার প্রতিযোগিতাকেও হার মানাইয়াছিলেন, কৈফিয়ৎ, ব্রোণ এ-কালের বৃদ্ধ ছিলেন না! সেকালের বৃদ্ধ কিরূপ, চক্ষে দেখি নাই, তবে বৃদ্ধ হইলে বার্দ্ধক্য যে আসিতই ইহা অনুমান করা চলিতে পারে।

• • • •

তবে যে "নাট্যমন্দির···বাঙ্গলার রঙ্গালয়ের একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল, নাট্য সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতিই 'যাহাদের' চরম লক্ষ্য—কেবল তাহারা যেখান 'যাহাদের' অভিপ্রায় নয়," তাহাদের দ্বারা নূতনত্বের নমুনা এইরূপই পাইবার আশা আমরা করিয়া থাকি।

• • • •

এই নাট্যমন্দিরের "অনেক আশা, অতি উচ্চ অভিলাষ, মহৎ উদ্দেশ্য, প্রকৃত নাট্যশিল্পের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ" দেখিয়া দর্শকবৃন্দ যে তাঁহাদের চিরাভ্যস্ত সহানুভূতি এবং অনুগ্রহ দানে বিমুখ হইবেন না, তাহা একরূপ সুনিশ্চিৎ!

• • • •

কোন একটি রঙ্গালয়ের নৃত্য দেখিয়া আমরা বলিয়াছি যে সে সার্কাসের কসরত। আমরা এই সংখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধা নর্ত্তকীর নাচের চিত্র মুদ্রিত করিয়াছি। দেখিলে, বুঝা যায় যে "ধাপক-ধাই ও ধূলা উড়ান ও দর্শক-তাজ্জনো ছাড়া-ও নাচের কসরত আছে, তা যেখান-ও চলে, দেখতে লোকও ছুটে।

সমাজে ব্যভিচার

"সত্যবাদীতে" প্রকাশ :—"মেদিনীপুর জেলার পড়েরেডা থানার কাতরাবাদী গ্রামের কয়েকজন দুষ্ট প্রকৃতির যুবক বেলা আন্দাজ তিনটার সময় একটী বিধবা রমণীর সতীত্ব বলপূর্ব্বক নষ্ট করিয়াছে। স্ত্রীলোকটী গ্রামের প্রান্তভাগে অবস্থিত একটী কূপ হইতে জল আনিতে গিয়াছিল।" বিনে বিচারে একটী গ্রামের কতকগুলি যুবক একজন অসহায়া বিধবার, সতীত্ব নষ্ট করিতে সাহসী হইয়াছে। সমাজের কতখানি অধঃপতন হইলে ইহা সম্ভব হয়, একবার ভাবিয়া দেখুন। যারা বাকি রমণীর জীবনের সার, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়—তাহাই বিনা-দ্বিধায় হরণ করিতে, যাহাদের যুবকদের বাধিল না। সমাজের ভয়, লোক-লজ্জার ভয় হইল না। অন্য কথা ছাড়িয়া দিলাম, গ্রামসম্পর্কে যাহাকে ভাইয়ের মতই রক্ষা করা কর্ত্তব্য, সেই তাহারই গ্রামের যুবকেরা জোর করিয়া লাঞ্ছনা করিল, তাহার সতীত্ব নষ্ট করিল। সমাজের সম্মতি শক্তি নাই, তাই মুখের আর ব্যভিচারকে ভাবিয়া শুনিয়া উপেক্ষা করে, কখনো প্রশ্রয় দেয়। আজ দুর্ব্বলের পীড়ন রূপের সমাজ দাঁড়াইয়া আছে, দুর্ব্বলের রক্ষার ভার তাহার নাই। সমাজের সেই জমাট শক্তি থাকিলে, দুর্বৃত্ত যুবকগুলি কখনো একজন রমণীর এমন ভাবে সতীত্ব নষ্ট করিতে সাহস পাইত না। ভরসা, এই দলিত যুবকরা কোন্ শ্রেণীর অর্থাৎ তথাকথিত 'ভদ্র' শ্রেণীর কি না। হইলেও আশ্চর্য্য হইব না। কারণ কি ভদ্রতা, কি কালচার, সবই আজ দুর্লভ হইয়াছে। বাজারের খেয়ালখেয়ালে, দেশহিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া, সমস্যার সন্ধানে যাইতে চাহ কি? এই যে ব্যভিচার একে বন্ধ করার কোনও প্রেরণা তোমার মধ্যে নাই কি? অসহায়া বিধবার, অত্যাচারিতা নারীর চক্ষের জল মুছাইবার আগ্রহ হয় না কি? মানুষের উপর এই যে লাঞ্ছনা, একে দূর করিতে বদ্ধপরিকর হও। নিপীড়িতা নারীকে লক্ষ্য করিয়া শুধু এই কথাই বলিতে পারি, ওগো, সমাজ তোমার রক্ষার ভার গ্রহণ করে নাই, তোমাকে শুধু শাসন করিবার সে অধিকারী। যদি পার, লাঞ্ছিতা, উৎপীড়িতা, আপনার মান আপনি রাখ। আমাদের সমাজে অত্যাচারী আছে মানুষ নাই, শাসনের আছে লাঠি নাই, ব্যভিচারী আছে গায়ের জোর, মনের তাই নাই।

"স্বরাজ"

"অমৃতবাজার পত্রিকা"র সম্পাদকীয় নিবন্ধটীতে ও প্রস্তাব বিপিন-চন্দ্রের মূর্তীচারা দেখিতে পাই। পত্রিকার বিচুড়ীতে যে পাল মহাশয় পত্রিবর্তন করিতেছেন তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। বাজবাজারের স্বেচ্ছা মহাশয়ের দেখিতেছি,—পাল মহাশয়কে অভিশ বাঁধনে বাঁধিয়া-ছেন। তাঁহাকে শুনাও, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের নূতন ইংরেজী কাগজও শীঘ্র বাঁহির হইবে। সে কাগজ স্বরাজ্য দলের মুখপত্র হইবে। সে কাগজের সহিত পাল্লার পাল্লা পত্রিকা-ঠাকুরাণী না থাক, সেইজন্যই বিপিনচন্দ্রকে এমন করিয়া আঁকড়িয়া ধরা হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে বোধ হয়, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্রের ব্যয়ও পত্রিকার মলাটের উপরে সম্পাদক-রূপে আমরা দেখিতে পাইব, সে সম্ভাবনাও আছি হইয়াছে।

"আরক"

জার্ম্মেণীর স্বদেশপ্রীতি

জার্ম্মাণ জাতি স্বদেশপ্রীতির জন্য সুপ্রসিদ্ধ। স্বদেশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহারা নিম্নলিখিত কয়টি আদেশ পালন করিয়া থাকে। এই আদেশগুলি স্বদেশের উন্নতকামী অন্যান্য জাতিও নিজদের দেশের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে পারে।

(১) যখনই টাকা পয়সা খরচ করিবে তখন তোমার দেশবাসীর স্বার্থের কথা স্মরণ রাখিবে।

(২) যখনই কোন বিদেশী জিনিষ কিনিতে যাইবে, তখনই মনে করিবে যে, তোমার ঐ কার্য্যের দ্বারা তোমার স্বদেশের খাদ্যের বৃদ্ধি হইতেছে।

(৩) জার্ম্মাণ ছাড়া অন্য কেহ যেন তোমার টাকা পাইয়া লাভবান হয় না।

(৪) বিদেশী কলওয়ালা কিনিয়া জার্ম্মাণীর কারখানাগুলিকে কলাঙ্কিত করিও না।

(৫) তোমার আহারের টেবিলে যেন বিদেশী খাদ্যের পরিদর্শন হয় না।

(৬) জার্ম্মাণীর কারখানে জার্ম্মাণীর কলমে লেখাপড়া করিবে—জার্ম্মাণ দেশের ষ্টীল কলম ব্যবহার করিবে।

(৭) জার্ম্মাণীর মদ্য, জার্ম্মাণীর কল ও জার্ম্মাণীতে প্রস্তুত "সিগার পান করিয়াই তোমার স্বদেশীতে প্রকৃত জার্ম্মাণীর ভেক্ত বজায়ক হইবে।

(৮) জার্ম্মাণ ব্রেণে উৎপন্ন কফি যদি ভাল না হয়, তবে জার্ম্মাণ উপনিবেশে যে কফি জন্মে তাহা পান করিও।

(৯) তোমার পোষাকে যেন জার্ম্মাণীতে তৈয়ারী হয় এবং মাথায় জার্ম্মাণীর টুপি থাকে।

কাউন্সিলকে ক্রমে মাথামাতালের গুলির আড্ডায় পরিণত হতে চলেছে। এবার দুজন মাতালী দুটী প্রস্তাব করবেন বোটীল বিয়াজেন—দুটীই গুলির আড্ডার যোগ্য। একজন আবার করবেন যে, প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে অন্ততঃ একবার যেন বার্ম্মিংহিএর শৈলশিখরে ভার্চুয়াল বসে; আর এক জনের দাবী ভবিষ্যতে যে সমস্ত সহকারী কাজ খালি হবে, তাহার শতকরা ৭০ জন যেন মুসলমানদের দেওয়া হয়, আর কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৫০টী যেন মুসলমানেরা পায়। এর পরে বোধ হয় কেউ প্রস্তাব করবেন যে, প্রত্যেক মাতালীর জন্য বার্ম্মিংহিএ বাড়ী করে দেওয়া হোক, আর একখানা টেণের বন্দোবস্ত হোক, আর মুসলমান মাতালীদের প্রত্যেককে একজন করে মেয়েমানুষ কিনে দেওয়া হোক। 'আনন্দবাজার' ভারতবর্ষা-বাসের কথা শুনতে পেলেন না-কি? সং, বাং। 'আনন্দবাজার'

শ্রীযুক্ত বসুমতীর বাজার, বৈলকণ্ঠ রাও দেশ প্রভৃতি, ছাড়া অন্যান্য হীন ও মৌলভী আবেদালী সাহেব সাগরপুরের সভ্যাগ্রহ ব্যাপারে অন্যান্য নিষ্ঠা আমিন্ট্রেট কর্তৃক প্রত্যেককে ছেড়ে মহাশয়ের সময় কারাবাস ও জরিমানে ৩০০০৲, ১৫০০৲, ৭৫৲ ও ১৫০৲ অর্থদণ্ড হইয়াছে। "দেশবন্ধুর আর্থিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট ফিস নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—বোধ করি।"

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

২য় বর্ষ] ৫ই শ্রাবণ শনিবার ১৩৩০, ইং ২১শে জুলাই। [৩য় সংখ্যা

হাওড়া ব্রিজের সম্মুখ

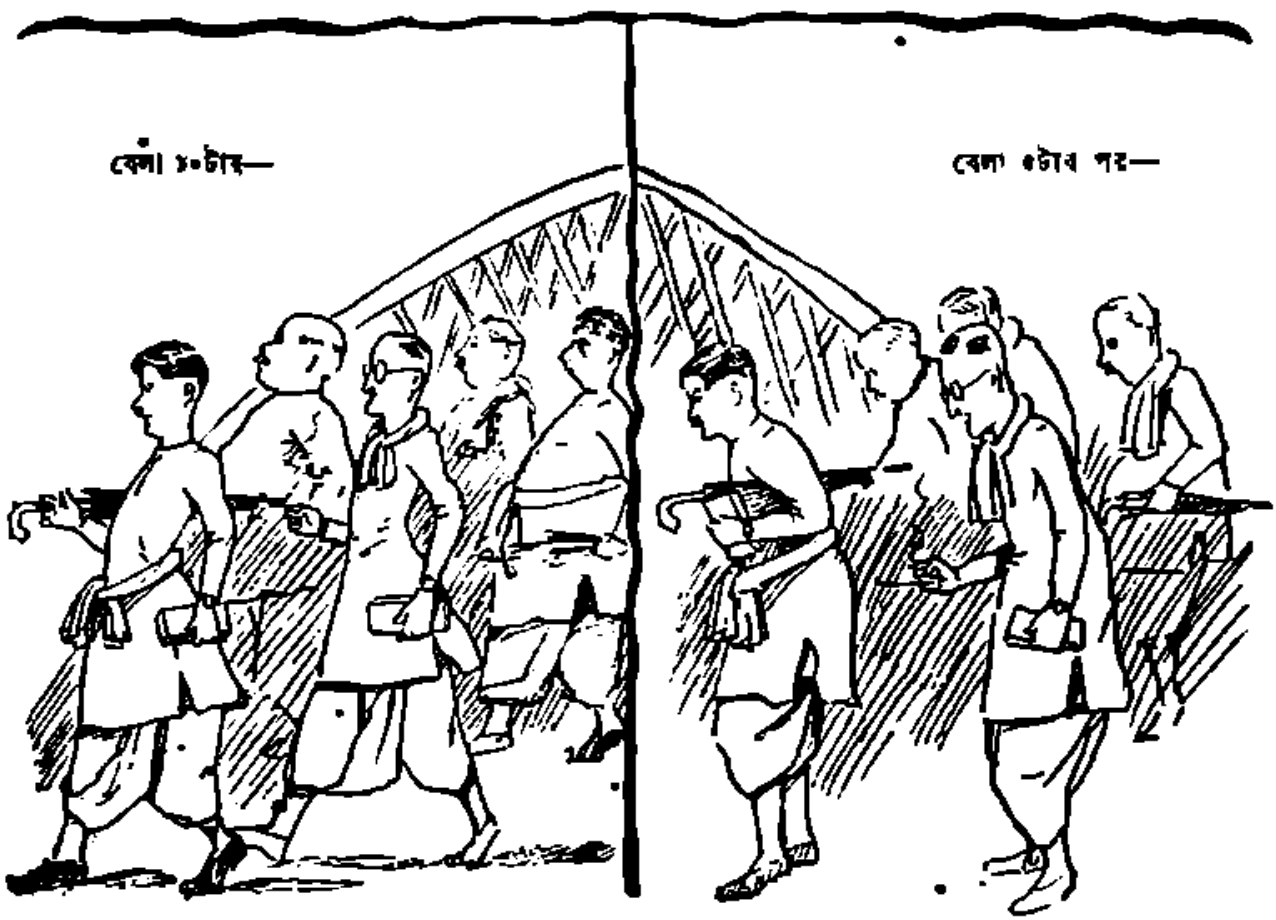

পার্থক্য—আসুন বলিবনা!

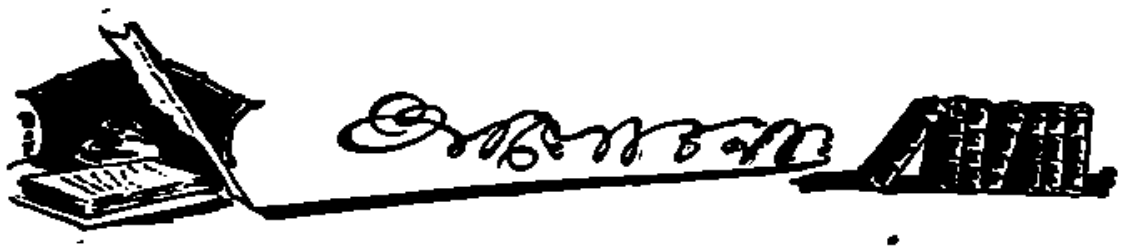

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলিয়া যাইতেছে—দেশের দুর্দশাও ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। দেশের অধিকাংশ লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, পরিধানের যোগ্য বসন পায় না। লোকের অন্নাভাব বস্ত্রাভাব দেশে দিন দিন বাড়িতেছেই। ইহার আনুসঙ্গিক ভাবে দেশে নানা ব্যাধি পীড়া, অনাচার, চুরি, ডাকাতী, নানারূপ নীচতা বিশেষ ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। আনুসঙ্গিক ভাবে যাহা আসিতেছে তাহার কোনটিকেই আমরা বাধা দিতে পারিতেছি না। বহু রকম ব্যাধি পীড়া এ দেশে স্থায়ী ভাবে কায়েমী আসন গাড়িয়া বসিয়াছে। তাহার একটিকে বাধা দিবার উপায় করিয়া উঠিতে না উঠিতেই আশে পাশে আরো নূতন রকম দশটি বিভীষিকা অট্ট হাসি হাসিতেছে। দেশের লোকে এই সব ব্যাধি পীড়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া মরিতেছে।

• • •

দেশের লোকের মনে কোন দিকেই শান্তি নাই। সকলেই কি যেন একটা অজ্ঞাত মনের অশান্তিতে জ্বলিয়া মরিতেছে। দেশের চারিদিকে সুন্দর মাঠ, বাতাস, কত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য—দেশ ভরা কত সোণার ক্ষেত কত সম্পদ; এগুলি দেশের লোকে দেখিয়া তৃপ্ত হয়। কিন্তু যখন এই সব সোণা ফলে তখন তাহা দেখিতে দেখিতে কোন যাদুমন্ত্রের বলে যেন দেশবাসীর সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়—দেশবাসী তাহার ফলভোগ করিতে পারে না। তাই অভাব দেশে লাগিয়াই আছে। দেশের লোকের অশান্তি ক্রমেই বাড়িতেছে!

• • • •

অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। দেশবাসীর স্বভাব এই মারাত্মক অভাবের তাড়নায় ক্রমেই নীচের দিকে যাইতেছে। দেশের ব্যাধি পীড়া, চুরী, ডাকাতী নানা রকম নূতন নূতন নীচতা এগুলির মূলে রহিয়াছে দেশের অতি বিস্তৃত দারিদ্র্য ও অভাবের তাড়না। সকলেই কোনরকমে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নানা রূপ নীচতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। বিশ্বাসঘাতকতা, মায়া, প্রবঞ্চনা, চুরী ডাকাতী, দেশে তাই অতি সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে।

• • • •

দেশের অভাব যদি কমে, দেশবাসীর অন্ন সংস্থানের উপায় যদি হয়—তবে দেশের ব্যাধিপীড়া এই সব নানা নীচ প্রবৃত্তিও সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যাইবে। বেকার সমস্যাই হোক, কোন ব্যাধি পীড়া নিবারণের ব্যবস্থাই হোক, অনাচার নিবারণী ব্যবস্থাই হোক সকলের মূলে রহিয়াছে অন্ন সমস্যা ও বস্ত্র সমস্যা। এই মূল সমস্যাকে চাপা দিয়া আনুসঙ্গিক সমস্যা গুলিকে দমন করিবার জন্য যত চেষ্টা হইতেছে তাহার কোনটিই সফলতা লাভ করিতে পারিতেছে না। গোড়া কাটিয়া আগায় জল যতই ঢালা যাক না কেন তাহাতে কোন কাজ হইবে না। নানা সমস্যা, বাকবিতণ্ডা, গণ্ডগোল করিতে করিতে—দেশে আরো কত গোল যে পাকাইয়া উঠিবে তাহার অন্ত নাই। অথচ দেশের এই সর্বগ্রাসী মূল সমস্যাকে ফাঁকি দিয়া ফাঁকতালে এড়াইবারও উপায় নাই। মহাত্মা গান্ধীর কার্য্য পদ্ধতি ও প্রেরণা দেশবাসীকে দেশের এই মূল অভাবের দিকে নজর দিতে শিখাইতেছিল। দেশের লোককে আত্ম-নির্ভরতা, ও আপনার ভাত কাপড় অর্জ্জনের যোগ্যতা দিতেছিল। যে দেশের লোক এই যোগ্যতা হারাইয়া একটা মোহের বশে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে—তাহাদের মধ্যে একটা প্রতিঘাত আনিয়া তাহাকে ঘুরাইয়া দেওয়া বিপুল ক্ষমতার পরিচয়। মোহ এক দিকে শত প্রলোভন বিস্তার করিয়া নিজ ক্ষমতায় মোহগ্রস্তের অতলে টানিতেছে—আর তাহার সেই পথে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে আত্মবোধ—কার্য্যকরী ক্ষমতা। ইহা লাভ করিলে দেশ বাঁচিবে ধ্বংসের মুখ হইতে, নতুবা নয়।

এক কার্য্য এবং এক সংকল্প হইতেই জাতির সংঘবদ্ধ ভাব ফুটিয়া উঠে। এক জাতীয় উদ্বেগ ও ভাব হইতেও দেশে এরূপ মিলন সম্ভব। কিন্তু এদেশে জাতি ও সমাজ সব ছত্র-ছাড়া হইয়া গিয়াছে—নামেই ইহা শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু দেশের কোন কার্য্যে ইহার কার্য্যকরী অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না। কার্য্যও জনে জনে আকাশ পাতাল বিভিন্ন। তাই কর্মধারার একত্বের মধ্য দিয়া মহাত্মা এ দেশে একটা জাতীয় ভাবের বিকাশ করিতে চাহিতেছিলেন। বাঁচিয়া থাকা দেশের লোকের সকলেরই প্রয়োজন—এবং এই বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই দেশের লোক দেশের মধ্যেই ছুরী জাকাতী নানা রকম নীচতা, নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি করিয়া কোন রকমে চলিতেছে—কিন্তু এ বাঁচিয়া থাকার মধ্যে না আছে শান্তি না আছে সুখ। কি একটা বড় অদৃশ্য শক্তির প্রচণ্ড আঘাত কেবলি যেন নীচু পানে লোককে নামাইয়া রাখিতেছে—উঠিতে চাহিয়া মুক্ত আকাশ বাতাস—মুক্ত মনুষ্যত্ব দেখিবার অবকাশ দিতেছে না। বাঁচিয়া থাকিয়াও সব সময় ধ্বংসের চিন্তা—সব সময় মনে আসে যে দিন কি করিয়া চলিবে!—কৃষক ও তাঁতীর বস্ত্র সব বিলাস বর্জ্জন করিয়া জাতিকে আগে তাহার অস্ত্রবস্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে। তারপর এ দেশে যদি কোন বড় কাজ সম্ভব হয়। তাহার পূর্ব্বে সঙ্ঘ-বদ্ধ ভাবে কোন বড় কাজ এই অভাবের দেশে কি করিয়া সম্ভব হইবে তাহা বোঝা যায় না। এই দুটি মূল জিনিষ অর্জ্জন করিতে দেশের লোককে যে শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে বর্ত্তমান দেশের অবস্থায় তাহা সামান্য নহে। কোন শক্তিমান শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্য কিম্বা কোন রাজ্য অধিকার করিবার জন্য যত প্রাণ, রক্ত, সাহস ও একাগ্রতার প্রয়োজন কোন অধীন দেশবাসীর হয় এ দেশের লোককে তাহা অপেক্ষা কম ত্যাগ স্বীকার একার্থে করিতে হইবে না। অভাবের তাড়নায় স্বভাবের যে নীচতা আসিয়াছে তাহার গতি ফেরানো যাইতে পারে আত্মনির্ভরশীলতায় ও আত্মবোধে। দেশের সমস্যাগুলির মধ্যে অভাব বড় আকারে একটা—তাই কৃষাণ ও তন্তুবায়ের কাজ যদি প্রথমেই কর্ত্তব্য হিসাবে গ্রহণ করে তবে দেশে এক জাতীয় ভাব ও লক্ষ্য আসিবে।

* * * *

দেশের পক্ষে আজ ইহা অস্বাভাবিক হইতে পারে—কিন্তু মহাত্মার সময় সারা দেশ এই মন্ত্রেই সাড়া দিয়াছিল। কর্ম্ম পন্থা দিবার যোগ্য লোক আবার দেশে না আসা পর্য্যন্ত নানা কর্ম্ম পন্থাই গ্রহণ করিয়া দেখা যাইতে পারে বটে কিন্তু এখন অভাবগ্রস্ত অস্ত্রশস্ত্র হীন দেশে আর কোন ব্যবস্থায় যে মূলের গলদ ঠিক ধরিতে পারিবে তাহা বোঝা যায় না।

* * * * *

কাউন্সিল প্রবেশ প্রসঙ্গ লইয়া বহু বাদ বিসম্বাদ মনোভঙ্গ দলভঙ্গ দেশে হইতেছে। কাউন্সিলে দেশের সত্য আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন লোকদের যাইয়া বেশী দিন টিকিয়া থাকিবার সম্ভাবনা যে নাই—তাহা অনেক সভ্যের পদ ত্যাগে বোঝা গিয়াছে। ইস্পাতের কাঠামো এ সব ভুয়ো বাদ প্রতিবাদে বড় নড়ে না। দেশের টাকার বেশীরভাগ প্রদত্ত কর তারে দেশের অভাব অভিযোগ আগে মিটাইয়া তারপর অন্যান্য নানা ঠাট বজায় রাখিবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এর কম অভাব ও দারিদ্র্যের দেশে অর্থাগমের ও অর্থ রক্ষণের উপায় দেশবাসীর হাতে কিছুমাত্র নাই। দেশ তাহাতে জন্মেই ডুবিতেছে, মরিবার মুখে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে ইস্পাতের কাঠামো অন্য ভাবে চালিয়া সাজাইতে হইবে। কিন্তু কৌন্সিলে তেমন প্রস্তাব উঠিলেই তাহা বার বার প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে দেশবাসীই ভোটে দেশহিতকর প্রস্তাব নাকচের সহায়তা করিয়াছেন, কোন স্থলে আমলাতন্ত্র নিজ সর্ব্বময়ী ইচ্ছার প্রাধান্য বজায় রাখিতেছে। দেশে সামন্ত-রাজ্য, রাজা, জমিদার প্রভৃতি যারা যেমন সাম্রাজ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তেমনি গণতন্ত্রের যুগে এ দেশেও একটা ভুয়ো কাউন্সিল লোককে দেখাইবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। যেন জনমতের ভিত্তির উপরেই দেশের শাসনশৃঙ্খলা চলিতেছে। কোন কোন স্থানে যাদের আলুনা হইয়া শৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা আনে এই যা দুঃখ। ন্যায় ও সত্য

কথা বলিবার সাহস সম্পন্ন লোকের বেশী মাত্রায় কাউন্সিল গমনে ইস্পাতের কাঠামো কেমন শক্ত ও দৃঢ় তাহা হয়তো আরো বেশী ভাবে প্রকট হইতে পারে। দেশের লোকের চোখ খুলিবার পক্ষে তাহা যে একটা মস্ত বড় উপাদান হইবে তাহা খুব সত্য এখনো নয়! কারণ কৌন্সিলে কি হয় না হয় সে খবর দেশের অল্প লোকেই রাখে। তবে একপক্ষে ইহা মন্দের ভাল। কারণ বোঝা যায় দেশে তবু কতকটি আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন লোক আমলাতন্ত্রের সহিত আইনতঃ বাক্‌সংগ্রাম করিতে পারেন।

• • • •

এই কৌন্সিলের বাকযুদ্ধে ও কার্য্যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সভ্যেরা যতটা স্বাধীন-চিন্ততার প্রমাণ দিয়াছেন বাংলার সভ্যেরা গত তিন বৎসরে তেমন প্রমাণ দিতে পারেন নাই। ভারতীয় পরিষদে বাংলার সভ্যদের স্থান সব প্রদেশের নিম্নে—এমন যে বাক্যবীর বঙ্গ ভাবাবিল বাঙ্গালী তাহার বাক্‌প্রবাহও যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কোন মায়ায়? তারপর বাংলা কৌন্সিলে দেশীয় মন্ত্রীদের নাকি অনেক কিছুই দেশহিতকর কার্য্য করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তেমন কিছু করিতে না পারিয়া বা তেমন কোন সুযোগ আমলাতন্ত্র তাঁহাদের না দেওয়াতে ইহারা নাকি বড়ই দুঃখিত। কিন্তু এই দুঃখ ও ক্ষোভে অনেক দেশের মন্ত্রী নিজেদের পাঁচ ছ' হাজার মাসিকী, ঢোলসার, বেয়ারা, গ্রাহা খরচ প্রভৃতির লোভ ছাড়িয়া কার্য্যে ইস্তাফা দিতে পারিয়াছেন কিম্বা নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও যথাসম্ভব দেশহিতকর কার্য্যের জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন কিন্তু বাংলা দেশের মন্ত্রীরা তেমন প্রমাণ—তেমন সাহস দেখাইতে পারেন নাই। ইহারা নাকি দেশবাসীর মনোনীত সভ্য—তবে দেশের কাজ কিছু না করিতে পারিয়াও কি জন্য ইহারা দেশের এতগুলি অর্থ হজম করিয়া যাইতেছেন? অপর সভ্যদের অধিকাংশও তালে হরিবোল দিয়া যাহা খরচের লম্বা ফর্দ্দ দাখিল করিয়া যথাসম্ভব পাইয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিতেছেন। বাংলা দেশের কৌন্সিলের সাধারণ অবস্থা এত হীন কেন?

• • • •

দেশীয় কৌন্সিলগুলিতে আবার নূতন মনোনয়নের সময় আসিয়াছে। নানা জনে নানা ভাবে ভোট সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যাপৃত। শোনা যাইতেছে মন্ত্রীদের কেহ কেহ এই সময়ে অস্বাভাবিক ভাবে আপন ভোটমণ্ডলের দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। হঠাৎ নূতন ভোট আদায়ের সময় এই সব মহামানুষের পল্লীসহর ও গ্রামের উপর এত প্রীতির প্রাচুর্য্য কেন? নবাব নবাব আলীচৌধুরী কৃষিমন্ত্রী। এই কৃষিপ্রধান দেশে এই তিন বৎসরে কৃষিমন্ত্রী মহাশয় নিজের মাহিয়ানা ও অন্যান্য যাহা খরচ বাবদ সম্ভবতঃ তিন লাখেরও বেশী টাকা গ্রহণ করিয়া কৃষির কি উন্নতি করিয়াছেন, দেশের লোকে তাহার কোন পরিচয়ই পায় নাই। ইঁহার মাসব্যাপী ভ্রমণের মধ্যে অনেক গ্রামও পড়িয়াছে। জেলায় জেলায় গবর্ণমেণ্টের কৃষিখামার আছে কিন্তু এই গ্রামগুলিতে কৃষিমন্ত্রীর কৃপা কটাক্ষ পড়িবার তো কোন কারণই তিনি এই দীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে সৃজন করেন নাই। তবে এ সব স্থানে ভোট প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে বটে। তাই লোকে সন্দেহ করিতেছে ভোটের আশাতেই

কাসিমুদ্দীন—(পৃঃ ৬৪ দ্রষ্টব্য)

তিনি সরকারী অর্থব্যয়ে এই দলা অঞ্চলে ভ্রমণে নিয়োজিত হইয়াছেন। দেশীয় কৃষি মন্ত্রীর দেশবাসীর এই সন্দেহ অপনোদনের কোন যোগ্য কারণ থাকিলে তাহা জানান কর্ত্তব্য।

নাভার মহারাজা সামন্ত রাজা—শিক্ষিত যোগ্য স্বাধীনচেতা। সম্প্রতি হঠাৎ তিনি নিজ রাজ্য, সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়াছেন। বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন নাই। অনেকে বলিতেছেন সিংহাসন ত্যাগ স্বেচ্ছায় নহে—রাজন্য-রক্ষা আইন কর্ত্তা ভারত সরকারের ইচ্ছা হইতেই নাভা রাজের এই পদত্যাগ ঘটিয়াছে। এত বড় একটা সামন্ত রাজার অকস্মাৎ সিংহাসনের উপর এমন বিতৃষ্ণা হইল কেন—কিংবা ছাড়িতেই বা বাধ্য হইলেন কেন সে সম্বন্ধে যে কারণ উল্লেখ হইয়াছে তাহা এমন ব্যাপারে একান্তই অপ্রচুর। মহারাজের পদচ্যুতিতে অনেক গুজব রটিতেছে—অনেকে বলিতেছেন মহারাজের স্বাধীনচিত্ততাই তাঁহার পদচ্যুতির অন্যতম প্রধান কারণ। ইহার কোন প্রতিবাদ রাজা বাহাদুর বা রাজস্ব সচিব হইতে মুক্তি দেওয়ার কর্ত্তাদের পক্ষ হইতেও এ পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই। এমন এক একটা হোমরা চোমরা সামন্তরাজের যখন এই অবস্থা তখন অন্যে পরে কা কথা!

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ তত্ত্ব—নৃতত্ত্বের গবেষণা যে কত মূল্যবান ও বিচিত্র সম্পদ তাহার আরো একটী উজ্জ্বল নমুনা সম্প্রতি বেরিয়ে গিয়াছে। প্রবাসী পত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার চমৎকারিত্বের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। আমরা তাহা স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিলাম। বাংলা দেশের পরলোকে বাংলার বাহিরের এমন কতটি মহা মহা পণ্ডিত গবেষক প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগের ইতিবৃত্ত রচনা করিতেছেন তাহা জানিবার ইচ্ছা হয়।

বাংলা দেশে বর পণ প্রথাব্যাপার একটা অদ্ভুত নৃশংস অত্যাচারের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। যে দেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও কন্যা পিতার পেটের ভাত পরণের কাপড় বজায় রাখিতে পারে না সে দেশে কন্যাকে যেন তেন প্রকারে দু'তিন হাজার টাকা অন্ততঃ দিয়া বরের হাতে সমর্পণ করা এ যে কি ভীষণ ব্যাপার তাহা যে ভুক্তভোগী সেই জানে। মরণের চেয়েও তাই কন্যাদায় আজ দেশে ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অভাবের আলায় সুস্থচিত্তে কেহই এখন পুত্র কন্যা কামনা করে না। কুন্তাতো নহেই। কিন্তু অন্তরের একান্ত অনিচ্ছায়ও বিধাতার বিধান নড়ে না। কন্যা হইলে সে পিতামাতার একটা মস্ত ভার হয়। বাংলা দেশে কত পিতা কন্যাদায়ে প্রাণ দিয়াছেন, কত সংসার শ্মশান হইয়াছে—কত কন্যা আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে—কিন্তু এই পাপ প্রথা বন্ধ হয় নাই। নিজ নিজ স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়া দেশের লোকেই সমাজের উপর, ব্যক্তির উপর এই পাষাণভার চাপাইয়া রাখিয়াছে। জাতির জীবন নারী,—জীবনের মূল উৎসকে অবমাননা করিয়া জাতি ক্রমেই নিরীর্য্য প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছে। মেয়ের বিবাহ দিতেই হইবে—যেমন করিয়াই হোক ভিটা মাটি বিক্রয় করিয়াও তাহাকে পাত্রস্থ করিতেই হইবে—এই যে ধারণা ইহা সমাজ হইতে দূর করিতে হইবে। নারীকে নিজের চলিবার ক্ষমতা, আত্মরক্ষার ক্ষমতা, সাহস, বুদ্ধি সবই এখন শিখিতে হইবে। কারণ দেশের যে রকম দিন কাল ক্রমশঃ পড়িতেছে তাহাতে দেখা যায়—পুরুষ কোন দিক্ দিয়াই নারীর মর্য্যাদা রাখিতে পারিতেছে না। বাংলার তরুণ যুবক সম্প্রদায়েরও কর্ত্তব্য—তাহারা কিছুতেই ভবিষ্যৎ জীবন-সঙ্গিনীর উপর ও তাহার পিতা মাতার উপর এই কর ভার স্তব্ধ না করিয়া সম্মানের সঙ্গে হাসিমুখে জীবন সঙ্গিনীকে গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হওয়া। নারী শিক্ষায় আজ নির্ভরক্ষম যদি হইতে পারেন তবে সংসার এখনকার চেয়ে অনেক মধুর হইবে, সংসারের অভাব জ্বালাও কমিবে। ভবিষ্যবংশীয়েরাও বুঝি মনুষ্যত্ব কিছু বেশী পাইবে। আপাতদৃষ্টিতে এমন হইলে একটু সামাজিক বিক্ষোভ বিবেচিত হইতে পারে কিন্তু পরিণামে ফল শুভকর হইবে।

নারীর পাপ ব্যবসায় বা বেশ্যাবৃত্তির কতকগুলি সুবিধা বন্ধ করিবার জন্য আইন হইতেছে। এরূপ আইনের আবশ্যকতা আছে স্বীকার করি। কিন্তু আইনের নামে পুলিসের হাতে আরো কতকগুলি ক্ষমতা দিলেই যদি আইনের কাজ শেষ হইয়া যায় তবে এরূপ আইন দেশ বা সমাজের উপকারার্থে আদৌ লাগিবে না। গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের চুরী করিয়া আনিয়া বেশ্যাবৃত্তির জন্য পালন করা অবশ্য অপরাধ। এইরূপ আরও যে সমস্ত উপসর্গ আছে তাহা দূর করা কর্ত্তব্য। তবে বেশ্যা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই আছে। সমাজের পক্ষে একটা অপরিহার্য্য জিনিষ না হইলে এতকাল ইহা টিঁকিয়া থাকিতে পারিত না। পূর্ব্বকালের বেশ্যাদের পরিচয়ে জানা যায় বেশ্যারা সুন্দরী ও ও সর্ব্বকলা দক্ষা ছিল। কতকগুলি কলাকে ইহারা বাঁচাইয়া রাখিত—ও আমন্ত্রিত অর্থশালীদের ইহারা নানা রকমের কলা সৌন্দর্য্যে আনন্দ দিতে পারিত। তাই ইহারা সমাজের নিকট, দেশের নিকট একটা সম্মানও পাইত। আজ এ দেশীয় বেশ্যাদের মধ্যে সে কলা-সৌন্দর্য্যের বিকাশের পরিচয় কচিৎ মেলে—ইহা একটা ঘৃণিত কামের ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ কাম কলার সৌন্দর্য্য নাই, ফুটিয়া উঠিয়াছে একটা জঘন্য বীভৎসতা। পেটের দায়ে বাধ্য হইয়া অনেক মেয়ে লোক শরীর বিক্রয় করিয়া অন্ন সংস্থান করিতেছে। ইহাদের চলিবার অন্য কোন ব্যবস্থা বা উপায় সমাজ করিতে পারে নাই। নারীর অনিচ্ছায়—তাহার উপর অত্যাচার হইলেই সমাজ তাহাকে সমাজচ্যুতা করে—সে দাঁড়াইবে কোথায়? নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এখনো চার বৎসরে বিয়ে হইয়া পাঁচ ছ' বৎসরে বিধবা হয়। তারপরে অনেক স্থলে ঘরে ঘরে ইহাদের যে বেশ্যাবৃত্তি চলে তাহা রোধের উপায় কি? এ সব ব্যাপারে সন্তান সম্ভাবনা হইলে লোকলজ্জায় ভ্রূণহত্যা হয়। তারপর বেশ্যাদের মধ্যে অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিতা মেয়েরা আসে—তাহাদের কেহ যৌবন-প্রবৃত্তি দমন করিতে না পারিয়া স্কুলের বাহির হইয়াছে, কেহ খাইবার পরিবার কষ্টে সংসারের জ্বালা সহিতে না পারিয়া আসিয়াছে। বেশ্যাদের মধ্যে অনেকেই বড় সুখে থাকে না। স্কুলের জন্য ইহাদের মনে কোন সময় অনুতাপ আসিলেও ইহাদের স্কুল সোধরাইবার কোন উপায় নাই। দশ বছরের একটি মেয়ে লাঞ্ছিত হইয়া এক বৎসর যদি বেশ্যালয়ে থাকে তবে তাহাকে সমাজ আবার গ্রহণ করে কি? দোষী, নির্দ্দোষী কিম্বা কাহারও চিত্তবৃত্তি বিচার করিয়া উদ্ধারের ব্যবস্থা ইহাদের হইতে পারে না! সমাজের পুরুষেরা দুর্বৃত্তদের অত্যাচার হইতে নারীকে রক্ষা করিতে পারিবে না—অথচ নিগৃহীতা নারীকে সংসার বঞ্চিতা করিতে তাহারাই কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইবে। বেশ্যাগৃহে অনবরত গমন ও বেশ্যালয়ে পড়িয়া থাকিলেও পুরুষ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ভাবে চলে—আর নারী—একবার পদস্খলনেই তার চির পতন—অথচ বেশ্যাবৃত্তির প্রশ্রয় কেহই দিবে না—কিন্তু কি কারণে দেশে এমন কদাকার, অশিক্ষিতা কলাবিদ্যাহীনা বেশ্যার প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাও যে দেখা আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে

সেতার শিক্ষা

৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ১৷৷০

সেতারের অতিরিক্ত গত ,, ৷৷০

প্রকাশক :—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

৪।১এ সেন লেন, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা

এবং গুরুদাস লাইব্রেরী ও

ডোয়ারকিন কোংর নিকট প্রাপ্তব্য।

স্বরাজ-সোপান

আসল কথা

(শ্রীঅনাথকান্তি বসু)

* * আসল কথা হচ্ছে আমাদের দেশে বর্ত্তমান আন্দোলনের দ্বারা পরিবর্ত্তিত দেখতে চাই। দেশে স্বাধীন চিন্তার স্রোত বইছে। কাজেই কোন ব্যক্তি বিশেষের—তিনি যতই মহান হোন না কেন, মন গড়া পরিবর্ত্তিত কার্য্য প্রণালী অধিকাংশ চিত্তে সহজে কোন মিলে প্রস্তুত হয়। পুরুষ মন কিন্তু তাই মেনে নিতে প্রস্তুত। তাই এখানেই হচ্ছে পুরাণ দল ও তাঁদের বিপক্ষদল সকলের পার্থক্য। এ পার্থক্য কার্য্যপ্রণালীর তত্টা নয়, যতটা মনের গতির অর্থাৎ mentality'র। পুরাণ মনের কথাই এই উপাধি বর্জ্জন ভুলে অসহযোগ বর্জ্জন, আদালত বর্জ্জন, কাউন্সিল বর্জ্জন কাজে হোক বা হোক আমরা তা দেখতে চাইনে, আমরা ইচ্ছেমাই আঁকড়ে ধরে থাকব এবং তার কোন পরিবর্ত্তন প্রস্তাব আমলে নেবনা। তাতে অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে একবার দেখা যাক্। বক্তৃতার স্রোত বেড়ে যাচ্ছে, ঘুরে যাচ্ছে, ক্রমে আসছে, একেবারে থেমে যাচ্ছে, চলছে। ফুল ফলের আশা, আছিল আমাদের তাই। উপাধি বর্জ্জন আমরাই করেছি এবং সেজন্য কোন উপাধি বর্জ্জন না করেও মন-তো-আপাততঃ বলা যায়। এই যে মানসিক পুরাণ মন সেটা অস্বীকার করতে চাচ্ছে কিন্তু মনে, মনে খাঁচার, বন্ধনের নতুন পথ ধরতে চায় না, তাতে ভয় অজানা গ্রহের জন্য কিছু অন্ধকারকে। এই যে একান্ত পর-নির্ভরতা, যাকে বলা যেতে পারে Slave mentality, এরই জন্য পুরাণ দলের কাছে হেরে গেছেন, হচ্ছেন এবং আরও ভবিষ্যতে সর্ব্বত্রই তাঁদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। অবশ্যম্ভাবী পুরাতনের পন্থী ছেড়ে নতুন পথ ধরবার সাহস দেখাতে পেরেছেন এই জন্যই লোক তাঁদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। তাঁদের মত ভ্রান্ত হতে পারে এবং আমি জানি যে সেদিন তাঁদের বিপক্ষে যাঁরা ভোট দিয়েছিলেন তাঁরা অনেকে তাঁদের মত ভ্রান্ত মনে করেন। তথাপি তাঁদের ব্যবসায়ে ও সাহস শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছে। যাঁরা সেদিন বাংলার প্রাদেশিক কমিটিতে দলাদলি করে পুরাণ দলকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পুরাতনের পন্থী থেকে কংগ্রেসকে উদ্ধার করা। তাঁরা জানেন একবার বাস্তব জীবনে স্রোত বহাতে পারলে আবর্জ্জনা তার গতি পরিবর্ত্তন করে দেবে।

পুরাণ দল যদি গঠনমূলক কার্য্যের সফলতা দেখাতে পারতেন, তাহলেও বোধ হয় তাঁদের পরাজয় হত না। কিন্তু তাঁরা তা দেখাতে ত পারেন নি; অধিকন্তু সমস্ত আন্দোলনটাকে ভুলে আধ্যাত্মিকতায় ভুল ব্যাখ্যা করে সকলকেই ভয় দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়। তাঁদের বড় বড় নেতারা কেউ কেউ ঘোষণা করেছেন যে বুরোক্রেসির সঙ্গে তাঁদের কোন বিবাদ (quarrel) নেই। আসহযোগ মানে তাঁরা বুঝেছেন যে, বুরোক্রেসির সঙ্গে কোন রকম লড়াই করা হবে না কারণ লড়াই করতে হলে তাদের ছুঁতে হবে এবং ছুঁলেই সহযোগ হয়ে যাবে অর্থাৎ আদালতের সাহিত্যপাত হবে। এই রকম তাঁরা যথাসাধ্য-প্রবর্ত্তিত অসহযোগের যেটুকু motive-power এতদিনে জোর দিয়েছিল। মহাত্মা ও বুরোক্রেসির সঙ্গে লড়াই করতে কাউন্সিলে ঢুকবার প্রস্তাব কাউন্সিলের ভিতরে এক লাইনে এই ঘোষণা করেই দেশের fighting spiritকে একদম নষ্ট করে দেছেন। তাঁরা এই লড়াইয়ের নাম শুনেই পলায়ন মনের পতাকা তুলে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা খুব সম্ভবতঃ এই আশা করেছেন যে, কাউন্সিল লড়াই যখন বন্ধ প্রতিজ্ঞায় হয়ে যাবে তখন আর এক রকমের লড়াই লাগিয়ে দিলে হবে। সে লড়াইটা কি রকমের হবে তা তাঁরা এঁদের এখনও স্পষ্ট ধারণা নেই, কিন্তু কালক্রমে সেটা নির্দ্দিষ্ট হবে। আসল কথা বুরোক্রেসির সঙ্গে এই লড়াইয়ের spirit বজায় রাখতে হবে। পুরাণ মনের সেই spiritএর একান্ত অভাব হয়েছে এ কথাটা বড়ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাই তাঁদের হাত থেকে সরে যাচ্ছে।

পুরাণ মনের কেউ যে এসব বুঝতে পারছেন না তা নয়, বাঙ্গপুরের সভাগ্রহ আন্দোলন তাঁদের হারান ইজ্জত (Lost credit) পুনরুদ্ধারের চেষ্টা। এতে কিছু ফল ফলবে সন্দেহ নেই কিন্তু এটা belated ব'লে ভারতবাসী তেমন উৎসাহ আনতে পারছে না। এর আগে মুক্তপ্রবেশে ও অন্যান্য স্থানে বুরোক্রেসি অস্ত্রবলে সভাসমিতি বন্ধ করে দিয়েছে। সেই সব অন্যায় আদেশ অমান্য করবার জন্য পুরাণ মনের নেতাদের অনুমতি চাওয়া হয়েছে কিন্তু তাঁরা তা যেন দি, বলেছেন civil disobedienceএর জন্য দেশ এখনও তৈরী হয় নি। বাঙ্গপুরের লোকেরা হঠাৎ কি করে প্রস্তুত হয়ে উঠল, তা বোঝা মুস্কিল। যাই হোক বুরোক্রেসি করে একটা অযোগ আমাদের দেবে লড়াই করতে আর তার অপেক্ষায় আমরা বসে থাকব এ নীতিতে উৎসাহ আসে না, শক্তির বৃদ্ধি হয় না। বাঙ্গপুরের দেখাদেখি বাংলার কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির আদেশে জাতীয় বিদ্যালয় ও অন্যান্য আপিস সমূহে জাতীয় পতাকা উড়ান হয়েছে। কিন্তু এখনকার পর্য্যন্ত তেমন ফল ফলে নাই। কাজেই লড়াই ক'রবার সুবিধে হয় নি।

আবিশ্যি এ কথা ঠিক যে গঠনমূলক কাজ করতে দেশে বুরোক্রেসি বাধা দেবে এবং তাতে সংঘর্ষ উপস্থিত হবে। স্বাধিনী আদালত করতে গিয়ে, ধরে। তোমার ওকালতী ব্যবসাটাকে দেশের সিকেট করতে গিয়ে এ সংঘর্ষ হয়েছে এবং আমরা সকলে সংঘর্ষ হবে। এসব আমায় চলতেও হবে কিন্তু আমাদের দেশ যাঁরা এই গঠন মূলক কাজের প্রস্তাব পাশ করে দিয়েছেন, তাঁরা এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে। এ সকল বাধাদেরও যদি তাঁরা কার্য্যকুশলতা দেখাতে পারতেন তাহলেও বোধ হয় তাঁদের পরাজয় হত না। তার পরে যা দেখাতে পারলে শুধু ফলের জোরে অসহযোগ মেরুদণ্ড রাখা যায়? দেশের লোকে বুঝেছে যে, যারা বিদেশের দুইটা প্রোগ্রাম আজ পরিবর্ত্তন করতে চাইছেন বা করবার চেষ্টা করে যা তাদের পক্ষ দলের প্রোগ্রামে যাবা দেবার কোন অধিকার নেই। যেন চার আনা এবং কাজের সাফল্য দেখেই তারা দল বিশেষের প্রাধান্য স্বীকার করবে। মহাত্মাজী অনেক বিষয়ে অকৃতকার্য্য হয়েছেন বটে কিন্তু একটা বড় কাজ তিনি করে গেছেন। সেটা হচ্ছে সমস্ত দেশে এক অভূতপূর্ব্ব আত্মবলের সাড়া। কিন্তু তাঁর মতাবলম্বীরা আজ এগিয়ে যেতে পারেন কি পিছিয়ে পড়েছেন। আজ দেখাতে না পারলে শুধু মহাত্মাজীর পক্ষ করে আছি বলে চলবার কতক্ষণ কি হবে। স্বরাজ্য দল যদি আজ দেখাতে পারেন, কাউন্সিলের আইনেই দেশের শুভ ভিত্তিরই হোক, দেশের লোক তাঁদের পক্ষ নেবে। যদি না পারেন আমরা নেতৃত্ব হারাবেন। তখন যদি দেশে নতুন দলের উদ্ভব হয় এবং তার নেতারা আমল শ্রেণির, কর্ম্মী ও বুদ্ধিমান হন, দেশের লোক তাঁদেরও একটা chance দেবে।

পিছনে

কাসিমুদ্দীনের মার্কা ও নব পিকুইক্

[শ্রীমনাচরণ ভৌমিক]

১

আদি পর্ব্ব

পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল, তখন আলেক্‌জান্দার কানিংহামের আমলে কাসিমুদ্দীন নামে একজন লোককে কলিক তা যাদুঘরে কেরাণী রাখা হয়। তাহার কাজ ছিল যাদুঘরে রাখিবার কোন জিনিষ আনা হইলে প্রথমেই সেই দ্রব্যটির তালিকা-অনুযায়ী নম্বর তাহার উপর সাদা রঙে-র দিয়া লেখা; এবং সেইজন্যই সে তাহার পিঠে দ্রব্যটির প্রাপ্তির তারিখ আঁক কুইয়া রাখিত। ১৮৭৪ সালের ১৯এ জানুয়ারী একটি অতি প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষের পাথরের কুঠার-ফলক যাদুঘরে আনীত হওয়ায় সে তাহার পিঠে ইংরেজীতে 19—গী 74 আঁক কুইয়া লেখে। কিন্তু তাহার ইংরেজী বিদ্যা অত্যন্ত কম ছিল। প্রথমতঃ আজ যে সে শুধু জিনিষ ইংরেজী কথা বলিতে পারিত,- ইংরেজ সাহেব সাহেব ও মেমসাহেব মেম সাহেব; এবং একদিন কার্য্যোপলক্ষে সে ব্যস্তসমস্ত ভাবে, "আজ কেন এত লোক জমিয়ে আসিয়াছ?" এই কথা জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর পেল, "আজি ছুটি সাহেব।" কাজেই লোকটি মাসের সংখ্যার স্থলে দুইটি ছোট ছোট ড্যাস দেয় নাই। কিন্তু ঐ পাথরের ছবি দেখিলেই বালকেও বুঝিতে পারিবে যে লেখা সাইনটা ইংরেজী তারিখ ১৯—১—৭৪, এবং তাহার নীচে ঐ দ্রব্যটির তালিকা-নম্বর ৮৯৯ সাল হইতে অঙ্কিত আছে।

উদ্যোগ পর্ব্ব

পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া পাথরটা মিউজিয়মে পড়িয়া ছিল। তাহার উপর পড়া পড়া ইংরেজী ও ভারতীয় পণ্ডিত তাহা দেখিয়াছিল কিন্তু কাসিমুদ্দীনের এই লেখাটির কেহই আদর করিলেন না। কেনই বা করিবেন? তাঁহারা ত সাধারণ মনুষ্য; কলিকাতা যাদুঘরের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের রিসার্চ স্কলার নন, তাঁহারা জীবন সন্ধ্যাকালীন নিজস্বতা, প্রবন্ধে কখনও প্রকৃতি করিয়া নিজ নিজ বক্তিত্ব জীবন এবং পাঠকে আকৃষ্ট করেন না; তাঁহারা কেহই কলিকাতার নব রিসার্চ-পি-এইচ্‌ডি হইবার উপযুক্ত নহেন। এমন সময় পুনা হইতে প্রেরিত প্রাক্তন ডক্টরেটের নামক একজন সংস্কৃতের এম্-এতে ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের কর্ত্তা এবং আয়রাইবেলে প্রবেশের করিয়া আসা হইল। লোকটির পাণ্ডিত্য এবং অন্যান্য গুণাবলির তালিকা এত বেশী যে বর্ণিত ঐ সময়ে বেতন এমন ৭৫৲ মাত্র যোগানা করা হয়, কিন্তু তাহাতে এখন উপরোক্ত অধিক ১,৪০০ বেতন এবং ৮০৲ ডিয়ারনেস্ এলাউন্স বাড়ী ভাড়া মাসে মাসে একশত টাকার বেতন হইতেছে, অর্থাৎ মিট ১৭০০৲ মাসিক পারিশ্রমিক। তা ছাড়া পেন্সন, পুস্তকপ্রকাশন প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে।

ডক্টরেটের আশায় ঐ বিভাগে একজন রিসার্চ শিক্ষক আসেন, নাম শ্রীপঞ্চানন মিত্র। তিনি প্রথম বিভাগে এম্-এ পাস, হাল আমলের ছেলেটার ডাকাবুকো, এবং ইউনিভার্সিটি-মেডেলার। ১৯১৮ সালে এই দুই মহাপণ্ডিত মিউজিয়মে ঢুকিয়া রিসার্চ আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমাদের মত সাধারণ লোক অতি অপণ্ডিত; আমরা পঞ্চাশকে পঞ্চাশ বলি, ডক্টরেটকে ডক্টর বলি। কিন্তু পঞ্চাশকে কাল প্রথম এবং ডক্টরেট কি বলিয়া না বেচিলে বৌদ্ধিক অবনতি ঘোষণা করিতে হইবে? এ ও সাধারণ লোকের মতই কাজ করা হইল। এই দুই রিসার্চ-মহা-পণ্ডিত অমনি পাথরখানি উল্টা করিয়া ধরিয়া কাসিমুদ্দীনের লেখা তারিখটির উপর অবজ্ঞা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাহার বর্ণনা অধ্যাপকদের ভাষায়-তাহা করা যাউক—

"অধ্যাপক পঞ্চানন মিত্র একদিন হঠাৎ এই প্রাচীন পাথরগুলির উপর আসিয়া পড়িলেন, এবং সভাই অনুধাবন করিলেন, যে, ইহার উপর কোন অক্ষর আঁকা আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আমার অফিস্-ঘরে গিয়া সেগুলি আমার সাম্নে পরীক্ষার জন্য রাখিয়া দিলেন।"

পাঠক দেখিবেন, যে, এখানে কলিকাতার পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের একটির রিসার্চ-প্রণালী অতি সুন্দর সূচিত হইয়াছে—"হঠাৎ" এবং "ছুটিয়া গিয়া" সমস্ত কাজ করা, সভ্য-পণ্ডিতদের কার্যকলাপে এইরূপ চট-পটে,—যা আমি পাস্ রিসার্চ টা উড়িয়া যায়।

যাহা হউক, তখন বঙ্গবাসীদের টাকায় ১৭০০৲ বেতন-ভোগী, কলিকাতার ইতিহাসের এম্-এ ও Ph D'দের মর্ত্তা হন্তাকর্ত্তা ডক্টরদের মহা রিসার্চ দ্বারা বাহির করিলেন যে এই কাসিমুদ্দীনের লেখার উল্টা পৃষ্ঠটা আর কিছুই নয়, "মানব দেবের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অক্ষরগুলির নমুনা সম্পূর্ণ এক এক [তাহার চেয়ে পুরাতন মানবের প্রাচীনতম কীর্ত্তি] খ্রীষ্ট জন্মের নিদানেরের এক বছরের।"

চক্কা-নিনাদ পর্ব্ব

জৈষ্ঠমাস চোখে চেয়ে। তখন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন ডক্টরেটের যৌবন বাঁধি (এবং তৎসঙ্গে নিজের স্বাভাবিক পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের প্রবেশ) আরম্ভ করিয়া দিলেন,—শুধু ডক্টরেটের প্রলোভ, তাহা সেই অতীত পঞ্চানন যোগের ইতিহাসে অপূর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে। সে ত আর ছজুরের সাদ্‌সোয়ার ছোট প্রধান, রৌপ্য-ফলকে যে-তাম্র মুদ্রা-কাহিনী (!!!) সম্বন্ধীয় মর্ত্তা অন্যের কাহিনী, প্রকৃতি দিতে পারে না।

এই মহা আবিষ্কারটি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-"তাহার ছাত্রের সিল্‌ভার জোন্স মেমোরিয়াল্ অনুবক্তৃতির তৃতীয়টিতে ছবি সহ প্রকাশিত করা হইয়াছে; তাহার সমস্ত বাহ্য বঙ্গের প্রাক্তনের পিত্ত ও চাঁদ পীড়িত প্রকাশ দিয়াছে (আশু-বাবুর নয়ে, ডক্টরেটের নয়)। আমরা ঐ পুস্তক হইতে ছবিখানা হাপিলাম। পাঠক নিজেই দেখিবেন। আশুবাবু যেমন সর্ব্ববিদ্যার পণ্ডিত এবং তাঁহার ভাষাজ্ঞান ও অনুবৃত্তিক নিপুণ ও ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে যেরূপ চরিত্রের বল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে ডক্টরেটের এই তত্ত্ব-রিসার্চ যে তাঁহার পর্যালোচনা উপযুক্ত পরিচিহ্ন (memorial) হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

চক্কা-ভঙ্গ পর্ব্ব

কিন্তু যিনি বাদ হইলেন। এখন শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মিউজিয়মের একজন প্রধান কর্ম্মচারী। তিনি যদিও আশুবাবুর অনুরক্ত ছোকরা, তথাপি তিনি পাথরটা সোজা করিয়া ধরিয়া বহু এই সুন্দর অক্ষর এতিহাসিক সোসাইটীর এক অধিবেশনে ডক্টরেটের আবিষ্কার আবার করিয়া বিয়াছেন। তবুতে পরে বিষ্ণু করা উচিত। কিন্তু হইবার কি না, পরে দেখা যাইবে।

সুলতানের সুলতানাগণ।

(প্রধানা) সালিমা।

বেহি। নবমে। মেহিদা।

হতভাগ্য সুলতান! এমন সুন্দরী পত্নীদের ফেলিয়া পালাইতে হইল যা! কি দুর্ভাগ্য! এককালের ভাগ্যবান সুলতানের পাঁচটি প্রধানা মহিষীর চিত্র উপরে দেওয়া গেল, ইঁহাদের আবার সতীন যে কতগুলি আছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইঁহারা সকলেই নূতন গবর্ণমেণ্ট হইতে "ভরণ-পোষণ" পাইতেছেন। সকলেই শিক্ষিতা, সঙ্গীত নিপুণা।

মিস্ কিলিস মহম্মান লাস্যময় নৃত্যলীলায় অধুনা যথেষ্ট নাম করিয়াছেন। নৃত্যের রমণীয়তার সহিত ইঁহার বেশের বিন্যাস তাঁহাকে সর্ব্ব-সাধারণের মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে। এই দুইটি নৃত্যে তাঁহার পোষাক দুইটি লক্ষ্য করিয়া দেখিবার বস্তু।

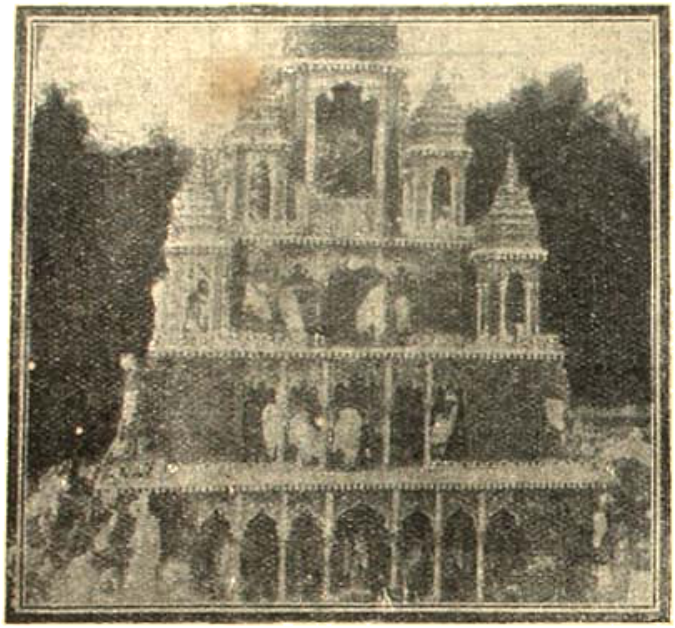

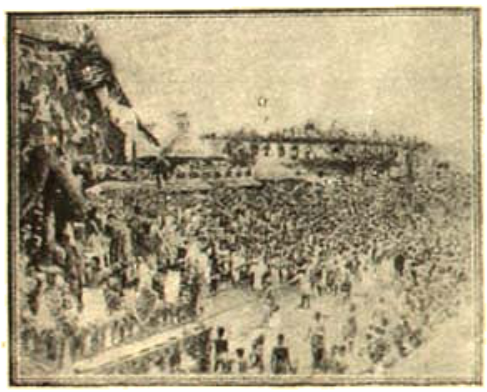

সুভদ্রার রথ। (পুরী)
সহস্র সহস্র নর-নারীর দ্বারা চালিত হইতেছে।

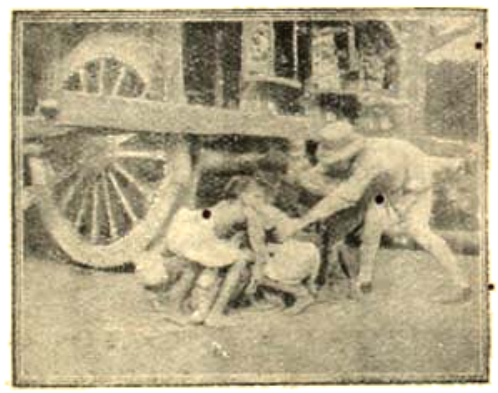

মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছে।
কাপ্তেন গুপ্ত, অনেকগুলিকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

পবিত্র রজ্জু।
যড়ি মাথায় ঠেকাইয়া পুণ্যার্জ্জন করিতেছে।

নাভা।

পাতিয়ালা।

এই দুই মহারাজার মধ্যে মন কসাকসি চলিতেছিল, ইহা লইয়া গণ্ডগোল অনেকদূর গড়াইয়াছে। সম্প্রতি নাভার মহারাজা তাঁহার সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। ভারত-সরকার বিধান দিয়াছেন, মহারাজা নাভা বৃত্তি পাইবেন, খেতাবও তাঁহার থাকিবে, কেবল মহারাজা স্বেচ্ছায় কিছু করিতে পারিবেন না, এমন কি, নড়ন-চড়নও না।

কলিকাতার গঙ্গায় প্রভাতের স্নান-দৃশ্য।

বাইয়োগ্রাফ-জগতের প্রেষ্ঠা-সুন্দরী মেরী পিক্‌ফোর্ড।

পাগল

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

১

আজ সকাল বেলা মিনি বিছানা ছাড়তে না ছাড়তে—আমার ঘরে চারটি পায়ের আওয়াজ পেলাম। সে তিন অভিযাত্রীর একজন হচ্ছে—আমি স্বয়ং পুলকের ছেলে। ছোটদের পায়ের একটা চলন ভঙ্গি আছে বলে তাদের আওয়াজ নিজেরা, অবশ্যই খুঁটি আর আমাকে ছাড়া কারও কাছে ধরা পড়ে না—তখন নিস্তারের আসার আওয়াজে তার সঙ্গে আসার কথা অনুমান করেছিলাম।

ওদের আসবার জন্যে ঘরের দ্বার খুলে দিলাম—একটার পরই আমার ছোটবন্ধু তার মিতার কাছ ছাড়া হয়ে যায়। সকালের নরীন আলো যে আনন্দের আবহাওয়ার—এক মধুর মোহময়তা সৃষ্টি করেছিল, তাতে ওরা দুঁজনায় নিশ্চিহ্নে—আমাদের যে ইতিহাসটার একটু ছায়া পড়ে নি। কিন্তু আমার একটা ভয় আছে—তখন আমি ওদেরকে সেটার সম্বন্ধে সাবধান করে দিলাম। তখনকার মি মিতার চোখ ওদের ভয় দূর করে আমাকে নিয়ে তামাসায় ভ'রে গেছল। আমার প্রতিবাদ শুনে, ওরা বেশ—প্রথমে ঠিক বুঝে পারি নি, তাতে হাসিয়ে আমার এমন হচ্ছিল, যিনি ওদেরকে আমার কাছে ধরে রাখতে পারলাম।

প্রথমে যেন সব বেশ হচ্ছে—ঠাকুর থেকে আমি বিশ্বাসঘাতক হবার পূর্ণ অধিকার করেছি, আমার একজন পূজারি ছিল—যে এই ভণ্ড-কারণে আমাদের ছাড়া একলাটি ছিটে বিদেয়—কি পুরস্কার সে আমার দিতে পারে। আমি কি পুরস্কার তার এতদিনে পুরস্কার এক সে পুরস্কার সে আমার জন্যে এই তার জন্য উপযুক্ত হবে।

ছোটবন্ধু মিতিনিদের সঙ্গে সঙ্গে—আমার সঙ্গে ওদের দিয়ে ঠিক আজ ছোটবন্ধু আসবে বিদেয়ের। আজ ওদের আসবার, অভিযাত্রী বিদায়ে ছাড়া যেমনি আমাদের দিয়ে ঠিক। আমার ঘিরে এসে আমার বিদায়ের ওদের —কি পুরস্কার চাই। আমি ভেবে বলবার "সময়"। এই প্রার্থনাটা আজ আমার খুব আশ্চর্যের বোধ হয় নি —ওদের যে ও আমাদের আনন্দময়ের আবহাওয়ার ছোটবন্ধু ছিল, ঠিক ঠিক ওদের সঙ্গ থেকে ওদের আমাদের হয়ে যাবার —ওদের বাড়ীর পুরস্কার ছেলে ব'লে আমার ওর তার বিশ্বাস হবে না, এ সময়ে সে বিশ্বাস ছিল। চুপি চুপি আমার আনন্দময়ের আমাদের ছেড়ে বিয়ে আমার চুপে আমার মুখখানি তাদের দিয়ে ওদের আমাদের ছোটবন্ধু চুমো পাবার ছেলে—আমরা, আনন্দময়ি বিদায়ি. এ ওদের আর এর বেশী ছোটবন্ধু না।

২

বিদায় হয়ে গেল—আমার আর মেয়েদের হ'য়ে গেল। ওরা একসঙ্গে ছেড়ে গেল—সে আমি আমাদের ছোটবন্ধু ছোটবন্ধু গেল। আমি একটা আমার মনে মনে মুখতে পারলাম ওদের—আমাদের একমুঠো ছোটবন্ধু ওদের মনের ছোটবন্ধু একটা আমার ছোটবন্ধু ওঁকে নিলাম। আমিও ছুটে ছুটে গ্রহণ পারি দেখার বা—ছোটবন্ধু একটা ছোটবন্ধু ছোটবন্ধু ছোটবন্ধু ছোটবন্ধু হ'য়ে আমার। এই ছোটবন্ধু নিয়ে গেল নিমিনি গেল ছোটবন্ধু—কিন্তু একটি ছিটে আমার না।

আমি ঠাকুর আমার সঙ্গে পাখাপাখি মনে ওরে রইলাম,—ছোট আমাদের আমাদের মনে ছোটবন্ধু। পুজোর আগে একদিন আমার আমার আমার আমাদের ছোটবন্ধু ছোটবন্ধু—আমি এক আমুর্ণ আমার নিয়ে এক একটা ছোট নিয়ে-আমাদের ওরে আমার নিয়ে ছুটে আসিয়ে আমার। আমার ছোট ছিঁড়ে ওরে এল—

—বুকের ভিতর যেন ঢেঁকি পাড় দিতে লাগলো, [illegible] ভাউন দেওয়া আর হ'ল না—হঠাৎ গাড়ী থেমে গেল, যাত্রীদের মধ্যে মহা হৈ চৈ প'ড়ে গেল। ব্যাপার লাইন ভেঙ্গে গেছে মনে ক'রে সকলে নেমে পড়লো। সেই মেয়েটিও ছেলে কোলে নেমেছে—সঙ্গে একজন পুরুষ মানুষ আছে—বোধ হয় ওর স্বামী দেবতা হবেন, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, আমি ওদের ঘরে নিয়ে বসালাম, ছেলেটিকে কোলে নিলাম—এদিকে গাড়ী ছাড়ার জন্য গার্ড সাহেব আমায় তাগাদা দিতে লাগলে—সেযে bloody swine প্রভৃতি বলায় আমি চটে গিয়ে তাকে মারলাম লাথি। সে লাথি খেয়ে গাড়ী ছেড়ে দিল।

৪

রাত্রের অন্ধকারে ভীষণ বর্ষায় সেদিন লাইন ভেঙে গিয়েছিল। দার্জিলিং মেল হঠাৎ নদীর মধ্যে পড়ে গেল। অনেক প্রাণহানি হয়েছিল। আমার চাকরীটা কিন্তু সেই দিনই খতম হয়েছিল। পাগলের মত হ'য়ে ঘুরে বেড়াতাম। অবশেষে তীর্থস্থানে আবার মঙ্গলার সঙ্গে দেখা হয়। মেল দুর্ঘটনায় মঙ্গলার স্বামী ও পুত্র মারা যায়—তার নিজের প্রাণ কোনও রকমে রক্ষা পায় কিন্তু চোখ দুটি যায়। এক সাহেব তাকে বাঁচিয়ে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়ীর লোকে জানে মঙ্গলাও মারা গিয়েছে।

৫

রূপ যৌবন শেষ হয়েছে—মঙ্গলা এখন পথের ভিখারিণী আমিই এখন তার চিরসঙ্গী। আমি ভিক্ষা ক'রে আনি, মঙ্গলা খায়। একটা তব্‌লা আর একটা একতারা বাজিয়ে লোকের বাড়ী গান করি—

"তারে দেখলে পরে আপন-হারা হই—"

এই লাইনটি গেয়েই আমার চোখে জল আসে। লোকে পাগল বলে, বলে একটা কানা মাগিকে দেখে বেটা আপন-হারা হ'ল। যাই হোক বাড়ীর ছেলে পিলে আমায় ভালবাসতো—তারা পয়সাটা-চালটা দিতো, তাতেই আমাদের দুজনের চ'লে যেতো। কারো কাছে একখানা কাপড় নিতাম—কিন্তু পরের দিন যে ছেঁড়া-কাপড়ে আমি ছিলাম আমাকে তাতেই দেখে লোকে গালাগালি করতো—বলতো—"বেটা যা পাবে, তাই মাগিকে দেবে।" আমি আর কি উত্তর দিব—শুধু প্রাণের আবেগে গাইতাম—

"তারে দেখলে পরে আপন-হারা হই।"

আমার এ পাগলামির অর্থ দুনিয়ার কেউ বুঝতো না। কেন যে নেশা ক'রে বুকের জ্বালা জুড়োতাম, কেন যে পাগলের মত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে মেগে বেড়াতাম—সে জানতো শুধু একজনা। মঙ্গলা জানতো। আর জানতেন মা সর্বমঙ্গলা—তিনি চোখের দৃষ্টি হরণ ক'রে নিলেন, মঙ্গলাকে অন্তর্দৃষ্টি দেওয়ার জন্য, আমার সর্বস্ব হরণ ক'রে নিলেন মঙ্গলাকে আমায় ফিরে দেওয়ার জন্য। তাই আজ পাগল হ'য়েও আমি এত ধনী—তাই শুধু আপন মনে গাই—লোকে বলে পাগল—কিন্তু আমি প্রাণ ভ'রে গাই—

"আঁখি মুদিয়া যে সাধ মিটেছে
রূপে মিটেছিল কই!"

ভিখারী

(ভাগলপুরের ছড়া)

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

ভিখারীরে তুমি পাড়' শত গালি
পাবিরে তাহার মালা,
যে মানুষ জেনো ক্ষুধায় আতুর
কানটিও তা'র কালা।

রাস্তা

(Holy Bible)

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

পাপের রাস্তা সবার চেয়ে বড়।
পুণ্যপথে সবার সদা কোরো;—
হউক পথের স্বল্পপরিসর,
অল্প লোকেই যায় সে পথের 'পর।

তোড়া

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

সংবাদ পত্রের কাহিনী

এককালে জগতে কোন সংবাদপত্র ছিল না। তখন মুখে মুখেই সংবাদ প্রচারিত হইত। খৃঃ পূঃ ৬৯১ সনে রোমে "Acta Diurna" (দৈনিক ঘটনা) নামে চিঠির আকারে প্রথম সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। এই প্রকার চিঠির আকারে শেষ সংবাদপত্র প্রচারিত হয় আমেরিকায় ১৭০৪ সনে। উহার নাম ছিল "Boston News Letter."

১৪৬৭ সনে ভেনেসিয়া হইতে "Gazette" নামে প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। দুটি দ্রুত ঘোড়ার সন্ধান দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া উহাতে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, উহাই জগতের প্রথম মুদ্রিত বিজ্ঞাপন।

কয়েকটি খ্যাত স্থান

সায়েতে বিখ্যাত "রবিন্সন ক্রুসো" বইখানি রচিত হইয়াছিল। বারকোর্ড ব্রিজ হোটেলের বাগানে বসিয়া কবি কিট্স তাঁহার "ইন্‌ডিমিয়ন" রচনা করেন। উহারই নিকটে জর্জ মেরিডিথ তাঁহার "ভায়েনা অফ দি ক্রস্‌ওয়েস" —এর প্রথম পত্তন করেন। মার্লোর নিভৃত কাননে বসিয়া শেলী তাঁহার—"দি রিভল্ট অফ ইসলাম" রচনা করেন এবং তাঁহার "দি চেন্সী" ইটালীর লিভোরণোতে 'ভিলা মেসোজানো'র ছায়ে বসিয়া রচিত হয়। এলফ্রেড টেনিসন্ আয়েল অফ ওয়েটে তাঁহার নিজ বাড়ীর মনোরম বাগানে বসিয়া বিশ্ববিশ্রুত "এনক আর্ডেন" রচনা করেন। আউচি নামক স্থানে বায়রণ তাঁহার "দি প্রিসনার অফ চিলন" লেখা শেষ করেন। কোরেন্টক পর্ব্বতের নিকটে কোন এক নিভৃত নিবাসে ওয়ার্ডস্‌ওয়ারথ তাঁহার "উই আর সেভেন" রচনা করেন। এক মধ্যসাগরে সমুদ্রপীড়ায় কাতর অবস্থায় রবার্ট ব্রাউনিং তাঁহার "ও, টু বি ইন্ ইংলণ্ড" রচনা করিয়াছেন।

শনিবারের ছুটি

শনিবারে যে আফিস প্রভৃতি সকালে ছুটি হইয়া যায় এই নিয়ম আজকের নয়। এডলো সেক্সনদের সময়ে দশম শতাব্দীতে তখনকার সম্রাট এডগার আদেশ করেন যে, সকল কাজকর্ম শনিবার দুপুরে বন্ধ হইয়া সোমবারের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। একাদশ শতাব্দীতে সম্রাট কেনিউটও এই মর্ম্মে এক আদেশ প্রচার করেন। ১২০৩ সনে স্কটল্যাণ্ডেও এই প্রকার আইন প্রচারিত হয়। সেকালে সপ্তাহের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি শনিবারদিন বাজার হইতে ক্রয় করিতে হইত বলিয়াই সকলের সুবিধার্থ এই ছুটির আদেশ প্রচার হয়।

মুচরা খবর

ইঁদুর দেখিলেই হাতী ভয় পাইবে।

• • • •

গড়ে ২০৩ জন লোকের মধ্যে মাত্র একজন ছয় ফুট উঁচু।

• • • •

পৃথিবীর খনিগুলিতে প্রায় ৩,৩০০,০০০ লোক কাজ করে।

• • • •

ইহুদীরাই সর্ব্বপ্রথমে বিবাহের অঙ্গুরী (Wedding ring) প্রচার করে।

• • •

অষ্ট্রিয়ায় প্রথম পোষ্টকার্ড ব্যবহৃত হয়।

• • • •

১১৭৫ সনে ইংলণ্ডে প্রথম ফুটবল খেলা হয়।"

গ্রহের ফাঁদ

(উপন্যাস)

[শ্রীসরসীবালা বসু]

৬

নির্জ্জন গৃহে দ্বিতীয় ব্যক্তির সমাগম মাত্রে তেজেশের একাগ্র চিন্তার বেই ছিঁড়িয়া গেল, তাহার উপর অন্ধকারে সেদিন উজ্জ্বল আলো জ্বলিয়া উঠিয়া প্রথমে যেন তাহারই দিকে কটাক্ষ করিয়া হাসিল, এ হাসি ঠিক পুরবালারই সুবঙ্কিম ঠোঁটের বাঙ্গ হাসির অনুরূপ।

তেজেশ কথা কহিল না, তবে একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল বটে। যতীশ আলো জ্বালিয়া দেশলাইটি পকেটে পুরিল, ঠাকুরের দীর্ঘাকার মূর্ত্তি বারেণ্ডার দেখা যাইতেই বলিয়া উঠিল, "বলি ঠাকুর, উদুন বসিয়েচ? এসে দুটো ভাতও ত পেলাম না, পরের বাড়ী ভিক্ষে মেগে খেয়ে পেট ভরাতে হলো, এমনি তোমার ধরা!" ঠাকুর কাছে আসিয়া কহিল, "আজ্ঞে দাদাবাবু, আমি তো জান্তাম না যে আপনি আসবেন, তা এখুনি ভাত তরকারী করে দিচ্ছি।"

যতীশ কহিল "তাই কর, খান কতক লুচিও ভেজে রেখো, সকাল আটটার গাড়ীতে আমি চলে যাব, তোমার তো তখন ভোর হ'বে, উদুন ধরিয়ে কিছু করে উঠ্‌তে পারবে না।" ঠাকুর চলিয়া গেল, তেজেশ এইবার প্রশ্ন করিল, "সকালেই যাবে কেন, যাবে যদি এক দিনের জন্যে আসারই বা কি দরকার ছিল?"

সুযোগ বুঝিয়া যতীশ কহিল, "হঠাৎ নতুন খবর পেয়ে না এসে পারলাম কই—"

ভ্রূ কুঁচকাইয়া তেজেশ কহিল "কে নতুন খবর দিলে শুনি?" "বউদি'র বাবা। বউদি শুনে পর্য্যন্ত নাকি ভারী কান্নাকাটি করচেন।"

তেজেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া গেল, অগত্যা যতীশ চেয়ার হইতে দাদার "পেনাল কোড" তুলিয়া চোখ বুলাইতে লাগিল, সে ছিল বি, এ ক্লাসের সাহিত্যানুরাগী ছাত্র, সুতরাং আইন শাস্ত্রের রসহীন আইনের ধারা গুলি তার চক্ষে মুষ্টি উদ্যত করিয়া সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল. কিন্তু দুজনের কারও মুখে কথা নাই, ঘরে ছুঁচটি পড়িলে শব্দ শোনা যায় এমনি চুপ চাপ, হঠাৎ এ অবস্থাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া তেজেশ প্রশ্ন করিল—"হরিহর বাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের জন্যে রামগতি ঘটক বলেছিল, না?

যতীশ সুযোগ বুঝিয়া কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ও লোকটার ব্যবসাই হচ্ছে ঐ। আমায় কেন, অনেককেই বলেছিল।"

আবার প্রশ্ন হইল, "অনেককে ঠিক নয়, তবে পাণ্টা ঘর দেখে বলেছে বটে, হরিহরবাবু নিজেও তো তোমায় অনুরোধ করেছিলেন, নয় কি?"

"কন্যাদায় হ'লে সব কন্যের বাপই অমন ব'লে থাকে" বাধা দিয়া তেজেশ কহিল—

"মেয়েও তুমি নিজের চোখে দেখেছিলে?"

যতীশ কহিল "হ্যাঁ।"

প্রশ্ন হইল "তার পর?"

যতীশ কহিল, "তার পর আর কি, কি শুনতে চান আপনি? আমি এখন পড়ছি, শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বৃথা পীড়াপীড়ি করবেন না।

তেজেশ গরিয়া কহিল "শুনতে চাই আমার মাথা আর মুণ্ডু! মেয়ে যে সুন্দরী তা তুমি অস্বীকার করতে পার না, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কন্যাদায় গ্রস্ত হয়ে তোমার হাতে ধরলেন, তুমি অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ সন্তান হয়ে তাঁর মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারলে না; যদি তাকে বিয়ে করতে তা হলে এ বোঝা আর আমার মাথায় চেপে বসত না।"

যতীশ অস্থির হইয়া কহিল "দাদা আপনি ভুলে

যাচ্ছেন যে সে মেয়েটি এখন আমার বউ দি, আপনি তো জানেন আমার বরাবরকার ইচ্ছে যে Self Supporting না হওয়া পর্য্যন্ত বে-থা করব না, সে Idea আমার ছিলই না, লোকের কথায় বা জেদাজিদিতে ও Idea আমার হয়নাও নি ?"

ভদ্রকণ্ঠে তেজেশ বলিয়া উঠিল, "চুলোয় যাক্ তোমার বউ দি, আর চুলোয় যাক্ তোমার Idea, আমিও তো বাপু পড়তে পড়তেই বিয়ে করেছিলাম, তা বলে কি পাশও হইনি, না Self Support করতে শিখি নি ? আসল কথা Merit থাকলে কোনো কিছুতেই আটকায় না। তুমি এখন থেকেই আমার পর ভাবতে শিখেছ দেখছি বিয়ে করে তোমার Wifeএর ভার কি তুমি কিছুদিন আমায় বইতে দিতে পারতে না ? এখন সেই আমারি তো গলায় পড়ল।"

অসহিষ্ণুভাবে দাঁড়াইয়া যতীশ কহিল "দাদা, কি বলছেন আপনি, সে মেয়েটি যে এখন আমার বউ দি, তার সম্বন্ধে এমন ভাবে উল্লেখ করাটা"—তেজেশ সে দিকে কাণ না দিয়া কহিল, "তোমার বউ দি শুনে পর্য্যন্ত শুধু পত্তর যাওয়া বন্ধ করেছেন, এ বিয়ে তুমি করলে আমায় আজ এ দায়ে আর ঠেকতে হোতো না, কি যে আমি করি এখন,—তোমারই দুর্ব্বুদ্ধির জন্যে—বাকি কথাটা উহ্য রাখিয়া তেজেশ চুপ করিয়া গেল। যতীশ বুঝিল ব্যাপার মন্দ নয়, চোটটা এখন পড়িল কি না তাহারই দুর্ব্বুদ্ধির উপর,—মনে মনে ঈষৎ হাসিয়া, উদ্বেগে দাদার দুটি খুরে নমস্কার করিয়া (যতীশ অবশ্য প্রাপ্তি বিশেষের চারিটি খুরের কল্পনা করে নাই) একান্তে কহিল "এ বিয়ে আপনার না করাই উচিৎ ছিল, ওরা হাজার পাকড়াও করুক, আপনি স্বচ্ছন্দে বেজ্ঞ জবাব দিতে পারতেন,—যেমন আমি দিয়েছিলাম"।

এবার তেজেশ বিলক্ষণ তাতিয়া উঠিয়া কহিল, "তাই বেড়ে জবাব দিয়েই তো আমায় একেবারে কৃতার্থ করেছ, তাতেই উহার বোঝা এসে ঘাড়ে পড়ল। কি যে করি এখন ছাই, মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে হয়।"

এ ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র আপত্তি না জানাইয়া নীরবে যতীশ গৃহ ত্যাগ করিল; ভ্রাতা ক্লান্ত তেজেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, অফিসের বড়া চূড়া খুলিয়া টাঙ্গে যাইয়া ঘরের মেজেতে ফেলিয়া দিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

৮

সেদিন কাছারী প্রত্যাগত নীলকান্ত বাবু, ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীকে দেখিতেই হাসিমুখে কহিলেন "আজ কি ভাগ্যিস্! চাঁড়ালের লক্ষ্মী যান ভুলে হঠাৎ আজ শ্রীমন্দিরে—অভাগার সদন মন্দিরে!

ঊর্ম্মিলা হাসিয়া আবৃত্তি করিল,

"রাজন্ তোমারই আমি অন্তরে বাহিরে"

চাঁড়ার ঘরটা বুঝি তোমার এলাকার মধ্যে নয়, না সেটা বুড়ো মা, ঠাকুরমারই একচেটে ?'

নীলকান্ত কহিলেন "তা তো আমি বলচি না, তবে কি না কাছারীতে সারাদিন এজলাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাক্ষীদের জেরা করতে করতে দেহ মন যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, বাড়ী ঢুকে ঘরে ঢুকেই যদি তোমার হাসিমাখা মুখ দেখতে পাই, তা হলে সব কষ্ট ভুলে যাই, তা তোমার এমন ধরা, যে কিছুতেই ও সমঝটি ঘরে এসে থাকবে না, ডোকা মুকীদের দুধ খাওয়া আর রান্নাঘরের কাজ নিয়েই তখন তুমি ব্যস্ত থাকবে।"

ঊর্ম্মিলা হাসিয়া কহিল, "সত্যিই ব্যস্ত থাকি বটে, তার ওপর শুনেছ তো ঠাকুরমার ঠাট্টা, যার সামনেই এমন করে বলেন যে লজ্জা হয়, বুড়ো হয়ে ওর তো লজ্জা শরম জ্ঞান নেই, কার সামনে কি বলে বলেন।"

নীলকান্ত জামা ছাড়া খুলিতে খুলিতে কহিলেন—"মুখপুড়ী কি যেন বলি বলি করচে, কি বলতে চাও বল না শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা করি ?"

স্বামীর পিঠে সোহাগের চাপড় মারিয়া ঊর্ম্মিলা কহিল, "উকীল বটে, সাক্ষীর মুখ দেখেই মনের ভাব টের পাও, হতভাগা কাছারী আজও কেন যে তোমার কদর বুঝলে না তাই ভাবি। সত্যিই একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেচি, তেজেশ বাবুর বিয়ের খবর তা হ'লে মিথ্যে না, কাছারীতে কিছু শুনলে না কি ?"

কাছারীর বৈঠক গৃহে ক্ষুদ্র সহরের যাহা কিছু দৈনন্দিন ঘটনা ও তাহার আলোচনা সমালোচনা—প্রত্যহ যথা নিয়মে অনুষ্ঠিত হইবার কোনো ত্রুটি ছিল না; উকীল, মোক্তার, আমলা, কেরাণী অনেকেই ইহার সভ্যরূপে গণ্য ছিলেন, যথাসময়ে আলোচনা সভার বিবরণ সভ্যদের অন্তঃপুরেও আসিয়া পৌঁছিত, এবং অন্তঃপুরিকাগণ এ সভার খোস খবর শুনিবার জন্য যে বরাবরই আগ্রহান্বিত থাকিতেন, উর্ম্মিলার ঔৎসুক্য দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

নীলকান্ত বাবু কহিলেন, "সবাই বলচে, এটা ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার! ভেজেশ বাবু যেরকম ত্রৈণ,—যে স্ত্রীর মুখ চেয়ে দিন রাত তার আঁচল ধরে ঘরের কোণে চুকে থাকতেন, স্ত্রীর অসুখ হলে কাজ কর্ম্ম কিছুতেই মন দিতে না সেই স্ত্রীর মরা পর্য্যন্তও আর তাঁর সবুর সইল না! তবে ইন্দ্রবাবু কি বলচেন শুনেচ, এখানে 'স্ত্রী' শব্দকে Common noun ধরে নিচ্ছেন, তার অর্থ হচ্ছে, স্ত্রী বিশেষের প্রতি ভেজেশের অনুরাগ হিসাবে সে ত্রৈণ নয়, সুতরাং তোমরা বন্ধুর প্রতি যে ভালবাসার উল্লেখ করে তোমরা গর্ব্ব কর, তা নয় "বাসে বটে স্ত্রীকে ভেজেশ বাবু, তার কোনো দাম নেই, এবারকার স্ত্রীটিকে—এমন কি আর গুটিচারেককেও যদি উনি বিয়ে করে বসেন সব কটিকেই অমন ভালবাসা বাসতে পারতেন।" উর্ম্মিলা কহিল, তা তোমাদের কোনো পর্ব্বারামেরই ও গুণে ঘাট নেই সে জানি, তবে ভাবচি এখন যদি বা যণি সেরে সুরে উঠ্‌ত, সতীনের খবরে সে এমন মন-মরা হয়ে যাবে যে সারবার আর কোনো ভরসা রইল না, সতীনও ঐ খবর দিয়ে গেল, কি নিষ্ঠুর এই পুরুষ জাত গো, তোমাদের কি একটু দয়া মায়া নেই, যণিকে একটুও দিলে না?

ঈষৎ ব্যথিতা সুরে নীলকান্ত কহিলেন—আমায় কেন জিজ্ঞেস করচ? তোমাদের আদর্শ প্রেমিক ভেজেশ বাবুকে গিয়েই জিজ্ঞেস কর গে না!" এ কথা সত্য, যে পুরুষ মহলে ভেজেশের ত্রৈণ আখ্যা থাকিলেও নারী সমাজে সে "স্বামীর আদর্শ" বলিয়া গণ্য হইত, এবং পাড়ায় বিবাহ উপলক্ষে স্ত্রী আচারের অনুষ্ঠান বিশেষে যণিকেই সর্ব্বাগ্রে বরণ করা কাহারও সম্মতির প্রতিকূল ছিল না, সুতরাং স্বামীর উক্তির প্রত্যুত্তরে উর্ম্মিলার মুখে কথা যোগাইল না, নীলকান্ত তখন আপনিই বলিয়া উঠিলেন—আমরা ত অতো ভালবাসতে জানি না, তবে এটা সত্যি, যে বিছানায় পড়ে পরিবার মরবে আর নিজে মাথার টোপর পরে বিয়ে করতে ছুটছি এ ব্যাপারটাও জানি না, ভেজেশ বাবুর আগেরও শিখ্‌লাম না, পেছেরটাও শিখ্‌লাম না, এতে কি বল গো?

যণিমালাকে উর্ম্মিলা সত্যসত্যই বাস্তবিকই খুব বেশী ভাল বাসিত সুতরাং এ ব্যাপার লইয়া রঙ্গ করিতে তার মোটেই উৎসাহ ছিল না, বরং উৎকণ্ঠা ছিল ঢের বেশী। স্বামীর ও কথার উত্তর না দিয়া সে কহিল—মুখ হাত ধুয়ে নাও, খাবার আনি। এই সময় নীলকান্তের বৃদ্ধা ঠাকুরমা ঘরে ঢুকিয়া নাৎবৌকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন "হ্যাঁ গা নাৎবৌ একি তোর পারার খোপে ঢুকে মুখোমুখী করে বকম বকম করবার সময়? সমস্ত রাত তো তার অসুখে পড়ে আছে, উনুনের আঁচ বয়ে যাচ্ছে খাবার করে নিগে না। ছেলেটাকে দুধ খাওয়াতে হবে, সে চ্যাঁ চ্যাঁ করে কাঁদছে আর তুই এসে খোপে ঢুকে বকম বকম করতে লেগেচিস?" মাথার ঘোমটা টানিয়া ক্ষিপ্র চরণে উর্ম্মিলা ঘরের বাহির হইয়া গেল। নীলকান্ত হাসিয়া কহিলেন—ঠাকুরদার সঙ্গে তুমি কি একদণ্ডও খোপে ঢুকে বকম বকম কর নি ঠাকুর মা যে কাউকে তা করতে দেখলেই তোমার চোখ জ্বলে যায়।"

ঠাকুর মা কহিলেন—না করে কি আর এমন কেটেছে রে, কারই বা কাটে বল, তবে সে রাতের জের দিন পর্য্যন্ত আর টানি নি দাদা।"

৬

যণিমালা ঠাকুরপোটির মুখে যখন সবিস্তার ও সালঙ্কার বর্ণনার সহিত শুনিল যে তাহার একান্ত প্রেমনিষ্ঠ পত্নী-গতপ্রাণ স্বামীরত্নটি নিতান্ত পাচমনার পীড়াপীড়িতে দায়ে ঠেকিয়া একজন বৃদ্ধ কন্যাদায়গ্রস্তকে নিতান্ত দায় উদ্ধার করিবার বাসনাতেই এ ভাবে বিবাহ করিয়া বসিয়াছেন, এবং এ ভাবে বিবাহ করিয়া বসাটা মোটেই তাঁর পুরুষ

মর্ম্মের প্রতিকূলও নয় তখন সে আর স্বামীর হৃদয় হীন-ভাবে নিতান্ত নিজের দিক দিয়াই বিচার করিতে পারিল না। তার উপর আরও যখন শুনিল, বিবাহ করিয়া পর্য্যন্ত অনুতাপ ও আত্মগ্লানিতে ভেজেশের এমন অবস্থা হইয়াছে যে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তিনি নিতান্ত উন্মনা ভাবেই দিন কাটাইতেছেন, মুখ চোখ এমন শুকাইয়া গিয়াছে যে, দেখিলেই "আহা" বলিতে ইচ্ছা হয়, তখন সহজেই মণির নারীচিত্ত করুণা ও মমতায় ভরিয়া উঠিল, অভিমানের তীব্র জ্বালা ভুলিয়া সে তখন মর্ম্মে মর্ম্মে সহানুভূতির বেদনা অনুভব করিল; চোখের জলে ভাসিয়া তাই সে যতীশের হাত দুটি ধরিয়া দীন কণ্ঠে কহিল, "লক্ষ্মী ভাইটি, তুমি এখন দু চার দিন তাঁর কাছে কাছেই থাক, নইলে যে মানুষ, মেহের যত্ন মোটেই করবেন না, তা আমি খুব জানি।" পুরবালা দিদিকে ঔষধ খাওয়াইতে ঘরে ঢুকিয়াছিল, জবাব দিল, "আহা কি মানুষই মাইরি, ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানেন না, হ্যাঁ যতীনবাবু, সাতাই কি আপনার দাদা চোখের জলে কালাপাণি সৃষ্টি করেছেন, ভিঙি নামিয়ে দেবো নাকি পার হবার জন্যে?" মণি রাগিয়া কহিল, "বয়সে ছোট হলেও কথা তুই এতো শিখেছিস পুরো, যে আমরা তোর কাছে বোবা। দিদিমার মুগ্যি শিষ্য হয়েচিস্ বটে, মানুষটার কথা শুনে তোদের কি একটুকুও দয়া হয় না রে?"

এখনি হয় তো রাগ করিয়া মণি ঔষধ খাইতে চাহিবে না, ফলে দাদা, যার কাছে পুরবালাকে বকুনী খাইতে হইবে, সুতরাং সে অনুনয়ের কহিল, সত্যিই বুঝি জামাই-বাবুর চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে, তা তিনি তো নিজের খাওয়া পরার দিকে কোনো কালেই নজর রাখেন না, তুমি এখান থেকে বলে পাঠালেও যে রাখবেন তা-তো বিশ্বাস হয় না ভাই, তার চাইতে কাজরী বন্ধ করে দিনকতক এখানে এসে থাকলেই তো হয়, তাই তুমি আসতে চিঠি লিখে দাও দিদি, কি বল যতীনবাবু?...

যতীশ কহিল, "সে হয়ত যদি হয় না, বাসার যা অবস্থা দেখে এলাম বউ দিদি, ভাঁড়ার ঘরে ছুঁচো আর ইঁদুরের কীর্ত্তন, বেয়ারাটি রান্না ঘরে স্থায়ী আড্ডা গেড়েছেন, কোনো জিনিষ দরকার হলে খুঁজে পাওয়া যায় না, ঠাকুরের তো কথাই নেই, সন্ধ্যেবেলা ঘণ্টা দুই, আর বেলা আটটা থেকে দশটা পর্য্যন্ত দু ঘণ্টার জন্যে তাঁর উদয় হয়, তার পর অস্ত। নূতন বউদি যে তোমার জন্যে কত ব্যস্ত হয়েছেন তা আর কি বলব!. তুমি বাপু শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর সেরে উঠে ঘরের লক্ষ্মী ঘরে চল। নইলে রাজ্য ছারেখারে যায়। আমায় বাসায় থাকতে বলচ কি, আমার এ বছর পরীক্ষা, আমি তো এখান থেকেই কলকাতা যাচ্ছি, একবার শুধু তোমায় দেখতে এলাম, আর দাদার অবস্থা শুনিয়ে গেলাম, যে ভালমানুষ, মুখে তো সাত চড়ে রা নেই, মেয়ের বাপ হাতে ধরেচে অমনি বিয়ে করে বসেছেন। এখন আবার ভেবে ভেবেও কালী হয়ে যাচ্ছেন, তুমি একখানা চিঠিই লেখো বউদি, নিজে আর তোমায় লিখতেও পারছেন না, আসতেও পারছেন না, অথচ ভেতরে ভেতরে ইচ্ছেটা যা হচ্ছে তা তুমি বুঝতেই পারচ।"

দিদিমা আসিয়া যতীশের সম্মুখে হাত ঘুরাইয়া কীর্ত্তনের সুরে গাহিলেন—

"রাই জুরেছে যমুনা,
যাও চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে বঁধু হেথায় এসো না।"

যতীশ হাসিয়া কহিল, "আমার কাছে কেন দিদিমা, যাঁর কাছে গাইবার তিনি এলেই গাইবেন, আমি বাইরের লোক মাত্র।" দিদিমা কহিলেন, "নেহাৎ বাইরের লোক নও ভাই, দাদার দূতও বট, আমিও দূতী, তাই সংবাদ গাইচি।"

যতীশ কহিল, "না দিদিমা, দূতও না, আমি মথুরা-পুরীতেও ফিরছি না, যাচ্ছি কলকাতায়।"

যতীশ বিদায় হইল, মণি সারাদিন যতীশের কথাগুলা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, সে কি সত্যই তবে ভেজেশকে আসিবার জন্য চিঠি লিখিবে? যাঁহার আকস্মিক নির্দ্দয় ব্যবহারে তার জীবনের নির্ম্মল নীলাকাশ কাল মেঘে ঢাকিয়া সব জ্যোতিঃ অন্ধকারের গর্ভে মিলাইয়া গিয়াছে, যাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় তার যৌবনের আনন্দ-স্বপ্ন চক্ষু হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া গিয়া তাহাকে জাগরণের জ্বালাময় জীবনে পলে পলে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইতেছে, যে মৃত্যু চিন্তা কয়েকদিন পূর্ব্বে তার কাছে

কি "বিভীষিকা"ই ছিল, অথচ হৃদয়হীন স্বামীর ব্যবহারে সেই 'বিভীষিকা'কে সে আজ একমাত্র গতি মুক্তি জ্ঞানে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত—এক কথায় তাঁর সব ত্রুটি ক্ষমা করিয়া কেমন করিয়া তাঁহাকে আজ সে কাছে ডাকিয়া লয়?

মণির অন্তর নিহিত সতীমহিমা যদিও এ প্রস্তাবটিকে প্রত্যাখ্যান করিতেছিল না, কিন্তু নারীত্বের অভিমান ফুলিয়া উঠিয়া কহিল—"হ'লোই বা স্বামী, থাকলেই বা তাঁর অধিকার যা ইচ্ছা করবার—ভালবাসার গর্ব্ব যখন করেন তখন বিনা অপরাধে কেন আমার রোগশয্যার এ দাগা দিয়ে বস্লেন? মরণে পরে যা খুসী করতেন, কেউ তো বাধা দিত না। লোকের পীড়াপীড়ির ওজর এমনি কি মূল্যবান জিনিষ, যার জন্যে আমার প্রাণের ভালবাসাকে এমন করে উপেক্ষা করলেন?" আবার মণির চোখের জলে বান ডাকিল, কিন্তু সে বান ভাসিয়াই গেল; সতী মহিমা সত্যই তার জয়-পতাকা উড়াইল, নারীত্বের অভিমান সেখানে টিকিতে পারিল না, পুরুষের দশ দিক আছে, নারীর একমাত্র দিক, এক লক্ষ্য—তাহা স্বামী, সতী নারী যদি স্বামীর সমস্ত ত্রুটিই হাসিমুখেই না মার্জ্জনা করিতে পারে—তবে তার কিসের সতীত্ব? মণি চোখের জলে ভাসিয়া সব অভিমান ভাসাইয়া সেই দিনই তাই জ্যেঠামশাইকে লিখিল—"কেমন আছ? ভালোই বোধ হয়, জেঠাই মা লিখেছে, মণির এ যাত্রা মরা হলো না বলেই বোধ হচ্ছে, শুনে কি বল্‌তে চাও?" অতি ক্ষুদ্র চারি ছত্র লেখা চিঠি, কিন্তু বিন্দু বিন্দু সুধারও সঞ্জীবনী শক্তি চির অযোধ—তাই এই ক্ষুদ্র পত্রখানি যে অমর সুধা জ্যেঠামশাইর নিকট বহন করিয়া লইয়া গেল, অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহা পাইয়া জ্যেঠামশাই কৃতার্থ হইলেন। তাঁর বৃদ্ধ হৃদয় এই অমৃত বিন্দু পানেই মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়া যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে নবীন শক্তি সঞ্চয় করিল। এই কয় ছত্রের উত্তরে সে আট পৃষ্ঠা ভরিয়া যে পত্র রচনা করিল, তাহার জন্য সমস্ত রাত্রিই তাহাকে বিনিদ্রভাবে কাটাইতে হইল; কতদিন ধরিয়া যে ভাবের উচ্ছ্বাস আর হৃদয়মধ্যে পথহারা ভাবে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল আজ উৎসের মুখে তাহাদের উদ্দাম গতি রোধে কে? নিজের দুর্ব্বলতা ও ত্রুটির কথা অকপটে স্বীকার করিয়া জ্যেঠামশাই বার বার অপরাধের জন্য শাস্তি প্রার্থনা করিল, সে যে মণির একনিষ্ঠ পূজারী, চিরজীবন সে যে মণিরই প্রেমের ভিখারী, মণিই যে তার নয়নের আলো, হৃদয়ের শক্তি সে কথা সে পত্রের প্রতি পৃষ্ঠায় একবার করিয়া লিখিল। যদিও সে ভাবুকতার মোহে অন্যের পাণিগ্রহণ করিয়াছে কিন্তু মণি থাকিতে কখনই সে তাহাকে স্ত্রীর আসন দিবে না, দিবে না, ভিখারিণী আসিয়া রাজরাণীর অধিকারে প্রতিষ্ঠিতা হইবে এ কি সম্ভব ইত্যাদি ইত্যাদি! সব শেষে লাল কালি দিয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিল,

"ফিরে এস গো ফিরে এস,
আমার সব সুখ দুঃখ বন্ধন ঘর মম অন্তরে ফিরে এস,
আমার শয়নে স্বপনে এস,
আমার নয়নে নয়নে এস,
এসো—এসো—এসো—গো—"

ওগো স্বামীর এমন সোহাগপূর্ণ অনুনয় ও মিনতিভরা অজস্র প্রণয় নিবেদন অঙ্কিত—সেই সুধে বৃষ্টি বা কত বিন্দু অশ্রুচিহ্ন লাঞ্ছিত প্রেমপত্র যদি কোনো নারীর হস্তগত হয়, সে কি আর তার প্রেমাস্পদের প্রতি বিমুখ থাকিয়া নারী প্রেমের মহিমাকে খর্ব্ব করিতে পারে, না তাহা সম্ভব?

মণিমালা নিমেষের মধ্যে অভিমানের বেদনা, অপমানের জ্বালা সমস্ত ভুলিয়া স্বামীর সেই প্রেমপত্রখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া হৃদয়তার লাঘব করিল, চোখের জল ঝরাণও আর মানা মানিল না, ছিন্ন লতার মত বিন্দু বিন্দু করিয়া বুকের উপর গড়াইয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

শিল্প মঞ্জুরী

[শিল্পী—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়]

প্রথম পর্য্যায়

২).

নিকার বোকার - ।

ছোট ছোট ছেলে ও মেয়েদের পায়জামা ও পাইপিন (Yoke) সংযুক্ত জামাকেই নিকার বোকার বলে। এই নিকার বোকাই ছোট ছেলে মেয়েদের পরিধানের পক্ষে বড়ই আরাম দায়ক।

নিকার বোকারের মাপ :—

মেরুদণ্ডের ঠিক উপরের ঘাড়ের গোড়া থেকে হাঁটু ১″ ইঞ্চি নীচে পর্য্যন্ত পুট মাপ মেরুদণ্ডের যে স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে সে স্থান হইতে শরীরের সংযোগ স্থান পর্য্যন্ত পুট মাপ নিতে হইবে। সেত মাপ,—মেরুদণ্ডের ঠিক উপর থেকে কোমরের অংশ পর্য্যন্ত যে মাপ লওয়া হয় তাকে সেত বলে।

লম্বা—২৩″ ছাতি—২৪″ পুট—৪″ সেত—৬″ মোহরী—৮″ সেরম—৮″ গলা—১১″

নিকার বোকার কাটিবার নিয়ম :—

ক ও খ লাইন সেতের ১″ ইঞ্চি বেশী—৭″ ইঞ্চি তার মধ্যে ক ও গ বিন্দু পর্য্যন্ত ছাতির ¼ ইঞ্চি—১″ ইঞ্চি—৫ ইঞ্চি গও ঘ বিন্দু ১½″ ইঞ্চি নীচে ছাতির লাইন ; তা'হলে ক ও চ বিন্দু পর্য্যন্ত পুটের মাপ ৫″+½″ ইঞ্চি —ক ও গ অংশ ছাতির ¼ অংশ—১″ ইঞ্চি এই সঙ্গে হাতের মোহরীর মাপ পাওয়া যায়। ঘ বিন্দু হইতে ছাতির মাপের ¼″ অংশ+১½″ ইঞ্চি বেশী রাখিয়া ঙ বিন্দু পর্য্যন্ত আনিতে হইবে। ঙ ও ছ বিন্দু সঙ্গে সমান্তরালে সংযোগ করিয়া লইতে হইবে। পরে ঘ বিন্দু হইতে কোমরের ¼ অংশ ১½″ ইঞ্চি বেশী রাখিয়া ঝ বিন্দু পর্য্যন্ত টানিয়া ঙ ও ঝ এর সঙ্গে মিলাইয়া দিতে হইবে। পরে ক ও ট বিন্দু পর্য্যন্ত ছাতির ¼″ অংশ ক লাইন হইতে ট লাইন ½″ ইঞ্চি উপরের দিকে রাখিয়া ক ও ট সংযোগ করিয়া ট উঁচু সংযোগ করিতে হইবে। তারপর চ ও ছ চিত্রানুযায়ী বাঁকা ভাবে সংযোগ করিয়া লইলে পিছনের কাপড়ে চিত্রের দাগ দেওয়া হইল। তারপর ক, ট, চ, ছ, ঙ, ঝ, ও ঘ লাইন কাটিয়া লইলে পিছনের কাপড় ও সামনের কাপড় কাটা হইল। এখন চারি

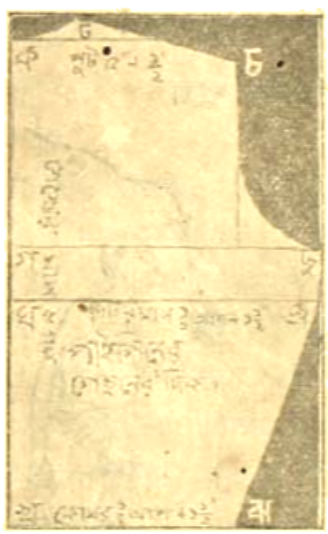

৭ক চিত্র

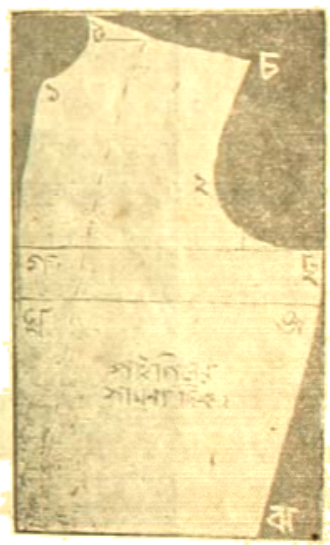

৮ক চিত্র

কিংবা কাপড় হইতে নীচের জোড়া অংশ রাখিয়া বাদ দেওয়া জোড়া কাপড়টী তার উপর ট হইতে ছাতির ঠ অংশ নিয়া ১ বিন্দু পর্য্যন্ত এরূপ বাঁকা ভাবে গলা করিতে হইবে। সাহনের চ ২ ও ছ বিন্দু এরূপ গঠনে (Shape) রাখিয়া কাটিয়া লইলে গলার অংশ কাটা হইল। এরপর ক ও ব যে বিন্দু করা হইয়াছে সোজা দিয়ও করিয়া কাপড় কাটিয়া লইলে সাইজের কাটা হইল।

৯নং চিত্র

তারপর পায়জামার বিষয় যে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সে অনুপাতে কাটিয়া লইলে নিকার বোকার কাটা শেষ হইল।

নিকার বোকার সেলাই :—

নিকার বোকারের পাইপিনের সামানায় যে কাটা অংশ আছে তাহাতে সোজাভাবে নেপেল জোড়া দিয়া নিতে হইবে। পরে ঐ দুই অংশ পেছনের কাপড়ের সঙ্গে পাশের অংশ জুড়িতে হইবে। পাশের অংশ জোড়া হইয়া গেলে ফাঁক জুড়িয়া লইয়া পূর্ব্বে যে পায়জামা করা হইয়াছে ও পায়জামার কোমরের যে আলাদা ফিতা জড়াইবার কাপড় জোড়া দেওয়া হইয়াছে তাহা জোড় না দিয়া এই পাইপিনের কোমরের সঙ্গে নরম বা কুঁচি দিয়া জুড়িয়া দিতে হইবে। এখন ১½ ইঞ্চি চওড়া গলার মাপের থেকে ১" ইঞ্চি বেশী রাখিয়া অর্থাৎ গলা ১১" ইঞ্চি +১" ইঞ্চি=১২" ইঞ্চি গলা রাখিয়া ফিতাখানি গলার সঙ্গে ভিতর দিক জুড়িয়া দিলেই নিকার বোকারের জোড়ার কাজ শেষ হইল।

তারপর নেপেলের বামদিক বোতামের ঘর করিয়া ডান দিকের অংশে বোতাম বসাইয়া লইলে নিকার বোকার সম্পূর্ণ হইবে।

১০ চিত্র

পিতাপুত্র

কর কি, কর কি। অমন গোঁয়ার্তুমি কাজ করো না। শেষে কি একটা কাণ্ড

নূতন নাট্যাগার

(প্রাপ্ত)

একদল ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের হঠাৎ খেয়াল চাপিল যে ফূর্ত্তি ও পয়সা দুইই চাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ ব্যাঙ্কের সর্ব্বেসর্ব্বা, কেহ মহাজনীর প্রধান চেলা ও নন্-কো-অপারেশনের মুরুব্বি এবং কোষাধ্যক্ষ, কেহ সমাজ-নীতি চালক কমিদার বৃহদ্বয়।—ইঁহারা সকলেই ব্যবসায়ী এবং মা-লক্ষ্মী ইঁহাদের অতি বশ। সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর রাত্রে কিছু রঙ্গরস ও ফূর্ত্তির প্রয়োজন তাই এই সিন্ডিকেটের দল আর্ট থিয়েটারের নাম দিয়া ষ্টার থিয়েটারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ষ্টার অতঃপর ইঁহাদেরই পরিচালনায় চলিবে। ইঁহাদের সব জাতি গোত্র সর্ব্ববিষয়ে পরিদর্শন ও পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গের মহলাও চলিতেছি ইঁহারাই দিতেছেন।

আমাদের একান্ত ধারণা ছিল কোন একটা ব্যবসা আরম্ভ করিতে হইলে উহাতে একটা (training) শিক্ষার দরকার হয়। থিয়েটার লাইনে শিক্ষানবিশী না থাকিলেও কি করিয়া দেশহিতৈষী কর্ম্মবীরগণ বক্তৃতামঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া একেবারে রঙ্গালয়ের মহলায় নেতৃত্ব আরম্ভ করিলেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। সুতরাং এই নূতন দলের সব কার্য্যই যে নূতন রকমের হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শ্রীমতী তারাসুন্দরী ষ্টারে ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ভুবনের হইতে অভিমানেই নাকি কালিকাতায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু এই নব্য সম্প্রদায় তাঁহাকে কি কারণে মনোনীত করিলেন না, জানিনা। তারাসুন্দরী বৃদ্ধা হইয়াছেন, এখন আর তাঁহার সে যৌবন নাই—সেই কারণেই কি তাঁহাকে আবার ভুবনেশ্বরে ফিরিয়া যাইতে হইল? হায় রে—অদৃষ্ট! তাই আজ ষ্টারের প্রধানা অভিনেত্রী হইলেন মিস্ মনোরমা। তাহার অভিনয় দেখিয়া আমরা হাসিব কি কাঁদিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু দুঃখ ছাই, সব ভুলিয়া যাই, মুরুব্বির জোর সর্ব্বত্র। য্যাডানের পাণ্ডী থিয়েটারে দ্রৌপদীর অভিনয় করিয়াছিলেন বর্ত্তমান যুগের নাট্যসম্রাজ্ঞী মিস্ সহর আর সেই দ্রৌপদীর অংশ ষ্টারে অভিনয় করিতেছেন মিস্ নিভাননী। নব্য-সম্প্রদায়ের রুচি সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা ছিল দ্রৌপদীর রূপ দেখিয়া আমাদের সে মতেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নবসম্প্রদায়ে বাবদা বুদ্ধির প্রাচুর্য্য—দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দৃশ্যে বেশ পরিপুষ্ট হইয়াছে। পৃষ্ঠের উপরের বাক্স হইতে কালির ন্যায় কাপড় দুঃশাসন ক্রমাগত টানিতে লাগিলেন—আট বটে! কর্ণবধের সময় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন গাণ্ডীব চালনা করিবেন, না নিজের উত্তরীয় সামলাইবেন তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। অর্জ্জুন বোধ হয় সে সময় কলা-কারুতা দেখাইতে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন।

তারপর নব্য নাট্যাগারের নব-নাটক কর্ণার্জ্জুন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিবার আছে (যদিও আপনারা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছেন) বাল্যকালে কাশীরামদাসের মহাভারত পাঠে যেটুকু আনন্দ উপভোগ করা গিয়াছে এই কর্ণার্জ্জুন নাটক-খানি পড়িয়া—তাহার তিলমাত্র উপভোগ করা গেল না। এই নাটকখানিকে তৃতীয় শ্রেণীর নাটক বলিলে অত্যন্ত বেশী বলা হয়। ইহাতে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখো পাধ্যায়ের নাম না থাকিলে কোন শিক্ষানবিশী নাট্যকার-প্রার্থী লোকের লেখা বলিয়া মনে হয়। একখানি সাধারণ পৌরাণিক নাটকের মধ্যে প্রহেলিকাময় চরিত্র দুএকটি করি সন্নিবেশ করিবার সাধ নূতন নাট্যকারদের হয়, তাহা অনেকেই জানে কিন্তু বৃদ্ধদেরও যে হয়—তাহা

এই প্রথম দেখা গেল। প্রায় প্রতি দৃশ্যে প্রহেলিকাময়ী নিয়তি—আবির্ভাব, কথা ও গানের মহিমা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। এই অংশ শ্রীযুতী তারাসুন্দরীর মুখে কিরূপ শুনাইত জানি না, যেন শুনিতা-ছিলাম তাঁহার জন্য এই রহস্যময়ীর সৃষ্টি—কিন্তু শ্রীযুতী নীহারের মুখে যে অভিনব শুনাইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিও নাটকের নাম কর্ণার্জ্জুন—কিন্তু অর্জ্জুন বেচারীকে কেন যে এমন ছিচ্‌কাইয়া টানিয়া আনা হইয়াছে তাহা বুঝিলাম না। তাঁহার মুখ ফুটিয়াছিল ও মাত্র দু'চারিটি আওয়াজ। কর্ণাভিনয় নাম দিলেই ত বেশ হইত। একথায়,মহাভারত হইতে গুটীকত খাপছাড়া বৃত্ত লইয়া উহাকে নাটক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাও চাই বৃত্তগুলি এলোমেলো ভাবে সাজাইয়া রস ভঙ্গ করিয়া নাট্যকার কি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন বোঝা গেল না। কুন্তীর বিচিত্র বৃত্ত কর্ণ কুন্তী সংবাদ—ভাবে, ঘটনা বৈচিত্র্যে অপূর্ব্ব, সে বৃত্তটিও আর্ট লিমিটেডের হাতে পড়িয়া মাঠে মারা গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অমর অতুলনীয় কর্ণ কুন্তী সংবাদ বাংলা সাহিত্যে পূর্ব্ব হইতেই থাকা সত্ত্বেও নাট্যকার তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। কর্ণ বীর, কর্ণ দাতা, কর্ণ মহৎ ইহা সত্য কথা; কিন্তু কর্ণ মানুষ ছিলেন—গ্রন্থকার প্রতি পদে পদে কর্ণের বীরত্বকে উজ্জ্বল করিতে গিয়া নাটকের অন্যান্য পাত্র পাত্রী-দের প্রতি অবিচার করিয়াছেন; কর্ণকেও সত্য মানুষ হইতে দেন নাই—অপর চরিত্রগুলিকেও মানুষ বলিবার সুযোগ দেন নাই। কর্ণ চরিত্রকে উজ্জ্বল করিতে গিয়া মহাভারতের অপলাপ করা হইয়াছে। পাণ্ডবদের পক্ষে ও দুর্য্যোধনের সহায়তায় কর্ণের মন পাণ্ডবদের উপর পূর্ব্ব হইতেই বিষাক্ত হইয়াছিল। এই বিষ ক্রমে কর্ণের মনে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার অন্তরের এক দিকে নীচতাও আনিয়াছিল বটেই। তাই দ্রৌপদীর অপমানে, পাণ্ডবদের বন প্রেরণে, দ্বৈতবনের অভিযানে, গোধন হরণে, অভিমন্যু বধে কর্ণের নীচতার প্রমাণ মহাভারতে প্রচুর পাই। তারপর পিতৃমাতৃ পরিচয় দিতে না পারিয়া কর্ণ মনে যে জ্বালা সর্ব্বক্ষণ অনুভব করিতেন এই দুইয়েও মিলিয়াই মহাভারত সমরের এক প্রকার মূল কারণ বলা চলে। এ নাটে মানুষের এই স্বাভাবিক নীচতা ও জ্বালাকে সরাইয়া রাখিয়া কর্ণকে বীরত্বের উচ্চস্তরে বসাইতে গিয়াই নাট্যকার কর্ণ চরিত্র মাটি, সঙ্গে সঙ্গে অর্জ্জুন চরিত্র ও অন্যান্য চরিত্রগুলিও কর্দ্দমাক্ত করিয়াছেন। কর্ণ—ভীমের সঙ্গে, চিত্রসেনের সঙ্গে, অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ বহুবার হারিয়াছেন ও জিতিয়াছেন। কিন্তু হারিবার কথা কোথাও উল্লেখ না করায় সত্যের অপলাপ ঘটিয়াছে ও কর্ণ চরিত্রও ম্লান হইয়াছে। পরশুরাম প্রভৃতি চরিত্র নাটকে প্রবেশ করাইবার আবশ্যকতা বোঝা গেল না। এ গুলির প্রাসঙ্গিক উল্লেখই যথেষ্ট হইত। শকুনী চরিত্র উল্লেখ যোগ্য—অভিনয় কৌশলে চরিত্রটি ফুটিয়াছে ভাল। অভিনেত্রীদের মধ্যে পদ্মাবতীর ভূমিকা উল্লেখ যোগ্য। আর কোন অভিনেত্রীর নাম উল্লেখ করা চলে না। কিন্তু ইহাদের উপরেই ঘন ঘন ফুলরাশি ও তোড়া বর্ষণের প্রাচুর্য্য দেখিয়া মনে হইতেছিল শ্রাবণের ধারার মত কলিকাতায় বাজারেও কি ফুলের মূল্য অতি সস্তা হইয়া পড়িয়াছে? ঘন ঘন তোড়া নিক্ষেপ ও করতালির বাহুল্যে মনে হইতেছিল, ইহাদের উঠাইবার জন্যও লোকের অভাব বোধ হয় দেশে নাই। গুণের আদর দিতে যেন বোধ হয় সবে আরম্ভ করিল!

বসিবার স্থান ইত্যাদির প্রশংসা বাহির হইতে শুনিতে পাইয়াছিলাম; কাগজেও পড়িয়াছিলাম। কিন্তু ভিতরে গিয়া ৩য়, ২য় ক্লাসের অবস্থা যা দেখিলাম একেবারে চক্ষুস্থির। দু' টাকা ব্যয় করিয়াও আগেকার গ্যালারীর সেই জন্তুর নীচে আসন। দুর্ভাগ্য কি তাতেই শেষ, তা নয়। আধুনিক অভিনয় প্রণালীতে অভিনেতা অভি-নেত্রীদের স্থান সাধিবার কি ব্যবস্থা আছে জানি না। তবে আমার আশঙ্কা হইতেছিল আমি বুঝি কালা হইয়া গিয়াছি। মাঝে মাঝে দু' এক জন অভিনেত্রীর স্বর কানে আসিয়া সে ভুল ভাঙ্গাইতেছিল বটে। তবে দৃষ্টি শক্তি লোপ হয় নাই তাহা বুঝিতেছিলাম—অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অহিমাত্রায় হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে। নাচ—যাহোক্, গীত সে কথা নাই বা বলি-লাম। আর কনসার্টে সে কেমন তাল দেয় তা শুনুন—একটা তাণ্ডবাত্মক শোক দুঃখের—মানসিক চাঞ্চল্যের

অভিনয় অন্তে শঙ্খনী সমস্ত গৃহ শুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন অমনি ঐক্যতান বাদন বাজিয়া উঠিল 'নয়ন গলিয়ে যায় সুনীলিম গগনে—হাসিতেছে তরু শির দিনমণি কিরণে।' এমনিসব নানা বিচিত্র সমন্বয় দেখিয়া শুদ্ধ চিত্তে ফিরিয়া আসিলাম। সমালোচনাকে শত্রুভাবে গ্রহণ না করিয়া যদি আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ নিজেদের দোষ ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা করেন তবেই সুখের বিষয় হইবে।

চিত্র-সূত্র

[শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু]

বায়স্কোপের ছবির মাঝে মাঝে কথার খানিকটা, কিংবা ভাল বেঝে দু-একটা লাইন তুলে দেওয়া হয়, তাতে ব্যাপারটা কি হচ্ছে, বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়। কেইবা সে সব লেখে, আর লিখে লাভটাই বা কি রকম হয়, এ দেশের অনেকেই তা জানেন না।

মনে হয় কাজটা ভারী সহজ, কিন্তু একখানা ছবিকে ভালো করতে হ'লে এই রকম লেখার এত দরকার যে এই ক'রেই অনেক লোক বিস্তর টাকা রোজগার করছে। কাজ ত' শুধু পরিচ্ছেদগুলি'র নাম সাজিয়ে দু-একটা কথা বসানো, অথচ তাদের এক একজনের উপার্জ্জন ইজেণ্ডের মন্ত্রণাসভার মন্ত্রীর মাইনের চেয়েও বেশী। তবু তারা কেউই খুব নামজাদা নয়।

মিসেস্ হিলিকার

বায়স্কোপের প্রসিদ্ধ অভিনেতা আর অভিনেত্রীদের সকলেই চেনে, আর তারা কে কত মাইনে পায়, তাও সবাই জানে। কিন্তু কোটি কোটি দর্শকের মধ্যে মিসেস্ ক্যাথারাইন হিলিকারের খবর কজন রাখে? আর, তাঁর ছবি দেখলেই বা কে চিনতে পারবে? অথচ এই মহিলাটি কেবল পরিচ্ছেদের নামকরণ ক'রে, ও যারা বায়স্কোপ করেছে, তাদের মুখে কথা যুগিয়ে দিয়ে, এক একখানা ফিল্মএ দুহাজার থেকে তিন হাজার পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় ৩৫০০০৲ টাকা অবধি পেয়ে থাকেন। এ ধরণের রচনায় যারা হাত পাকিয়েছে, তাদের মধ্যে মিসেস্ হিলিকারই সবচেয়ে বেশী উপায় করেন। ভালো লেখক মোটে ১০।১২ জন আছে; আরো ঢের লোকের দরকার।

মিসেস্ হিলিকার ফিল্মটা বার বার দেখে তারপর লেখা সুরু করেন। কাটছাঁট বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ ফিল্মটা ওঁর টেবিলের ওপর রাখা হয়, একটা ছোট যন্ত্রের সাহায্যে ছবিগুলি তিনি ভালো ক'রে দেখেন। তার দু'ধারে লাটিমের মতন চাকা লাগানো আছে, তাতে ফিল্মটা জড়িয়ে যায়। উল্টোদিকে ঘুরিয়ে যে কোন অংশ যতবার ইচ্ছে দেখা যেতে পারে। ফিল্মএর নীচে একটি ছোট আলো জ্বলে।

সকলেই একথা জানে যে একই সময়ে অনেকগুলি কাজের অভিনয় করাই হচ্ছে বায়স্কোপের বৈশিষ্ট্য। অথচ কোন কাজটাই যাতে গল্প থেকে খাপছাড়া না হয়ে যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ যেন ঠিক কন্সার্ট বাজানোর মতন; বেহালা, বাঁয়া-তবলা ফ্লুট সবই চলেছে, অথচ মনে হচ্ছে যেন একটা সুরে একটা সুর বাঁধছে। এইজন্যে প্রত্যেক দৃশ্যে, প্রত্যেক ভাব, আলাদা আলাদা নাম দিয়ে দেখাতে হবে, তা সে যতই হোক, আর যত এইটুখানিই হোক।

বাক্যালাপে যাতে কোন ভুল না হয়, তা দেখবার জন্যে অনেক লোক থাকে, তবুও মাঝে মাঝে সাজ্ঘাতিক ত্রুটি থেকে যায়। একটা ফিল্‌মএ এক জায়গায় একবারে দেখানো হয়, যে নায়িকা বাইরে যাবার পোষাক পরে বেরিয়ে গেল, একটু পরেই আর একজায়গায় দেখা গেল, তার গায়ে জামা নেই। এ ধরণের ভুল সংশোধন হয় পরিচ্ছেদের নামকরণের সময়। এসব ক্ষেত্রে খানিকটা ফিল্‌ম একেবারে বাদদিয়ে নতুন জিনিষ ঢোকান হয়।

জুন ম্যাথিস্, এনিটা লুস্, এড্‌উইন্ গোল্ডউইন, ফ্রান্সিস্ মেরিয়ন্—এঁরা সব এই কাজে অনেক পয়সা উপায় করছেন। এঁরা একরকম বসড়া ক'রে ছেড়ে দেন; সে সব অন্য লোকের কাছে যায়, তাঁরা আবার বেছে বেছে নতুন নতুন কথা বসান।

এমনি ধারা লেখার কতটা কাজ হয়, তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ঘটনাটা খুব প্রসিদ্ধ। একটা পারিবার নাটকের অভিনয় হচ্ছিল, তাতে একটা দৃশ্যে একটি মেয়ের বিবাহ-সম্বন্ধে ব্যাপারে তার বাবা মুরুব্বিয়ানা ক'রে বাধা দিতে দাঁড়িয়েছেন। মেয়েটির চোখ দিয়ে জল পড়ছে, আর তার অভিভাবকের ভাবটা কি বোঝা যাচ্ছেনা। এইখানে দর্শকদের কি-হয় কি-হয় রকমের একটা উৎকণ্ঠা জেগে ওঠে। হঠাৎ মেয়েটির বাপ নাকের কাছে মস্ত একখানা কাল রুমাল ধরলেন, সঙ্গে সঙ্গে পর্দ্দার ওপর একটা হাঁচির শব্দ ফুটে উঠল—হুব্! এই যে ছোট্ট একটুখানি কথা, এ হয়ত ছাপার অক্ষরে ব্যক্ত করাও যায় না, কিন্তু দর্শকদের ওপর এর কাজ হল যেন বিদ্যুতের মতন। ভয়ের পালাটা এইতেই কেটে গেল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এমনি লেখা যাঁরা লিখে থাকেন, তাঁরা দু-একটা কথার সাহায্যে একখানা সাধারণ ছবিকেও খুব উঁচুদরের ক'রে তোলেন।

কারণটা হচ্ছে এই :—সাধারণতঃ খানিকটা পাড়া-গেঁয়ে কথা, নয়ত একটু ইঙ্গিত কিম্বা একটা ভালো রসিকতা—যার মানেটা চট্ করে লোকে বুঝতে পারে, এসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। মিসেস্ হিলিকারের প্রতিভা এ বিষয়ে যথেষ্ট দেখা গেছে। তাঁর কাজ "ধিরোভোরা,"* আর "প্যাশন্" ব'লে দুখানা বইয়ে দেখা যাবে।

বছর দুয়েক আগে একখানা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবির নামকরণের সময় তাঁর কৃতিত্ব প্রথম প্রকাশ পায়। পাহাড়, বন, হ্রদ, বাগান ছবিতে দেখানো হচ্ছিল, তারি সঙ্গে হিলিকারের সুনির্ব্বাচিত এক একটা লাইন মনের আনন্দ-রসধারাকে জাগিয়ে তুলছিল। তাঁর কথার প্রয়োগ এমনি সুন্দর ছিল, যে তাই প'ড়ে দর্শকদের মনে হচ্ছিল একজন প্রাণের বন্ধু যেন ঐ সব জায়গা গুলো দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। দৃশ্যপট যেন তাঁর কথার সুরকে কবিতার মালা হয়ে উঠেছিল।

সে সব ছবির বর্ণনা এমনি কৌশলে করা হয় যে দর্শকেরা ছবির সঙ্গে আর লেখার সঙ্গে কোন তফাৎ বুঝতে পারে না, সে সব ছবির বেশ নাম হয়। এমন ছবিও ঢের দেখা যায়, যার দৃশ্যের সঙ্গে কথার কোন মিল নেই, এবং ব্যাপারটাকে ভাল ক'রে বোঝাবার মতন ভাষার অভাব প্রতিপদে নজরে পড়ে। মার্কিন ভাষার কাটখোট্টা ধরণ, কথার ভুল লিখা বাজে বিবরণ দেখলে প্রায়ই দর্শকরা চটে ওঠে। লেখার দোষে খুব ভালো অভিনয়ও মাটি হয়ে যায়। সেইজন্যে বায়স্কোপের ব্যবসাদাররা ভালো লেখক পাবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করছে না। এই কাজে এখনো ঢের পয়সা উপায় হতে পারে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে লেখকের অভাব নেই, অভাব প্রতিভার।

* "ধরোভোরা" কলিকাতায় প্রদর্শিত হয়। সং, বাঃ।

গ্রীষ্মের দিনে
স্নানের আরাম পাইতে, শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে, আমাদের আইডিয়াল্ গ্লীসেরিন্ এবং বৈশিনে প্রস্তুত :—চন্দন, রয়েলবকুল মাখুন ও ভালোরূপ সাবান ব্যবহার করুন।
ইণ্ডিয়ান্ সোপ্ কোম্পানী
৬৪।১এ, বেচুরা বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন ২৪২৬

সাচ্চা কথা

(ছুটকির ডায়-মার্কা)

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত]

১। সাজ পরিবর্ত্তন করিতে স্ত্রীলোকের যতটুকু সময় লাগে তাহা অপেক্ষাও কম সময় লাগে তাহার মন পরিবর্ত্তন করিতে।

২। পুরুষ লোকের মাথায় একটা কাজ করিয়া ফেলিলেও পরে তাহার একটা যুক্তি খুঁজিয়া পায় কিন্তু স্ত্রীলোক কোন যুক্তির ধার ধারে না।

৩। স্ত্রীলোক ছায়ার মত—যদি তাহাকে অনুসরণ কর সে দ্রুত পালাইবে, যদি তুমি পালাইতে চাও সে তোমাকে অনুসরণ করিবে।

৪। জগতে মাত্র দুটি ভাল স্ত্রীলোক আছেন,—একটি যাহাকে জীবনে দেখি নাই—অপরটি যিনি এপারের মায়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

৫। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আদর্শ অনেক উচ্চ।

৬। বিবাহ করিবার পূর্ব্বে চোখ একবার ভাল করিয়া মেলিতে চেষ্টা করিও; বিবাহ হইয়া গেলে চোখ দুটি আপনা হইতেই বুজিয়া যাইবে।

স্বামী ভাস্করানন্দের মঠ

[শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু]

ফিরায়োনা আঁখি, দেখ দেখ চেয়ে
স্মৃতি-মন্দির পাষাণে গাঁথা!
পুণ্যতীর্থ, হেরিয়া পান্থ
শ্রদ্ধা-আনত করিয়ো মাথা।
একদা যাঁহার ত্যাগের মন্ত্র
বারাণসী হ'তে সকল দেশে,
ধ্বনিত হইল ক্ষত্র কণ্ঠে
দীর্ঘ দিনের সাধনা শেষে;
নগ্ন যাঁহার দীপ্ত মূরতি,
সংযমে ছিল অতুলনীয়;
পদরেণু যাঁর নৃপতি জনের,
ছিল—মুকুটের চেয়েও প্রিয়,
সেই ভাস্কর-আনন্দ-স্মৃতি,
দেখ ভাস্করে তুলেছে গ'ড়ে।
প্রতি মর্ম্মরে তারি অর্ঘ্যের
প্রীতি-নিবেদন উছলি' পড়ে।

ভাস্করানন্দ-মঠ

দেশ ও বিদেশ

অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মাজীকে উপলক্ষ করিয়া যাহারা মাতিয়া কারাবরণের সুযোগ লইয়া, গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাঁহার তাল্লুক শ্রেণী লাভ করিয়া মহাত্মাজীকে উপহাস করিয়া লইয়াছেন। অল্প, সরল-বিশ্বাসী জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া দেশে অশান্তি সৃষ্টির অপরাধে মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র ইতিহাসে মসীবর্ণে চিত্রিত হইবে—এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের হোমরাচোমরা ব্যক্তি নিঃসন্দেহ হইয়া থাকেন, তবে কারারুদ্ধ মহাত্মা গান্ধীকে কূপমণ্ডূক, অন্ধকূপহত্যা, ইত্যাদি ইতর ভাষায় বিদ্রূপ অপরাধে বিদায় অপরাধে তাঁহার তাল্লুক শ্রেণী এবং তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টকেও ইতিহাস অভিযুক্ত করিবে, কেবল তাহাই নয়, এই উদ্ধত অপরাধ তুলন মূল্য করিয়া বিচার করিয়া দেখিবে, এ সম্বন্ধে আমরাও নিঃসন্দেহ।

'আনন্দবাজার'

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলেন,—

বর্ত্তমান সময়ে জনসাধারণকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জেলায় রাজনৈতিক সঙ্ঘ স্থাপন করিতে হইবে। এই রাজনৈতিক সঙ্ঘ দেশের নির্ব্বাচকমণ্ডলীদিগকে উপযুক্ত রাজনৈতিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। যদি জনসাধারণ এইরূপভাবে শিক্ষিত হয়েন তাহা হইলে তাঁহারা উপযুক্ত ব্যক্তিগণকেই ব্যবস্থাপক-সভা প্রভৃতিতে পাঠাইবেন। যদি স্বরাজলাভের আশীর্ব্বাদ সাম্রাজ্যান্তি ব্যবস্থা-পরিষদে স্থান গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহার তাল্লুক শ্রেণী এইরূপ ভাবে আর কথা কহিতে পারিবেন না। যদি গবর্ণমেণ্ট তথাপিও এইরূপ প্রতি-নিধিদিগের কথা না শুনেন তাহা হইলে মহাত্মা গান্ধীর "কর-বন্ধ" কার্য্য আরম্ভ হইবে। জনসাধারণ প্রতিনিধি পাঠাইবার সময় এই কয়টি সর্ত্ত তাহার নিকট হইতে লিখাইয়া লইবেন :—প্রথম জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিবে; দ্বিতীয়, দেশের নিকট দায়িত্বপূর্ণ শাসন প্রণালীর জন্য গবর্ণমেণ্টকে চাপ দিবে, তৃতীয়, হিন্দু ও মুসলমানদিগের একতা চেষ্টা করিবে, চতুর্থ, অস্পৃশ্য শ্রেণীর স্বার্থোন্নতির জন্য চেষ্টা করিবে, পঞ্চম হাতে চরকা ব্যবহার নিয়মিত করিবে; সাধ্য মত ও রাজনৈতিক ব্যাপারে হুঁৎ-মার্গ উঠাইবার চেষ্টা করিবে।

'হিতবাদী'

'ইণ্ডিয়ান' লিখিতেছেন, কলিকাতার অবস্থা ভাল নহে বলিলেও চলে। [illegible] করিতেছে, দেশের ছিটে উপরে যে আছিল [illegible] ওয়াই অবিকাংশ, অন্যান্য পাড়ায় আর কলিকাতা নাই—[illegible] [illegible] অবস্থার সম্বন্ধে খবর পাইলেও তিনি এখন [illegible] [illegible]।

[illegible] নাকি সম্প্রতি তারে ওভিয়ারগণের [illegible] [illegible] করিয়াছে। বিষয় বাড়িয়াই চলিল [illegible] পরিণাম কি হইবে!

'অরাজ'

কলিকাতার বরপুত্র, বিপুল অর্থের অধীশ্বর, হিন্দু ধর্ম্মের ধ্বজা-ধারকদের মহারাজাধিরাজ যে মহাকালী পাঠশালার পরিচালকমণ্ডলের অধিনায়ক, যে 'মহাকালী পাঠশালা' কলিকাতার হিন্দুত্বগৌরবের পরিচায়ক, একমাত্র হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় সেই মহাকালী পাঠশালার ভিত্তি গুলিতেছি ১০ হাজার টাকার তাড়ার মোগাদ্যন্ত্র দিয়া খনন করিয়াছেন। মহাকালী পাঠশালার দেনা ছিল ৩০ হাজার টাকা। শুনিয়াছিলাম, প্রসিদ্ধ তবলা ব্যবসায়ী শ্রীযুত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই দেনা পরিশোধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং এক বৎসর এই টাকার সুদ লইবেন না—এমন প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। এই এক বৎসরের মধ্যে টাকা তুলিয়া বিদ্যালয়টিকে ঋণমুক্ত করিবার ব্যবস্থাও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় করিবেন বলিয়াছিলেন। এ পক্ষে ২০ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতিও তিনি নাকি সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীদিগের নিকট পাইয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসা করি, এখন সুবিধাজনক ব্যবস্থায় স্কুল কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুত বিনয়েন্দ্রের হস্ত মহাশয় সমস্ত হন নাই কেন? আরও শুনিতেছি হস্ত মহাশয় স্কুল-কমিটির সদস্যগণের বিনা অনুমতিতেই নাকি বাড়ীটি বিক্রয় করিয়াছেন। এমন তিনি হাইকোর্টের মহারাজাধিরাজের আদেশ ও সম্মতি পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, স্কুলের ৩০ হাজার টাকা দেনা পরিশোধ করা হইয়াছে। আর আদায় ১০ হাজার টাকা বিনয়েন্দ্রবাবুর নিকট বাকি পড়িয়া আছে।

এদিকে একাদশ,—বিনয়েন্দ্রবাবু ইনসলভেণ্ট অর্থাৎ দেউলিয়া হইবার জন্য হাইকোর্টে দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন। এ খবর যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দুঃখিনী মহাকালী পাঠশালার এই ১০ হাজার টাকার গতি কি হইবে? হাইকোর্টের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের নিকট আমরা সকল ব্যাপার শুনিতে চাই। তিনি আমাদের উৎকণ্ঠা দূর করিবেন কি?

'অরাজ'

সি বলশেভিক বলিয়াছেন, জনসাধারণের সৈন্যদল রাখিবার পর যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কাজ হইতে এ পর্য্যন্ত মাত্র ৪৩ কোটি টাকা। ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে গেলে লোকসান ছাড়া লাভ হয়, এমন কোন দিন দেখা যায় নাই। কাজেই সি বলশেভিকের কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই।

'অরাজ'

টাকাটার মধ্যে আরও কত মিলাইবে? 'ঃ সঃ'

১৯১২ হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে মুসলমান, খৃষ্টান বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকসংখ্যাই বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু হিন্দু-সংখ্যা ২,৩৯,২৫১ কমিয়াছে। হিন্দুর সংখ্যা এত কেন কমিতেছে—হিন্দুর ভাবা একবার ভাবেন কি?

[illegible] শ্রীযুক্ত বিনয়ের অনুবাদ এখন মুদ্রণ পর্য্যন্ত। উপহার [illegible] একখানি হইয়াছে। মূল্য ১।০

"পথ গেল ভরে কুহকের শরে, কেঁদে কেঁদে গেল বুক ঢেকে
সন্ধানে তার চোখ ছুটি গেল, কণ্ঠ কাতর ডেকে ডেকে।"

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

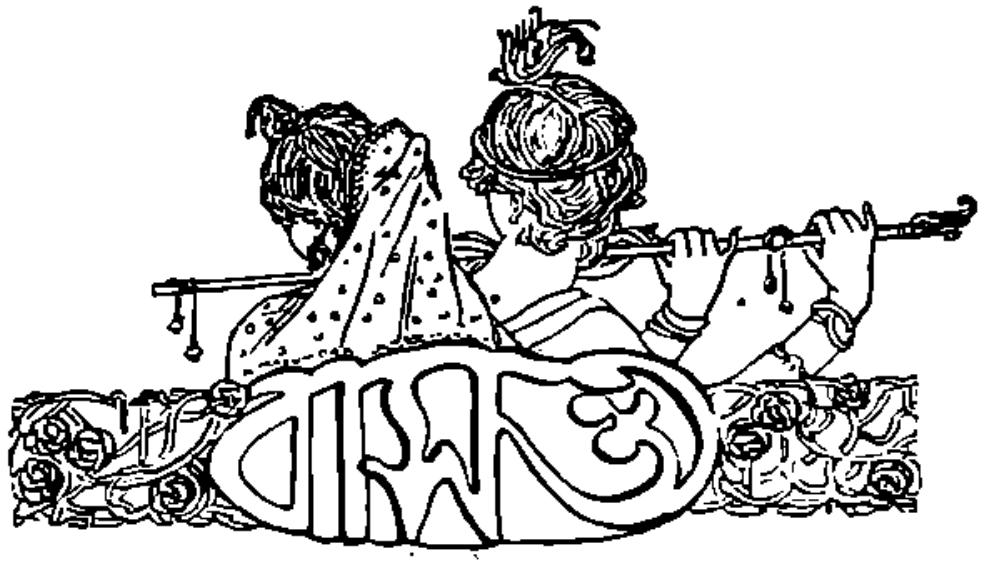

২য় বর্ষ] ১২ই শ্রাবণ শনিবার ১৩৩০, ইং ২৮শে জুলাই। [৪র্থ সংখ্যা

সাময়িক সঙ্গীত

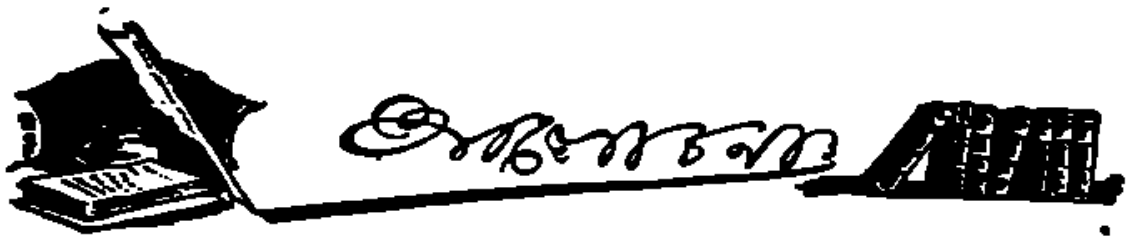

অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে যে দাঁড়াইতে পারে না—দাঁড়াইবার যোগ্য শক্তি ও সাহস যে হারাইয়া ফেলিয়াছে লোকে তাহারই উপর অত্যাচার করিবার সাহস পায়। অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস হইতে প্রথম প্রথম অত্যাচারীর অত্যাচারের বেগ হয়তো আরও জোরে আসিতে পারে। কিন্তু আঘাতে প্রতিঘাত যদি দু' চার বার পড়ে তবে অত্যাচারী আপনা হইতেই ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু বার বার বাধা না দেওয়াতে—অত্যাচারী ভাবে সে অপ্রতিহত, দুর্জ্জয়—সুতরাং তাহার অত্যাচারের লোভ মাদকতা, শক্তির গর্ব্ব দেখাইবার স্বাভাবিক ইচ্ছা ক্রমেই বাড়িয়া চলে। আজ জগতের সর্ব্বদেশের সর্ব্ব জাতি ও সমাজ—ব্যক্তি বিশেষ, অত্যাচার অবিচার সহিতে নারাজ। তাই তাহারা অত্যাচারীর অত্যাচারকে প্রতিঘাতে প্রত্যাহত করিতেছে। ইহাতে অত্যাচারীর অত্যাচারের বেগ প্রথমটা অত্যাচার অসহিষ্ণুদের উপর তীব্রভাবে পড়িলেও তাহা ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া আসে। অসহিষ্ণুদের অসহিষ্ণুতার তীব্র ঝাঁকে শক্তি গর্ব্বীর সহ-জাত অত্যাচার করিবার প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ইহাই বিশ্বের মানব মনের নিয়ম; এবং যুগ-যুগান্ত হইতে জগৎ এই ভাবেই চলিতেছে। মিষ্টি কথায়—ন্যায় ও মনুষ্যত্বের বচনে অত্যাচারীর অত্যাচার স্পৃহা কমে না। শক্তির সাধনা করিয়া—ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্যে অত্যাচারিত মানবের মনুষ্যত্বের বোধ যখন জাগ্রত হয় তখনি শুধু ধীরে ধীরে অত্যাচার গর্ব্বিতের ক্ষমতার হ্রাস হয়। অনিয়ম অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ইহাই পন্থা। যে ভাবে যে দিক দিয়াই যাও ইহাতে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। এ সংঘর্ষে জয় পাইয়া পিছাইয়া থাকিলে অত্যাচারীর হাতে ক্রমশঃ আরও নির্য্যাতিত হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। তাই অত্যাচার হইতে যাহারা মুক্ত হইতে চাহে—তাহাদের সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। বুদ্ধি, বল ও কৌশলে সংঘর্ষের মুখে দাঁড়াইবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে হইবে।

• • • •

নব্য তুর্কীর বিজয়োল্লাসে আজ সমগ্র ভারত আনন্দিত। সমগ্র প্রাচ্য জগতও বোধ হয় ইহাতে নূতন একটা আশার কিরণ দেখিতে পাইয়াছে। এ যুগে প্রাচ্যের কাছে পাশ্চাত্যের এতটা নতি স্বীকার অভাবনীয়। আবেদন নিবেদন, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কথার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দেওয়ার মধ্যে নব্য তুর্ক সম্মানের এ বিজয় মালা কণ্ঠে ধারণ করে নাই। সমানে সমানে অসি ধারণের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া, সমান সমান রাজনৈতিক চালে দক্ষতা লাভ করিয়া তুর্ক আজ এই অমূল্য সম্পদের অধিকারী হইয়াছে। জাতির হৃত প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধারের উদগ্র বাসনা—অসাধারণ মানসিক বল সম্পন্ন জনকত স্বদেশ প্রাণ যুবক যুবতীর প্রাণে জাগিয়াছিল। নব্য তুর্ক সম্প্রদায় এই দেশ প্রাণতার প্রেরণা সমগ্র জাতির উপর দিয়া বহাইয়া দিয়া—দুর্দ্ধর্ষ জাতির স্তিমিত অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিবার বল দিয়াছেন। মুস্তাফা কেমাল এই জাতীয় জীবন যজ্ঞের হোতা—প্রাচ্যের বিরাট শক্তিশালী পুরুষ। শক্তির বন্দনা আজ সারা জগত করিতেছে।

• • • •

তুর্ক জাগিয়াছে। আফ্‌গানীস্তান, পারস্যেও জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এ জাগরণের সাড়ায় প্রাচ্যের আরও অনেক দেশ ও জাতি যে নূতন জন্ম লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান ও চালই যে জগতের উপর প্রভুত্ব করিবার একমাত্র যোগ্য ইহা প্রাচ্য বোধ হয় আর স্বীকার করিয়া থাকিতে চাহিবে না। চোখের ধাঁধা ও মনের ধাঁধা একবার কাটিলেই

জাতির মুক্ত স্বাধীন মনোবৃত্তি আবার বিপুল ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া চলিবে। সে ধারায় কত ফুল প্লাবিত হইবে, কত ভাঙ্গা গড়া চলিবে কে জানে?

• • • •

ভারতের রাষ্ট্রে, সমাজে, ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখ লাঞ্ছনার অবধি নাই। দিনে দিনে ইহা বাড়িয়াই চলিয়াছে। আজ যে অত্যাচার লাঞ্ছনা বড় বেশী ভীষণ ভাবে গায়ে বাজে কাল তাহাই দেখি বড় গা-সওয়া হইয়া যায়। আবার নূতন একটা লাঞ্ছনা আরও ভীষণভাবে তাহার স্থান জাঁকাইয়া বসে।—এমনি করিয়া দিনে দিনে লাঞ্ছনার কত স্তূপিকৃত ভার যে দেশের জীবনে পাহাড় প্রমাণ হইয়া সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে তাহার শেষ নাই। কোনটার প্রতিকার কোন দিক দিয়া হইতেছে এমন কথা শোনা যত না যায়—নূতন নূতন লাঞ্ছনার কথা তার চেয়ে ঢের বেশী শোনা যায়। যুগের কি গলদে লাঞ্ছনার ও দুঃখের এই ভার ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে—এবং এত লাঞ্ছনাই বা এই দেশের ভাগ্যেই শুধু আসিয়া জমিতেছে কেন?—কোথায় ইহার মূল গলদ!

• • • •

জাতীয় লাঞ্ছনার এই লজ্জাভার অবসান করিয়া—জাতির ব্যক্তিত্ব বোধ, সমাজ বোধ, রাষ্ট্র বোধ ও দেশ বোধের একটা সাড়া বিদ্যুতের স্পন্দনের মত জাতির প্রাণে জাগাইয়া দিয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী! মানুষের মূল অধিকার, শিক্ষা সম্বন্ধ বোধ, মর্য্যাদা জ্ঞান, কতটা দেশবাসীর আছে ও দেশবাসী কোনটা কতটা পাইবার যোগ্য তাহার অনেকটা পরখ হইতে পারিয়াছিল মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে। সে পরখে জাতির লাঞ্ছনা সর্ব্বদিক দিয়া এমন কলঙ্কিত মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—যে জাতি তাহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিল।—সত্যস্বরূপ এই এ দেশের!

• • •

জাতির জাতীয় আন্দোলন মহাত্মাকে কেন্দ্র ও লক্ষ্য রাখিয়া যখন উহার গতিতে চলিয়াছিল—তখন সে গতি প্রবাহ তাহার ভক্ত হইয়া গেল মহাত্মার একটি বাক্যে। জাতীয় উৎসাহকে এমন করিয়া স্তম্ভিত করিয়া—প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আত্মাহুতি দিয়া মহাত্মা একি খেলা ভারতের সমগ্র জাতীয় জীবনের উপর দিয়া খেলিয়া গেলেন! এ কি জাতির ধৈর্য্য—ধৈর্য্য ও একাগ্রতা পরীক্ষা—না কি? না বল্গা সবাইয়া লইয়া আবার জাতিকে স্বেচ্ছায় চলিতে দিয়া দেখা যে চালক কিভাবে কেমন চলিবার ক্ষমতা! যোগ্য আলো এ চালনা পাইলে জাতি সংঘবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইতে পারে, সংহতি বোধও তাহার মধ্যে আসে, তাহা না হইলে সব যেন কেমন খাপ-ছাড়া, বেসামাল হইয়া পড়ে।

• • • •

দেশে ব্যক্তি লাঞ্ছনা হয়—সমাজ হাসে, সমাজের গায়ে ব্যক্তির লাঞ্ছনা লাগে না। সমাজকে সমাজ যখন আবার এইভাবে লাঞ্ছিত হয়—তখন ব্যক্তির গায়ে বড় বাধে না ব্যক্তি তখন হাসে। রাষ্ট্রে লাঞ্ছনা হয়—সমাজ ও ব্যক্তি ভাবে নিজেকে কোন রকমে বাঁচাইতে পারিলেই হইল। ব্যক্তির উপর আজ সমাজের যে লাঞ্ছনা চলিয়াছে—ইহার বিরুদ্ধে ব্যক্তি বিদ্রোহ করিতে পারিতেছে না। ব্যক্তি পিষ্ট হইয়া পড়িতেছে—সমাজ হাসিতেছে। বাংলার সমাজে একদিকে এই হাসি—আর এক দিকে নিরবচ্ছিন্ন কান্না। কান্না প্রাধান্য লাভ করিতেছে, হাসি তাহার ভিতর ডুবিয়া যাইতেছে। সবটা দেশ যখন শুধু কান্নার হাহাকারে ভরিয়া উঠিবে তখন হয় জাতি মরিবে নয়তো বিদ্রোহ করিয়া একটা ব্যাভিচার ঘটাইবে। মাঝা মাঝি অবস্থায় এ সমস্যার প্রতিকার বুঝি হইবে না।

• • • •

মহাত্মা গান্ধীর কারাগমনের পর হইতে দেশ জোড়া আবার একটা বিক্ষোভ জড়তা অবসাদ ও ম্লানভাব আসিয়াছে। আজ নানা জনে নানা মত দিতেছে—দেশ কাহারো মত শুনিতেছে না। তাহাদের কথা জন কত কাগজওয়ালা নিত্য কাগজ পুরাইবার জন্য ছাপিতেছেন—দেশের লোকের প্রাণে সে কথা আদৌ বল ভরসা জাগাইতে পারিতেছে না। গ্রহণ করিবার যোগ্য বা অযোগ্য কোন রকম কথাই তাহার অনেকগুলি নয়। যেন শুধু কিছু বলিতে হইবে এই জন্যই তাহা বলা। এমনি যখন দেশের অবস্থা তখন মহাত্মা

গান্ধীর দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কি মতামত তাহা জানিবার জন্য দেশবাসীর স্বাভাবিক একটা কৌতূহল হওয়া বিচিত্র নয়। মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘ ছ'বৎসরের জন্য কারাগতে প্রেরিত। প্রতিত অবস্থায় জেলের প্রাচীরের মধ্যে বসিয়া তিনি সূতা কাটিয়া তাঁত বোনেন, আর বই পড়েন এই তাঁর কার্য্য। আর চিন্তা যে কি করিতেছেন—সে আমরা ধারণা বা অনুভব করিতে পারি মাত্র।

*

মহাত্মা কারাগমনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে এবং তারপরও দু'একবার বোধ হয় বলিয়াছেন এক হাজারও অন্ততঃ অ-সহযোগ বিশ্বাসী লোক যদি থাকে তবে এ আন্দোলন সার্থক হইবে; ছ' বৎসর পরে ভারতের কোটি কোটি অ-সহযোগ বিশ্বাসী লোকের মধ্যে এক হাজার লোকও কি মহাত্মা পন্থী থাকিবে না?

* *

সে দিন শেঠ যমুনালাল বাঁজাজের প্রেস্তারের পর মহাত্মার সহধর্ম্মিণী তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে মহাত্মা বলিয়াছেন—তোমরা জেলে যেতে পারনি—এখনো যে বাইরে—এই দুইটি মন্তব্য হইতে মহাত্মার মতামত বোঝা যায়।

* * * *

অতবড় সম্মানী শিখ সামন্ত রাজা নাভার মহারাজ—তাঁর এমন ভাবে সিংহাসনচ্যুতি। রাজা নাকি স্বাধীন-চেতা—তাই তাঁর এ দুর্গতি। তা হলে রাজা মহারাজাদের ও রকম হইতে নাই। যে সব স্বাধীন সামন্ত রাজ নিজ রাজ্য হইতে দেশী সংবাদ পত্র বিতাড়িত করেন তাঁরাই তা হলে চালাক লোক। কিন্তু আজ মহারাজের পক্ষে দু'কথা বলাতে আকালীতে-পরদেশী পত্রের প্রচার নিষেধ হইয়াছে। তাকে আর সে পত্র স্থানান্তরে যাইতে পারিবে না। শিখ সমাজ এই ব্যাপারে আন্দোলন করিতেছে। কিছুদিন আন্দোলন চলিবেও বটে—তারপর থামিবার সময় হইলে আপনিই থামিবে। যা গেল নাভার মহারাজেরই গেল। অমন পঞ্জাবের ছিল দীলিপ-সিংহেরও গিয়াছে, আরও অনেকের গিয়াছে। সময় হইলেই যাইবে।

* * * *

তারকেশ্বরের মোহান্তের এলাকায় তারকেশ্বরের মন্দির স্থাপিত। এখানে অসংখ্য হিন্দু নরনারী শ্রদ্ধাভার পূজা দিতে যান। বাংলার এই বর্দ্ধ স্থানটি প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই বর্দ্ধ স্থানটি সম্বন্ধে নানা কলঙ্ক কাহিনী শোনা যায়। দেবতা দেখিতে যাত্রীদের নিকট হইতে জুলুম করিয়া দর্শনী আদায় এসব তো হিন্দু দেব দেবীর মন্দির ও তীর্থ স্থানের কলঙ্ক আছেই। এ ছাড়া আরো যে কলঙ্ক শোনা যায় সে বড় ভীষণ! সুন্দরী স্ত্রীলোক এই সব তীর্থ স্থানে গেলে মন্দিরের ক্ষমতাশালী লোকেরা তাহাদের মর্য্যাদা নষ্ট করিবার প্রয়াস পায়। এই কেলেঙ্কারী পূর্ব্বে তারকেশ্বরে ঘটিয়াছে—শোনা যায় বিচারালয়ে অপরাধীর সাজা হইয়াছিল। এখনও এ সম্বন্ধে জোর গুজব রটে এবং অনেকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। তবে হাতে নাতে ইহার প্রমাণ মেলে না।" তাই বিচারালয়ে এমন গুরুতর অভিযোগের বিচার সম্ভব নয়। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মের দিক্ দিয়া ও মনুষ্যত্বের দিক দিয়া এ গুজব রটিবার কারণ যাহাতে না ঘটিতে পারে তেমন ব্যবস্থা হওয়া সঙ্গত নহে কি? দেব দেবী যদি সাধারণের সম্পত্তিই হয় তবে তাহার উপর সাধারণের আধিপত্য থাকা বাঞ্ছনীয়। এক জনের জমিদারীর ছত্র তলে দেশের ভক্তিমতী নারীরা পূজার্থিনী হইয়া গিয়া যদি অপমানিতা লাঞ্ছিতা হইয়া আসেন তবে কি উপায় হইবে! শোনা যায় এমন ভাবে ভ্রষ্ট-চরিত্রের কাছে লাঞ্ছিতা হইয়াও যুবতীরা যা তাহার আত্মীয়েরা সমাজে লাঞ্ছিতা হইবার ভয়ে এই লজ্জা ও গ্লানিজনক ব্যাপার চাপা দিতে চেষ্টা করেন—তাই লম্পটের বিচারালয়ে যোগ্য সাজা পাইবার ব্যাঘাত ঘটে। হায়রে সমাজ আর দেববন্দির!—

বাঙ্গালীর বীরত্ব

চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায়।

[শ্রী যতীন্দ্রমোহন রায়]

রাজনীতি ক্ষেত্রে খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী আধুনিক বাঙ্গালীর শেষ গৌরবময় পুণ্যযুগ। সেই অতীতযুগে বাঙ্গালীই বাঙ্গালা দেশের অধিপতি ছিল—সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহাদেরই শাসনাধীন ছিল—বাঙ্গালার পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদয় বাঙ্গালা কেদার, প্রতাপ, কন্দর্পনারায়ণ, রামচন্দ্র, কীর্ত্তিনারায়ণ, লক্ষ্মণমাণিক্য, মুকুন্দরাম, শক্রজি, ঈশাখাঁ, চাঁদগাজী, কমলগাজী প্রভৃতি বীরপুরুষগণের বীরত্বগৌরবে সমুজ্জ্বল ছিল। তাঁহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, অধ্যবসায়, জয়-পরাজয় কাহিনী, বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত ওতঃপ্রোত-ভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। এতকালের পর—সকল কথার আলোচনা করিবার উপায় নাই। বিদেশীয় ভ্রমণ-কারীগণের গ্রন্থে, মুসলমান ঐতিহাসিকগণের তত্ত্বারিখে মেশীয় মুলাচার্য্যগণের ঘটককারিকায় বিক্ষিপ্তভাবে তাঁহাদের সেনাদলের বাহুবিক্রমের কথা তাঁহাদের অলৌকিক স্বদেশপ্রেম ও আত্মবিসর্জ্জনের কথা উল্লিখিত আছে। এই সময়ে পাঠানগণ তাহাদের ভূমিহরণে ব্যস্ত, মোগলেরা তাহাদের স্বাধীনতা লোপ করিতে বদ্ধপরিকর, মগ ও ফিরিঙ্গিগণ তাহাদের ধনসর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে অগ্রসর। বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে বাঙ্গালীর, উপযুক্ত নেতার অধীনে আপনাদের বাহুবল আশ্রয় করিয়া সকলেরই বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। একালের বাঙ্গালীর ন্যায় তখনকার বাঙ্গালীরা হীনবীর্য্য ছিল না। তাহারা ভাসমান পক্ষীছায়ার উপরিষ্ট হইয়া বাঙ্গালার এই বিপ্লব নীরবে সন্দর্শনে করে নাই। মোগল-পাঠান—মগ—ফিরিঙ্গি এই শত্রুচতুষ্টয়ের বিরুদ্ধে শক্তিপরীক্ষার জন্য সেকালের বাঙ্গালী বন্দুক তরবারি ধারণ করিয়া সেই অদ্ভুত সমর ক্রীড়ায় প্রেমদান করিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ ছিল এই রণক্রীড়ার পীঠস্থান। আজকালও সন্ধ্যায় পল্লী বৃদ্ধগণের মুখে মুখে তাঁহাদের, কীর্ত্তিকাহিনীর কথা সগৌরবে গীত হইয়া থাকে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেকালের জনৈক বাঙ্গালী নেতা চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায়ের পুণ্য কাহিনীর আমার আভাস মাত্র প্রদান করিব।

বঙ্গদেশে ষোড়শ শতাব্দীতে যে কয়েকটী হিন্দু ভৌমিকের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে বাকলা চন্দ্র-দ্বীপের কন্দর্পরায় একজন শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। কন্দর্পনারায়ণের পিতামহের নাম পরমানন্দ বসু। ইনি চন্দ্রদ্বীপের প্রাচীন দেব-রাজবংশের কন্যা কমলার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেব-রাজা বংশের শেষ রাজা অপুত্রক মৃত হইলে কমলার বংশধর জগদানন্দ যাতামহের রাজ্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। কিন্তু কিয়ৎকাল রাজ্য ভোগ করিবার পর নদীগর্ভে পতিত হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। প্রবাদ এই যে, রাজা জগদানন্দ সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন; এজন্য মৃত্যুকালে তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি বলে পদ্মা জলবৃদ্ধি করিয়া রাজপুরী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া-ছিল এবং নদীগর্ভ হইতে দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে জলমধ্যে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিয়া-ছিলেন। তাহার ফলে রাজা নদীর জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

পিতার মৃত্যুর পরে কন্দর্পনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই সময় মগ ও ফিরিঙ্গিগণের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। পর্ত্তুগিজ ফিরিঙ্গিগণ এদেশে বাণিজ্যার্থ সমাগত হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক্‌গণের প্রতিদ্বন্দ্বি-তায় উত্তেজিত হইয়া দস্যুতা অবলম্বন করতঃ জলপথে নানা প্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহারা সমুদ্রোপকূলে এবং নদীমুখে প্রবিষ্ট হইয়া,—গ্রাম-সমূহ বিনষ্ট করিয়া, প্রথাদি লুণ্ঠন করিয়া, রমণীগণের সতীত্ব—মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া, সর্ব্বত্র ভীতির সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহাদের অত্যাচার উৎ-পীড়নের কথা দেশে প্রবাদের মত প্রচারিত হইয়া

পড়িয়াছিল। এই জন্যই কবিকঙ্কণ তদীয় অমর কাব্যে লিখিয়াছিলেন :—

"কিরাতির দেশখান বাহে খর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমাদে ডরে।"

ইহাদের অত্যাচারে সমগ্র সুন্দর-বন অকাল জনমানব-হীন হইয়াছিল। কন্দর্পনারায়ণ এই সমুদয় জলদস্যুগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাদের সঙ্গে বহুবার যুদ্ধ করিয়াও তাহাদের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভের কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। পিতার শোচনীয় মৃত্যু এবং পদ্মপালতুল্য জলদস্যুগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হেতু কচুয়াতে রাজধানী রক্ষা করা কিছুতেই নিরাপদ নহে স্থির করিয়া কন্দর্পনারায়ণ বর্ত্তমান বরিশাল নগরীর ঊনপঞ্চাশৎ বর্ষপূর্ব্বে বাবুগঞ্জকাঠী নামক গ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই স্থান হইতে পুনরায় হোসেনপুর, পরে ক্ষুদ্রকাঠী গ্রামে স্থানান্তরিত করেন। এই সকল স্থানের স্বাস্থ্য ও সমাজ দোষশূন্য জ্ঞান করিয়া অবশেষে তিনি মাধবপাশা গ্রামে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজধানীর ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।

কন্দর্পনারায়ণ মাধবপাশায় রাজধানী স্থাপন করিয়া চতুর্দ্দিকে পরিখা এবং সুদৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টন করিয়াছিলেন এবং তৎপর যুদ্ধোপযোগী সৈন্য এবং উৎকৃষ্ট নৌবহর নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন। কন্দর্প নারায়ণের নির্ম্মিত একটী পিত্তলের কামান বরিশাল পুলিশ কোর্টের সম্মুখে অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কন্দর্পনারায়ণের অত্যুদয় দৃষ্টে তুলুয়াধিপতি বীরবর লক্ষ্মণ মাণিক্য ঈর্ষান্বিত হইয়া সময় সময় চন্দ্রদ্বীপ আক্রমণ করিতেন এবং কন্দর্পনারায়ণও লক্ষ্মণ-মাণিক্যের রাজ্য মধ্যে সসৈন্যে আপতিত হইয়া লুণ্ঠন করিতেন। ফলে উহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহাদি চলিত। কথিত আছে যে একবার উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইলে উভয়েই তুল্য বলশালী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার পরে পরস্পরের বিরোধের অবসান হইয়াছিল।

এই সময় মোগলের বাহুবলে পাঠান-শক্তি নির্ম্মূল প্রায় হইয়াছিল। তথাপি পাঠানেরা দলবদ্ধ হইয়া প্রণষ্ট —গৌরবের উদ্ধার মানসে সময় সময় মোগলের অধিকৃত স্থান সমূহ আক্রমণ করিত। দুর্দ্ধর্ষ পাঠান-বীর মাসুম কাবুলির সহিত একবার মোগল সেনাপতি সাহাবাজ খাঁর শক্তিপরীক্ষা হইয়াছিল। মাসুমখাঁ যমুনা নদীর তীরে আসিয়া সাহাবাজের গতিরোধের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সাহাবাজ সহস্র সহস্র তীর ও গোলা গুলির মধ্য দিয়া দ্রুতগতিতে নদী অতিক্রমণ পূর্ব্বক বিপক্ষ দলের সন্নিহিত হন। বিদ্রোহীরা সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়নপর হয়। এই যুদ্ধে বাবসাহের রণতরী যোগদান করিতে পারে নাই। কন্দর্পনারায়ণের নৌবলের সহায়তার ফলেই এই যুদ্ধে মোগল সেনাপতির জয়লাভ হইয়াছিল। পলায়নপর পাঠানগণ জীবাংশা পরবশ হইয়া চন্দ্রদ্বীপ উপস্থিত হয় এবং কন্দর্পনারায়ণের রাজ্য মধ্যে উৎপাত আরম্ভ করে। বীরহৃদয় তেজস্বী কন্দর্পনারায়ণ সসৈন্যে পাঠানগণকে হোসেনপুর নামক স্থানে আক্রমণ করিয়া এরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল যে, হতাবশিষ্ট পাঠান-সৈন্য বহুকষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

হোসেনপুরের যুদ্ধের পরে কন্দর্পনারায়ণ মগদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হন। একবার মগেরা বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া মাধবপাশার সন্নিকটবর্ত্তী হইলে কন্দর্পনারায়ণ জলপথে এবং স্থলপথে তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের পথ রুদ্ধ করিয়া অসীম বিক্রমে শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান "মাণিক-মুদীর ভাবানী" নামক খাল যে স্থানে কালীগিরা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে সেই স্থানে উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। ফলে মগেরা পরাজিত হইয়া রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল।

মোগল-পাঠান-সংঘর্ষকালে মোগলের পক্ষাবলম্বন করিলেও মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে কন্দর্পনারায়ণ অন্যান্য ভৌমিকগণের ন্যায় বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া মোগল শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

মায়া

[শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ]

চারিদিকে অফুরন্ত সবুজের ঢেউ।...

শ্যামল শস্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে ছোট একটী গ্রাম্য পথ—শীর্ণ, শুভ্র, কঠিন।... ... ...

সেই পথে রোজ আমাকে দু'বার যাওয়া আসা করিতে হয়—একবার দশটায়—আবার চারটায়—আমি স্কুল মাষ্টার!...আমার বাসা হইতে স্কুল প্রায় এক মাইল দূর—আমি রোজ এই পথটুকু দশ মিনিটে হাঁটিয়া চলিয়া যাই। অন্যান্য মাষ্টার আমার এই ক্ষমতা দেখিয়া আমাকে তারিফ করেন।... ...

স্কুলের ঠিক মাঝ পথে একটী ছোট্ট গ্রাম। তাহারি সম্মুখে একটী বাগানের ধারে প্রকাণ্ড এক আম গাছ। সেই আম গাছের নীচে রোজ দেখি সে দাঁড়াইয়া আছে—কুন্দ ফুলের ন্যায় শুভ্র তার দেহ...সরলতা মাখানো বড় বড় তার দুটী চোখ...নবযৌবনের গতি চঞ্চলতা উছলিত তার সর্ব্ব অঙ্গে।... ... ...

রোজ আসি, রোজ যাই...দেখি সে ঠিক ঐ গাছ তলাটীতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেখিয়া দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। এমন নির্জ্জীব গ্রাম, এমন গ্রাম্য সরলতাপূর্ণ টানা টানা চোখ, এমন নিটোল শুভ্র-দেহ—কার মন না এতে মুগ্ধ হয়?... ... ...

আমার প্রতীক্ষা সে নিশ্চয়ই করে—নতুবা রোজ ঠিক স্কুলের সময়টীতে সেই গাছতলায় ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানটীতে আসিয়া দাঁড়াইয়া সে থাকিবে কেন?...সেকি উদ্দেশ্য-হীন?...নিরর্থক?...অমনি, অমনি?... ...

কোনোদিন বিকালে দেখি তার মা সেই বাগানের পাশ দিয়া কোথায় যাইতেছে। যাকে দেখিবামাত্র সে ছুটিয়া পলাইয়া যাইত। এমনি ভাবে দশমাস কাটিয়া গেল।.... ... ...

তখন শীতকাল। মাঠে শস্য নাই। ঐ গ্রামের পাশ দিয়া যাইতেছি—সেই বাগান—ঐ আমগাছ—কিন্তু কই!...সে কোথায় গেল?...সে কেন আজ আসিল না?... ... ...

চিন্তা ভারাক্রান্ত মনে চলিয়াছি...পা যেন চলিতে চায় না।... কিছুদূর অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইলাম এক ঝাঁক পাখী—শকুনের পাল!...

একটা কঙ্কাল ঐ না দেখা যাইতেছে!...

কোথায় সেই নিটোল দেহ—শুভ্র-কান্তি—স্নিগ্ধ চাহনি!...নিঃশেষে আজ ঐ শকুনীর দল সে সব গ্রাস করিয়াছে! একদিন যাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম সে কোন রূপসী রমণী ছিল না—সে ছিল একটী ছোট্ট গোবৎস!... ...

ধন্য হতাশা

[শ্রীলীলা দেবী]

যে আশা মোর হয়নি সফল
সেই হতাশা
তোমার আশায় জাগল মোর
প্রেম পিয়াসা;
যে সাধ আমার বাধ সেধেছে
সে বাধ সাধা
সরিয়ে দিল তোমার সাথে
দেখার বাধা।

তাইতো স্বপন ব্যর্থ আমার
পাই যে সাড়া তোমার আমার
হতাশা তাই আনন্দ ভূত
গোপন হাসা।

যে ফুল আমার পায়নি রবির
কিরণ পরশ
পায়নি শশীর সুধার ধারা
নিবিড় হরষ
আঁধার ঘন সেই গহনে
প'ড়ল চরণ কোন লগনে
তোমার প্রেমে ধন্য আমার
বিফল আশা—
যে আশা মোর হয়নি সফল
সেই হতাশা!

বুদ্ধির জোর.

[শ্রীসুমতীবালা মজুমদার]

১

সেদিন পূজার ছুটীতে দেখে যাচ্ছিলাম। শেয়ালদ' ষ্টেশনে এসে ভীড় দেখে বাড়ী যাওয়ার আশা সেদিনের মত একরকম ছেড়ে দিয়েছিলাম। হঠাৎ সৈলেনের পাল্লায় পড়ে গাদা গাদা লোক ঠেলে প্লাটফরমে ঢুকতে হ'ল। প্লাটফরমে লোকের মত জনস্রোত দেখে আর গাড়ীর ভেতর গাদাগাদি আরোহী দেখে মনে যেটুকু বা আশা ছিল, তাও গেল। সৈলেন আমাকে টানতে টানতে একটা গাড়ীর সামনে থেকে অন্য গাড়ীর সামনে নিয়ে যেতে লাগল। বৃথা আশা গাড়ীতে তিল পরিমাণ স্থানও ছিল না। হতাশ ভাবে বলিলাম—"আর কেন ভাই, ফিরে চল। আজকের মত যাওয়ার আশা ছেড়ে দাও।" সৈলেন বলিল—"দূর তাও কি হয়—আজ আমি মরিয়া হয়েছি। আজ যাবই।"

গাড়ীর ঘণ্টা হল। সৈলেন জোর করে আমাকে নিয়ে একটা কামরার মধ্যে ঢুকল। আমাদের বেগ সামলাতে না পেরে কতকগুলি আরোহী পড়ে গেল। গাড়ীর মধ্যে মহা গোলযোগ পড়ে গেল। যারা পড়ে গিয়েছিল তারা নানা রকম বিশেষণ যোগ করে আমাদের মিষ্ট সম্বোধন করতে লাগল। আমরা কোন কথা না করে সেই গোলমালের সুযোগে দুটী দাঁড়াবার স্থান করে নিলাম।

"কি গরম বাপ্‌রে বাপ্! জামা কাপড়গুলো সব ভিজে গেছে" বলিয়া সৈলেন সার্টের বোতাম খুলিতে লাগিল। আমি বলিলাম—"কতক্ষণ এমন করে থাকবি?"

—"যাক্ কেন, গাড়ীটা একবার ছাড়ুক, বসবার যায়গা হবে এখন"—সোয়াস্তাবে সৈলেন উত্তর করিল।

২

হু হু করতে করতে চাঁদপুর মেল উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে পড়ল। বাতাস গায়ে লাগতে লাগল—বড়ই আরাম বোধ করিলাম। নিজেদের পূর্ব্ব অবস্থার কথা ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়েছি—এমন সময় দেখি সৈলেন অজ্ঞান হয়ে কতকগুলি লোকের উপর পড়ে যাচ্ছে।—ধরি করে তাকে ধরলাম কিন্তু রাখতে পারলাম না। কতকগুলি লোককে নিয়ে সে গাড়ীর পাটাতনের উপর পড়ে গেল।—"কি হ'ল কি হ'ল"—গাড়ীর মধ্যে একটা রব উঠিল। বহু আরোহী স্থানত্যাগ করে ঠেলা ঠেলি করিয়া দেখিতে আসিল। দয়ালী আরোহী দ্বারা তারা ধরাধরী করে সৈলেনকে তুলে নিজেদের বসবার বেঞ্চে শুইয়ে দিল। সৈলেনকে বেঞ্চে শোয়াইবার পর একজন আরোহী বলিল—"ইনি কি আপনার লোক মশাই?

—হাঁ

—এঁর কি মিরগির ব্যারাম আছে?

—না—এই গরমে বোধ হয় সর্দ্দিগরমি হয়ে থাকবে।

—ওর মাথাটা কোলে করে একটু বসুন না মশাই আমরা না হয় একটু দাঁড়িয়ে থাকি।

আমারও বসবার নিতান্ত দরকার হ'য়ে পড়েছিল আর সৈলেনের এই অবস্থা দেখে মনে বড় ভয়ও হয়েছিল—তা যা হোক, আমি সৈলেনের মাথাটী কোলে নিয়ে বসলাম।

৩

কত দেশ কত প্রান্তর কত ষ্টেশন পেছনে ফেলিয়া চাঁদপুর মেল বিজয়ীর ন্যায় আনন্দ ধ্বনি করিতে করিতে রানাঘাটে আসিয়া থামিল।—বহুলোক নেমে গেল—গাড়ীটা প্রায় খালি হয়ে গেল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সৈলেন চোক বুজে ছিল, এবার চোখ খুলতে খুলতে উঠে বসল।

—"কোন ষ্টেশন রে?"

—রানাঘাট, তুই ঘুমো।

—সত্যি ভাই বড্ড ঘুমিয়েছি। এতক্ষণ তোর কোলে মাথা ছিল—কোন কষ্ট হয়নি তো তোর?

—কষ্ট খুবই হোত যদি এখনও তুই না জাগ্‌তিস্।

—কেন আমার কি হয়েছিল?

আমি আদ্যোপান্ত সব কথা বলিলাম। শুনিয়া সৈলেন হাসতে লাগিল। তার পর বলিল—আচ্ছা বোকা তো তুই।

—কি রকম?

—আরামে বসে আছিস কি করে এখনও বুঝতে পারছিস্ না? ওটা একটা চাল। আমি ইচ্ছে করেই বসবার যায়গা করবার জন্যে ঐ বুদ্ধিটা খাটিয়েছিলাম।—সৈলেন হাসিতে লাগিল।

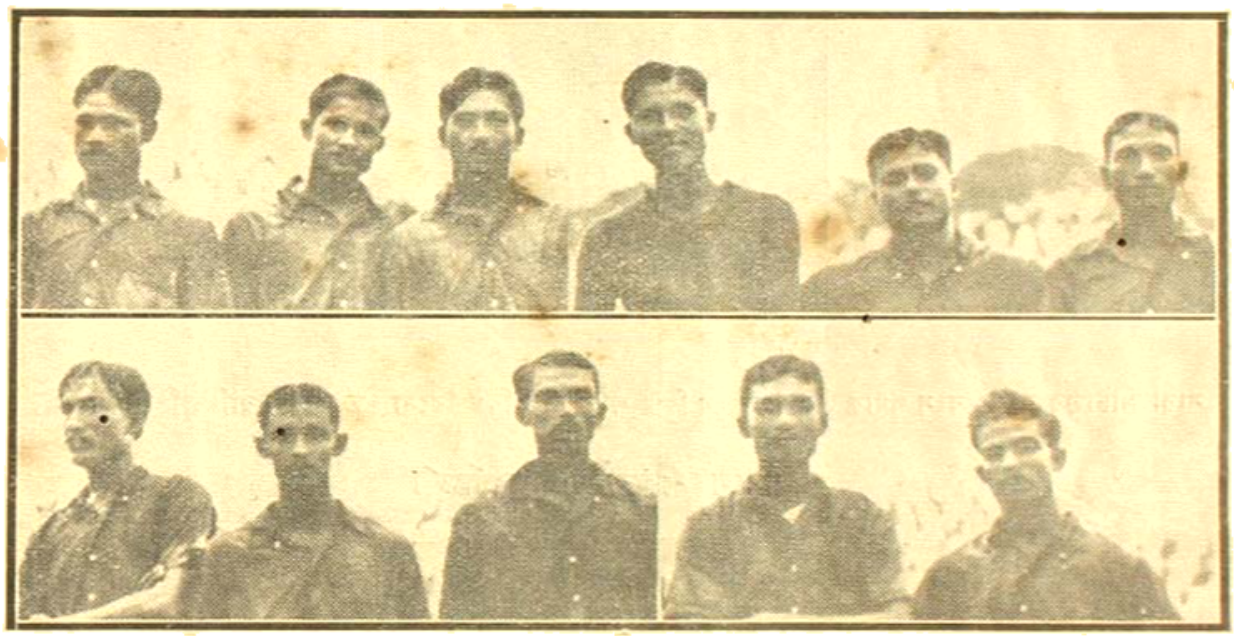

বাঙ্গালীর গৌরব—মোহনবাগানের খেলোয়াড়-বৃন্দ।

অভিনেত্রী সম্রাজ্ঞা শারা বার্ণাড।

শারার তুলনা বিহীন চক্ষু দু'টি।

শারা আটাত্তর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই চক্ষুর মোহিনী শক্তিতেই বিশ্ব বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

হ্যামলেট্-বেশে শারা বার্ণার্ড।

শারা হ্যামলেটের অভিনয় করিতেছেন—"Alas, Poor yorick !"

অন্তের পূর্ব্বে।

বার্দ্ধক্য-জীর্ণ বপু শারার অন্তরে নবীনতা পূর্ণ দৃষ্টি সেই আবেশময়ী যাহা অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও বিশ্বের পরম আদরের বস্তু ছিল।

শারার ভাস্কর্য্য।

শারা-যে থিয়েটারেই শুধু তাঁর প্রতিভা দেখিয়ে ছিলেন, তা নয়, শারা ভাস্কর্য্য বিদ্যাতেও যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। শারা শিল্পীরূপে যখন ষ্টুডিওতে কাজ করতেন তখনকার একটী চিত্র।

সে-কেলে সাজে শারা বার্ণাড

এ পোষাকে শারাকে দেখিলে কাহারো সাধ্য ছিল না যে বলে, শারা ফরাসী-কন্যা! শারা যে কোন্ দেশের মেয়ে, কোথায় ঘর, কেহই বুঝিতে পারিত না, অথচ সে যেন সবারই অতি পরিচিত।

আম্রঃ হারার-দল।

সাগর কূলে

[শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়]

"ধেৎতেরীকা—এমন ক'রে জীবন ভরা দুঃখ ভোগ করার চেয়ে দশবার মরা ভাল।"

রবীন হাঁ করিয়া সমুদ্রের নীল জলের দিকে চাহিয়া এই কথাগুলি বলিল। বেচারা একজনকে প্রাণপণে জোরসে ভালবাসিয়াছিল কিন্তু তাহার এক বিন্দুও প্রতিদান পায় নাই। সে সহর ছাড়িয়া, আজ লোকালয় হইতে দূরে একলা সমুদ্রের তীরে বসিয়া তারই কথা ভাবিতেছিল যে তার জীবনকে এমন ভাবে প্রেমসমুদ্রের তীরের পাথরের উপর আছড়াইয়া চূর করিয়া দিল। কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন এক সপ্তাহ শুরু ভোজনের পর বদ্‌হজম হইয়াছে। বদ হজমের চিহ্ন রবীনের মুখময় ছড়াইয়াছিল।

সে আপন মনে ভাবিয়া চলিয়াছে কত কি, তাহার ঠিক নাই। একবার তাহার মনে হইল সে প্রেমের জন্য তাহার সমস্ত জীবনকে বিশ্বমানবের কল্যাণে বিলাইয়া দিবে, আর একবার তাহার মনে হইল সে প্রতিহিংসা লইবে। কোনটা যে শেষ পর্য্যন্ত করিবে তাহা কোন রকমেই স্থির করিতে পারিতেছিল না। এমন সময় দেখিল, দূরে একটা ছোট ছেলে তাহার দিকে চাহিয়া হি হি করিয়া হাসিতেছে! ছেলেটার চেহারা দেখিয়া তাহার পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে একটা সেলার সুট পরিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে ঠিক একটা মুড়ির বস্তার মতন মনে হইতেছিল। আর তার মুখখানা একটা কাণাভাঙ্গা ভাতের হাঁড়ির মতন—গায়ের রংটা নিখুঁত কালো! ঐ হতভাগা ছেলেটা কিনা রবীনের এমন হৃদয়ভাঙ্গা দুঃখের দিনে মুক্তোর মত সাদা দাঁতগুলো সবকটা বাহির করিয়া হাসিতেছে! হায় রে! যদি সে রবীনের বাথার কণামাত্র হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিত, তবে সে এমন করিয়া সেলার সুট পরিয়া সমুদ্রের ধারে আসিয়া সাদা দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে পারিত না!

হঠাৎ একটা পাথর রবীনের নাকে আসিয়া লাগিল, রবীন মুখ তুলিয়া দেখিল সেই ভূতমুখো ছোঁড়াটা আর গোটা কয়েক পাথর তাহার দিকে পটাপট ছুড়িয়া দিয়া ডাঙ্গার দিকে দৌড় দিল। আরো কয়েকটা পাথর আসিয়া রবীনের কাণে চোখে এবং কপালে লাগিল। ভগ্নপ্রাণের উপর এই অত্যাচার রবীনের সহিল না, সে জুতা ফেলিয়া রাখিয়া ছেলেটাকে ধরিবার জন্য তাহার পিছন পিছন দৌড়াইতে লাগিল। তাহার আর অন্য কোন দিকে খেয়াল ছিল না। একটা বালির চিপি পার হইয়া সে যখন সেই কেলে ছেলেটাকে প্রায় ধরিয়া ফেলিয়াছে, তখন দেখিল, ছেলেটা একটি তরুণীর পাশে গিয়া আড় এবং গোবেচারার মতন মুখ করিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটিকে দেখিয়া রবীন থমকিয়া দাঁড়াইল। রবীন ছবি আঁকিত, কাজেই সে সৌন্দর্য্য দেখিলেই অবাক হইয়া দেখিত। সে ঐ কেলে, ভূতের মতন পাজী ছেলেটার সঙ্গে ঐ স্বর্গী পরীর মতন সুন্দরী মেয়েটিকে হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল। মেয়েটি বীণার ঝঙ্কারের মত মধুর কণ্ঠে বলিল

—আবার কি বাঁদরামো হচ্ছিল? বাবাকে চিঠি পোষ্ট করতে হবে মনে আছে কি? এখন তাড়াতাড়ি না করলে চিঠি আজ আর যাবে না, অথচ গত দুদিন কোন চিঠি তাঁকে দেওয়া হয় নি। তাড়াতাড়ি ফেলে এসো। ছোঁড়াটা বলিল—আমিত ভাই জন্যেই তাড়াতাড়ি আসছিলাম—পথে ঐ ভাজা কই মাছের মতন চোখওয়ালা লোকটা তাড়া করল, তাইতে দেরী হয়ে গেল।—

কথাগুলা বলিয়া সেই ছোঁড়াটা রবীনকে আবার মুখ ভেংচাইয়া দিল। রবীনের ইচ্ছা হইল, তাহার দুই গালে শ-পাঁচেক চড় বসাইয়া দেয়। রবীন কি বলিবে ভাবিতেছে এমন সময় সেই পরীকন্যা ঐ দানবটার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে চলিয়া গেল। তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাইল না। রবীনের চোখে মেয়েটিকে বেশ লাগিল। নীলাম্বরি সাড়ি পরিয়া—তাহার আঁচলটা

সমুদ্রের দিকে বাতাসে উড়িতেছে,—ভারি সুন্দর দেখাইতে, রবীনের ইচ্ছা হইল একবার মেয়েটির পিছনে দৌড়াইয়া বলিয়া আসে যে "তুমি বড় সুন্দরী।" মেয়েটি সুন্দরী বলিয়াই রবীনের বড় ভাল লাগিল,অন্য কোন কারণে নয়। সুন্দরীকে ভাল লাগা এবং তাহাকে সুন্দরী বলাতে এমন কিছু দোষ ত আর নাই। রবীন অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া সেই মেয়েটির চলা-পথের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর এমন সুন্দরীকে "সুন্দরী" না বলিতে পাওয়ার বিষম দুঃখে তাহার ভাঙ্গা মন আরো ভাঙ্গিয়া পড়িল। পরের দিন রবীন সমুদ্র তীরে জলের অতি নিকটে বসিয়া আছে, তাহার মুখ কিন্তু উনুখ হইয়া ডাঙ্গার দিকে। সে ক্রমাগত ভাবিতেছে কখন সেই পেঁচা ছেলেটা আসিবে! আজ রবীন খালি পায়ে আসিয়াছে, কারণ গত কাল সে যখন জুতা ফেলিয়া দৌড় মেয় তখন একটা ঢেউ আসিয়া তাহার জুতা জোড়াটা ভাসাইয়া লইয়া যায়। সে ডাঙ্গার দিকে চাহিয়া আছে—এমন সময় তাহার পিঠে কি একটা আসিয়া বেশ জোরে পড়িল। রবীন চমকাইয়া উঠিয়া ফিরিয়া দেখিল তাহারই একপাটি জুতা ঢেউএর উপর চড়িয়া তাহারই পিঠে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার মেজাজ ভয়ানক খারাপ হইয়া গেল। সে জুতা-টাকে হাতে লইয়া প্রাণপণে জোরে আবার জলের মধ্যে ফেলিয়া দিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও সেই সুন্দরী এবং সেই কেলে ছেলেটার দেখা মিলিল না। রবীন ফিরিয়া যাইবার জন্য উঠিল।

জলের পাশ দিয়া দিয়া রবীন চলিতেছে, সব সময় ডাঙ্গার দিকে চাহিয়া চলিয়াছে, যদি সেই পল্লীমেয়েটিকে দেখিতে পায়। হঠাৎ কিসে পা লাগিয়া রবীন জলে পড়িয়া গেল। তাহার জামা কাপড় এবং মাথার চুল সব ভিজিয়া গেল। গা-ঝাড়িয়া উঠিয়া দেখিল তাহারই আর এক পাটি জুতার কিতায় তার পা জড়াইয়া গিয়া সে পড়িয়া গিয়াছে। জলে-নিক্ষিপ্ত-পাটী জুতার জন্য তাহার মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল। সে এবার এই পাটিকে আর না ফেলিয়া, উঠাইয়া লইয়া গেল।

বাড়ী গিয়া রবীন বনির পত্র পাইল। সে লিখিয়াছে—

"তোমার বীণার আজ বিয়ে হয়ে গেল। সেই বুড়ো ব্যাটাকেই বীণা শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে করল। তোমায় আগেই বলেছিলাম ওদব মেয়ের দিকে ঘেঁসো না—তুমি তখন ত শুনলে না, এখন বোঝ। বিয়ের সময় বীণাকে নাকি খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। গহনা যে কত পরেছিল তার সীমা নেই। বীণার নামে বুড়ো একখানা বাড়ী লিখে দিয়েছে। আর একটা মজা জান—বুড়ো ব্যাটা তার প্রথম পক্ষের ছেলেটাকে তার কে-এক দূর সম্পর্কের মাসি না পিসির সঙ্গে কোথায় ঠেকে পাঠিয়ে দিয়েছে। আর আর লিখবার বিশেষ কিছু নেই। পরে আরো লিখবো। আশা করি ভাল আছ। আমি ভাল—তোঃ বণি—

পুঃ—বীণারা আজ সকালে দারজিলিং গেল।

পত্রখানা পড়িয়া রবীনের মনটা যতখানি খারাপ হবার কথা, ততখানি হইল না। সে বীণাকে গত চার বছর ধরিয়া ভালবাসিয়াছে, শেষে বীণা তাহাকে টাকার জন্য এমন করিয়া ত্যাগ করিল! রবীনের কিন্তু আজ বিশেষ দুঃখ হইল না। দুঃখ যতখানি হইবার কথা ততখানি দুঃখ হইলে রবীন নিজেও বিশেষ সুখী হইত না। এই জন্যই দুঃখ না হওয়াতে রবীন একটু বেশ খুশীই হইল। "যাক্ এবারের সংসারের মায়া কাটলো, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম"—বলিয়া বাতি নিবাইয়া দিয়া রবীন শুইয়া পড়িল। রবীন চিন্তাকর, তাই সে শুইয়া শুইয়া অনেকের রূপের কথা ভাবিতে লাগিল। কিন্তু সকলের রূপই যেন সেই সাগর কূলে দেখা মেয়েটির কাছে হারিয়া গেল। অনেকক্ষণ রূপ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার পর রবীনের হঠাৎ মনে পড়িল সে বিকাল হইতে কিছু না খাইয়াই আছে, এবং এই কথা মনে পড়িবামাত্র সে পেটের ভিতর কি জ্বালা অনুভব করিল। বিছানা ত্যাগ করিয়া বাতি জ্বালিয়া রবীন ঘড়ীতে দেখিল, রাত প্রায় একটা। ঘরের কোথাও কিছু খাবার নেই, কেবল খানিকটা চিঁড়া এবং এক টুকরা মিছরি আছে। বেচারা পেটের জ্বালায় তাহাই গপাগপ খাইতে লাগিল। একটু পরেই তাহার গলায় আর একটা বিষম জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল। মিছরির সঙ্গে শ-চারেক লাল পিপড়া রবীন গালে পুরিয়াছে, গালের মধ্যে পিপড়াগুলা অবশ্যি অনুভব করিয়া গেলবার করাতেই এই জ্বালা। অনেক কষ্টে এক গেলাস জল

যাইয়া রবীন সে রাত্রের মত বাতি নিবাইয়া আবার শুইয়া পড়িল।

গত-চারদিন সামন্ত জ্বর এবং গলার অসুখে ভুগিয়া রবীন সকালে আবার সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে আসিয়াছে। তাহার ভিজা বালিতে বসিতে মন সরিতেছিল না বলিয়া সে আস্তে আস্তে বেড়াইতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সে দেখিল দূরে সেই সেদিনের পরী কন্যা বসিয়া আছে। রবীন তাড়াতাড়ি সেই দিকে হাঁটিয়া চলিল। কাছাকাছি গিয়া দেখিল সুন্দরী সমুদ্রের জলের দিকে ভীতিবিহ্বল নেত্রে চাহিয়া আছে। দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া রবীন দেখিল সেই পেঁচা-মুখো হতভাগাটা ডুবন জলে পড়িয়া ঢেউএর ঝাপটা খাইয়া প্রায় মরিবার মতন হইয়াছে। কখন তাহাকে দেখা যাইতেছে, কখনো বা সে ঢেউএর তলায় চলিয়া যাইতেছে। রবীনকে দেখিয়া সে সাহায্যের জন্য হাত একবার উঠাইয়া আবার জলের তলায় চলিয়া গেল। রবীন আর অপেক্ষা না করিয়া কেবল জুতাটা ফেলিয়া জামা কাপড় সমেত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং অনেক কষ্টে সেই ঢেলে ছোঁড়াটার কাছে হাজির হইল। কাছে হাজির হইয়া তাহাকে রবীন কোনদিকেও দেখিতে পাইল না—হঠাৎ পায়ে কিসের টান অনুভব করিল এবং ক্রমশঃ তলাইয়া যাইতে লাগিল। অনেক কষ্টে খানিকটা জল পান করিয়া ভাসিয়া উঠিল; তার পাশেই দেখিল সেই প্যাচা-টা হাবুডুবু খাইতেছে। কিন্তু যেমনি তাহাকে রবীন ধরিতে গেল, অমনি সেই প্যাচা তাহাকে এমন ভাবে গলাতে জড়াইয়া ধরিল যে রবীনের আর নড়িবার চড়িবার শক্তিও রহিল না। প্যাচার গায়ে জোরও কম নয়। প্রায় আধ ঘণ্টা জলের মধ্যে নাকানি চোবানি খাইয়া, সের পাঁচেক নোনা জল গিলিয়া রবীন তীরে ফিরিল। তীরে ফিরিয়া দেখিল, সেই হাড়িমুখো ছেলেটা তাহাকে মুখ ভ্যাংচাইতেছে এবং প্যাক প্যাক করিয়া হাঁসের মত হাসিতেছে। ব্যাপার দেখিয়া সুন্দরী মেয়েটিও একটু মুচকি হাসি হাসিয়া ফেলিল। রবীন সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া জগত সংসারের উপর রুষ্ট হইয়া ভিজা কাপড়ে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

নারীজাতির উপর রাগ করিয়া রবীন প্রায় এক সপ্তাহ জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু আর ভাল লাগে না দেখিয়া সে পুনরায় সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে লাগিল। সমুদ্রের ধারে আসিবার পূর্ব্বে রবীন স্থির করিয়াছিল, এবার হইতে সে ঐ প্যাচা মুখো ছেলেটার দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না এবং সেই সুন্দরী মেয়েটীর সম্বন্ধে রবীন বিশেষ কড়া কোন বন্দোবস্ত করিতে দ্বিধা বোধ করিল, তবে সে তার দিকে আর তাকাইবে না ইহা একরকম ঠিক করিয়া রাখিল।

সমুদ্রের ধারে সহরের শেষ দিকে একটা আমবাগান আছে। সব গাছগুলোতেই তখন বেশ কাঁচা-মিঠা আম ঝুলিতেছিল রবীন দেখিল সেই প্যাচা কতকগুলা আম লইয়া তাহার দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে। সে রবীনের কাছে আসিয়াই বলিল, "বসুন, আজ আপনাকে আম খাওয়াব"—রবীন কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সে তাহাকে কোঁচা ধরিয়া টানিয়া বালিতে বসাইল এবং আমগুলা রবীনের কোলের উপর ফেলিয়া দিয়াই "নুন নিয়ে আসি" বলিয়াই অন্য দিকে দৌড় দিল। এই কাণ্ড লিখিতে যা সময় লাগিল, হইল তার অর্দ্ধেকেরও কম সময়ে। ছেলেটা চলিয়া যাইবার এক মিনিট পরেই গোটাচারেক খাটো খাটো ধুতি আর কোর্ত্তা পরা যম-দূতের মত ভয়ঙ্কর চেহারার লোক দৌড়িতে দৌড়িতে রবীনের কাছে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। তারপর তাহার কোলে আম দেখিয়া তাহারা কয়েকটা অশ্লীল সম্বোধন করিয়া রবীনকে বলিল—"আরে চোট্টা, তু শালা রোজ রোজ আম যা ক'র ভাগ্ যাতা হে, আজ তোঁ শালেকো পাকড়া দেখ্লাকর ছোড়েগা। বড়া তক্‌লিফ দিয়া, হা ত'রি নানীকো ঘুসমে রসক বাঁধে"—। রবীন একেবারে ভড়কাইয়া গেল। সে ব্যস্ত বলে—"বাপু আমি আম চুরি করি নি তোমাদের বাগান থেকে,"—সেই ভয়ঙ্কর মত লোকগুলো তাকে ততই লাঠি উঁচিয়ে মারতে আসে। তারপর তারা রবীনকে ধরিয়া বাগানের দিকে লইয়া চলিল।

রবীন দেখিল, তাহাদের সঙ্গে জোর করিয়া লাভ নাই, কাজেই সে কোন কথা না বলিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিতে

লাগিল। তাহারা অবশেষে রবীনকে বাগানের মধ্যে একটা ছোট ঘরে প্রবেশ করিতে বলিল। এইখানে রবীন বলিল—না, ওসব হবে না, বাইরে বসবো, ঘরের ভেতর যাবো না।" তাহারা রবীনকে জোর করিয়া ধরিয়া ঘরের ভিতর ফেলিয়া দিল। তারপর তাহারা পুলিস ডাকিতে চলিয়া গেল। রবীন ক্রমাগত ১ ঘণ্টা চেষ্টা করিয়াও দুয়ার বা জান্‌লা ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে পারিল না।

ঘণ্টা দেড়েক পরে রবীনের হঠাৎ মনে হইল কে যেন বাহির হইতে দুয়ারের শিকলি খুলিতেছে। শিকল খুলিবামাত্র দুয়ার খুলিয়া রবীন ঘুসি বাগাইয়া বাহিরে আসিল। কিন্তু বাহিরে আসিয়াই ঘুসি শুদ্ধ হাত যেন জমাট বাঁধিয়া গেল বলিয়া মনে হইল। রবীন সামনে দেখিল সাগরকূলের সেই পরীকন্যাটি! রবীন বলিল—"আপনি"—

—হ্যাঁ, সব বল্‌ছি, এখন তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে আসুন, লোকগুলো হয়ত এখুনি এসে পড়বে।"—তাহারা দুজনে একরকম দৌড়াইয়াই মাইল খানেক বালি চাকা-পথ পার হইয়া গেল। তারপর আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। একটু পরেই দেখিতে পাইল সেই প্যাচাটা একটা ঢিপির উপর বসিয়া একমনেই গোটা কয়েক আম গিলিতেছে। রবীন সেই ছোঁড়াটাকে দেখিয়াই ভীষণ রাগিয়া গেল এবং সার্টের হাত গুটাইয়া সেই প্যাচাকে ধরিয়া বেদম মারিতে লাগিল। মিনিট দশেক মার দিবার পর তাহার খেয়াল হইল যে এই প্যাচার বোন পাশেই দাঁড়াইয়া আছে। তখন তাহার বেজায় লজ্জা হইল—এবং সে মার থামাইয়া দিয়া, মুখ নীচু করিয়া পরীকন্যার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইতেই সেই মেয়েটি বলিল—"বেশ করেছেন, বাঁদরটাকে প্রত্যেক দিন সকালে এই রকম কিছু পাওয়া দরকার, আমার ক্ষমতা থাকলে আমিই দিতাম।" ভাই মার খাওয়াতে বোনের এত আনন্দ দেখিয়া রবীন কেমন অবাক হইয়া গেল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার ভাইকে এমন ভাবে মার খেওয়া সত্যিই ভয়ানক অন্যায় হয়েছে।"—মেয়েটি বলিল—"না না আপনি ভুল কচ্ছেন ও আমার ভাই নয়। ওর বুড়ো বাবা আবার বিয়ে করেছে। বিয়ের সময় ছেলেটাকে আমার সঙ্গে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। ছেলেটা ভয়ানক পাজী, নতুন মায়ের যে কি অবস্থা করবে কে জানে।

রবীন বলিল—"আচ্ছা ওর বাবা কি বীণা বলে কোন মেয়েকে বিয়ে করেছে।"

"হ্যাঁ—আপনি তাকে জানেন নাকি?"

"জানি, আমার এখন সত্যিই তার জন্যে বড় কষ্ট হচ্ছে—আপনারা এখন কতদিন থাকবেন এখানে? যদি বেশীদিন থাকেন তবে বিকালে এক সঙ্গে বেড়ানো যাবে, একলা একলা আর ভাল লাগে না"—

"থাকতে পারে খুসী হতাম—কিন্তু ওর বাবার চিঠি এসেছে আজ বিকালেই রওনা হতে হবে"—

"ভালই হল—আমিও আজ বিকালে যাব, তিনটার গাড়ীতে যাবো।"

"আমরাও তাই যাবো, কলকাতায় গিয়ে আমাদের বাড়ী যাবেন ত? আমাদের বাড়ীর ঠিকানা—"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাবো"—

বিকালে বেলা তিনটার গাড়ীতে তাহারা সমুদ্র তীর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সেই সুন্দরী মেয়েটির পাশে গাড়ীতে রবীন একলা বসিয়াছিল। মাঝে মাঝে মুখ বাড়াইয়া দুজনেই মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

গ্রীষ্মের দিনে

স্নানের আরাম পাইতে, শরীর স্নিগ্ধ ও ফুর্তিপ্রদ রাখিতে, আমাদের আইভিনাল গ্লীসেরিন্ এবং মেসিনে প্রস্তুত :—চন্দন, রজনীকুল বাথ ও টয়লেট সাবান ব্যবহার করুন।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানী

৩৪।১এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন ২৪১৬

গ্রহের ফাঁদ

(উপন্যাস)

[শ্রীসরসীবালা বসু]

৯ম

সন্ধ্যার সময় খুব এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, অথচ রাত্রি আটটা না বাজিতেই আকাশ একেবারে পরিষ্কার। পূর্ণিমার চাঁদ রূপালী আলোয় চারিদিক ঝকঝকে করিয়া তুলিয়াছে, সদ্য কোটা শিউলী ফুলের গন্ধ ভিজা বাতাসকে অতি মধুর করিয়া সহজেই মানুষের মনকে এক অজানা পুলকে ভরাইয়া দিতেছে। সুতরাং এ হেন সময় মণির অনুরাগসিক্ত তেজেশের মনটির অবস্থা যে কেমনটি হইয়াছে তাহা কল্পনা করা বিশেষ কঠিন নয়, চিঠি পত্র সবেগে চলিলেও তেজেশ এতোদিন আর মণির কাছে আসিতে পারে নাই। মণি দিন দিন আরোগ্যলাভ করিতেছে। এই সংবাদ শুনা অবধিই তার মুমূর্ষু যৌবন দিনের পর দিন সজীবতার আভায় ভরিয়া উঠিতেছিল। সম্প্রতি শ্বশুর মহাশয়ের আহ্বানকে উপেক্ষা করিয়া সে থাকিতে পারে নাই, তাই এতদিনের পর কাল সে এখানে আসিয়াছে। শ্যামসুন্দর বাবু মেয়েকে বলিয়া দিয়াছিলেন, দৈবদুর্বিপাকে যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তেজেশের দ্বিতীয় পত্নীগ্রহণের উল্লেখ করিয়া যেন কেহ আর না তাহাকে লজ্জিত করে। মণিও ঠিক মনে প্রাণে এই উপদেশ বাণীটিকেই কামনা করিতেছিল। কিন্তু দিদিমা বা পুরবালাকে তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে তার সাহসে কুলায় নাই, বাবার নিষেধ বাক্যটিকে সে তাই নীরবেই অন্তরের সহিত বন্দনা করিয়াছিল।

অসীম কুণ্ঠা ও সঙ্কোচের বোঝায় অবনতপ্রায় হইয়া তেজেশ আসিয়া শ্বশুর বাড়ীতে দেখা দিল, তবে শ্বশুর, শাশুড়ী, দিদিমা, এমন কি চির চঞ্চলা, কৌতুক প্রিয়া পুরবালার সাক্ষাতে সম্ভাষণের যখন সে কোনো কিছু অনুযোগ বা পরিহাসের আভাস পাইল না, তখন তার মন প্রাণের আড়ষ্ট ভাব অনেকটা কাটিয়া গেল। তারপর রাত্রে মণির সহিত সাক্ষাৎ,—মণিও যখন হাসিমুখে কুণ্ঠিত স্বামীর—"দৈবদুর্বিপাকের ঘটনা"কে উড়াইয়া দিল তখন তেজেশের মন আজিকার মেঘ মুক্ত শরতের নীলাকাশের ন্যায়ই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

তাই আজিকার প্রকৃতি তেজেশের চক্ষে অতি সুন্দর, দিগন্তবিস্তৃত বনানীর শ্যামছবি তার চক্ষে দ্বিগুণ মধুর, জ্যোৎস্নার হাসি তার চক্ষে অসীম শোভায় ঢল ঢল, একাকী বারেন্দায় বসিয়া তেজেশ মুগ্ধ চক্ষে সম্মুখের দিকে চাহিয়া আছে, ধানক্ষেতের আলে ছাকা জাল পাতিয়া পল্লীবাসীরা মাছ ধরিয়া ফিরিতেছে, কে কতগুলা মাছ ধরিয়াছে তারই আলোচনা করিতেছে, সে আনন্দে তাহাই শুনিতেছে; একে একে যে যার বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল, নির্জ্জন পল্লী নিশা শুধু ঝিল্লী-তানে মুখর—মধ্যে মধ্যে নিশাচর পক্ষীর চীৎকার—তেজেশ ভবিষ্যৎ কল্পনায় বিভোর হইল। শীঘ্রই মণি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবে, আবার তেজেশের শূন্য গৃহমন্দির, আরাধ্যা দেবীর অধিষ্ঠানে পূর্ণ হইবে, কি আনন্দ, কি আনন্দ।

হঠাৎ মনে পড়িল শান্তর দুই চিঠির কথা—জগতে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ কি দেবতার চক্ষেও সহেনা সে, নহিলে এমন জ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রে প্রিয়া-মিলন উৎফুল্ল আসরে তেজেশের ভবিষ্যতের সুখ কল্পনা বিভোর চিত্তে হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি গুলার কথা স্মরণ হইবে কেন? বুড়া লিখিয়াছে সে পীড়িত, বাঁচিবার আশা কম, মরিলে মেয়েটার অবস্থা সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়—ইত্যাদি মামুলী কাহুনী। তেজেশ তা করিবে কি, একবার সে এই নাকী কান্নায় ভুলিয়া সে বুড়ের জাতি মান বাঁচাইবার জন্য মেয়েটার নারীজন্মকে সার্থক করিতে গিয়া নিজের পায়ে নিজে কুঠার হানিয়াছে, সে আঘাত যে এতো শীঘ্র শুকাইয়া আসিল এই ঢের; এখন আবার বৃদ্ধ দ্বিতীয় বার কাহুনী সুরু করিয়াছে। এ সবে কাণ দিতে গেলে আর কি তেজেশ বাঁচিবে? সেই জন্যই সে চিঠির কোনো উত্তর

দেয় নাই, বুড়া পল্লীগ্রামের লোক হইলেও নেহাৎ কাঁচা বুদ্ধি ছিল না, রেজেষ্ট্রী চিঠি দিয়াছে, তেজেশ তবুও সম্পূর্ণ চুপচাপ। কি ছাই চিন্তা, ভাবিবে না বলিয়া মনের গতি অন্য দিকে ফিরাইলেও বারবার তেজেশের মনে বৃদ্ধ হরিহরের অনুনয় বাণী সাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল—এই সময় পুরবালা আসিয়া ডাকিল "চৌধুরী মশাই কি ঘুমুইনাইন খেয়েছেন না কি ?"

তেজেশ চমকিয়া উঠিয়া কহিল—"কেন ঠাকুর ঝি, হঠাৎ এ কথা বল্‌চ কেন ?"

পুরবালা হাসিয়া কহিল—"তিনবার ডেকেও যে সাড়া পাই-নি। এখানে একলাটি বসে কি হচ্ছে, দিদিরা ভাল ছেলেতে ভাবছেন যে।"

তেজেশ কহিল—"বেশ তো, চল না, খেলি গিয়ে।"

পুরবালা যাইবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ আর না দেখাইয়া কহিল—"আচ্ছা আপনি কি ভাবছিলেন বলুন দেখি ?"

তেজেশ কহিল—"বিশেষ কিছুই না, চাঁদের আলো বৃষ্টির পর কেমন ফুটে উঠেছে তাই দেখছিলাম, আর ভাবছিলাম, শরতের জ্যোৎস্না কি সুন্দর !"

পুরবালা কহিল,—"তাই ভাবতে ভাবতে এমন তন্ময় হয়েছিলেন, যে আমি তিন তিনবার ডেকেও সাড়া পাই নি, তখন মনে করলাম হয়তো অসুখ বিসুখে ঘুই-নাইন খেয়ে আপনার কানের মোম ধরেছে—তা যেমন আপনি কবি মনু বা ভাবুক মন যে চাঁদ দেখে আপনার এতো তন্ময় ভাব এসেছিল ! নিশ্চয় আপনি আর কিছু ভাবছিলেন !"

তেজেশ হাসিয়া কহিল—"তোমার দিদির সুন্দর মুখ-খানির কথা ভাবছিলাম, হলো এইবার ?

পুরবালা কহিল—"দিদির সুন্দর মুখ যদি এতোই আপনার ধ্যান ধারণার ধন হ'য়ে থাকত তাহ'লে তার পাশে আর একখানি সুন্দর মুখ আপনি ফুটতে দিতেন কি ? বলুন না সত্যি কথা ?

ঠিক্ এই প্রসঙ্গটিই তেজেশ এড়াইয়া চলিতে চায়, নিষ্ঠুর পুরবালা তা জানেও—অথচ খোঁচা দিয়া সে এখন এই প্রসঙ্গই তুলিতেছে, তুলিলে অবান্তর কথা অনেকই উঠিয়া পড়িবে, এবং তাহার শেষ কতদূর পর্য্যন্ত টানিতে হইবে তাহা কে জানে ? তেজেশ অসহিষ্ণু ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল—"চল না ঠাকুর ঝি, তাস খেলি গিয়ে। কেন আর বাজে কথাগুলো তুলতে চাইচ, যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নেই !"

পুরবালা দুষ্টামী ভরা হাসি হাসিয়া কহিল—"তা তো চারা নেই, আপনি তা হ'লে সে স্ত্রীটিকে নিয়ে ঘর করচেন না তো, এটা নিশ্চয়ই ঠিক কথা ?"

তেজেশ রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—"এ কি তোমরা অবিশ্বাস কর্‌চ পুরো ?"

পুরবালা কহিল—অবিশ্বাসও করিনি, বিশ্বাসও করবার মতো কিছু দেখচি না, সে হতভাগীকেও যে নেহাৎ জলে ফেলে ভাসিয়ে দেবেন এটাই বা আপনার কোন্ ধর্ম্মে সইবে ?"

কি বিপদ, সংসারে ঘুরিতে ফিরিতে চারিদিকে কি ছেলেরই মূর্ত্তি, ধর্ম্ম আর নিয়মের বেড়াজাল ? এই উচিৎ আর কর্ত্তব্য গুলার খোঁচাখুঁচির ঠেলা সহিতেই কি মানুষের জন্ম ? তেজেশ পুরবালার কথার উত্তর দিতে পারিল না, অথচ মনটা তার খোঁচা খাইয়া বেশ একটু সাড়া অনুভব করিল।

৯

একমাত্র সন্তান পার্ব্বতীকে সুযোগ্য কুলীন সন্তানের হাতে সঁপিয়া দিয়া বংশের সন্তান অক্ষুণ্ণ রাখার গর্ব্বে হরিহর যতটা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন, অসুখে পড়িয়া জামাতাকে বারবার চিঠি লিখিয়া উত্তর না পাইয়া ও ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা—অনুপাতে ততোটা বেশী না হইলেও অল্প হয় নাই, সুতরাং তিনি একরকম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াই পরপারে যাত্রা করিয়াছিলেন, রোগশয্যায় শুইয়া যতোবারই স্নেহপ্রতিমা পার্ব্বতীর ম্লান মুখখানির দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়িয়া পিতৃহৃদয় কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, ততোবারই দুহিতার শাঁখা রুলী পরা সেবারতা দুটীর হাত দুখানির দিকে চাহিয়া, আর তার নিষ্কলুষ-সুন্দর সিঁথীর দিকে তাকাইয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন যে

আকৃতির চিহ্ন যে বালিকার এতো উজ্জ্বল, সে কখনও স্বামী কর্তৃক অনাদৃতা হইয়া জীবন কাটাইবে না। মৃত্যুর দিন শোকাকুলা পত্নীর পানে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে আশ্বাস দিয়াছিলেন—"হঠাৎ ডাক এসে গেচে, না গিয়ে উপায় নেই, একলা রইলে ব'লে বড্ড ভয় পাচ্ছ, জামাইকে আস্‌তে লিখলাম, এলেন না, নিশ্চয় তাঁরও কিছু অসুখ বিসুখ হয়ে থাকবে, ভাল হয়ে নিশ্চয় আসবেন তাতে সন্দেহ করো না। ভদ্র সন্তান যাকে স্ত্রী বলে স্বীকার করেচেন তাকে কখনই পায়ে ঠেলবেন না, তাহ'লেই তোমার আর কোনো ভাবনা রইল না—একলা মানুষ যেমন ক'রেই হোক্ নিজের পেট চালিয়ে নিতে পারবে।" হরিহর তো সান্ত্বনাচ্ছলে আশ্বাস বাণী শুনাইয়া চলিয়া গেলেন, অভাগিনী ব্রাহ্মণী কিন্তু চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। অনেক কাঁদাকাটা করিয়া জামাতাকে একবারটি আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন, কিন্তু কোথায় কি, অরণ্যে রোদন তাঁর সুরেই মিলাইয়া গেল, কেহ সাড়া দিল না, অনাথিনী নারী দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া জামাতার খুড়া শ্বশুরীর নিকট গিয়া ধর্ণা দিলেন, তাঁহারা পরিষ্কার ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহাদের এ বিষয়ে হাত দিবার কোনো অধিকার নাই; ভেজেশ নিজের ইচ্ছায় বিবাহ করিয়াছে, নিজের ইচ্ছায় স্ত্রীকে গ্রহণ করা না করা তাহারি হাত, মধ্যে হইতে এ ব্যাপারে তাঁহারা কিছু বলিতে চাহেন না। বড় জোর, সময় মত ভেজেশকে একখানি চিঠি লিখিয়া দিবেন।

অগত্যা চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে যোগমায়াকে বাড়ী ফিরিতে হইল, নিজের জন্য তাঁর বিশেষ কোনো ভাবনা নাই। কিন্তু নির্বান্ধব গৃহে রূপের ডালি যুবতী কন্যাকে লইয়া কেমন করিয়া দিন কাটাইবেন এই দুর্ভাবনাই তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অভিভূত করিয়া ফেলিল, কোনো রকমে স্বামীর শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করিয়া পার্ব্বতীকে লইয়া নিজেই জামাতার নিকট যাইবেন স্থির করিলেন, কিন্তু দেবতা তাঁর সে সাধেও বাদ সাধিয়া বসিলেন।

যোগমায়া নিজেও অসুখে পড়িলেন, "যার কেহ নাই, সমস্ত তাঁহাকে আশ্রয় দিতে নারায়ণ" এই প্রবাদ বাক্য স্মরণ করিয়া প্রথম প্রথম তিনি রোগকে আমল দিলেন না, জ্বর লইয়াই কাজ-কর্ম্ম চলা-ফেরা করিতে লাগিলেন, সুযোগ বুঝিয়া রোগ তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল, তখন তাঁহাকে একেবারে শয্যা লইতে হইল। দরিদ্র গৃহস্থের গৃহের অসময়ের সম্বল কিছুই ছিল না, সামান্য এক আধ টুক্‌রা সোনা রূপা যাহা ছিল, স্বামীর অসুখের সময় তাহা নিঃশেষ হইয়াছে। উপরন্তু কর্জ্জ করিয়া স্বামীর শ্রাদ্ধ শান্তি করিয়া সমাজ ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছেন, তারপর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে মা ও মেয়ে কোনো রকমে নিজেদের দৈনিক অন্ন যোগাইয়া লইতেছিলেন, এইবার?

যোগমায়া বেশ বুঝিলেন যে তাঁরও ডাক আসিতেছে, পার্ব্বতীর কথা ভাবিয়া তাঁর চোখ ফাটিয়া জল আসিল, বুক ফাটিয়া যদি কিছু বরা সম্ভব হইত তাহা হইলে যাহা ঝরিত তাহা অসহায়া বিধবা নারীর তপ্ত শোণিত বিন্দু।

সে দিন ছিল একাদশী, রোগশয্যায় ছিন্ন কাঁথার উপর শ্রান্ত দেহ বিছাইয়া, অসহ্য তৃষ্ণার জ্বালা চাপিয়া, যোগমায়া বেলা দুপুর পর্য্যন্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। হঠাৎ স্মরণ হইল পার্ব্বতী এতো বেলা পর্য্যন্ত মুখে জল দেয় নাই, সকাল হইতে ধান সিদ্ধ, চাল কোটা এইসব লইয়াই ব্যস্ত আছে, তখন চমকিয়া উঠিয়া তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে ডাক দিলেন—"পার্ব্বতী"!

"মা।" "এতো বেলা পর্য্যন্ত কাজ নিয়েই আছিস্, নিজের মুখে কিছু দেবার যোগাড় কর্‌লি কি?

"হ্যাঁ মা করেচি, তুমি ব্যস্ত হয়ো না" বলিতে বলিতে পার্ব্বতী মার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কারে কাচা এক-খানি ধবধবে লাল পাড় কাপড়ে সদ্যস্নাতা পার্ব্বতীর গৌর বপু গৌরীর ন্যায়ই দীপ্তি পাইতেছে। মা দেখিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "কত বেলাতে যাবি মা, বেলা যে দুপুর বাজ্‌তে চল্‌লো" পার্ব্বতী কহিল—"খান দেড়ো ক'রে কাপড়গুলো কারে দিয়েছিলাম মা, বড্ড ময়লা হয়ে-ছিল, কেচে এনে শুকুতে দিচ্ছি, ভুবণের পিসী ধান ভান্‌তে এলো, তাই দু'গণ্ডা কুটে দিয়ে রান্না চাপালাম, একটু বেলা হয়েছে তাতে কি?"

মা কহিলেন,—"কি রাঁধ্‌লি?"

পার্ব্বতী কহিল—"কি আর রাঁধব, যেমন ছিল গাছে, তাই দুটো তুলে পুড়িয়েছি, কাঁচা লঙ্কা মেখে খাব'খন।"

যোগমায়া কান্না ভরা কণ্ঠে কহিলেন—"আঃ আমার পোড়া কপাল, আজ যে একাদশী রে, আজ কি এরোস্ত্রী মেয়েকে নিরিমিষ খেতে আছে? ঘাটে গামছা চাঁকা দিয়ে দুটো চুনোপুঁটিও কি ধরতে পারনি না? বেলা তো হয়েইছে, যা দুটো একটা যা মাছ পাস্ এনে আঁস মুখ কর্, আর মাথায় চিরুণী ছুঁইয়ে সিঁদুর দে। স্বামী যেমনই হ'ন্ আর যেখানেই থাকুন তাঁর কল্যেন, মেয়ে মানুষকে করতেই হয়, স্বামীর বাড়া দেবতা মেয়ের আর কেউ নেই মা।"

পার্ব্বতী দ্বিরুক্তি না করিয়া নীরবে মার আদেশ পালন করিতে গেল, মা চক্ষু মুদিয়া আপনার মনে ভাবিতে লাগিলেন—"হায় মা দুর্গা, চিরকালটা তোমায় ডেকে আস্‌চি মা, কোন অপরাধে আমার এই একমাত্র সোনার পুতুলকে কাঙালিনী ক'রে রাখলে। মার আমার এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চেহারা, জামাইও হলো রাজপুত্তুরের মতন, কিন্তু মাকে আমার অনাথিনী যেমনই থাকতে হলো, পাষাণী গো,—এই কি তোর মনে ছিল মা,—কোন্ অপরাধে পার্ব্বতীকে আমার যৌবনে যোগিনী সাজালি বলে যে দুর্গা, শুনে তবু বুক ঠাণ্ডা করি।"

এদিকে পার্ব্বতী মার আদেশমত গোটাকত চুনামাছ ধরিয়া আগুনে ঝলসাইয়া লইয়া ভাত খাইতে বসিয়াছিল। বেচারী খাইবে কি, চক্ষের জলে অন্ন তার লবণাক্ত হইয়া উঠিল। যে স্বামীর কল্যাণ চিন্তা অহোরাত্র হৃদয়ে ধরিয়া সে প্রতিপদে কত নিয়ম, কত বাধা, নিষেধ মানিয়া চলিতেছে, কোথায় তিনি? পার্ব্বতী নিতান্ত বালিকা নহে, স্বামীকে সে একদিন মাত্র দেখিয়াছিল, স্বামীর সেই আশ্বাস বাণী—"তোমায় নিয়েই যাব, বেশী দিন এখানে ফেলে রাখব না," দিনরাত্রি সমস্ত জীবনের ধ্যান তার কাণে বাজিয়া চলিয়াছে, কিন্তু হায়, শুধু বাজাতেই কি তার পরিসমাপ্তি? আর কি তার কোনো সার্থকতা নাই? যের আকৃতি পুরুষ নেই—কণ্ঠে যাঁর যেবতারই ন্যায় "যাচ্ঞে" অমৃত বাণী—তিনি কি এমনি নিষ্ঠুর যে তাঁর পথ চাহিয়া একটি অজ্ঞান জীবন শতদল যে সুদূর পল্লীপ্রান্তে দিনের পর দিন বিকসিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাকে তিনি আপনারই চরণ পূজার জন্য গ্রহণ করিবেন না? তবে তিনি কেমন উপাস্য, কেমন দেবতা?

পার্ব্বতীর ক্ষুধার অন্নের গ্রাস যখন এমনি ভাবে চক্ষের জলে ভিজিয়া অভুক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেছিল সেই সময় ভেজেশ আপনার বাসায় কাছারী কামাই করিয়া সদ্যঃ আগত মণিমালাকে সাদরে বরণ করিয়া লইতে ব্যস্ত ছিল, কত দিন পরে ঘরের লক্ষ্মী আজ আবার তার পরিত্যক্ত পাদপীঠে পদার্পণ করিতে আসিয়াছে, ভেজেশের এ কি কম সৌভাগ্য? এ সৌভাগ্যের মর্য্যাদা পুরাপুরি বজায় রাখিতে তার আজ কত ব্যগ্রতা, কত আকুলতা। পার্ব্বতীর মাতার অঙ্ক চিহ্ন আঁকা চিঠি গুলাকে শতটুকরা করিয়া ছিঁড়িয়াও তার মন শান্ত হয় নাই, একটি একটি টুকরা কুড়াইয়া লইয়া সব সে আজ আগুনের মুখে আহুতি দিয়াছে, একবার খেয়ালের বশে একটা ছেলেমানুষী ক'রয়াছে বলিয়া তার জের যে সারা জীবন সে টানিয়া বেড়াইবে এমন নির্ব্বোধ যে নয়, প্রেমিক সে,—প্রেমের মর্য্যাদা জানে, মণির প্রতি ভালবাসা তার কেমন যে এখনিও তার পরিচয় এইবার সে ভাল করিয়া দিবে। কে সে কোথাকার পল্লীবালা—পার্ব্বতী! স্বপ্নের ছায়ামাত্র, বাস্তব জীবনে তার চিহ্ন কোথায়?

(ক্রমশঃ)

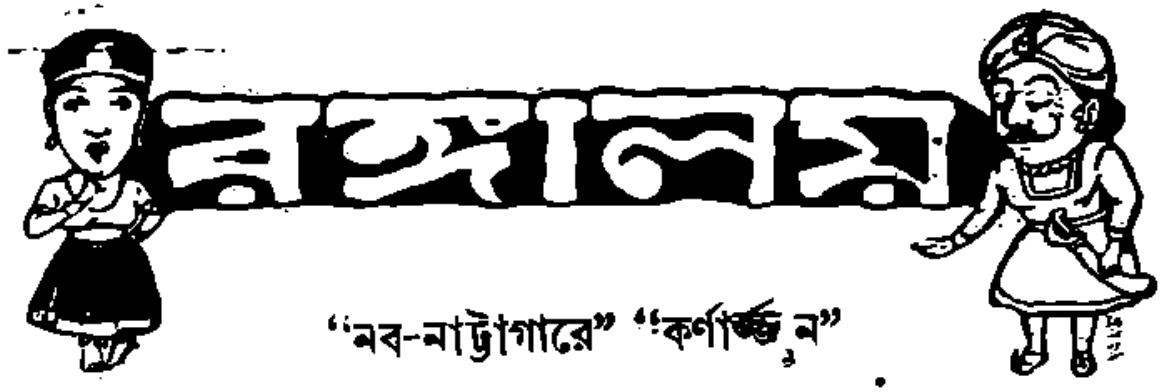

"নব-নাট্যাগারে" "কর্ণার্জ্জুন"

মানুষের স্বভাবের এই রীতি সকল সময়েই তাহারা নূতনের ভক্ত; পুরাতনে মানুষ বেশীদিন মননিবেশ করিতে পারে না আবার ইহাও তাহার স্বাভাবিক সংস্কার যে নূতনকে সে সহজে বরণ করিয়া লইতেও চায় না। যেন কোথায় খানিকটা গরমিল, অসামঞ্জস্য আছে বলিয়া নূতনের প্রবর্ত্তনেই বিরুদ্ধতা সে করিয়া বসে। ইহা চিরদিনই প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে যে কোন একটা কিছু নূতন পুরাতনের স্থান অধিকার করিবার উপক্রম করিতেই বিশ্ববাসী যতদূর সম্ভব বাধা দিয়া তাহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, নূতনের বিপক্ষে অভিযান করিয়াছে, আন্দোলন চালাইয়াছে। এই বিবর্ত্তনের মাঝে কত নূতন লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, আবার কত পুরাতনকে ধ্বংসের ক্রোড়ে বিদায় দিয়া নূতন আসন বিস্তার করিয়াছে। নূতন যদি সত্যমণ্ডিত হয়, নূতনে যদি প্রেরণা থাকে, তাহার যে অধিকার, সে তাহা জয় করিবেই; বিরুদ্ধবাদীর বাধা তাহার সে জয়ের পথে বিঘ্ন হইতে পারিবে না। আর নূতন যদি সত্য-বিবর্জ্জিত হয়, তবে পুরাতনের বাধা সহিবার ক্ষমতা তাহার না থাকারই সম্ভাবনা, বিরুদ্ধতার বন্যায় কোথায় যে ভাসিয়া যায়, তাহার সন্ধান মিলে না।

কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দী কাল যাবদ্যাবৎ রঙ্গালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সৃষ্টিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি রঙ্গালয় হইয়াছে, লয় পাইয়াছে, তাহাদের ইতিহাস আলোচনা করিতে ইহাই দৃষ্ট হয় যে তাহাদের অধ্যক্ষ, অভিভাবক ও অভিনেতাগণ সকলেই প্রায় সেই সৃষ্টি-কর্ত্তাদের পন্থাই অনুসরণ করিয়া চলিয়া আসিতেছিলেন। রঙ্গালয়ের দর্শকগণও এতকাল তাঁহারা যাহা দেখাইতেছিলেন, তাহাই নিরুপদ্রবে দেখিয়া আসিতেছিলেন। এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যাঁহারা রঙ্গালয়ে অভিনয় করিয়া গিয়াছেন, এখনও করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রতিভাবান অভিনেতার অভাব ছিল না, এখনও যে আছে তাহা মনে হয় না, এই পঞ্চাশ বৎসর-কাল যাঁহারা নর্ত্তকের অধ্যক্ষতা করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানী, শিক্ষিত বা ভাবুকের যে অসদ্ভাব ছিল বা আছে, এ সন্দেহ-ও আমরা করি না, তবে তাঁহারা সকলেই এক পথ ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন; সেই পথকেই কেহ যথা সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া মার্জ্জিত ও সংস্কৃত করিয়া চলিতেছিলেন, দর্শক কিছুকাল নূতন পাইয়া সে-গুলা মানিয়াছিল (প্রথমে নূতনের প্রারম্ভে কিছু বিরুদ্ধতা ঘটিয়াছিলই) তারপর সে-দিকে উন্নতি দেখিয়া অভিভূত-ও হইতেছিল, আবার কখনও চর্ব্বিত চর্ব্বণের আধিক্য দেখিয়া বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিতেছিল। ঠিক এমনি সময়ে এক নূতন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের নাম আর্ট-থিয়েটার লিমিটেডের পরিচালিত ষ্টার থিয়েটার।

মানুষ নূতনের ভক্ত হইলেও পুরাতনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে অনেক সময় নূতনের ধারা ও উদ্দেশ্য ধরিতে পারে না। ষ্টার থিয়েটার যখন নব-বেশে নব-ভাবে, নব-কলেবরে, আবির্ভাবটন করিলেন, তখন নূতন-ভক্তগণ তাঁহাদের পুরাতন প্রীতির বলেই এই নূতন ভাব ধারাকে সাদরে গ্রহণ করিতে পারিলেন না; সুতরাং মনে হইতে লাগিল, সবটাই যেন বাড়াবাড়ি হইতেছে—মানুষের জীবনী লইয়া অভিনয় করা যাইতে পারে, সব সময়ে তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার কি এমন প্রয়োজনীয়তা আছে! গ্রাউনস্ল্যাট গিরিশচন্দ্র বলিতেন—অভিনয় উৎকর্ষতা দেখাইয়া লোককে আনন্দ দেওয়াই অভিনেতাদের ও

রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষগণের মূলা উদ্দেশ্য। নাট্য-সম্রাটের এই উক্তি আজও রঙ্গমঞ্চের কর্ণধারগণ অবনত মস্তকে পালন করিতেছেন সত্য কিন্তু তাঁহারা সেই সঙ্গে অভিনয়কে যতদূর সম্ভব বাস্তবতাপূর্ণ, জীবন্ত করিবার চেষ্টায় মাতিয়া উঠিয়াছেন। বিশ্ব যে একটি বিরাট রঙ্গ-ভূমি এবং জীবিত নরনারী যে সকলেই স্ব স্ব ভূমিকা অভিনয় করিয়া চলিয়াছে, প্রত্যেক মানুষের অভিনয়ে যে জীবন্ত অংশটি ফুটিয়া রহিয়াছে, রঙ্গমঞ্চেও যাহাতে এমনি ভাবপূর্ণ অভিনয় হয়, তার থিয়েটার বাঙ্গালায় সে প্রচেষ্টা প্রথম করিয়াছেন।

"বাসন্তী"তে তাঁহার কর্ণধারত্বের যথেষ্ট বিরুদ্ধ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। নূতনের অভিযানে যে এমনই একটা বিরুদ্ধতা সাধারণ মধ্যে জাগিয়া উঠিবে, ইহা আমরা জানিতাম এবং এই বিরুদ্ধতা চিরদিনই নূতনকে মলিন না করিয়া, উজ্জ্বল করে বলিয়াই আমরা সে আলোচনায় বাধা দিই নাই। আমাদের আরও বিশ্বাস ছিল, যে নূতন সম্প্রদায়ে যে-সকল ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তি যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা দোষগুণ বিচারপূর্ণ সমালোচনাকে শত্রুতাবশে না গ্রহণ করিয়া মিত্রভাবেই গ্রহণ করিবেন এবং যথাসম্ভব দোষ বর্জ্জনের চেষ্টা করিবেন। আহ্লাদের বিষয়, আমাদের সে আশা পূর্ণ হইয়াছে। দ্বিতীয় তৃতীয় রাত্রির অভিনয় আর গত শনিবার রাত্রের অভিনয় তাহার প্রমাণ! সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা ও নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাব-ও যে বিষাক্ত হইয়া উঠে নাই, শিক্ষিতের পক্ষে ইহা স্বাভাবিকই হইয়াছে।

এই নূতন সম্প্রদায়কে আরও কিছুদিন হয়ত বিরুদ্ধতা সহ্য করিতে হইবে, কারণ নূতন আলোক সহিতে পারে, তেমন চক্ষু তাঁহাদেরই প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। পঞ্চাশ বৎসরের সংস্কার একদিনে ঘুচিবার নয়। ঘুচাইবার ভার তাঁহাদেরই লইতে হইবে, লোকমত, জনমত তবে তাঁহাদের পক্ষে আসিয়া দাঁড়াইবে।

রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এই প্রচেষ্টা যে সম্পূর্ণ নূতন ও অভিনব তাহাতে সন্দেহ নাই। এই নূতনত্ব আবার এমনই প্রোজ্জ্বল আলোক বিভাসিত যে পুরাতন-পন্থীদিগের প্রতি মুহূর্ত্তেই অসহ্য অবহ্য বলিয়া মনে হইবে কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা চলিবে না যে রঙ্গমঞ্চের সহিত জীবনের, সমাজের, জাতির দেশের এমনই এক অটুট সম্বন্ধ বর্ত্তমানে আছে এ চিরকাল থাকিবে যে কেহ কাহারও আগে ও পিছে পড়িয়া থাকিতে পারিবে না; যদি থাকে—সে অক্ষমতা, আর কিছুই নয়।

রঙ্গালয়ের রাজা-রাণী বলিতেই মনে হয়, রাজা যেন সেই অভিনোড়া মখমলের হাফ প্যাণ্ট ও মার্সেলের পোষাক পরিয়া কোমরবন্ধ তরবারী কটিতে বাঁধিয়া এবং রাণী সেই সেপোয়াজ পরিয়া বিলাতীর বাইজী নাচিলেন, যত ভাল অভিনয়ই হোক,দেশের লোকের রুচি আর তৎপ্রতি নাই। দর্শক তবু যে এতকাল সে-সকল দেখিত, তাহার একমাত্র কারণ দেখাইবার ভার যাঁহাদের, তাঁহারা দেখাইতেন, বলিয়া। রাজা রাণীর সহিত শয়ন মন্দিরে উপবিষ্ট আছেন, এখনি হয়ত নিদ্রিত হইবেন,কটিবন্ধ তরবারীও কি খুলিবে? মাথার উষ্ণীষ, কোমর বন্ধ এ-সকলও কি থাকিবে? এতদিন থাকিত,এই নূতন সম্প্রদায় পুরাতনের জীর্ণ প্রাচীর ভগ্ন করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন,রাজা রাণী হইলেও,তাঁহারা নর-নারী। আফিসের সময় ধড়াচূড়া পরেন বটে, গৃহে শয়নাগারে না প্রয়োজন হয় ধড়ার, না প্রয়োজন হয় চূড়ার। রাজসভা বলিতেই মনে পড়ে সেই সারি সারি কেতার বেন্ট-উচু চেয়ারে অকাতরে বসিয়া কিন্তু-মার্সেলের পোষাকে সভাসদবৃন্দ—না পারেন নড়িতে, না পারেন পাশ ফিরিতে, যেন কতকগুলি সঙ সাজাইয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, রঙ্গমঞ্চের প্রথম জীবনে এই সমাবেশ দর্শক দেখিয়াছিল, এখনও দেখিতেছিল—নূতন সম্প্রদায় এই প্রথম দেখাইলেন যে তখন কেতার বেন্ট-উচু চেয়ার ছিল না এবং লোকগুলাও সঙ ছিল না, মানুষই ছিল। তাহারা নড়িতে চড়িতে পারিত, দরকার হইলে উঠিয়া পায়চারি করিতে পারিত, নির্ব্বাক আড়ষ্ট বসিয়া না থাকিয়া কথোপকথন করিবার স্বাধীনতা তাহাদের ছিল। দুই জন নট কথা বলিতেছে কি পরামর্শ করিতেছে, সেই ঘরে আর দশজন যদি উপস্থিত থাকে, তাহারা কি করিবে, এই ছিল এতদিনের সমস্যা। এতদিন তাহারা নাড়ুগোপাল হইয়াই অবস্থান করিত, এখন

তাহারা দর্শকের মনে কথা-বার্ত্তা বা গল্প-গুজব চালাইতে পারে। অভিনয়ে ব্যক্ত কথাবার্ত্তাই যে দর্শকের মনে ছাপ দেয়, তাহা নহে, দৃশ্যপট, পোষাক, হাব-ভাব এ সমস্তই দর্শকের দর্শনীয় বস্তু। ইহার কোনটিকে উপেক্ষা করা চলিতে পারে না। এই নব্য-সম্প্রদায় এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সর্ব্বথা তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। কেহ-কেহ অনুযোগ করিয়াছেন যে "ভয়ানক শোক দুঃখের ...অভিনয় অন্তে শকুনী...গৃহ শুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন,... ঐক্যতান বাদিয়া উঠিল—নয়ন গলিয়ে যায়"...আমরা স্বয়ং ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তবে আমাদের মনে হইল, পরবর্ত্তী দৃশ্যের বর্ণনা এরূপস্থলে যাওয়াই সঙ্গত হইয়াছে। পরের দৃশ্যের ঘটনার আভাষ দেওয়াই দৃশ্যান্তরসূচক ঐক্যতান বাদনের উদ্দেশ্য বলিয়াই আমরা মনে করি। কর্ণার্জ্জুন এখানকার প্রথম নাটক। ইহাতেই তাঁহারা যে নূতনত্ব দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাদের অভিনন্দিত করিতেছি। যে সমস্ত শিক্ষিত, ভদ্র, দেশ-সন্তান এই নব্য-সম্প্রদায়ের উদ্বোধন করিয়াছেন, যাঁহাদের উদ্যোগ ও অর্থব্যয়ে পুরাতন এমন নূতন রূপ লইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে তাঁহারাও দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র। দেশের, সমাজের, ব্যক্তির রুচির সহিত রঙ্গমঞ্চের রুচি প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে মিলিত করিবার এই প্রথম প্রচেষ্টা তাঁহাদের জয়যুক্ত হৌক, ইহাই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেছি।

(২)

[শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়]

নীরভাগ থেকে ক্ষীরভাগ যাঁরা গ্রহণ করতে নারাজ, নিন্দাতেই তাঁদের মুখ খোলে ভালো। তাঁদেরও কলম আছে, কিন্তু সেইটেই বড় ক'রে দেখবার বিষয় নয়—এবং যাঁরা কেবল তাই দেখেন, তাঁদের অরসিক বললেও বোধ করি মহাপাতক হবে না।

তবু, অরসিককে বরং অগ্রাহ্য করলেও করতে পারি, কিন্তু যাঁরা পরনিন্দার সুখ চরিতার্থ করবার জন্যে মিথ্যা কল্পনার খাঁচল-ছাড়া যেন এবং মস্তিষ্ক থেকে নব নব দোষ সৃষ্টি ক'রে গালিগালাজে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, তাঁদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া অসম্ভব।

গেল-সংখ্যার "বাসন্তীর" "কর্ণার্জ্জুনের" সমালোচনা প'ড়ে আমার এই কথাগুলিই মনে হচ্ছে। তবে, যাঁর নিজের কাছেই নিজের নামের কোন মূল্য নেই এবং দশের সামনে নিজের নাম ছাপাতেও যিনি লজ্জিত হন, তাঁর কাছ থেকে ওর বেশী আশা করাও আহাম্মকি ছাড়া আর কি হ'তে পারে? ঐ লেখাটিতে স্থানে স্থানে খাঁটি কথা বলবারও চেষ্টা আছে, এও আমি না মেনে পারব না। কিন্তু মিথ্যা নিন্দা ও অযথা আক্রমণের দ্বারা উক্ত বেনামী সমালোচক মহাশয় নিজেই নিজের চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছেন।

"কর্ণার্জ্জুনে"র অভিনয় আমি দু-বার দেখেছি এবং ভালো না লাগলে বিনিপয়সাতেও কেউ বোধ হয় দুবার অভিনয় দেখতে যায় না। তবে অভিনয় যে নির্দ্দোষ হয় নি, এ কথা বলা বাহুল্য। একেবারে সকল ভূমিকার আগাগোড়া নিখুঁত অভিনয় কোন দেশেই কেউ কখনো দেখেছেন কি না সন্দেহ! সুতরাং "কর্ণার্জ্জুন"ও যে মোটে-শুদ্ধ ষড়িয়ে অভিনীত হয়েছে, এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে এবং তাই নিয়ে তিলকে তালে পরিণত করবারই বা দরকার কি?

"কর্ণার্জ্জুনে"র অভিনয়ে অনেক নটকে এই প্রথম প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'তে দেখলুম্ এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার নবীনও বটে। বিলাতের এক নামজাদা নট বলেছেন, "পঁচিশ বৎসর অভিনয় না করলে কোন অভিনেতার শিক্ষাকাল সম্পূর্ণ হয় না এবং তিনি আপনাকে ভালো অভিনেতাও ব'লে দাবি করতে পারেন না।" এত-বড় শক্ত একটা আর্ট যে এই নবীন নটরা প্রথম চেষ্টাতেই পুরোপুরি ধরণ ক'রে ফেলবেন, এমন যুক্তিহীন আশা করাই অন্যায়। নবীনের প্রধান দোষ, অলঙ্কার-বাহুল্য। "কর্ণার্জ্জুনে"র কয়েকটি ভূমিকার অভিনয়ে সে দোষটি আছে। অলঙ্কার খুব সাবধানে, বুঝে-সুঝে যায়গা মাফিক ব্যবহার করতে হয়,—এখানে যা হয় নি। গান স্থানে সবটাই সিঁইসিঁয়ি নয়, এবং ছবি

যানে কেবল রঙের পর রঙের বাহার নয়। সব আর্টেরই গোড়ার কথা এই এবং অভিনয়ও হচ্ছে একটি উঁচু-দরের আর্ট। এ জ্ঞান দীর্ঘকালের সাধনা-সাপেক্ষ, "ষ্টারে"র নবীন অভিনেতারা এখনো সাধনার সে স্তরে উঠতে পারেন নি।

নবীনের আর একটি দোষ, "ষ্টাইলে" নিজস্ব ছাপের অভাব। নূতন "ষ্টারে"রও কোন কোন অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ভাব-ভঙ্গি ও কথা বলবার বিশেষ ধরণটি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নকল করবার চেষ্টা ক'রেছেন। এতেও যে রসভঙ্গ হয় নি, তা আর কেমন ক'রে বলি? শিশির বাবুর "ষ্টাইল" শিশির বাবুতেই মানিয়ে যায়,—অন্যে তা গ্রহণ করলে সেটা ব্যঙ্গাভিনয়েরই সামিল হয়ে দাঁড়ায়।

তবু, এই নবীন দলের অভিনয়ের মধ্যেও এমন একটা তাজা নূতনত্ব, উচ্চ শ্রেণীর রস-সৃষ্টির জন্যে এমন একটা উপযোগী প্রাণ, আপন আপন ভূমিকাকে জীবন্ত ও সরস ক'রবার জন্যে এমন একটা প্রচেষ্টা দেখলুম, যা অবহেলা করা অসম্ভব এবং যার জন্যে টাকা খরচ করলেও সে টাকা জলে পড়লা ব'লে অনুভাপ হয়ে না। এঁরা কেউ গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসান কাটেন নি;—এঁদের অনেকের মধ্যেই শক্তির অঙ্কুর আছে,—আধুনিক বাঙ্গলার রঙ্গালয়ের 'প্লাকার্ড'-সাহিত্যে বিখ্যাত অনেক তথাকথিত প্রতিভাবানদের মধ্যেও যা অত্যন্ত দুর্লভ। এঁরা কেউ মরা মানুষ বা কাঠের পুতুলের মতন রঙ্গমঞ্চের উপরে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন না। এঁরা প্রস্ফুটিত পুষ্প না হ'লেও, কাগজের ফুলও নন। এঁদের রস আছে, তবে, তা পরিপূর্ণতার লোভন নয়—এ আলোকের অপেক্ষা আছে বটে।

তা ব'লে নতুন "ষ্টারে"র সবাইকেই এই দলে ফেলতে পারি না। শকুনির ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র যে অভিনয় দেখে গেছি, তেমন আমার আর দুখানি ক'রব, ভেবে পাচ্ছি না। কেবল এই একটিমাত্র ভূমিকা দেখে নেই, রঙ্গলের টাকা অন্যে-পাসে উঠে আসবে। গোড়া থেকেই শকুনির চরিত্রটিকে নরেশ-বাবু যে বিশেষভাবে ধরতে পেরেছেন, তাতেই আমার বিশ্বাসটি তিনি আগাগোড়া বজায় রেখে গেছেন। কোন কোন সমালোচক বলেন, নটের উচিত নিজের ভূমিকার মধ্যে একেবারে তন্ময় হয়ে ডুবে যাওয়া। আর এক দলের মতে, নটের উচিত অভিনয়-কালে সচেতন থাকা। কোন্ পক্ষের মত ঠিক, তা জোর ক'রে বলা যায় না। আমার মতে, দুই দলের কথাতেই সত্য আছে। যিনি যে ভাবেই অভিনয় করুন, রসের ইঙ্গিত যিনি দিতে পারেন, তিনি বড় দরের আর্টিষ্ট। নরেশবাবু আশুতোষের দলে। শকুনির ভূমিকায় তিনি একেবারেই শকুনি হয়ে ডুবে গেছেন এবং গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত যে প্রগাঢ় রসানুভূতির সঙ্গে জনসাধারণের ভূমিকাসাধন ক'রে গিয়েছেন, বর্ত্তমান রঙ্গালয়ে তার তুলনা মেলা শক্ত কথা। স্থানে স্থানে প্রতি হিংসা-লোলুপ শকুনির কথা-বার্ত্তার ধরণ ও ভাব-ভঙ্গি দেখলে আতঙ্কে হৃৎপিণ্ড যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়—মনে হয় না আমরা অভিনয় দেখছি এবং এ শকুনি আসল শকুনি নন! কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, এই ভূমিকায় নরেশবাবুর পূর্ব্ব-অভিনীত চাণক্যের ভূমিকার ছায়া আছে। সম্ভব। কিন্তু সে দোষ নরেশবাবুর নয়। "কর্ণার্জ্জুনে"র শকুনি-চরিত্রের সঙ্গে "চন্দ্রগুপ্তে"র চাণক্য-চরিত্রের অংশ-বিশেষের কিছু কিছু মিল আছে। কিন্তু নরেশ বাবুর শকুনির ভূমিকায় নূতনত্ব নেই, এ কথা মানলে আমরা গাড়ল ব'লে প্রমাণিত হব। এ ভূমিকায় এমন নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য আছে অসংখ্য, চাণক্য-রূপী নরেশবাবুতে আমরা যা মোটেই দেখি-নি।

কর্ণের ভূমিকা দিয়েছেন প্রবীণ ও খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী। প্রথম যেদিন "ষ্টারে" তাঁর অভিনয় দেখি, সেদিন হতাশ হয়েছিলুম। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে তাঁর অভিনয়ের অপূর্ব্বত্ব আমাকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ ক'রেছিল। তাঁর সমযোগ্য-অভিনেতা এখনকার রঙ্গালয়ে বেশী নেই, মুক্তকণ্ঠে তা স্বীকার করছি। সভায়-সভায় ও তার পরের দৃশ্যে পুত্র-বধির দৃশ্যে এবং বিশেষ ক'রে কর্ণ-কুন্তীর সাক্ষাতের দৃশ্যে তাঁর অভিনয় আশ্চর্য্য-রকম উচ্চ-স্তরে গিয়ে উঠেছিল। তবে দুঃখের বিষয়, কর্ণ তাঁকে মানায় নি। প্রায় আঠারো-

উনিশ বৎসর আগে তিনকড়ি বাবুকে আমি "রাজা ও রাণী"র কুমারসেনের ভূমিকায় দেখেছিলুম এবং মনে পড়ে, তখন তাঁকে মানিয়েছিল বেশ কি চমৎকার! কিন্তু তখনকার আর এখনকার তিনকড়ি বাবুতে সবলের চেয় তফাৎ! তবে এই বয়সের ঘোষ তাঁর অভিনয়-গুণ সকলকেই ভুলে যেতে হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

অপরেশ বাবুর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ভূমিকা ছোট হ'লেও সুন্দর। তাঁর চোখের সেই রক্তলিপাসী ক্ষুধিত দৃষ্টি-আর নটোপযোগী সুধাবা কণ্ঠস্বরের লীলা মনকে মোহিত না ক'রে ছাড়ে না। আর ভালো লেগেছে দুঃশাসন ও বিকর্ণের ভূমিকা। অভিনেত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হয়েছে গন্ধাবতীর।

হয়তো আরো কোন কোন বিষয় নিয়ে কিছু নাড়া চাড়া করলে ভালো হোতো.—কিন্তু এবারে তা আর হয়ে উঠল না। অতএব এই ব'লেই 'ইতি' করতে বাধ্য হলুম যে, "কর্ণার্জ্জুনে"র অভিনয় দেখলে যথার্থ রসিকের চিত্ত-ক্ষুধা অতৃপ্ত থাকবে না। অবশ্য অরসিকের মনের খবর রাখি না, আর তারা কি ভাববে না ভাববে "কর্ণার্জ্জুনে"র অভিনয় দেখে, সেজন্যে এতটুকু মাথা ব্যথারও দরকার নেই বোধ হয়।

(৫ ও)

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

আর্ট থিয়েটারের পরিচালনাধীন হয়ে তাঁর থিয়েটার নব কলেবর ধারণ করেছে এবং কর্ণার্জ্জুন নাট্যাভিনয়ের তাদের রঙ্গমঞ্চে নাকি অনেক নূতনত্বের অবতারণা হ'য়েছে এ খবরটা অনেকের মুখে শুনেও আমি দেখতে যেতে ইতস্ততঃ করেছিলেম একেবল "বাসন্তী" পত্রিকায় "শ্রীনাট্যমোদী" লিখিত কর্ণার্জ্জুন অভিনয়ের সুদীর্ঘ সমালোচনাটি প'ড়ে! তার পর যেদিন দেখে এলেম —এ সেই প্রত্যেকটি লেখক যে 'নাট্যমোদী' মহাশয়ের সমালোচনার প্রতিটি ছত্রকে প্রতিবাদ লিপি পাঠাতে হচ্ছে, কারণ তাঁর নিছক অসত্য সমালোচনা পড়ে আমি একটা দেখে যাই যেতো অভিনয় না দেখে ঠকতে বসেছিলেম! তিনি যে কি উদ্দেশ্যে এই নবীন নাট্য সম্প্রদায়ের অভিনয় অভিনয় চাতুর্য্যের মিথ্যা নিন্দা ক'রে পাঠকদের প্রতারিত করবার চেষ্টা করেছিলেন; সেটা ঠিক বুঝতে না পারলেও, এই কথাটা সেদিন আমার কাছে বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল যে অসত্য লিখেছি বেশেই বোধ হয় উক্ত সমালোচনা লেখক তাঁর জ্ঞানার নিজের মান প্রকাশ ক'রতে সঙ্কোচ বোধ করেন ব'লেই 'নাট্যমোদী'র ছদ্মবেশে আত্মগোপন ক'রেছিলেন। যে যাই হোক এখন এই ছদ্মবেশী 'নাট্যমোদী'র উল্লিখিত সমালোচনার একটু কঠোর আলোচনা করা আমি উচিত বলে মনে করছি। প্রথমেই তিনি বলেছেন যে "দুই টাকা ধার করিয়াও পূর্ব্বেকার গ্যালারি অর্থাৎ ছত্রের নিম্নে বসিতে হয়! আর চেয়ার গুলিতে বসিয়া উঠিবার কালে বেহ অর্দ্ধপিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা অধিক।" এটুকু পড়লে এই কথাই মনে হওয়া সম্ভব যে তাঁর থিয়েটারে সেই 'পূর্ব্বেকার গ্যালারিই এখনও আছে কেবল তার মূল্য হ'য়ে গেছে দুই টাকা!' 'আর চেয়ার গুলি'—অর্থাৎ গ্যালারি ছাড়া যে সব চেয়ারের ব্যবস্থা হ'য়েছে সেগুলি দর্শকের 'অর্দ্ধপিষ্ট' করবার বন্দোবস্ত মাত্র! 'নাট্যমোদী'র এ অভিযোগ যে মিথ্যা সেটা রঙ্গালয়ে প্রবেশ করবামাত্র চ'খে পড়লো! গ্যালারির অস্তিত্ব একেবারেই নেই, আগাগোড়া দেখলুম চেয়ার সাজানো প্রত্যেক চেয়ার খানি 'রিজার্ভ' করবার ব্যবস্থা হ'য়েছে আসনের অধিকার নিয়ে আজ দর্শকদের মধ্যে দল-যুদ্ধ হবার সম্ভাবনা নেই! বাঙালী পরিচালিত বাঙলা থিয়েটারের ইতিহাসে এই বোধ হয় সর্ব্ব প্রথম দর্শকের বসবার একটা সুবন্দোবস্ত করা হ'য়েছে দেখলুম। বাঙলা থিয়েটারের দর্শকদের একটি চিরন্তন অসুবিধা দূর করার জন্য আর্ট থিয়েটার কোম্পানীর কর্তৃপক্ষদের তাঁহাদের

নিকট কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদই আশা ক'রতে পারেন, এ সম্বন্ধে নাট্যামোদীর অমূলক টিপ্পনী নিতান্তই যেন বিদ্বেষের বশে করা হ'য়েছে বলে মনে হয়।

তার পর নাট্যামোদী মহাশয় নাটক খানির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মন্তব্য প্রকাশ ক'রে তার মধ্যে "দেখিবার শিখিবার ও বলিবার মত কিছুই পাইলাম না!" বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

নাট্য সাহিত্যের দিক দিয়ে—কর্ণার্জ্জুন নাটক খানির রচনা যদিও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নি কিন্তু তার উপাদান, চরিত্র ও ঘটনা সমাবেশ সমস্তই মহাভারতের কেবল 'নিয়তি'র অংশ ছাড়া; নিয়তিটি নাট্যকারের নিজের সৃষ্টি এবং শকুনি চরিত্রের গোপন রহস্যটুকুও লেখকের পরিকল্পিত। শ্রীযুক্ত নাট্যামোদী মহাশয় যদি এই নাটকে কিছু "দেখিবার শিখিবার ও বলিবার" না পেয়ে থাকেন তাহ'লে সমগ্র মহাভারত পাঠেও তাঁর বিশেষ কোনও উপকার হ'বে বলে মনে হয় না!

তার পর তিনি এই পৌরাণিক নাটক খানির অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চে "সেই মামুলি বক্তৃতা, সেই তীর ধনুক (অবশেষে গাছ পালা) ছোড়াছুড়ি ছাড়া আর কিছুই দেখিলাম না—" বলে "অত্যন্ত দুঃখ" জানিয়েছেন। তাঁর এই মোক্ষোক্তি প'ড়ে মনে হয় সম্ভবতঃ তিনি এই পৌরাণিক নাটকাভিনয়ে 'মার্টিনের রাইফেল্' ও হাউইয়ার কামান দেখ্‌বার আশা করে গেছলেন এবং বক্তৃতা মামুলির (যদিও সর্ব্বত্র মামুলি বক্তৃতা ছিল না!) পরিবর্ত্তে আধুনিক অশ্রুতপূর্ব্ব কিছু শোনবার অভিলাষ ক'রেছিলেন সুতরাং তাঁর হতাশ হওয়া ছাড়া আর কি গতি হ'তে পারে সেটা আমরা ঠিক জানি না!

শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র মিত্র তাঁর এই শকুনীর ভূমিকায় যে অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন বাংলার রঙ্গমঞ্চে সে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অতুলনীয় ছবি! তাঁর অভিনীত কাত্যায়ন বা চাণক্যের অংশ শকুনীর অভিনয়ের পাশে যেন ম্লান হয়ে পড়ে। কর্ণের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী এবং অর্জ্জুনের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী যে অপূর্ব্ব নট-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই বিস্ময়কর! এইরূপ শক্তিশালী অভিনেতা গণের সমাবেশে বাংলার রঙ্গমঞ্চের যে শ্রীবৃদ্ধি সাধন হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। নাট্যামোদী মহাশয় তাঁর প্রবন্ধের শেষে "এই শ্রেষ্ঠীর নাটক নট লইয়া এ যুগে থিয়েটার চালানো সম্ভব হইতে পারে না" বলে যে আশঙ্কা জানিয়েছেন সেটাতে তাঁর এ যুগের রঙ্গালয় সম্বন্ধে একান্ত অনভিজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হয়েছে! বাংলার অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী ছাড়া ষ্টারের এই সব নূতন অভিনেতাদের চেয়ে ভাল অভিনয় ক'রতে পারেন এরূপ একাধিক গুণী আমরা অন্য কোনও রঙ্গমঞ্চে এখনও পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হ'তে দেখিনি! কর্ণ, অর্জ্জুন, দুঃশাসন বিকর্ণ প্রভৃতির মুখোস অভিনয় বার বার আমাদের শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ীর সেই অপূর্ব্ব অভিনয় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল! শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী অল্প কয়েক দিন মাত্র প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'য়ে ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর অসাধারণ অভিনয় প্রতিভা যে বাঙ্গলা থিয়েটারের হাওয়া বদ্‌লে দিয়ে গেছে ষ্টারের কর্ণার্জ্জুন দেখে এ কথা সকলকে একবাক্যে স্বীকার করতেই হবে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে শ্রীযুক্ত নাট্যামোদী মহাশয়—যে কর্ণার্জ্জুন অভিনয়ের দৃশ্যপট ও সাজ-সজ্জা সম্বন্ধে অকপটে প্রশংসা ক'রেছেন এটা তাঁর লেখার মধ্যে যেন অনেকটা আশাতীত রকমে এসে পড়েছে বলে মনে হয়। সুদীর্ঘ নিন্দাবাদের মধ্যে এই অল্প ক'টাইন প্রশংসা একপাশ থেকে—ঠিক যেন ব্যঙ্গের মতো শোনাচ্ছে! কর্ণার্জ্জুন অভিনয়ের সাজ-সজ্জা ও দৃশ্যপট বাস্তবিকই এমন সুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হ'য়েছে নাট্যামোদীর মতো নিন্দুকেও সেটা অস্বীকার করতে সাহস করেন নি! তবে স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদ ও রঙ্গক্ষেত্রের বর্ণ-চর্চ্চা সম্বন্ধে আমাদের মনে হয় আরও উন্নতি করার প্রয়োজন।

অন্যান্য অভিনেতা ও দ্রৌপদী প্রভৃতি অভিনেত্রীর অভিনয় ভাল হয় নি। অভিনেত্রীদের মধ্যে পদ্মাবতী তাঁর ভূমিকা সুন্দর ও স্বাভাবিকরূপে অভিনয় ক'রেছেন এবং নিয়তির আকৃতিগত সৌষ্ঠবের অভাবসত্ত্বেও অভিনয় মন্দ হয় নি। নাট্যকার অর্জ্জুনের প্রতি যে অভিসম্পাত

করেছেন তাতে বাস্তবিকই নাটকের নাম 'কর্ণার্জ্জুন' দেওয়া চলে না, কারণ অর্জ্জুনের চরিত্র তিনি কোথাও ফোটাবার চেষ্টামাত্র করেন নি তবু যে দর্শকদের মনে অর্জ্জুনের একটা রূপ ফুটে ওঠে সেটা কেবল মাত্র সুযোগ্য অভিনেতার অভিনয়ের গুণে! বাংলা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম এক সঙ্গে অনেকগুলি প্রিয়দর্শন ও সুপুরুষের চেহারা দেখে বেশ খুসি হওয়া গেল!

গত সপ্তাহের বাসন্তীতে আর এক বক্তা কর্ণার্জ্জুনের সমালোচনা বেরিয়েছে, দেখলেম, এটিও বেনামী, এবং সমালোচকের মুখোস প'রে লেখক অভিনয়ের আলোচনা যতটা না করুন আর্টথিয়েটারের কর্তৃপক্ষদের ব্যক্তি গত কুৎসা করেছেন তার চেয়ে ঢের বেশী। বিশেষ তারা সুন্দরীর সম্বন্ধে তিনি যে মিথ্যা মন্তব্য প্রকাশ করেছেন সেটা নিতান্তই অশোভন হ'য়েছে!*

অরাতি বন্দনা

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

নমস্কার আজ লও আমাদের
উৎসাহী সব নিষ্কুকেরা
মিথ্যা কথার কল্পতরু
হিংসা, লোভের কন্ধুকেরা।
হীন-পিশাচের ধর্ম্ম প্রচার,
এমন করে করবে কে আর
প্রেত পুরীর হায় কোন রাখানে
তাই তোমাদের লোপার ভেরা।

২

এমন প্রখর দুষ্টমতি
ধরার মাঝে পাইনি ধনায়,
বেজীবনের নিয়তি
তেমনি বিপুল অধ্যবসায়।
যেমন মধুর মিষ্টভাষী
তেমনি পরম অবিশ্বাসী
এমন মানিক রাখতে যে হয়
দিয়ে গোবর গণ্ডী বেড়া।

৩

খুইয়ে হায় মারলে জন্মে
দূর অনলে তোমরা বুঝি,
দুঃশাসনের নিকট জ্ঞাতি
তুলনা যে পাইনে খুঁজি।
লোক সমাজের আবর্জ্জনা
কাঁটা দিয়ে হায় কেলতে মানা
আলোক বনে তোমরা চেড়ী
কসার বনে তোমরা ভেড়া।

৪

তোমরা নিজে ভস্ম বনাও
তাই মরেনি গুপ্ত পাপে,
তোমরা আজ উই-ইঁদুরের
তাই জেনো ভাই বংশ বাড়ে।
সুখ পাবিনে বলছি ওরে
মাদার গাছে গা ঘষ্‌লে
কেমন করে যাবজ্জীবন
খুঁটার জোরে লড়বে মেড়া।

৫

ভগবানের ভয় রাখ না
তোমরা ধনীর দাসানুদাস,
এঁটো পাতা স্বর্গে কি যায়
যাও জোরে যাও যতই বাতাস।
তাস দিয়ে যায় তেতাস খেলা
চল না গড়া সাত মহলা
ধাউস ঘুড়ির কাটলো সুতা
এখন সবে লাটাই ঘোরা।

* আমাদের নিজস্ব বক্তব্য এই সংখ্যাতেই মুদ্রিত করা হইল। এ সম্বন্ধে আর কোন বাদপ্রতিবাদ বাসন্তীতে প্রকাশ করা হইবে না। সম্পাদক।

দেশ-বিদেশ

বেথুন কলেজের ছাত্রীদের স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু ইতিপূর্বে সংবাদপত্রের মারফৎ যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে বেথুন কলেজের ছাত্রীনিবাসে যেখানে ৬০ জন ছাত্রীর স্থান হইতে পারে এবং ব্রাহ্ম সমাজ হোষ্টেলে বড় জোর ৩৫টি ছাত্রীর স্থান আছে। অথচ এবার সমষ্টি: ১০০টি ছাত্রী সমিতি-ভুক্তিলাভ পাস করিয়া বেথুন কলেজে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে। ছাত্রীদের হোষ্টেলের এই শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে সেই সময়েই আমরা আলোচনা করিয়াছি এবং এদিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিও তখনই আমরা আকর্ষণ করিয়াছিলাম। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, গবর্ণমেণ্ট এদিকে মনোযোগ দিয়াছেন। বেথুন কলেজে যে সব ছাত্রী ভর্ত্তী হইবে তাহাদের হোষ্টেলের আসবাবপত্রের জন্য গবর্ণমেণ্ট ২,৫০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। তাহা ছাড়া বাড়ী ভাড়া বাবদ প্রতি মাসে ৩০০ টাকা হিসাবে প্রদান করিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য ইতিপূর্বেই বেথুন কলেজের কাছেই ফিরিঙ্গি ষ্ট্রীট ৫০৬ নং এই উদ্দেশ্যে ভাড়া লইয়াছেন। এই বাড়ীটিতে ২৫ জন ছাত্রীর স্থান হইবে। সাময়িক এই ব্যবস্থাটি যে সমস্যা অনেকটা সরল করিয়া আনিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন হইতেই স্থায়ী ব্যবস্থার দিকেও মনোযোগ দেওয়া দরকার। বেথুন কলেজের ছাত্রীদের বাসের উপযোগী করিয়া আর একটি হোষ্টেল তৈরী করিবার জন্য খানিকটা জমী অনেকদিন আগেই কিনিয়া রাখা হইয়াছে। ঐ জমীতে হোষ্টেলের বাড়ী তৈরী করার কাজও আরম্ভ করা হয়। অবশ্য এ সুবিধা গবর্ণমেণ্টের অর্থের অসচ্ছলের উপর বিশেষভাবেই নির্ভর করে এবং ছাত্রীদের অবস্থা যে স্বচ্ছল নহে তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অবস্থায় অবস্থার ভিতরের অল্প স্বল্পায়ে যদি সংক্ষেপ করিয়া এ কাজটিতে হস্তার্পণ করা যায়। এ দেশের মেয়েদের ভিতর উচ্চ শিক্ষা তাহার নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদি কাহারো ভিতর একটু আধটু আগ্রহ দেখা যায় তবে তাহাদের কোনো অসুবিধার জন্য যাহাতে তাহারা বাধা না পড়ে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাই যে আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য।

সুপ্রেমিয়ার কতকগুলি লোক নূতন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ হইয়াছে। ইহাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন হইবে। যুদ্ধমন্ত্রী ,বন্দুকদের ফলাফল বলিয়াছেন, ষড়যন্ত্রকারীরা হইলে ফলাফলটা কিরূপ হইত, এখনো তাহা প্রকাশ করা হইত।

পর্তুগালে রাজা-রাজারা খুবই হক হইয়াছে। সেদিন ঐশীয় সম্রাট্‌কে হত্যা করিয়া গণতন্ত্রীরা ঘোষণা করিয়াছে এবার করিয়া করিয়া [illegible]। তাহার পর তাহারা খ্রীষ্ট শিষ্যের উপাসক যেখানে [illegible]। আপাতঃ তাহা নয়। যেখানে রাজনৈতিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। তাহার অবস্থা যে কতদূর সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে।

গত ১৩ই জুন ১৯২০ অপরাহ্ণে ডাক্তার মেকফার্লেন সভাধিকারী, কে, ই, সি আই-ই, মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় কালীবাড়ীতে উক্ত বণিকের প্রথম বার্ষিক উৎসবার্থে নিমন্ত্রিত সৈনিক বাঙ্গালী সাহিত্যিক এবং সাহিত্যামোদি ভদ্রলোকগণ সমবেত হইয়াছিলেন। সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যাদুময় সঙ্গীতে সকলেই চিত্তাকর্ষণে ও মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছিল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় এখানে বঙ্গসাহিত্য চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা ও মন্দিরের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করেন। পরে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এখানে বাণী-মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এবং কোন্‌পথে বঙ্গসাহিত্যের গতিসঞ্চালন উপকারিতা বিশদভাবে বিবৃত করেন। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন মহাশয় এবার 'সাধনা' সম্বন্ধেই তৃপ্তিকরে সমর্থ হইয়াছিল। সাহিত্য সভায় গীতবাদ্য মধুর হইয়াছিল, মৃদুল এখানে নিবন্ধ সৈনিক সাহিত্য-চর্চ্চা তাহার অধ্যবসায়ীর পক্ষে বিশেষ প্রশংসনীয়। নিবন্ধ সৈনিক সাহিত্য-সভার উৎসব এই প্রথম এবং ইহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর চা-পান এবং জলযোগ পূর্ব্বক উৎসব নিষ্পন্ন হয়।

ফুর্ণসভি খালাস হইয়া গিয়াছে। এক মুক্তোক্তিরও এখনও সন্ধান হয় নাই, তিনবার তাঁহারা দেখিবার সময় চাহিয়াছে। যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রতিনিধি হিসাবে হলেন ও সাহি হয়ের আবিষ্কারক, তবে যেহেতু তুর্কী ঐ সভি খালাস করিয়াছে, সেই-হেতু তিনি খালাস করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

গত ১৭ই জুলাই হইতে আকাশি-তে পয়সেরী পত্রের প্রচার পোষ্টাফিস হইতে বন্ধ করা হইয়াছে, পোষ্টাফিসের কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে সরকারের আদেশ অনুসারেই এরূপ করা হইয়াছে। মাতার মহারাজার পক্ষপাত সম্বন্ধে এই পত্রে অনেক কথা বাহির হইয়াছিল, সম্ভবতঃ এখন আকাশি-তে-পয়সেরীর সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের এমন ভাবনা। 'আকাশি-তে-পয়সেরীতে যদি কোন বিষয় বন্ধ হইয়া যাবে, সরকার ও তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, তাহাতে সত্য প্রকাশের সুবিধা হয়। না করিয়া কর্তৃপক্ষের এমন চাল কেন? মাতার মহারাজার পক্ষ সমর্থন কর্তৃপক্ষের এমনি কোন বিষয়ের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না।

এবার [illegible] উপলক্ষে কলিকাতায় কোন ধনী ব্যক্তির [illegible] শোনা যাইতেছে। এটা যে খুবই দুঃখের, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব-গত উৎসবেই এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছিলাম। এখনও [illegible] হয়। সম্ভবতঃ ঐ উৎসবে বিবাহ বিলাস করিবার ইচ্ছা [illegible] ছিল না।

আলো—ছায়া

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

২য় বর্ষ] ১৯শে শ্রাবণ শনিবার ১৩৩০, ইং ৪ঠা জুলাই। [৫ম সংখ্যা

"দেখি নাই কভু, শুনি নাই কভু—এ হেন তরণী !"

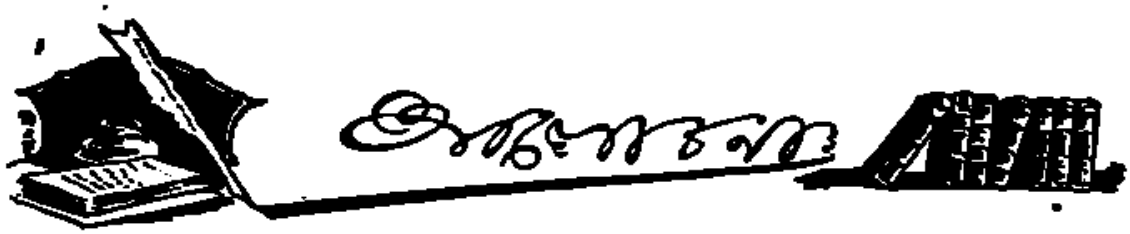

স্বরাজে আমাদের জন্মগত অধিকার। স্বরাজ না পাইলে ভারত কোন দিক দিয়া কখনো সুখী হইতে পারিবে না। পরাধীন ভারতের অঙ্গনে দাঁড়াইয়া লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক ভারতগগনের স্বাধীন চন্দ্র সূর্য্য ও নাগপাশবদ্ধ ভারতবাসীর পানে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বজ্র অচঞ্চল স্বরে এই পরম সত্যবাণী ভারতবাসীকে শুনাইয়াছিলেন। জন্মভূমির মুক্তিকামী স্বরাজমন্ত্রের গুরু, তেজস্বী মারাঠা ব্রাহ্মণ তিলক আজ তিন বৎসর হয় আমাদের ছাড়িয়া তাঁহার সাধনোচিত ধামে চির স্বরাজের নন্দনে গিয়াছেন। পরাধীন পর-সভ্যতা-মোহ-মুগ্ধ দেশে এই সত্য বাণী শুনাইতে আসিয়া তিলককে আজীবন অত্যাচার ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। দেশীয় রাজনীতিকেরা মারাঠা তিলকের এই আকস্মিক অভ্যুত্থান ও অভিযানে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন—তাই তাঁহারা তিলককে নগণ্য করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন—দলেভারী দেশীয় রাজনীতিকেরা তাঁহাকে তেমন আমোল দেন নাই। কিন্তু আগুন কতক্ষণ—কতকাল ছাই-চাপা থাকিতে পারে! বিশেষ করিয়া বাতাস যদি তাহার সহায় হয়। দেশের লোকের মতি গতি ক্রমশই পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল—তিলকের মন্ত্র-শিষ্যে ভারতের রাজনীতিক গণ্ডী পূর্ণ হইতে লাগিল। এই সময়ে স্বরাজ মন্ত্রের পুরোহিতের প্রাণের কামনা আরো বিশেষ ভাবে পূর্ণ করিবার সহায়ক হইলেন ভারতীয় আমলাতন্ত্র। আমলাতন্ত্রের ভীতির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া দেশ-সেবা—সে ছিল একরকম পরোক্ষ ভাবের দেশ সেবা। নিজস্ব নির্য্যাতন সাধনা এ দেশ-সেবার মধ্যে তেমনভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত না। নিজেকে বাঁচাইয়া চলাই ছিল এ রাজনীতির ধর্ম্ম। মারাঠা তিলক তেমন রাজনীতি হইতে দেশীয় পরাধীন রাজনীতির ধারা পরিবর্ত্তিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই ধারা পরিবর্ত্তনের মধ্যে আমলাতন্ত্র সদ্ধার বিকট মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। তিলকের কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইল দীর্ঘ ছ' বৎসর। তিলক প্রতিষ্ঠিত 'মারাঠা' ও 'কেশরী' পত্র তখন দেশীয় জনগণের মনের উপর দিয়া বিজয়কেতন উড়াইয়া চলিয়াছে। মারাঠা তিলকের প্রভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ক্রমেই প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িতে লাগিল। যে ব্যবস্থা ও ভীতিতে রাজদ্বারে তিলক দণ্ডিত হইলেন সেই ব্যবস্থাই দেশের জনসাধারণ তাঁহাকে আদর্শ লোকমান্য তিলক মহারাজ বলিয়া গ্রহণ করিল। তারপর তিলকের উপর চলিতে লাগিল একপক্ষের ক্রমাগত দণ্ড, নির্য্যাতন অত্যাচার—আর এক পক্ষের শ্রদ্ধা প্রীতি ও পূজা। এই অবস্থার মধ্য দিয়া লোকমান্যের জীবনের অবসান হইয়াছে।

• • •

জ্ঞানে, মনীষায়, চরিত্র বলে, লোকমান্য তিলক বিরাট পুরুষ ছিলেন। অনেক বিচক্ষণ রাজনীতিক বলেন, ভারতের ভাগ্যে এমন কর্ম্মী পুরুষসিংহ যদি ১২০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিতেন তবে তিনি একটা বিশাল আদর্শ রাজ্য স্থাপিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। পর-শক্তির প্রভাবের মোহ ভারতকে এমন অভিভূত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহা হইতে ভারতকে মুক্ত করিতে এক জীবনে তিনি পারেন নাই। কিন্তু তিলকের জীবনের প্রতিটি কার্য্য দেশের উপর এমন একটা শক্তি ও প্রেরণা দিয়া গিয়াছে—যাহাতে স্বরাজ সংগ্রামে অবিচলিত থাকিবার জন্য ভারতকে অনুক্ষণ উদ্বোধিত করিতেছে। শিক্ষক ও সংবাদপত্র সেবকরূপে তিলকের প্রথম প্রভাব বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা। দেশপ্রাণতার যোদ্ধা তিলকের জীবনের পূর্ণ স্বরূপ ভাস্বর হইয়া ফুটিয়াছে। তিলক প্রাণে

প্রাণে বুঝিয়াছিলেন যে ভারতবাসীকে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইলে স্বরাজ তাহাকে সর্ব্বাগ্রে অর্জ্জন করিতে হইবে। স্বরাজ ছাড়া ভারতবাসীর জ্ঞান বিজ্ঞান, মান মর্য্যাদার কোনই মূল্য নাই। তাই ভারত গীতার নব ব্যাখ্যাতা, উত্তর কুরুতে আর্য্যনিবাস প্রভৃতি গভীর জ্ঞান ও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা—দেশ-বিদেশে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া মান্য তিলক নিজ জ্ঞানের পরিচয় দিবার জন্য তেমন উৎসাহী কোনদিন ছিলেন না। জীবনে এক মুহূর্ত্তের অধিক কাল তাঁহাকে যদি কারাগৃহে বন্দিত থাকিতে না হইত তবে তিনি বোধ হয় এ সময় গ্রন্থ লিখিতে পারিতেন না। জেলে ইহার উপর কয়েদীভাবে প্রথম কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছিল বেতের চেয়ার বোনা, বার্ণিশ লাগান ইত্যাদি—পরে কয়েদ করিবার মালিকেরা ইহার জ্ঞান ও বিদ্যার পরিচয় পাইয়া পুঁথিপত্র ঘাঁটিতে দিতেন—এই সময়টা হইতেই বিশ্ববাসী লোকমান্যের জ্ঞানের কতকটা পরিচয় পাইয়াছে।

* * * * *

সাংসারিক শোক দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, ব্যাধি পীড়া, জীবনের সব চেয়ে প্রিয়তম সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাকে কর্ত্তব্য পথ হইতে এতটুকু বিচলিত করিতে পারে নাই। নির্য্যাতন লাঞ্ছনা, তিনি অঙ্গের ভূষণ করিয়া লইয়াছিলেন। মনে কামনা ছিল তাঁর মাতৃ-মুক্তির ধ্যান—ও মাতৃভূমির উদ্ধার। দেশকে সঙ্ঘবদ্ধ, শক্তি পূজার পূজারী ও বীরত্বে উদ্বোধিত করিবার জন্য লোকমান্য বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মারাঠী বীর শিবজীর স্মৃতি পূজা উৎসবের আয়োজন করেন। এই বীর-পূজা নিখিল-ভারত গ্রহণ করিয়াছিল। আমলাতন্ত্রীয়ের চোখ দুটি এই উৎসবের উপর পড়িলেও পরে পুনাতে নিখিল ভারত শিবজী স্মৃতি আগারের ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন ইংলণ্ডের যুবরাজ দিয়ে। জানিনা কোন দুর্ভাগ্যে আবার সে উৎসব স্রোত তিমিত হইয়া আসিয়াছে! দীর্ঘ ছ' বৎসর কারাগার প্রান্ত হইয়া তিলক ইংরেজের আদালতে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, 'আইনে দোষী, অপরাধী হইলেও—নিজেকে আমি নিরপরাধ বলিয়া জানি। যে উদ্দেশ্যে আমি আত্মনিয়োগ করিয়াছি সে উদ্দেশ্য বোধ হয় বন্দী অবস্থায় আরো বেশী দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়িলেই সিদ্ধ হইবে—বুঝি এই ভগবানের ইচ্ছা!'

* * * * *

সহযোগী 'আনন্দবাজার' লোকমান্য তিলকের তৃতীয় শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার স্মৃতির তর্পণ করিয়াছেন। তিলক সংখ্যা 'আনন্দবাজারে' দেশের গণ্য মান্য সকলেই এই দেশপ্রাণ নেতাকে শ্রদ্ধা অঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। বাংলার সাময়িক পত্র জগতে দেশপ্রাণতার এমন শ্রদ্ধা নিবেদন সত্যই অপূর্ব্ব। বাংলার আর কোন পত্র তো নহেই—তিলকের 'মারাঠা' পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধ বাসরে লোকমান্যের স্মৃতির প্রতি এতটা শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পারে নাই। আমরা 'আনন্দবাজার' হইতে এই দেশ নায়কের জীবনের পরিচয় কতকটা উদ্ধৃত করিলাম। মহাত্মা গান্ধী বলেন—'তিলক মরিয়া গিয়াছেন, এ কথা বলিলে তাঁহার অবমাননা করা হইবে। তাঁহার সত্তা চিরকাল আমাদের সঙ্গে রহিবে। আমরা যেন তাঁহার সাহস, তাঁহার সরলতা, তাঁহার শ্রমশীলতা এবং তাঁহার দেশ-প্রীতি আমাদের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করিয়া ভারতের এই অদ্বিতীয় লোকমান্যের অক্ষয় স্মৃতি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করি।'

* * * * *

'ছত্রপতি শিবজী মহারাজের জন্ম ও কর্ম্ম ভূমিতে, মহামনীষী পেশোয়া বাজীরাওএর দেশে,বন্ধুর কঠিন মহারাষ্ট্র-ভূমির বক্ষে, একটা গৌরবময় সাম্রাজ্যের শ্মশানে বসিয়া, অতীত মহিমার নির্ব্বাপিত প্রায় চিতাগ্নি হইতে একটি স্ফুলিঙ্গ লইয়া, এক মারাঠী ব্রাহ্মণ যুবক স্বাধীনতা যজ্ঞের হোমানল প্রাণপণ ফুৎকারে প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন; তাহারই দীপ্তির রক্তিম আলোকে সমগ্র ভারত বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, স্বদেশ-বিগ্রহের প্রথম পুরোহিত বাল গঙ্গাধর তিলক!...জীবনের প্রথম প্রভাতেই তিলক দেখিলেন—এই বিশাল বিচিত্র ভারতবর্ষ দাসিত্বজ্ঞানহীন, স্বেচ্ছাচারী, মুষ্টিমেয় শাসক-সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছামত শাসিত হইতেছে,—কোটী কোটী নরনারী অজ্ঞতায়, মূঢ়তায়, দারিদ্র্যে অবিচারে, অত্যাচারে, মরুবৎ নিষ্পেষ্ট,—তথাকথিত উচ্চকণ্ঠীয় শিক্ষিত-সম্প্রদায় ভীরু, কাপুরুষ, সংশয়-

ভূর, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী। তিলক প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, এই পরাধীন, পতিত জাতির মুক্তি সাধনায় তাঁহাকে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াই তিলক উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ-প্রসূত-সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। এদেশের বিদেশী শাসক-সম্প্রদায় ও খৃষ্টান মিশনরীরা আমাদের যে সমস্ত রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারের নিন্দা করেন, তাহা পরিহার করিয়া আমরা ইংরাজের সমকক্ষ হইব—এই মনোবৃত্তিপ্রসূত সংস্কার-স্পৃহা শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল; অপর দিকে ব্রিটিশ শাসন ও ব্রিটিশের অপক্ষপাত ন্যায়-বিচারের মহিমাকীর্ত্তনকারী রাজনৈতিক দলের বাৎসরিক আবেদন-নিবেদনের পালা গাহিবার জন্য পরিচালিত কংগ্রেসী আন্দোলনেও—অনেকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছিল! এই উভয় পন্থাকেই পরিহার করিয়া এক অভিনব পন্থায় চলিবার জন্য তিলক অগ্রসর হইলেন।—শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, শিল্পোন্নতি—এ সকল পরের কথা, সর্ব্বাগ্রে চাই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা!'

• • • •

আনন্দবাজারে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লোকমান্য সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

তিলক মহাশয়ের জীবনের বিশেষত্ব এই ছিল, যে, তিনি কখনও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের মন জোগাইয়া,তাহাদের অনুমোদিত, অভিপ্রেত বা আবশ্যক কাজ করিয়া; তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া, স্বজাতির ও স্বদেশের জন্য কিছু অধিকার ও শক্তিলাভের চেষ্টা করেন নাই;—তিনি নিজের কোন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ইংরেজকে খুশি ক'রতে চেষ্টা কখনও করেন নাই,তাহা বলা ত সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। এই বিশেষত্বটির উপর জোর দিবারও কারণ আছে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট (এবং বোধ হয় সমুদয় পরদেশশাসক গবর্ণমেণ্ট) কখন পরাধীন দুর্ব্বলকে, ন্যায়পরায়ণতা ও সদাশয়তার বশবর্ত্তী হইয়া, অধিকার দিতে, শক্তিশালী করিতে, পারেন না। সহযোগিতা বলিতে ইংরেজ এই বুঝেন যে, তাঁহারা কার্য্যনীতি ও কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশ করি; দিবেন, আমরা তদনুসারে কাজ করিব। "দুই সমান পক্ষের সমানে সমানে সহকর্ম্মিতা," পরাধীন জাতির পক্ষে সহযোগিতার এ মানে ইংরেজের রাষ্ট্রনৈতিক অভিধানে লেখে না। প্রকৃত সহযোগিতার মানে এই, যে তোমার দরকারের সময় তোমার অভিপ্রেত কার্য্যে আমি তোমার সহায় হইব, আমার দরকারের সময় আমার অভিপ্রেত কার্য্যে তুমি আমার সহায় হইবে। কিন্তু পরাধীন জাতির সহিত এইরূপ দুই-তরফা সহযোগিতা ইংরেজদের রাজনৈতিক শাস্ত্রে অবৈধ। বাস্তবিক, যে ইংরেজকে বলিতে পারে, "আমি এইটি চাই; তুমি যদি আমার প্রয়োজন ও অভিপ্রায় অনুসারে কাজ কর, তাহা হইলে আমিও তোমার অভিপ্রায় ও প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করিব, নতুবা নহে," এবং এই প্রতিজ্ঞায় অটল থাকে, তাহাকে ইংরেজ দণ্ড দিতে পারে, কিন্তু মনে মনে শ্রদ্ধা না করিবেই। তিলক এই রকমের মানুষ ছিলেন। এইজন্য ইংরেজ তাঁহাকে নিগৃহীত করিয়াছে, বহুবার; কিন্তু তিনি শক্ত মানুষ ছিলেন, কখন নরম হন নাই। তাঁহার শিরদাঁড়াটা দৃঢ় ছিল। যশ, শির পাইবার জন্য সেলাম করিতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না।

•

কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ তিলক তর্পণে গাহিয়াছিলেন—

তীর্থ হ'ল কয়েদখানা যাহার ইন্দ্রজালে
নির্ব্বাসনে কাঁপ্‌ত না যার হিয়া;
ছিল যে-জন দীপ্তি-তিলক বৃদ্ধ বেশের ভালে
বজ্র-মেঘের বিদ্যুতে নিছিয়া;—
'কেশরী'যার বাহন ছিল—ঘোসর বেশের শুভ,
স্বাতন্ত্র্যে যে ছিল রাজার মত,
'স্বরাজ' ছিল স্বপ্ন যাহার, স্বদেশ-প্রীতি ধ্রুব,
সেই মহাপ্রাণ আজ্‌কে মরণ-হত!
সাঁচ্চা পুরুষ-বাচ্চা সে যে মর্দ্দ তেজের ছবি—
নয় কোনোদিন ন্যস্ত জুজুর ভয়ে;
ভিক্ষা-পন্থী নয় ভিখারী, নয় সে প্রসাদ-লোভী,
স্পষ্ট কথা বল্‌ত কয়ে হ'য়ে।
ঘোসাবোদের তোষাখানায় ছিল না তার ঠাঁই
আকাই-কড়ার অনারেবল্ নয়;

লতা বিতান

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক

(আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

আইক্ ইন্সিওর বা জীবন বীমা করাটা অধুনা আমাদের দেশে লোকের কাছে অপরিচিত নয়। কিন্তু হাতের আঙুল, পায়ের আঙুল, গলার স্বর, বীমার কথা শুনলে নিশ্চয়ই চমকে উঠতে হবে। চমকানেও উপায় নেই, কারণ এ সত্যি কথা।

নর্ত্তকী-রাণী অ্যানা প্যাভলোভা তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুলটি যেটির ওপর ভর দিয়ে তাঁকে নাচতে হয়, সেটি বীমা করেছেন—২০০০০টাকায়! আর একজন নর্ত্তকী তাঁর নাম মেপিয়ার ডোয়াক্স—দু'খানি পা'ই

প্যাভলোভার সোণার পা!

বীমা করে বসে আছেন, এক লাখ ৮০০০০টাকায়! ভাবো, ভাবুক, পা দুটো!

প্যাভেরিস্কি এক লাখ আশি হাজার টাকায় তাঁর হাত বীমা করেছিলেন; তার জন্যে বছরে ১২ হাজার টাকা প্রিমিয়াম দিতে হত। এ ছাড়া তাঁর আবার আঙুল, বুড়ো আঙুল, চোখ, পায়ের বুড়ো আঙুল আলাদা আলাদা বীমা করা ছিল। এই ভদ্রলোক একবার একটি নখের অসুখে একটি কনসার্টে যোগ দিতে পারেন নি বোলে বীমা কোম্পানীর কাছ থেকে ১৫০০০ টাকা আদায় করেছিলেন।

স্যারিকা প্রেষ্ঠা প্যাটি তাঁর কণ্ঠস্বরও বীমা করেছিলেন। ইনি প্রত্যেক অভিনয়ে গলার স্বরটি ১৫ হাজার টাকায় বীমা করতেন। বুকে দেখুন অবস্থাটা!

অধ্যাপক হাক্সলী ৭৫ হাজার টাকায় তাঁর দৃষ্টি বীমা করেছিলেন। দৃষ্টি হারালে টাকাটা পেতেনও।

এ ছাড়া কত লোক যে কত কি বীমা করে তার ঠিক নেই। আমাদের অত টাকা-ও নেই, তার কথাও নেই। তবে পাঁচটা বড় লোকের বড় কথা মুখরোচক—লিখতেও, শুনতেও।

ভ্যান হারবার্ট বার্কার—এঁর হাত দু'খানাও ভারী রকমের টাকায় ইন্সিওর করা আছে।

রুবেলিস্ক, এঁর একটি হাত কত টাকায় ইন্সিওর করা শুনবেন? শুনুন, এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকায়।

সে ছিল লোক-মান্য তিলক, তুলনা তার নাই,
জাতীয়তার তিলক সে অক্ষয়!
হৃদয়ে তার নিত্য-উদয় শক্তিরূপা মাতা,
ললাটে তার বেদের সরস্বতী;
ভারত-রথের রথী ক'রে গড়েছিলেন ধাতা—
ছত্র-চামর-বিহীন ছত্রপতি!
ভুল-সময়ে এসেছিল হঠাৎ কেমন ক'রে,
বিদায় নিল তেম্‌নি আচম্বিতে—
খুঁজ্‌ছে যখন দেশের হৃদয় খুঁজ্‌ছে সকাতরে
যুগের যজ্ঞে পৌরোহিত্য নিতে।

ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেন,—

যুগাধিককাল তিনি কারাগারে বাস করিয়াছেন, নির্ভীক সত্যবাদিতার জন্য। দেশের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অর্থ, ক্ষমতা, যশের আকাঙ্ক্ষা তিনি করেন নাই। তিনি ব্রাহ্মণ কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রাধান্য সংস্থাপনের চেষ্টা তিনি করেন নাই। তাই মহারাষ্ট্রের সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়, সকল শ্রেণীর লোক তাঁহাকে ভালবাসিত, ভক্তি করিত। তিনি ছিলেন দক্ষিণের মুকুটহীন রাজা।

শিল্প মঞ্জুরী

[শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়]

প্রথম পর্য্যায়

(৩)

পেনী—ছোট ছেলেমেয়েদের পেনী আর একটী আরামদায়ক জামা। এই জামা ছেলে মেয়েরা হাঁটিবার পূর্ব্বাবস্থা পর্য্যন্ত ব্যবহার করে।

পেনীর মাপ :—লম্বা—১৬″ ছাতি—১৮″ পুট—৪″ পুটহাতা—১০″ মোহরী—৫″

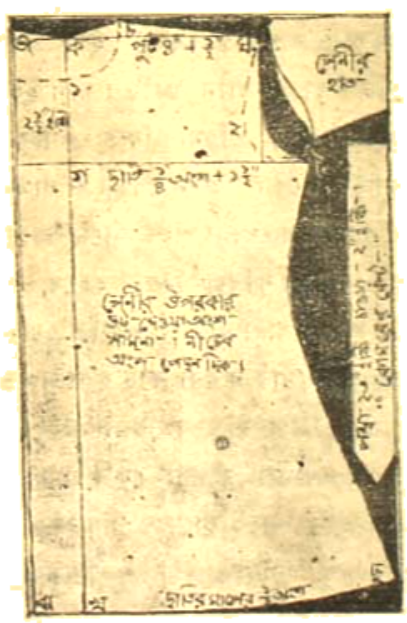

১১নং চিত্র

পেনী কাটিবার নিয়ম :—প্রথমতঃ যে কাপড়ের পেনী হইবে তা'কে লম্বা দিক ছাতির মাপে কাপড়কে ডবল ভাঁজ করিয়া এড়ো দিকে লম্বা মাপের ডবল ভাঁজ করিতে হইবে। ডবল ভাঁজের মোড়া অংশে ক ও ব লাইন হইতে ২½″ ইঞ্চি মাপ দিয়া ক ও ব লাইন টানিতে হইবে। ক হইতে ঘ পর্য্যন্ত পুট মাপ ৪″ ইঞ্চি+½″ ইঞ্চি বেশী রাখিয়া চিহ্ন কর। ক, ঘ লাইন হইতে ½″ ইঞ্চ উপর দিক বেশী রাখিয়া ক ও চ ছাতির ¼ অংশের স্থানে চিহ্নিত করিয়া চ ও ঘ চিত্রানুযায়ী একটু বাঁকা ভাবে চিহ্নিত করিতে হইবে। তারপর ক খ লাইনে পুটের যত মাপ আছে ক গ ৪″ চিহ্ন করিয়া গ হইতে ট পর্য্যন্ত ছাতির ¼ অংশ+১½″ ইঞ্চি (ছাতির ¼ অংশ ৪½+১½=৬ ইঞ্চি) হইল ঘ ও ছ হাতের জন্য ছাতির মাপের ¼ অংশ অর্থাৎ ৯″ ইঞ্চি ছ চিহ্ন ঘ লাইন হইতে ½″ ইঞ্চি উপরে বাঁকা ভাবে মোহরীর জন্য ও ছ কোমরের জন্য চিত্রানুযায়ী বাঁকা ভাবে সংযোগ করিয়া লইলে পেনীর পেছন দাগ

দেওয়া শেষ হইল। এখন ঙ, ক, চ, ঘ, ট, ছ, খ ও ক দাগ দেওয়া অংশ কাটিয়া লইলে পেছন ও সামনার কাটা হইল। এরপর দাগ দেওয়া—উপরের জোড়া অংশ লইয়া অর্থাৎ সাম্‌নার অংশে সামান্য বাগিয়া কাটিয়া লইতে হইবে।

ক ও ১ ছাতির ½ অংশ নীচের দিক চিত্রানুযায়ী বাঁকাভাবে চিহ্ন করিয়া লইবে। তারপর ঘ ২ ট ½″ ইঞ্চি ভিতর দিক হাতের আকার (Shape) ভঙ্গ চিহ্নিত করিয়া কাটিয়া লইলে সাম্‌না কাটা শেষ হইল।

পেনীর হাত কাটিবার নিয়ম :—হাতের জোহোড়ার কাছে যে অতিরিক্ত কাপড় বাহির হইয়াছে তা হইতে হাত কাটিতে হইবে, কাপড়কে প্রথমতঃ তবল ভাঁজ করিয়া দুই টুক্‌রা কাপড় রাখিয়া তা হইতে পুটের মাপের অংশ ৪″ ইঞ্চি সঙ্গে ½″ ইঞ্চি বেশী দিয়া ঠ পর্য্যন্ত চিহ্ন করিয়া ত ও খ ১½″ ভিতর দিক নিয়া ঘ, ঠ একটা সোজা লাইন টানিয়া ত, ঠ চিত্রানুযায়ী বাঁকাভাবে দাগ দিতে হইবে। তারপর ত হইতে ড পর্য্যন্ত পুটহাতা ১০″ ইঞ্চি হইতে পুট ৪″ ইঞ্চি বাদ দিয়া পুটহাতার মাপ লইতে হইবে। অর্থাৎ এখানে ৬″ ইঞ্চি হইল। ড হইতে জোহরী ৫ ইঞ্চির অর্দ্ধেক ২½″+১½″ ইঞ্চি বেশী নিয়া চ পর্য্যন্ত চিহ্ন করিয়া নিয়া ঠ, চ, সংযোগ করিয়া লইয়া ত, ঠ, চ ও ড দাগ দেওয়া অংশকে কাটিয়া লইলে হাত কাটা শেষ হইল।

১২নং চিত্র

পেনী সেলাই :—পেনীর সচরাচর পেছন দিকে বোতাম ঘর বসান হয়, কারণ পেছন দিকে বোতাম ঘর বসাইলে ছোট ছেলে মেয়েগুলির হাত পা নাড়িবার পক্ষে সুবিধা হয় সেইজন্য সাম্‌নের দিকে বোতাম ঘর না করিয়া পেছন দিকে বোতাম ঘর করা যুক্তি সঙ্গত। প্রথমতঃ পেছন দিকের যে অংশ কাটা হইয়াছে তাকে গলা হইতে ৫″ ইঞ্চি নীচের দিক বাবাবাকিতে কাঁচির সাহায্যে কাটিয়া লইতে হইবে। পরে ঐ অংশের উপর একটিতে ½″ ইঞ্চি পরিমাণ ভাঁজ করিয়া ফিল্‌নী সেলাই করে অপরটীতে ১″ ইঞ্চি পরিমাণ ভাঁজ করিয়া ফিল্‌নী করিতে হইবে। ফিল্‌নী করা হইয়া গেলে বখেয়া সেলাই দ্বারা সেলাই করিয়া নিয়া সেইটী ½″ ইঞ্চি সেটী হবে বোতাম পটী ১″ ইঞ্চি যেটীতে আছে সেইটী হবে কাজঘর। কাজঘর ও বোতাম পটীর পাশে সরু সরু বরেকটী পটী দিয়া নিলে দেখিতে বেশ সুন্দর হবে। এখন সাম্‌নার অংশে ঐ যে তবল ভাঁজে ঙ ও ক এবং ঙ ও খ পর্য্যন্ত যে ২½″ ইঞ্চি কাপড় বেশী রাখা হইয়াছে ক ও গ ইহার ১½″ বা ২″ ইঞ্চি নীচে ঘন পেহু দিয়া বা কুচি দিয়া একখানি ছাতির মাপ হইতে ৫″ ইঞ্চি কাপড় বেশী চওড়া ২″ ইঞ্চি (ছাতি ১৮″+৫″=২৩″ ইঞ্চি, চওড়া ২″ ইঞ্চি) পরিমাণ ফিতা কাটিয়া ঐ পেহুর স্থানে বসাইয়া দিতে হইবে। এদিকে কোমরের বেল্ট বা কোমর বাঁধার কাজ চলিবে। এখন পেছন ও সাম্‌নার কাপড়কে দুই পাশে জুড়িয়া নিয়া কাঁধ জুড়িবে, কাঁধ জোড়া হইয়া গেলে গলায় যে খোলা অংশ আছে তাহাতে কাপড়কে কুঁচি দিয়া বালোয়ার তৈয়ার করিয়া বা চিকণ অথবা লেস বসাইয়া সেলাই করিয়া দিতে হইবে, পরে নীচের অংশে কাপড় কুঁচি করিয়া দিলেও চলে চিকণ বা লেইস দিলেও চলে অথবা সাদা রাখিলেও ক্ষতি হয় না। পূর্ব্বে বলেছি সুন্দর করা আমার হাত নয় যার চোখে যেমন ভাল লাগে। আমার কর্ত্তব্য কাট ছাঁটে অভাব ঘুচানো।

হাত সেলাই :—হাতের জন্য চারি ভাগে যে দুই টুক্‌রা কাপড় আছে তাকে প্রথমতঃ খুলিয়া ফেলিয়া হাতের জোহরীতে বুকে যেরূপ বালোয়ার দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ যদি লেস দেওয়া হইয়া থাকে হাতেও লেস দিয়া ফিল দিয়া বসাইয়া সেলাই করিয়া লইয়া ঠ ও চ অংশ জুড়িয়া নিয়া পেনীটিকে ভিতর দিক উল্টাইয়া হাতও ভিতর দিক উল্টাইয়া জোহোরা জুড়িয়া দিয়া সেলাই করিয়া লইতে হইবে।

সেলাইয়ের কাজ হইয়া গেলে পেছন দিকে যে বোতাম পটী ও কাজ ঘর করিবার পটী করা হইয়াছে, তাহাতে

কাজ ঘরের পটীতে দুইটী বোতাম ঘর করিয়া লইতে হইবে। এবং তাহার সমস্থানে চিহ্ন করিয়া বোতাম বসাইয়া লইলে পেনী সেলাই সম্পূর্ণ হইল।

এর পর ক্রমশ থাকিবে।

সংগ্রহ

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

আফ্রিকার অধিবাসী ঃ—

আফ্রিকাদেশের কোন এক প্রদেশের অধিবাসীদিগের জীবনযাপনের ইতিহাস ভারী অদ্ভুত। তার মধ্যে গোটা-কতক এই :—

তাদের মধ্যে কারু মৃত্যু হ'লে তারা শবদেহকে শ্মশানে নিয়ে যায়। সেখানে গাঁয়ের বুড়ীরা আসিয়া শবদেহকে টুকরো টুকরো করিয়া কাটিয়া ফেলে। তারপর আত্মীয়েরা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শবের মাংস রাঁধিয়া উদরসাৎ করে।

সেখানে যে নারী যত বেশী মোটা পুরুষেরা তাকে তত বেশী রূপসী বলিয়া ভালবাসে। যে সব মেয়ের দাঁত বাঁকরা তারাও রূপসী বলিয়া সেদেশে বিখ্যাত।

তাদের গোয়ালারা গাঁইগুঁইদের ভারী ভালবাসে ও প্রাণপণে সেবা ও যত্ন করে। কোন গাভী মারা গেলে তাঁরা স্ত্রী-পুত্র বিয়োগের চেয়েও বেশী শোক-দুঃখে কাতর হইয়া পড়ে।

সে দেশে সতীত্বের আদর্শ ভারী নীচু। বাড়ীতে অতিথি এলে, গৃহস্বামী তাকে নিজের স্ত্রীর দেহদান করিয়া অতিথি-সৎকার করে।

সে দেশে নারীরা স্বহস্তে প্রকাণ্ড সূচের দ্বারা কপাল ও গুন ক্ষত করিয়া ফেলে। এই ক্ষত সে দেশের রূপসী-দের চক্ষে বিশেষ সৌরবের চিহ্ন।

আশ্চর্য্যজনক দৌর্ব্বল্য ঃ—

যারা স্নায়বিক দুর্ব্বল তারা কোন ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা সহজভাবে কইতে পারে না। সে রকম কোন ছাত্র মৌখিক পরীক্ষায় ভীরুভাবে জন্ত উত্তর দিতে আমতা আমতা করে। তাদের উচিত যে সময়ে মুখের ভিতর লবেঞ্চুস বা এমন একটা কিছু ছোট জিনিস পুরিয়া রাখা। তাতে মুখ সরস থাকে। মুখের ভিতর যে লালা থাকে তা শুকাইয়া যাওয়ার স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য আসিয়া পড়ে। কেননা সেই শুষ্কতার প্রভাব মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডের উপর গিয়া পড়ে ; কাজেই মুখের শুষ্কতা দূর করিতে পারিলে

ভীরু ও লাজুক লোকদের সপ্রতিভ স্বাভাবিক ভাবটা আবার ফিরিয়া আসে। যৌথিক পরীক্ষার সময় এই উপায় অবলম্বন করিলে ছাত্রদের উপকার হইবে আশা করা যায়।

টুকরো :—

বলা ভারী সোজাই থাক—মস্তিষ্কের পক্ষে।

পৃথিবীর কোথাও কোথাও সবুজ রংএর বরফ পাওয়া যায়।

শাকসব্জী খাওয়া ছেড়ে দেওয়া—'বেরিবেরি' ও মাথায় টাকপড়া রোগকে ডেকে আনারই সামিল।

নারীদের চেয়ে পুরুষদের হৃদয় বেশী কোমল—এমনি একটা কথা কোন খবরের কাগজে পড়া গেল।

আমেরিকার রেলগাড়ীতে আজকাল স্ত্রীলোকদের ধূমপান করার জন্য আলাদা কামরার বন্দোবস্ত হয়েছে।

মাথা ধরেছে? ভাবনা কি? এক গেলাস ঠাণ্ডা জলে একটি পাতিলেবু গুলে খেয়ে ফেলুন—মাথা ধরা ছেড়ে যাবে। আর একটা গুরুত্ব, মাথায় ঠাণ্ডা জলের পটী বেঁধে রাখা।

পাখীরা যা ডিম পাড়ে তার আকারের সঙ্গে তাদের দেহের আকারের কোন সম্পর্ক নাই। দাঁড়কাক ও কোকিলের আকার প্রায় এক অথচ দাঁড়কাকের ডিম কোকিলের ডিমের চেয়ে পাঁচ ছয় গুণ বড় হয়।

ফুটবল খেলে বাড়ী ফিরে প্রায়ই অতিরিক্ত পরিশ্রম-বশতঃ দেহ শ্রান্ত ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তা দূর করবার উপায়—খেলার এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা পরে গরম জলে গায়ের নোন্তা মিশিয়ে স্নান করা।

নিউইয়র্কে প্রতি রাত্রে পঞ্চাশ হাজার লোক বেতারের সাহায্যে কন্সার্ট শুনিয়া থাকে।

প্রৌঢ় বয়সে পৌঁছুবার আগেই শতকরা পঞ্চাশ জন পুরুষের মাথায় টাক পড়ে যায়, কিন্তু সে বয়সে শতকরা একজন নারীরও মাথায় টাক দেখতে পাওয়া যায় না।

কিছুদিন আগে কোন বাংলা খবরের কাগজে পড়েছিলুম—সব চেয়ে ভাল দাঁত মাজা যায় আপেলের দ্বারা।

স্বাস্থ্যচিকিৎসা :—

রমণীর সঙ্গে যে কোন যানের তুলনা চলতে পারে। চালক ভাল না হলে পদে পদে বিপদ ঘটতে পারে।

তোমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে যখন কথা কইবে তখন নিশ্চয় সে এমন জিনিসের কথা পাড়বে যেটা তার একান্ত অভাব।

সমালোচনায় কেউ চরিত্র হারিয়েছে বলে শোনা যায়নি

সেদিন একটী লোক বলছিলেন—বনের পশুকে বশ করা খুবই সহজ কিন্তু আসল শক্ত কাজ হচ্ছে নিজের স্ত্রীকে বশ করা।

জ্ঞানলাভ করতে চাইলে যে লেখকদের মতামত তোমার সঙ্গে মেলে না তাদের রচনা মন দিয়ে পড়।

যোগীদের শয্যা

(অনুবাদ হইতে)

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

ভূমি,—শয্যা সুখকর
তুল,—উপাধান ;
যামন,—বলয় মৃদু,
আকাশ,—বিতান।
চন্দ্রমা,—উজ্জ্বল দীপ,
বণিতা,—বিরতি
বহু আলিঙ্গনে যাঁ'র
তিনি শুদ্ধ মতি।
—এ যে যোগীজনোচিত
সুখদ শয়ন।
কোথা পাবে ভবভীত
নৃপতি এমন?

মায়ের-প্রাণ

[শ্রীগিরবালা দেবী, রত্নপ্রভা, সরস্বতী]

৯

"জেঠাইমা ও জেঠাইমা!"

"অজু আয় বাবা আমি তোর কথাই ভাবছিলাম। কবে মুঙ্গেরে যাওয়া ঠিক কর্‌লি?" বলিয়া শ্যামসুন্দরী প্রতিবেশী যুবকের বসিবার জন্য বারান্দায় একখানা আসন পাতিয়া দিলেন। আসনে না বসিয়া শ্যামসুন্দরীর পায়ের কাছে মাটীতে বসিয়াই অজয় উত্তর করিল "কাল যাওয়াই ঠিক হয়েছে জেঠাইমা, তোমার যদি বিনুদাকে কিছু খাবার টাবার দিতে ইচ্ছা হয়—তাহলে তৈরি করে রেখ'—আমি যাবার সময় নিয়ে যাব।"

"হ্যাঁ, বাবা তোর সঙ্গে তো কিছু দেবার ইচ্ছাই আছে; আজ দুটো বছর বাছা আমার বাড়ীর কোন দ্রব্যই মুখে দেয় না। কতকাল কিরে আসতে পারে নি, সে তিলের নাড়ু, চিড়ের মোয়া, খেতে বড় ভালবাসে তারই কিছু তোর সঙ্গে পাঠিয়ে দেব।" অজয় হাসিয়া বলিল "এখন কি বিনুদার এসব ভাল লাগবে? এখন তিনি হাকিম হয়েছেন, বড় লোকের জামাই হয়েছেন; তাই দুটো বছরের মধ্যে একবার তোমায় পর্য্যন্ত দেখতে আসার সময় পেলেন না।"

শ্যামসুন্দরী কণকাল মৌন থাকিয়া ব্যথিত স্বরে বলিলেন "সে যে ছুটী পায় না অজু! পরের চাকুরী, তার দোষ কি?" নইলে আমার কাছে আসা কি তার অনিচ্ছা! তোরা সব বৌমার কথা বলিস, বিয়ের পরে আমার ভাল। ঘরে এসে ঢুকেছিল বলেই কি বড় হলে বুঝি হলে তার নিজের ভিটায় ফিরে আসবে না এইটা তোরা মনে ভাবিস?" বলিতে বলিতে প্রবাসী পুত্র ও পুত্রবধূর সুন্দর শান্তিপূর্ণ সুখছবি মায়ের হৃদয় দর্পণে প্রতিভাত হইল; দীর্ঘশ্বাস বাহিরা বেদনার অশ্রুজল করিয়া পড়িল; পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি ব্যাকুল চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন। অজয়ের নিকট কিন্তু এ অশ্রু গোপন রহিল না।

রক্তের সম্বন্ধ না থাকিলেও এই ছেলেটী বাল্যকাল হইতেই শ্যামসুন্দরীকে মায়ের মত ভাল বাসিত, ভক্তি করিত আবার অনেক সময় অভিমান করিয়া আব্দার করিয়া শ্যামসুন্দরীকে অস্থির করিয়া তুলিত। মধুময় শৈশব হইতেই বিনয়ের মাতৃস্নেহের অংশীদার হইয়া—তাহার সহিত খেলা করিয়া, কলহ করিয়া তাহার কৈশোর জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। শ্যামসুন্দরীর এতটুকু মনোকষ্ট এতটুকু হৃদয়ব্যথা অজয় সহিতে পারিত না। স্নেহশীল পুত্রের জন্য মায়ের উচ্ছ্বসিত অশ্রু দেখিয়া বিনয়ের উপর তাহার ক্রোধের পরিমাণ আজ আরও বাড়িয়া গেল। তীব্রস্বরে সে উত্তর দিল "মনে ভেবে আর কি হবে জেঠাইমা, চোখেই তো দেখতে পাচ্ছ! বৌ পরের মেয়ে—তার কথা বলি না, বিনুদা নিজেই পাষাণ হয়ে গেছে, কত কষ্টে তুমি তাকে মানুষ করে ছিলে, লেখা পড়া শিখিয়ে ছিলে সব সে ভুলে বসে আছে। এরা আবার সুশিক্ষিত! আমি মুঙ্গেরে শুধুই বেড়াতে যাচ্ছি না, মনের খেদ মিটিয়ে বিনুদাকে দুটো কথা শোনাতেই আমার যাওয়া।" অজয়কে বাধা দিয়া মিনতি ভরা কণ্ঠে শ্যামসুন্দরী বলিলেন, না, অজু বিনুকে তুই কোন কঠিন কথা বলিস না। সে ছুটী পায় না বলেই আমার কাছে আসে না। কাজ কর্ম্মের ব্যস্ততায় হয়ত চিঠি লেখবারও ও অবসর পায় না। আর আমায় দেখবার তো তুই আছিস বাবা, তোর উপর নির্ভর করেই সে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে।"

অজয় কি যেন বলিবার জন্য চক্ষু তুলিয়াই হঠাৎ থামিয়া গেল। কণকাল নিস্তব্ধ বেদনাময়ী মাতৃমূর্ত্তির দিকে চাহিয়াই তাহার [illegible]

অন্ধকার রাত্রির শীতল ধারায় স্নাত হইল, স্নেহবিহ্বলা চির কল্যাণময়ী জননীর হৃদয়ে পুত্রের দুঃখ-কষ্ট আশঙ্কা করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। এই ভুল ধারণাই যে একমাত্র হৃদয়বান পুত্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্তার সান্ত্বনা হল, নিরাশার অন্ধকারে উজ্জ্বল প্রদীপ শিখা, শুষ্ক দীর্ণ হৃদয়ের পরতে পরতে নব বর্ষা সমাগম!

কিছুক্ষণ চিন্তার পর আস্তে আস্তে অজয় বলিল "তোমার চিন্তা নাই জেঠাইমা; আমি বিনুদাকে কিছুই বোলবো না কেবল নূতন করে আনিয়ে আসব, মানুষের কি অমৃত বিষেই ভগবান গঠিত করেছেন।"

শ্যামাসুন্দরীর বদনে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল; তিনি কথা কহিলেন না, অজয়ের নিকটে আরও একটু সরিয়া বসিয়া তাহার মস্তকে পরিপূর্ণ স্নেহের সহিত নীরবে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

ক্রমে মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্র অবসানে শোভাময়ী সন্ধ্যা কানন কুন্তলা বনশ্রেণীর উপর ম্লান ছায়া ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। বাঁশবাড়ের উঁচে এঘন-স্নিগ্ধকারী কাল বৈশাখীর মেঘস্তূপের মধ্য হইতে দ্বিতীয়ার প্রভাহীন চন্দ্র ধীরে উদয় হইলেন। অজয় প্রস্ফুটিত বকুল ফোরক সৃষ্টিত করিয়া স্পর্শে, গন্ধে, সন্ধ্যাপবন উতলা হইয়া উঠিল। পথের অদূরে হাবাজনি ক্রমেই বিলীন হইয়া আসিতেছিল, পাখীদের সান্ধ্য নীড় নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ হইল। শুধু নদীর তটের অবিশ্রাম কলকল ধ্বনি আরও স্পষ্ট করিয়া তুলিল।

অজয়কে বিদায় দিয়া শ্যামা সুখময়ী গৃহে সান্ধ্যদীপ প্রজ্বলিত করিয়া তুলসী মঞ্চে দীপ দিতে চলিলেন। অজয়ের একপার্শ্বে গোময় লিপ্ত তুলসীমূলে প্রদীপ দিয়া সুদূর হৃদয়া জননী প্রবাসী পুত্রের মঙ্গল কামনা করিয়া, সেইখানে লুটাইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। নির্জ্জন নিভৃত কক্ষে তাঁহার নিরাশায় উদ্বেলিত বিক্ষিপ্ত মনটাকে মালাজপের মধ্যে নিবিষ্ট করিতে স্নাত শ্যামাসুন্দরীর একটু বিলম্ব হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে পুত্রের আলোচনাই বোধ করি ইহার একমাত্র কারণ। অতীতের দুঃখময় স্মৃতি আজ নূতন আকারে তাঁহার মনোমধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছিল। মনে পড়িল, পঞ্চম বর্ষের বালক পুত্র লইয়া পতি বিয়োগের সেই বিষাদময় কাহিনী। সংসার [illegible] অভাব সহিয়া, দুঃখ সহিয়া বিনয়কে প্রতিপালন করিয়া তোলা। সেই অতীতের মধ্যে দুঃখিনীর অমূল্যমণি—সেকি আজ যাকে বিস্মৃত হইয়াছে, এটা কি কখন ও সম্ভব হইতে পারে? অজয়ের ভুল! মহাভুল! তাহার ভুল ভাঙ্গিবার জন্য ভগবান ধন্য করিয়া বিনুকে একবার মার তৃষিত তাপিত বক্ষে ফিরাইয়া আনো। তাহাকে স্পর্শ করিয়া তাহার সুধাপূর্ণ মা, মা, কণ্ঠস্বর শুনিয়া যার অন্তরখানি পূর্ণ হউক, দীপ্ত হউক।

২

সমস্ত রজনী বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়া অতি প্রত্যূষে, শ্যামাসুন্দরী শয্যাত্যাগ করিলেন। শিব পূজার পুষ্প চয়ন করিবার জন্য আজ আর অধিক সময় তাঁহার অতিবাহিত হইল না। নিত্য নৈমিত্তিক গৃহকর্ম্ম সারিয়া ঘরদ্বার পরিষ্কার করিয়া তিনি পুত্রের জন্য খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে বসিলেন। আজই দ্বিপ্রহরে অজয় মুঙ্গের রওনা হইবে ইহারই মধ্যে সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত না করিতে পারিলে বিনুর বাড়ীর জিনিষ, মার হাতের প্রস্তুত জিনিষ খাওয়া হইবে না। সে যে দুটী বছর মার হাতের খাদ্য গ্রহণ করে নাই, তাই আজ যা তাঁহার যত শক্তি যত সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া নানাবিধ খুসিই আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। বিনয়ের বন্ধু অজয়ের গাড়ী 'রাজনী' এবার প্রস্তুত হইয়াছে। তাহারই দুধের দ্বারা শ্যামাসুন্দরী ক্ষীরতক্তি করিলেন। নূতন গাছে দুইটি মাত্র নারিকেল ফলিয়াছিল; তাহা দিয়া বিনয়ের জন্য নকুল হইল বাগানের খেজুর রস আল দেওয়া গুড় ছিলের নাড়ু তৈরী করিয়া চিকার মোয়া প্রস্তুত করিবার জন্য শ্যামাসুন্দরী উনানের উপর গুড় চড়াইয়া দিলেন। অতিমাত্র ব্যস্ততায় হঠাৎ খানিকটা ফুটন্ত গুড় তাঁহার বাম পায়ের উপর পড়িয়া না যাওয়া পুড়িয়া গেল। কিন্তু সেদিকে চাহিয়া দেখিবারও তাঁহার অবসর ছিল না। একটু উষধ প্রলেপের সময় ও তিনি নষ্ট করিতে পারিলেন না; কি জানি অজয় আসিয়া পড়ি-ফিরিয়া যায়, তবে ত বিনয়ের কোন খাওয়া হইবে না। অসহ্য জ্বালায় [illegible]

ফুল্ল-কমল।
শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।

Lakshmibilas Press.

স্থানটী নিজ হস্তে দ্বারা। জিজ্ঞাইয়া আসন বসনে শ্যামাসুন্দরী মাটীর ভরেকটী হাঁড়ী লইয়া খোবার গুলি শুকাইয়া দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে অঙ্গন ভরিয়া গেল। পল্লীবাসীরা আহারান্তে বিশ্রাম সুখে মগ্ন হইল; তপ্ত-দাহকর কলাগাছের পাতা দুলাইয়া দেহমনের শ্রম দুরাইয়া উঁচুল বৃক্ষের ছায়া সুনিবীড় গ্রাম্য ঘাটে সবরেত বহুদের অঙ্গন উজাইয়া বহিতে লাগিল। বকুলের পুষ্পস্তবক পল্লবের ভিতর লুকাইয়া মৃদু কলস্বরের উৎস খুলিয়া দিল।

অজয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া ডাকিল "জেঠাইমা, তোমার সব হয়ে গেছে নাকি?" "হাঁ সবই হয়ে গেছে অজু"—বলিয়া শ্যামাসুন্দরী মুখ বাঁধা হাঁড়ী কয়েকটী অজয়ের দিকে সরাইয়া দিলেন। অজয় শ্যামাসুন্দরীর পায়ের নিকট ভূমিষ্ঠ হইতেই আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল "জেঠাইমা, করেছ কি? পাখানা যে একেবারেই পুড়িয়ে ফেলেছ! আহা, দুটো আলু খেঁতো করেও দাওনি একটু আমসত্ত্বের রসও দাও নি—বিনুদার জন্ত, তোমার এত কষ্ট এবে আমার কিছুতেই সহ্য হয় না, জেঠাইমা।" শ্যামাসুন্দরী লজ্জাবনতমুখে বলিলেন "ও কিছু নয় অজু; তোর কোন চিন্তা নাই বাবা। অমন কত হাত পা পুড়ে যায়। অত ঘরলে কি মেয়ে মানুষের চলে রে? তুই মুখেমুখে পৌঁছে আসেই মাথার বাড়ী ঘাস না; প্রথমে বিনুর ওখানে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে দুটী ভাই একত্রে বসে হাঁড়ী খুলে খাবার খাবি বুঝলি? আর, দেখী দেরী করিস না, শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর ফিরে আসিস।" প্রফুল্ল স্মিত হাস্তের সহিত অজয় বলিল—"দেরী আর হবে না জেঠাইমা—আমার বিদ্যার দৌড় তো তোমার জানাই আছে, একে ডেপুটীগিরি তো দূরের কথা কেরাণীগিরিও চলে না। জোয়ানের কোলের কাছে বসে তাঁত বোনা শাসন করাই চলে, কাজেই বিদেশে আমার স্থান নেই।" অজয়ের স্বল্প কথার মধ্যে একটু খোঁচা থাকিলেও তাহা শ্যামাসুন্দরীর নিকটে অতীব মধুর লাগিল। তাঁহার বহু সাধে সাধনে উদর প্রবেশ করিয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ স্নিগ্ধচিত্ত হইয়া থাকিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া প্রণামান্তে অজয় প্রস্থান করিল।

শ্যামাসুন্দরীর দিন আর কাটিতেছে না। যাহার সরল উচ্চ হাসির মূর্চ্ছনায়, কলকণ্ঠের ঝঙ্কারে গৃহখানি নিরানন্দ কর্ম্মখানি দিবানিশি মুখরিত হইয়া থাকিত সে অজয়ও কিছুদিন হইল প্রবাসগত। এখন আর প্রভাতের পাখীর সঙ্গীতসুধা বর্ষণের মধ্যে কেহ জেঠাইমা বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে আসে না। রবি-করোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে মহাভারতের পুণ্যময় গাথা তাহারও কণ্ঠে উচ্চারিত হয় না। ম্লান সন্ধ্যায় সেই পুরা-কালের কাহিনী শুনিবার জন্ত কোন তরুণ হৃদয় আর্দ্র উৎসুকতা লইয়া থাকে না। তাহাকেও পাতের প্রসাদ দিতে এখন রন্ধনের ঘটা নাই। না খাইলেও কেহ দেখিতে আসে না; তাহার জন্ত অনুযোগ করে না। বিনয়ের চিন্তা হইতে তাঁহার উদ্ভ্রান্ত অন্তরটী কাহার কথায় পুলকিত হইয়া উঠে না। পরের ছেলেকে ভাল বাসিয়া তাহার অদর্শনে এ কয়েকটী দিন পুত্র বিচ্ছেদ কাতরা মাতা মর্ম্মে মর্ম্মে নিজের পুত্রের বিচ্ছেদ বেদনা যেন নূতন করিয়া অনুভব করিতেছিলেন।

সেদিন প্রভাতে শ্যামাসুন্দরী ঠাকুর ঘরে বসিয়া পূজার জন্ত বিল্বদল বাছিতেছিলেন এবং উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে বার বার পথের দিকে চাহিতেছিলেন। আজই যে অজয়ের ফিরিয়া আসিবার কথা। সে ফিরিয়া আসিলে তাহাকে দেখিয়া, বিনয়ের সংবাদ পাইলে তিনি যে শান্ত হইতে পারেন। বিল্বদল তুলি সাজিতে তুলিয়া গৃহদ্বার মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিতেই সম্মুখে অজয়কে দেখিয়া শ্যামা-সুন্দরী আনন্দে দিশহারা হইয়া বলিলেন "কখন এসেছিস অজু, এমন চোরের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন বাবা? চল চল ঘরে গিয়ে বসবি। তুই সেখানে গিয়ে ভাল ছিলি? বিনু ভাল আছে?" সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িয়া অজয় গৃহে প্রবেশ করিয়াই শ্যামাসুন্দরীর বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। "শুয়ে পড়লি কেন, অসুখ করেছে কি?" বলিতে বলিতে অজয়ের মাথার নিকটে বসিয়া শ্যামাসুন্দরী তাহার ললাট স্পর্শ করিলেন। "না জেঠাইমা অসুখ নয়, রাত জেগে এসেছি কিনা তাই মাথাটা একটু ধরেছে। তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন?" "যে

করে তুই এলেই ভালি, দেখে আমি ভয় পেয়েই গিয়েছিলাম। একটু ঘুমুলেই মাথা ভাল হয়ে যাবে। কথাবার্ত্তা পরেই শুনব, এখন একটু ঘুমো।" অজয় সহাস্য মুখে বলিল "জেঠাইমার যে কথা! এখন আমার ঘুমাবার সময়!" "না ঘুমুলি ত বাপু বিনুর কথাই বল, সে খাবারগুলো খেয়ে কিছু কি বলছে, মুখে ভাল লেগেছিল?" অজয় মৃদু একটি হাঁ বলিয়াই চুপ করিয়া রহিল। যার বড় সাধের যত্নের তুচ্ছ অমূল্য খাবার গুলি দেখিয়া বিনয়ের সে সব অন্তরে ধনী কন্যার সম্মুখে লইয়া যাইতে ইতস্ততঃ করিবার কথা সে কোন প্রকারেই শ্যামাসুন্দরীর কাছে ব্যক্ত করিতে পারিল না, তাই নীরব হইয়া রহিল। কিন্তু তাহার এ নীরবতা উৎকণ্ঠিতা মায়ের ভাল লাগিতেছিল না। তিনি আগ্রহভরা কণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁ করেই চুপ করলি কেন অজু, বিনুর শরীর বুঝি ভাল নেইরে, অসুখ করেছে বলে সে বুঝি সে সব জিনিষের কিছুই খায় নি?" "অসুখ কেন হতে যাবে জেঠাইমা, বিনুদার শরীর বেশ আছে। শ্রাবণ মাসের প্রথমেই মামা মামীরা কাশী দর্শনে যাবেন সেই সময় মাকে তাঁদের কাছে দিয়ে আসতে হবে। তখন তোমাকেও আমি সঙ্গে করে নিয়ে বিনুদার সাথে দেখা করিয়ে আনব, দেখলেই বুঝবে তার চেহারা কত ভাল হয়েছে।" দীর্ঘকালের পর পুত্রের নির্ম্মল সুন্দর মুখখানি দেখিবার সম্ভাবনায় মার হৃদয়ে হর্ষের প্রস্রবন বহিল; বদন মণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইল; স্নেহ জড়িত কণ্ঠে বলিলেন "তাই নিয়ে যাস্ অজু, আমি তীর্থে যেতে চাইনা রে; বিনুকে দেখতে গেলেই আমার যত তীর্থ দর্শনের পুণ্য হবে। তা আমায় যে নিয়ে যাবি বিনুর কাছে জিজ্ঞাসা করে তার মত নিয়ে এসেছিস্? "তার আবার মত নিতে হবে কেন জেঠাইমা, তোমার হুকুমেই যে তার চলবার কথা, কিন্তু সে নিতান্ত হতভাগা বলেই সে সুখ থেকে বঞ্চিত। আর তুমি ত শুধু তার একলার মা নও জেঠাইমা! তোমাকে কোথাও নিয়ে যাবার আমারও ত অধিকার আছে জেঠাইমা।"

শেষের কয়েকটি কথা বলিতে অজয়ের কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হইয়া আসিল। অজয়ের সঙ্গে যাইতেও শ্যামাসুন্দরী ছেলের মতের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে ব্যথা দিলেন বুঝিয়া তিনি মনে মনে ব্যথিত হইলেন। বাল্যের প্রচুর অভিমান এখন অজয়কে পরিত্যাগ করে নাই দেখিয়া তাঁহার ওষ্ঠাধারে সরল হাসির রেখা মিলাইয়া গেল। তিনি অবনত হইয়া বারবার অজয়ের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া মৃদু কোমল স্বরে বলিলেন "আমার উপর বিনুর চেয়ে তোর অধিকারই বেশী অজু, সে আমার কাজের ছেলে কিন্তু তুই যে আমার কোলের ছেলে, তোর যেখানে খুসী আমায় নিয়ে যাস বাবা।"

৪

শ্রাবণের প্রথম। শীর্ণধারা নদীর জলে ঢেউ আবার উতলা হইয়া উঠিয়াছে। তীরের অরণ্যানী বর্ষাস্নাত হইয়া শ্যামশোভা ধারণ করিয়াছে। আকাশের বুক চিরিয়া চিরিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী চপলার লুকোচুরী খেলা আরম্ভ হইয়াছে।

অজয়ের সঙ্গে শ্যামাসুন্দরীর মুঙ্গেরে যাওয়ার স্থির হইয়াছে। নির্দ্দিষ্টদিনে পুরাতন ভৃত্য সনাতনের উপর ঘর দ্বার রক্ষার ভার দিয়া পুত্রদর্শনাভিলাষে অজয় ও তাহার মাতার সহিত শ্যামাসুন্দরী রওনা হইলেন। তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রাণে আনন্দ যেন ধরিতেছিল না। কতদিন পরে তপ্তহৃদয়ে বিনুকে নিবীড় করিয়া চাপিয়া ধরিবেন—তাহার মধুর 'মা,' 'মা', কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণ কুহরে সুধা বর্ষণ করিবে। নয়নপুত্রী কতকালের পর সেই বাঞ্ছিত বদন নিরীক্ষণ করিবে ভাবিতে ভাবিতে একটি মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় তাঁহারা মুঙ্গেরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্যামাসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া অজয় বলিল "জেঠাইমা, চল আগে মামার বাসাতেই যাওয়া যাক্, জিনিষ পত্র শুদ্ধ মাকে সেখানে নামিয়ে রেখে পরে তোমায় বিনুদার ওখানে নিয়ে যাব।" শ্যামাসুন্দরী এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। এত কাছে আসিয়া বিনয়কে দেখিবার অধীরতা তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। তিনি অজয়ের করেই বলিলেন "আমায় আগে বিনুর বাড়ীর সমুখে নামিয়ে দিয়ে তুই মামার ওখানে যা"

অন্তরের মাতা তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া ছেলেকে সেই ব্যবস্থা করিবারই আদেশ দিলেন।

শ্যামসুন্দরী যখন বিনয়ের বাসার ফটকের মধ্যে ঢুকিলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। খণ্ড মেঘের মধ্য হইতে চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ধারা তৃণদলে ভূমিতা ধরার বক্ষে কখনও ফুটিয়া উঠিতেছে কখনও বা মিলিয়া যাইতেছে; রহিয়া রহিয়া গুরু গুরু গর্জ্জনে মেঘ ডাকিতেছে; দুই দিবস ব্যাপী পথের অনিদ্রায় অনাহারে শ্যামসুন্দরীর শরীর বেতস পত্রের মত কম্পিত হইতেছিল। চক্ষের সম্মুখে অন্ধকার আরও গাঢ়তর হইয়া আসিতেছিল। তিনি কোনওরূপে অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে কাতর কণ্ঠে ডাকিলেন—"বিনু, বাবা আমার," তাঁহার কণ্ঠ সম্বেই হোক্ অথবা অন্য কোন কারণেই হোক্ দরোয়ান ওস্তাদ সিং নিভৃত কক্ষে কালাচাঁদের অধর চুম্বনের লোভ সংবরণ করিয়া বাহিরে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল—"কোন্ হ্যায় রে?" ভীত চকিত হৃদয়ে শ্যামসুন্দরী কহিলেন—"বিনু—তোমাদের বাবু কোথায়?" তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দরোয়ানজী হুঙ্কার দিয়া উঠিল। তাহার তাৎপর্য "হুজুর—এখনই আফিস হইতে ফিরিয়াছেন, এটা তাঁহার বিশ্রামের সময়; সুতরাং এখন ভিক্ষা মিলিবে না।"

কাছারী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া জলযোগের পর ডেপুটী বাবু শয়ন কক্ষে ইজি চেয়ারে অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় পাইপ টানিতেছিলেন। চেয়ারের হাতলের উপর বসিয়া সুসজ্জিতা সুন্দরী তটিনী নানারূপ হাস্য পরিহাসে স্বামীর চিত্ত-বিনোদন করিতেছিল। হঠাৎ দরোয়ানের তীব্র হুঙ্কার গবাক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেই গিয়া তটিনী বলিল,—"ফটক খোলা পেয়ে ভিখেরী ঢুকেছে বুঝি—বিদু না দিলে ওকি আর নড়বে?" "আমি তাড়া করেই নড়াচ্ছি। ভুঁড়ে লোককে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের কুষ্ঠিতে লেখেনি।" বলিতে বলিতে বিনয় গবাক্ষের সম্মুখে পত্নীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিল, মলিন বস্ত্র পরিহিতা অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনবতী একটী রমণী সন্ধ্যার অন্ধকারে বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ক-এক মুহূর্ত্ত সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল,—"এখানে ভিক্ষা মিলিবে না।" পরে দরোয়ানকে ডাকিয়া রমণীর দিকে অঙ্গুলী তুলিয়া বলিল "বাহার নিকাল দো।" রমণীর সর্ব্বশরীর সহসা কম্পিত হইতে লাগিল; ক্ষীণ কাতরকণ্ঠে 'মায়ো' বলিয়াই তিনি প্রায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় সেইখানে লুটাইয়া পড়িলেন। কি নিকটেই ছিল সে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—কোথাকার মুখী রোগী বাপু! আই অন্ধ ছেড়ে দিলে যে, এখন আবার এটাকে নিয়ে রাত ভোর কর্ণ-ভোগ তুমি আর কি।" বিনয় বাহিরে আসিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল "কি উৎপাত এসেই জোটে! আলো ধরে দেখ দেখি সত্যই মুখী রোগী কিনা।" তটিনী ধীরে ধীরে রমণীর নিকটে উপনীত হইল. তখন অন্ধকার বনশ্রেণীর উপর দিয়া মেঘভাঙ্গা পূর্ণচন্দ্র ফুটিয়া উঠিতেছে। শিথিল অঞ্চল প্রান্ত শয়না রমণীর মুখে প্রভাহীন চন্দ্রের জ্যোৎস্না নিপতিত হইয়াছে। সেই দিকে চাহিয়াই তটিনী চমকিয়া কহিল "ওগো, শীগ্‌গির এদিকে এস তো—যার মত দেখছি।" "এতক্ষণে যার মত দেখছ বৌঠান, এখনও তা বলে চিন্তে পার নি?" বলিতে বলিতে অজয় পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া শ্যামসুন্দরীকে কোলের উপর তুলিয়া লইল: পরে অগ্নিভরা চক্ষু দুইটি বিনয়ের দিকে মেলিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "বিনুদা তোমার এতদূর উন্নতি হয়েছে জানলে জেঠাইমাকে কখনও এখানে একলা আসতে দিতাম না। তোমার পরিচয় পূর্ব্বেই পেয়েছিলাম বলেই, তোমাকে উদ্ধার করবার জন্য জেঠাইমাকে এখানে এনেছিলাম, তখন কে জানত যে আমার অদৃষ্টে মাতৃ-হত্যার পাপও লেখা আছে।" তটিনী অজয়ের বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া অপরাধীর মত মস্ত বদনে দাঁড়াইয়া রহিল। মায়ের সেবা-শুশ্রূষার কথাটাও মুখে উচ্চারণ করিবার সাহস তাহাদের হইতেছিল না; কিয়ৎক্ষণ পরে শ্যামসুন্দরী আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন "অজু, আমি সুস্থ হয়েচি, আর মাথায় জল দিতে হবে না। তুই বিনুকে অত কথা বলছিস্ কেন, ওরে আমায় চিন্তে পারেনি; অন্ধকারে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখে বুঝতে পারেনি, তাতে অপরাধ হয়নি অজু; তুই ওদের মাপ কর বাবা।"

মাকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া, যার কণ্ঠস্বর শুনিয়া

বিনয় নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না। মুহূর্ত্তের মধ্যে স্থান কাল পাত্র সমস্তই বিস্মৃত হইল। কোন অতীতের বিস্মৃতির অন্তরাল হইতে অমৃতময় মাতৃস্নেহের অনাবিল প্রবাহের পুণ্যধারা তাহার শুষ্ক হৃদয়ে প্রবাহিত হইল। সে মায়ের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া অশ্রুপূরিত কণ্ঠে কহিল "মা তুমি আমায় ক্ষমা কর, মা।" মা হাত বাড়াইয়া অনুতপ্ত, ব্যথিত পুত্রকে বুকের নিকট টানিয়া লইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন "বউমা, তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? আমার কাছে এস মা।" শাশুড়ীর আহ্বানে বধূ তাঁহার কাছে অগ্রসর হইয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল "মার স্নেহে সন্তান যাকে চিনতে পারে না, যার কথা ভুলে থাকে, সে মোহ কাটিয়ে তোমার কোলে আপনার ঘরে আমাদের নিয়ে চল মা, আর—আর আজ তুমি আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর মা।" আনন্দে উদ্ভাসিত হৃদয়ে শ্যামাসুন্দরী বধূর অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া তাহার ললাটে স্নেহ-চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিলেন। অদূরে উপবিষ্ট অজয়ের দিকে চাহিয়া ভটিনী কহিল "ঠাকুরপো, তুমি আমাদের সব দোষ মাপ কর।" "আমাকেও ক্ষমা কর, অনু—তুই আমার শুধু ভাই নয়—তুই আমার শিক্ষাগুরু।" বলিয়া বিনয় অজয়কে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল।

অভিশাপের মূল্য

[শ্রীসুধীরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

(এক গ্রামে এক নীচ শ্রেণীর মণ্ডল নানা উৎপাত আরম্ভ ক'রে লোককে বিরক্ত ক'রে তুলছিল, লোকে তাকে নানা অভিশাপ দেয়। হঠাৎ একদিন পথে বজ্রাঘাতে তাহার মৃত্যু হয়। এ ছড়াটিতে পল্লী-হৃদয়ের ছবি ও মধুর বেশ পরিচয় পাওয়া যাবে)

লাঙ্গা এলো দেশে রে ভাই
লাঙ্গা এলো দেশে,
সাধুরা সব সমঝে চল
পস্তাবে নয় শেষে।
ক্রূর সে বটে ভারী
দয়া দুয়া বারি,
গরুর গোড়ায় দোড়ায় হ'ল
হস্ত মালায় এসে।

২

সরলতার ধার ধারে না
মিথ্যাবাদী চরম,
সঙ্গে সাথে মিত্রতা নাই
নাইক তাহার সরম।
হল্ চালনা ছেড়ে
চালাচ্ছে হাল বেড়ে
আনন্দে বুকের 'পরাটাতে'
হাম্বকা ভাব ঢেলে।

৩

অপকারই করবে ওরে
করবে না আর কিছু,
'মাত্না' ছাড়া মাথা উঁচার
হবেই হবে নীচু,
ভগবানের কাছে'
আরজি যখন গেছে
প্রেতশালার এ শিশু যাবে
আপনি গলায় ফেঁসে।

লেস

[শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু]

আজকাল কত রকমেরই না সুন্দর সুন্দর লেস বাজারে বেরিয়েছে! কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন লেসের কথা কেউ জানতে না, কাপড়ের 'ছিলা' যে অংশকে বলে, তাই থেকে লেসের প্রথম উৎপত্তি হয়।

সেই আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত কাপড় চোপড়ের সখ পুরুষদের চেয়ে মেয়েদেরই বেশী, এবং নতুন জিনিস থেকে নতুন নতুন পোষাকের কল্পনা তাদেরই মাথায় আগে এসেছে,—তা সে ঘাসই হোক, কি জানোয়ারের চামড়াই হোক!

সুদূর অতীতের কোন অসভ্য নারীর মনে সম্ভবতঃ একদিন এই ধারণাটা জেগেছিল, যে তুচ্ছ তৃণগুচ্ছও বিনুনি ক'রে বেঁধে মস্ত বড় একটা কিছু করা যায়, এবং বোধহয় তারপর থেকেই হাতে-বোনার কাজ আরম্ভ হয়। ক্রমে দেখা গেল, যে কোন জিনিস দিয়েই কাপড় তৈরী হোক, কাপড়ের ধারে ধারে তার কতকটা অংশ ফাঁসি হ'য়ে যেতেই। সে সমস্ত ফালি ফেলা চলে না, কিন্তু একটার সঙ্গে আর একটাকে বেঁধে দেওয়া চলে। সেই বাঁধাটা যাতে সৌখীন হয়, তারজন্যে নানা রকম নক্সা আঁকা হ'ল। নক্সা মাফিক করবার পর যে সুন্দর জিনিসটার সৃষ্টি হ'ল, তার নামই হ'ল ফ্রেঞ্চি বাংলায় —লেস্।

প্রথম প্রথম ন্যাপকিনের ছবি দেখে লেস্ করা হ'ত, তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পোষাকের সখ আর রুচির যত উন্নতি হতে লাগল, সেই অনুপাতে পরিকল্পনারও সংস্কার করার প্রয়োজন হ'ল। সান্ধ্যসজ্জায় ফুলটা আবার চিরদিনই মেয়েদের প্রিয়; হাতে-বোনার সব জিনিসই মেয়েরাই যখন প্রথম বার করেছে, তখন তাদের পছন্দসই লেসের কাজে ফুলের পাপড়ি, ফুলের বুঁড়ি, ফুলের তোড়ার নক্সারই যে বেশী প্রচলন হবে, এ আর আশ্চর্য্য কি?

সুতরাং 'সৌন্দর্য্যবোধের ক্রমবিকাশ' ব'লে লেসের একটা বড় নাম করা যায়। আবার, দেশে-বিদেশে যত রকম লেস আছে, তার মধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ডের লেসেরই কদর বেশী। এখানে সে দেশের দু-রকম বিখ্যাত লেসের ছবি দেওয়া গেল। প্রথমটার নাম হচ্ছে, ক্যারিকমেক্রস্,

ক্যারিকমেক্রস

এর নক্সায় বেশী ঘোরপ্যাঁচ নেই, লতাপাতা ফুল স্পষ্ট ক'রে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয়টা হ'ল শিয়ারিক্, এর

শিয়ারিক্

সমস্ত কাজ সূক্ষ্ম; এত সূক্ষ্ম যে ফটোতেও ভাল উঠে না। ও, ঃ, আর এ-র ছবি আর একরকম শিয়ের নমুনা, তার নাম আইরিশ্ পয়েন্ট্ লেস্। তাতে অনেক রকমের কারুকার্য্য থাকে।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, কোন কারখানার

ক্লাট পয়েন্ট

কলে এসব জিনিস তৈরী হ'ত না। তাহ'লে এর গৌরব কিছুই থাকত না। আমাদের দেশেরই মতন এসব দেশের মেয়েদের সম্পত্তি, তাও বড় ঘরে নয়, গরীবের ঘরেতে সুরু করে। অনেকখানি বয়স অবধি, এমনি করে তাদের সংসার তারা চালিয়ে যায়।

কিন্তু লেস তৈরী আর বয়নবিদ্যা ও-দেশের লোক আগে জানত না। আজও তারা স্বীকার করে, যে আমাদের ভারতবর্ষই তাদের গুরু। ভারতের নিজস্ব এই সব শিল্প একদিন সমুদ্রপারে ইউরোপের লোক নিয়ে যায়, সেখান থেকে আবার ফ্রান্স ইংলণ্ডে পৌঁছে দেয়। বুদ্ধিমান্ আমাদের তাও সেই সব সংগ্রহ করে শুধু সঞ্চয় করে রাখেনি, তার যথেষ্ট উন্নতিও করেছে।

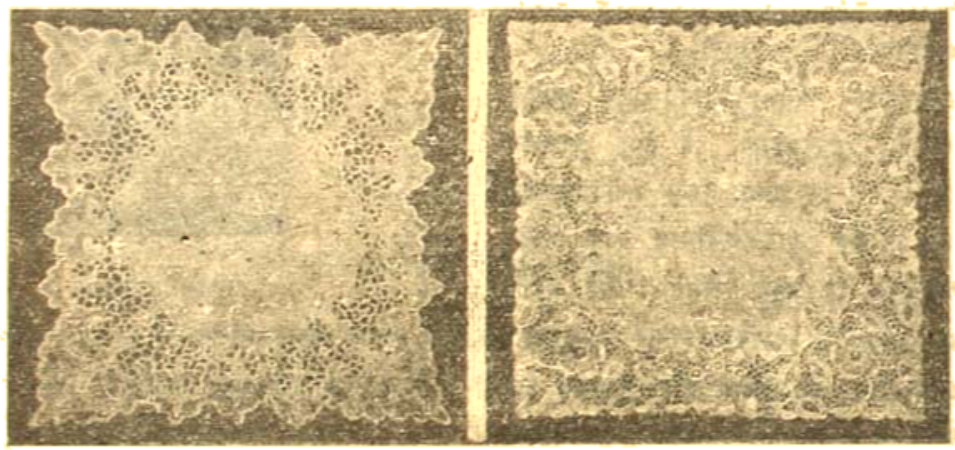

ঐ

আজ ভিনিসিয়ান্ লেস, লেসের মধ্যে নিখুঁত। যা কিছু গুণ লেসের প্রয়োজন বলতে গেলে, সবই এতে কাঠের কুটিরে গরীব আইরিশ মেয়েদের হাতে এই সব শিল্প গ'ড়ে ওঠে। এই যে ছবিতে একটি গোলাপ গাছ বিভিন্ন ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, কে বিশ্বাস করবে এটি একটি সাধারণ মেয়েরই একলার কাজ এবং সে কখনো কোন স্কুলে অবধি যায় নি? অথচ দেখা যাচ্ছে, চিত্রকরের আর কারিকরের উঁচু ঘরের প্রতিভা তার মধ্যে ছিল।

এই সব মেয়েরা, যতদিন লাবণ্য থাকে, ততদিন অক্লান্ত পরিশ্রমে শিল্প কাজ করে যায়, তার পর খুব বেশী বয়সে যখন চোখের জ্যোতিঃ ক'মে আসে, তখন এই সমস্ত সূক্ষ্ম জিনিস ছেড়ে মোটা পশমী কাপড় তৈরী আছে। যেমন-ইচ্ছে ভাঁজ করা যায়, ডিজাইনের ইচ্ছা কোথাও আটকায় না। তাছাড়া, এ সূতো খুব, আর জল দিয়ে কাচাও যায়—যা অন্য অনেক লেসের পক্ষে সম্ভব নয়। পেট্রোল দিয়ে পরিষ্কার করলে লেসের রং বীভৎস হয় না। যেদিন আগে, পেট্রোল যখন ছিল না, তখনকার সমস্ত লেসই তাই বিবর্ণ দেখা যায়।

ঐ ওঁর ছবি, আইরিশ ক্লাট পয়েন্টএর একখানি সুন্দর নমুনা, এটির দাম তিনহাজার টাকা।

ভিনি সুতোর এ দেশের এই পুরোণ শিল্পটা আমাদের মেয়েরা যদি নতুন ক'রে চর্চা করেন,—এই আশায় আমরা এই সব ছবি সংগ্রহ ক'রে দিলাম।

বাসন্তী—

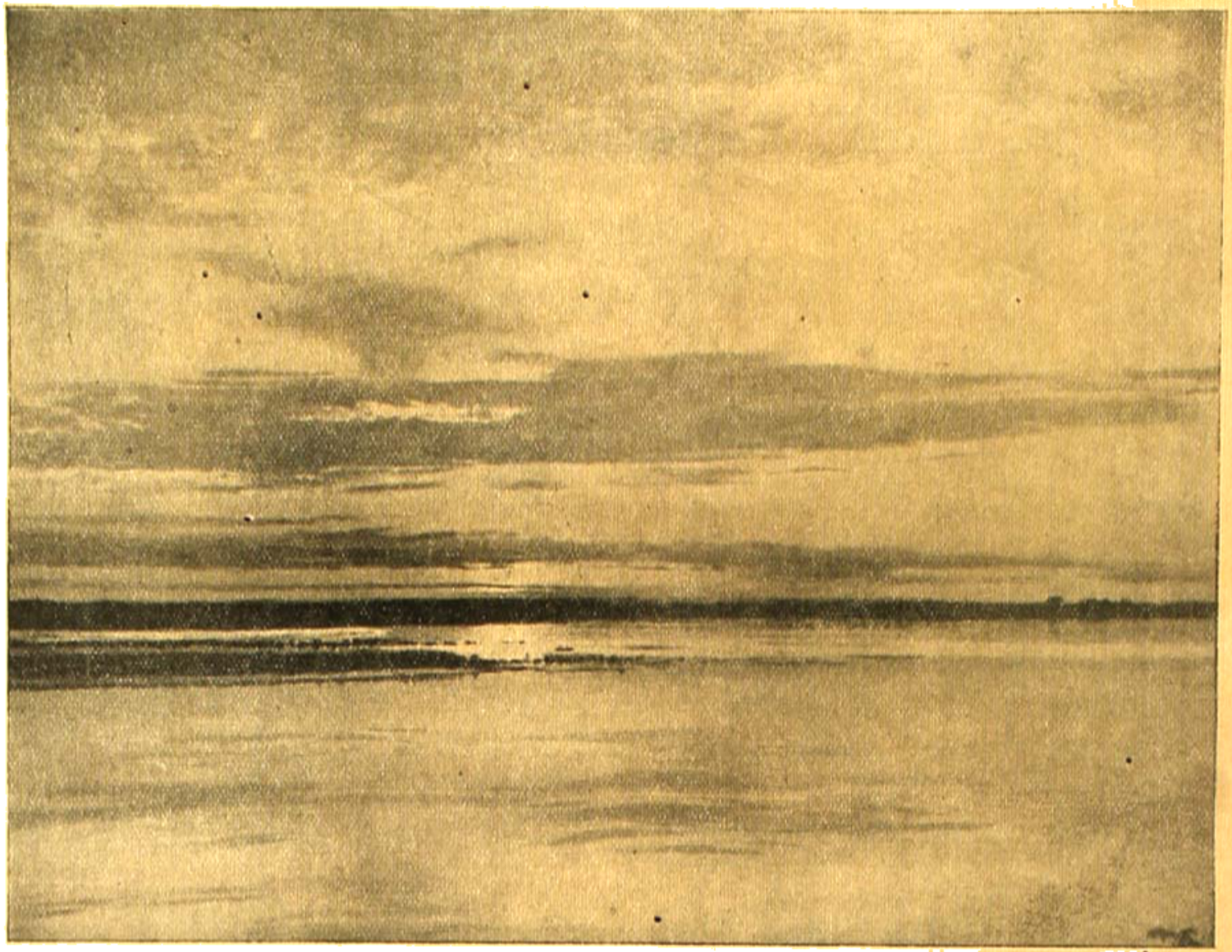

গ্রহের ফাঁদ

(উপন্যাস)

[শ্রীসরসীবালা বসু]

এক

স্নানান্তে শীতের সুখকর রৌদ্রে বসিয়া পিঠের উপর একরাশ ভিজা চুল ছড়াইয়া মণিমালা বড়ি দিতেছে, ছেলে কোলে সখী উর্ম্মিলা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, মণি হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল, "এলে যে এই বেলা, আমি কাল থেকে এসে পর্য্যন্ত দেখা করবার জন্য ছট্ ফটিয়ে মর্‌চি।"

উর্ম্মিলা ভ্রূ বাঁকাইয়া কহিল, "তাই কাল সন্ধ্যের পর একবার দেখা করতেও যেতে পারলে না, আমি আসবার জন্যে দু' তিনবার ঝিকে দেখতে পাঠালাম, তা কর্ত্তা তোমার হারানো ধন আগলে বসেছিলেন, কাল তো কাছারীও যান্‌নি, আজ যে সাহসে বুক বেঁধে যেতে পেরেছেন এই বেলা, আমরাও তাই দেবী দর্শনে আস্‌তে পার্‌লাম।"

মণি উর্ম্মিলাকে কাছে বসাইয়া সলজ্জ মুখে কহিল—"ঘর দোর সব যা হয়েছিল ভাই, তা আর কি বল্‌ব, কাল থেকে ঝাঁট পাট আর ধোওয়া পোঁছা নিয়েই আছি। এতো বড়ি খেতে ভালবাসেন, তা ঘরে যদি কিছু আছে, তাতেই দুটো ডাল বাটিয়ে বড়ি দিতে বস্‌লাম, তোমাদের সব খবর ভালো তো? খোকা বেশ বড় হয়েচে, আয় খোকা।"

খোকা কিন্তু ছোট দুটি হাতে মাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া জানাইল যে অপরিচিত কোলে যাইতে তার আদৌ ইচ্ছা নাই, উর্ম্মিলা কহিল, "দুদিন পরেই মাসীকে যখন চিন্‌বে তখন আপনা হ'তেই যাবে! আচ্ছা যমের মুখ থেকে বেঁচে উঠলে ভাই! আবার যে দেখা পাব তা মনেও হয় নি"—

"আহা তা আর বল্‌তে, এখন ভাগ্যিমানী এয়োরাণী হ'য়ে বেঁচে থাকুক, পাকা মাথায় সিঁদুর পরুক এই আমাদের আশীর্ব্বাদ, মা লক্ষ্মী আস্‌তে না আস্‌তেই ঘর দুয়োরের ছিরি ফিরে গেচে, কি যে ভূতের বাসা হয়েছিল!" বলিতে বলিতে নীলকান্ত বাবুর বৃদ্ধা ঠাকুর মা হরিনামের ঝুলি লইয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। মণি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঠাকুরমার পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, বড়ি দিবার জন্য হাতটি জোড়া হইয়া আছে সেজন্য পায়ের ধূলা লইতে অক্ষম, ঈঙ্গিতে সেকথা জানাইয়া দিল, ঠাকুর মা কহিলেন—"আহা থাক্ থাক্, অম্‌নিতেই শতেক আশীর্ব্বাদ করচি, এখন ব্যাটার মা হ'য়ে নারীজন্ম সার্থক কর মা, প্রাতর্বাক্যে তাই বলি! ন্যাপা ছেলে কোথায় কি, আর একটা বিয়ে ক'রে বস্‌ল, কপালে তোমার সতীন আছে মা, কে খণ্ডাবে?" সতীন জিনিষটা কোন্ মেয়ে সহিতে পারে, সুতরাং অসহিষ্ণুভাবে উর্ম্মিলা বলিয়া উঠিল, "কি কপাল কপাল করচ ঠাকুর মা, তেজেশ বাবু বিয়ে না করেই তো পারতেন!" এই প্রসঙ্গটি মণির বড় বেদনার স্থান সুতরাং মুখের হাসি তার ব্যথা-ম্লান হইয়া উঠিয়াছিল; ঠাকুর মা তাহা লক্ষ্য না করিয়া কহিলেন—"যাই বল্ তোরা, বরাত ছাড়া পথ নেই। এখনকার মেয়েদের তো বরাতে ফিরে গেচে, সতীনের ঘর আর ক'জনাকে করতে হয় বল্? আমাদের মা,ঠাকুরমারা আশে-পাশে সতীন নিয়ে দিন কাটিয়ে গেছেন, আমরা ছোট বেলায় ব্রতই করেচি—"মরনা, মরনা, মরনা, সতীন যেন হয় না।" "যাছি, যাছি, যাছি, সতীন ম'লেই বাঁচি।" "দুধের পিঠে তিন, না,হোক্ পুরুষ।" ঠাকুরমার ছড়া শুনিয়া উর্ম্মিলা খিল্‌খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, মণিমালা অনিচ্ছাতেও সে হাসিতে যোগ দিল, আর অবোধ খোকা রসভঙ্গের ন্যায় তার কচি ঠোঁট দুখানি হাসিতে ভরাইয়া দুই হাতে মার মুখ চাপিয়া ধরিয়া ভাবে ভাষায় প্রকাশ করিল যে—সেও সব বুঝিয়াছে।

ঠাকুরমা কহিলেন—"হাস্‌চিস্ কি লো—সরবিনীরা, সত্যিই আমরা এ সব ব্রত করেচি, তোর কার্ত্তিক মাস

ঘরে ঘরে মেয়েদের সেঁজুতি ব্রত করা রেওয়াজ ছিল, নইলে তখন কার দিনে কুলীনের ঘরে উঠ্‌তে সতীন, কর্‌তে সতীন হতো, সোয়ামী যাকে গাঁটছড়া বেঁধে ঘরে আন্‌তো তাকেই বরণ ক'রে ঘরে তুল্‌তে হোতো! এই যে না বলা না কওয়া তেজেশ হুট্ ক'রে মেয়েটাকে বে ক'রে বস্‌লো তাকে কি আর ফেলে দেবে? মণিকে এখন তাকে নিয়ে ঘর করা করতেই হবে, নইলে সেই বা যাবে কোথা? সতীশ বল্‌ছিল ভারী গরীবের মেয়ে, আহা, সামর্থ্য থাক্‌লে কি আর এখনকার দিনে সতীনের ওপর বাপ মেয়ে দিত না?" কথা গুলা মোটেই প্রীতিকর নয়, মণি এ সব কথা একদিনও আলোচনা করে নাই, বিশেষ বহু দিন পরে স্বামীগৃহে সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসাতে মন এখন তার সুখের স্বপ্নে বিভোর হইয়া আছে, যাবে হঠাৎ ঠাকুর মা আসিয়া অনাবশ্যক কথা উঠাইয়া তার সে স্বপ্নের মোহ ভাঙিয়া দিলেন, চোখদুটি তার ছল ছল করিয়া উঠিল, চতুরা ঊর্মিলা যেন বুঝিল, সখী তার এ প্রসঙ্গে ব্যথা পাইতেছে; অনাবশ্যক কথা বাড়াইয়া কোনো ফল নাই দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ঠাকুরমা, তোমার আজ বড্ড বেলা হয়ে যাচ্ছে, চানটি খেয়ে নেবে চল, এসে বরং গল্প করা যাবে, তোমারও তো এখন ভাত খাওয়া হয় নি মণি?"

মণি মাথা নাড়িয়া জানাইল হয় নাই, ঠাকুরমা তখন হরিনামের ঝুলি মাথায় ঠেকাইয়া কহিলেন—"তবে তুমি যাওগে নাৎবৌ, বেশী বেলা করো না মা, শরীরটির দিকে বেশ করে দৃষ্টি রেখো, আমরাও ছুটো খেয়ে আসি।"

ঠাকুরমা ঊর্মিলাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন, ঠাকুর আসিয়া পর্যন্ত শুইতেই ডাকিল। মণি কহিল—তার এখনও একটু দেরী আছে, ঠাকুর তাড়াতাড়ি বাড়িয়া ঢাকা দিয়া রাখিয়া নিজে খাইয়া বিশ্রাম করিতে যাউক, ঠাকুর হৃষ্টচিত্তে সে আদেশ পালন করিতে গেল। মণি বড়ি দেওয়া শেষ করিয়া হাত ধুইয়া শ্রান্তভাবে গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। আর অমনি দুই চক্ষে তার জলধারা বহিল।

এতোদিন সে তো সতীনের কথা একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিল, কিন্তু ঠাকুরমা যাহা বলিয়া গেলেন তাহা তো নিতান্ত বেঠিক্ কথা নয়, হউক অপ্রিয়—কিন্তু উহা সত্য, এবং এ সত্যকে অস্বীকার করিতে তার মন সরিতেছে কই, অথচ স্বামী প্রেমের অংশভাগিনীর কল্পনাও যে অসহ্য! স্বামী বিবাহ করিয়াছেন, এটা তাঁর ঠিক হয় নাই। তাঁর ভালবাসার মহিমা এখানে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, অথচ মণিমালা যে নিজের সতীত্বের উচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া তাঁহার সে ত্রুটি হাসিমুখে মার্জ্জনা করিতে পারিয়াছে এই ভাবিয়া সে আত্মপ্রসাদের গর্ব্বে পরিতুষ্ট ছিল। এখন কিন্তু ঠাকুরমা এ কি শুনাইলেন? স্বামী যখন তাহাকে বিবাহই করিয়াছেন, তখন তাহাকে অসহায় ভাবে পিত্রালয়ে তো আর ফেলিয়া রাখা উচিত নয়। অভাগিনী বালিকার সমস্ত জীবন কাটিবে কাহাকে লইয়া? স্বামী ছাড়া হিন্দু নারীর আর কি আছে, স্বামীর প্রেমই তার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা, মণি তো নারী, নারী হৃদয় রহস্য সে তো ভাল রকমই জানে। সুতরাং সেই অভাগিনীর দুর্ভাগ্যকে সে কেমন করিয়া সমবেদনার চক্ষে না দেখে?

অথচ তাহাকে স্বামীর অংশই বা সে কোন্ প্রাণে ছাড়িয়া দেয়? এইবার তো সতী মহিমা—আর গর্ব্বের সহিত মাথা দিতে চাহে না। সত্য বটে, হিন্দু নারীর ইহাই চিরন্তন আদর্শ, কিন্তু হৃদয় ধর্ম্ম তাহা স্বীকার করে কই? শাস্ত্রের আদেশ, সমাজের আদেশ—হৃদয় ধর্ম্মকে আমল দিবে না, তার মতামতের বিশেষ কোনো মূল্য নাই। কিন্তু হায়, চোখের জলে ভাসিয়া মণি আজ বার বার ভাবিতে লাগিল, সত্যই কি হৃদয় বলিয়া জিনিষটা এতোই হেয়? তার স্বাভাবিক চিন্তবৃত্তির কোনো সার্থকতা নাই?

৬

চৈত্র মাসের ছুটিতে শ্বশুর আসিয়া সতীশ দেখিল, বৌদিদি আগের দিন বাপের বাড়ী যাত্রা করিয়াছেন, দু এক দিনের জন্য নয়, দীর্ঘ গ্রীষ্মকালটি আম, কাঁঠাল, লিচু, গোলাপজাম প্রভৃতি সুমধুর ফলগুলি খাইবার জন্য পিত্রালয়ে তাঁহাকে থাকিতেই হইবে, ইহাই তাঁহার পিতার

আদেশ। যতীশ ইহাতে বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হইল, যেহেতু কলিকাতার মেসে বারমাস উঁচে বামুনের হাতের রান্না খাইয়া তার অরুচি ধরিয়া গেছে। আর বইগুলার নোট মুখস্থ করিয়া, প্রফেসারের লেক্‌চার শুনিয়া ও বাকী সময়টা কলেজের-সহপাঠীদের সহিত-বড় বড় সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্বন্ধে তর্কাতর্কী করিয়া জীবনটা যেন নেহাৎ এক ঘেয়ে হইয়াছে। দিনকতক এ সবের হাত এড়াইয়া বউদিদির সহিত ঘোসগল্পে বেশ একটু বৈচিত্র্য মিলিত, আর প্রত্যহ বউদিদির নিপুণ হাতের সেবা যত্নে, আদর আপ্যায়নে রসনাও তৃপ্ত হইত, পেটও ভরিত, তা কি-না গৃহলক্ষ্মী পলাতকা। যতীশ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, পলাতকার পাত্তা লইবে কি, না?

অতঃপর সে ঊর্ম্মিলা বউ দিদির কাছে গিয়া কিছুক্ষণ গল্প গাছা করিয়া মিষ্টান্নে পরিতৃপ্ত হইয়া বাসায় ফিরিল, স্নানাহার সারিয়া সে ভাবিতে বসিল দীর্ঘ গ্রীষ্মের অবসর সে এখন কোথায় কাটাইবে? এখানে নেহাৎ মুখটি বুজিয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা কলিকাতায় দু পাঁচজন বন্ধুর সঙ্গে সভা সমিতি, থিয়েটার বায়স্কোপ ইত্যাদি ঢের ভাল ছিল, অবশ্য এখানে বউদিদি থাকিলে মধ্যাহ্নের দীর্ঘ অবসর, কিছু বা নিদ্রা সুখে, কিছু বা দশ পঁচিশ খেলায়, আর কিছু বা কাঁচা আম ছেঁচা খাওয়ায়, গল্প-গাছার মধ্যে বেশ মোলায়েম ভাবেই কাটিতে পারিত, তাহা যখন ঘটিল না——নাঃ—এ আনিলে সে সোজা বউদিদির বাপের বাড়ীতেই গিয়া উঠিত। এখন হঠাৎ যাইতে গেলে দাদা রাগী দিবেন, সুতরাং——" চিন্তা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। অন্যমনস্ক ভাবে সে পাশের টেবিলের উপর তেজেশের নথির বোঝা পড়া করিতেছে, হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল একখানা পোষ্ট কার্ডের উপর—সে তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল। কাকা লিখিতেছেন—"তেজেশ, বধূ মাতাকে ও মোকামে লইয়া যাইবার জন্য যে চিঠি দিই এবং তাহার উত্তর দিলে না কেন, বুঝিলাম না। তোমার শ্বশুর মহাশয়ের পত্নী প্রাপ্তি হইয়াছে, সে সংবাদ নিশ্চয়ই তুমি জান। শাশুড়ীরও অসুখ অত্যন্ত খারাপ, বোধ হয় শীঘ্রই তাঁহারও পত্নী প্রাপ্তি ঘটিবে, এ অবস্থায় অভিভাবক শূন্য হইয়া থাকা বধূ মাতার পক্ষে বিশেষ বিপদজনক। সুতরাং পত্র পাঠ অবিলম্বে তাঁহাকে ও মোকামে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিবে, অত্র কুশল। নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী—পূর্ণচন্দ্র শর্ম্মণঃ।"

যতীশের মনের কোণের একটা পর্দ্দা সরিয়া গেল, দাদা যে আবার একটি বিবাহ করিয়াছিল সে স্মৃতি তাঁর বিস্মৃতির পর্দ্দায় একেবারে ঢাকা পড়িয়াছিল। সে বিবাহের দ্বারা মণিমালার প্রতিই একটা ঘোর অবিচার করা হইয়াছে ইহাই বুঝিয়া সে তখন দাদার প্রতি যতটা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, বউদিদির প্রতি সহানুভূতি তার ঠিক ততোটাই হইয়াছিল। পার্ব্বতীর এর মধ্যে কোন স্থান ছিল না। এখন যতীশের বেশ মনে হইতে লাগিল পার্ব্বতীকে কখনই আর এমন অসহায় ভাবে বাপের বাড়ীতে ফেলিয়া রাখা উচিৎ নয়, এখনি তাহাকে আনিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সে নিরপরাধী বালিকা, অন্যের ত্রুটির জন্য অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকে কেন?"

কার্ডখানি উল্টাইয়া যতীশ ছাপ দেখিয়া বুঝিল, চিঠি বেশী দিনের নয়, দাদা, এই পত্র পাইয়া কি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন জানিবার জন্য তার ভারী আগ্রহ হইল। সেজন্য কার্ডখানি হাতে লইয়া লইয়া পাশের ঘরে তেজেশ যেখানে বিশ্রাম করিতেছিল, সেইখানে আসিল।

তেজেশ, যতীশকে দেখিয়া কহিল,—"তোর ঘড়ীতে ক'টা বাজল রে, আমার ঘড়ীটা নেহাৎ বিগড়েচে, মোটেই ঠিক্ টাইম রাখতে পারে না।" যতীশ হাতের রিষ্ট ওয়াচ ঘুরাইয়া কহিল,—"একটা বাজে, পাঁচ মিনিট বাকী।"

"তবে এইবার উঠতে হয়, ভয়ঙ্কর গরম পড়েচে, টিকিনের এক ঘণ্টা কাছারীর ঘরেও বসা যায় না, বাসায় এসেও বসতে না বসতেই ঘণ্টা ফুরোয়।"

যতীশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হাতের কার্ডখানা দেখাইয়া কহিল,—"কাকার চিঠি কবে পেলেন?"

"পরশু বোধ হয়, ঠিক মনে নেই! যত সব বাজে চিঠি," বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, তেজেশ বাজার যাইবার পোষাক পরিতে সুরু করিয়া দিল। যতীশ কহিল—"আপনি বউদিদিকে আনবার কি করছেন? এমন একলাটোটি

আর তাঁকে সেখানে ফেলে রাখা ভাল দেখায় না। কাকা তো ঠিক কথাই লিখেছেন।"

হঠাৎ বোল্‌তার কামড় খাইলে মানুষের চোখমুখ যেমন ফুলিয়া উঠে, তেজেশেরও প্রায় সেই দশা হইল। মুখ ফুলাইয়া, চোখ পাকাইয়া সে কাঁজের সহিত বলিয়া উঠিল, "তোমার অতো কাজলামী করতে হবে না, নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে—আমার কর্ত্তব্য আমি বুঝি।"

যতীশ হটিল না, আবার কহিল—"তাঁকে যখন বিয়েই করেছেন তখন অন্ততঃ ভরণ পোষণ তাঁর আপনি করতেই বাধ্য, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তিনি এখন আপনার স্ত্রী—

মুখ বাঁকাইয়া তেজেশ বলিয়া উঠিল—"তার বাপ জোর করে যেমন নাচিয়েছিল তেমনি এখন"—কথাটা আর শেষ না করিয়াই তেজেশ থামিয়া গেল। "আপনার তখনি অগ্র পশ্চাৎ ভেবে কাজ করা উচিৎ ছিল"—বলিয়াই যতীশ আর সেখানে দাঁড়াইয়া ভ্রূকুটি দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিল না। "ছোট ভাই হয়ে বড়কে শিক্ষা দিতে আসে, কালের গতিকই এই" বলিতে বলিতে তেজেশ কাছারী অভিমুখে রওনা হইল। কিন্তু কর্ত্তব্য বুদ্ধির খোঁচা তার মনকে পীড়া দিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

সাচ্চা কথা

(সুধীবর্গের হৃদয়-বাণী)

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

বিপদের সংঘাতেই মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

২। মানুষকে বেশী বিশ্বাস করিও না। এই বিশ্বাসের ফলেই সে বেশী বিশ্বাসঘাতক হয়।

৩। জীবনে যে ভুল করে নাই, সে জীবনে কিছুই করে নাই।

৪। প্রথমে অন্যের পথ অনুসরণ করিয়া চলিতে আরম্ভ কর, দেখিবে অচিরেই নিজের নির্দ্দিষ্ট পথ খুঁজিয়া পাইবে।

৫। অন্যের দোষ ক্ষমা কর উত্তম, কিন্তু কখনও নিজের অন্যায় ক্ষমা করিও না।

৬। অন্যের প্রীতিভাজন হওয়ার সম্ভাবনা তাহারই অধিক যে নিজের ক্ষুদ্র সংসারে সকলের প্রিয়।

৭। পরের চাটুবাদ তত মারাত্মক নয় যত মারাত্মক নিজেই যখন নিজের কাজের প্রশংসা করে।

৮। খেয়ালের বশে যাহা করা যায় তাহা অপরকে ত সন্তুষ্ট করেই না—নিজেকেও নয়।

পিতা। এমন দুটি জিনিষের নাম কর যাহা এক শত বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে ছিল না, কিন্তু আজ আছে?

পুত্র। কেন বাবা—তুমি আর আমি।

গ্রীষ্মের দিনে

স্নানের আরাম পাইতে, শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে, আমাদের আইডিয়াল্ গ্লীসেরিন্ এবং বেসিলে প্রস্তুত :—চন্দন, গোলাপকুল মাখ ও ভায়লেট সাবান ব্যবহার করুন।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানী

৩৪।১এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন ২৪১৬

সাহিত্যে যুগমঙ্গল

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ]

"কবি গাইবেন দেশের মূক, অন্ধ ও দরিদ্রের তরে; তিনি প্রভাতগগনের শুকতারা, সূর্য্যের প্রথম রশ্মিসম্পাত; দিবা সমাগমের আশাবার্ত্তা তিনি ঘুমন্ত জগতকে জানাবেন।" দেখা যায়, চাষাভূষার প্রাণের গানে সদা বিভোর রুশীয় কবি তাঁর সমস্ত কল্পনারাগই সামাজিকতার নব আদর্শ চিত্রণে নিঃশেষ করেছেন। রুশীয় সাহিত্যে নির্জীব প্রেমের স্থান অতি অল্প; আর আজিকার আমাদের সাহিত্য অধঃপতিত জাতির প্রেমগুঞ্জন ও কান্না ছাই অধিকাংশ স্থলে আর কিছুই নয়; বাংলার কবি, বাংলার লেখক এখনও সেই মামুলী প্রেমের ভাঙা বাঁশরীতে ফুঁ দিতে ব্যস্ত; তাই মনে পড়ে "Nero fiddles when Rome burns"। এ সাহিত্যে সজীবতার ভাব ও সাড়া এখন কোথায়—যদিও আজ সকল জগৎ জীবন স্রোতে টলটলায়মান?

বিশ্বপ্রাণের হিল্লোলে আজ আইরীশ নব সাহিত্য উছলে পড়ছে। 'এ, ই' রসেল প্রমুখ নববিধানের কবিগণের সমাজ গঠনমূলক এক অভিনব বাণী সে সাহিত্যে অহরহ ধ্বনিত হচ্ছে: সে আলোড়নের মাঝে, প্রাণের নব উচ্ছ্বাসের উন্মাদনার মধ্যেও শান্তির সুর যে অস্পষ্টতঃ না বাজছে তা নয়।

যে কল্যাণময়ী বাণী শ্রবণের প্রতীক্ষায় রয়েছে আজ সকল জগৎ সে বাণী সুস্পষ্ট হয়ে বাজবে কখন্ ও কোন্ খানে? সত্য-শিব—সুন্দরের চির বাঞ্ছিত আলয়, সংযম ও মুক্তির পবিত্র তীর্থক্ষেত্র এই ভারতেই তা সম্ভবে, অনতিবিলম্বে সুস্পষ্টভাবে আনন্দে জয়মন্ত্রে ঘোষিত হবে। তখন কারো আর সংশয় থাকবে না; ভারত তার চিরন্তন ও সর্ব্বাঙ্গীন বিশেষত্ব, সত্য-সুন্দর জগন্মঙ্গল সনাতন আদর্শ জীবনের সকল দিকেই—কি সাহিত্যে, কি রাজনীতিতে, কি সমাজজীবনে ফুটিয়ে বিশ্বমানবকে এক অভিনব অপূর্ব্ব উপহার দান করবে; ভারত তার সংযমের দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে 'সত্যং শিব-সুন্দরম্' এই কল্যাণের আদর্শ জগতে প্রতিষ্ঠা করবে। এই অমল ধবল সংযমের, মুক্তির বীজেই ভারত সাহিত্যের প্রাণ সুত্রায়িত। এই মন্ত্র তার জীবনের সকল অঙ্গের তথা সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়ে সমস্ত বিশ্বমানবের প্রাণের বাণী হবে—যা ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ ও সাহিত্যে এক অভিনব, অপরূপ, বিশ্বজোড়া প্রাণমাতানো গানের ঢেউ তুলবে। ভারতের যুগযুগান্তের সাধনা যা, তারই মধ্যে এর সন্ধান; ভারতের বেদনা যা তা বিশ্বমানবের প্রাণবেদনার সাড়া বা প্রথম ও অস্ফুট স্পন্দন। বিধাতার এই ইঙ্গিত একটু আধটু কেউ কেউ যে ধরতে না পেরেছেন ও পারছেন তা নয়। তাঁরা তাই বুঝে সময় থাকতে আমাদের সাহিত্যকে সত্য-শিব-সুন্দরকে অন্তরে ধরবার উপযুক্ত মন্দিররূপে গড়িয়ে তুলতে বলছেন। এই মন্ত্রের দ্রষ্টাদের মধ্যে আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ একজন; অদূর প্রাচ্যে ঋষি টলষ্টয়ও সেদিন ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে ও সাহিত্যে যে মন্ত্রের ঘোষণা করলেন তা আমাদেরই এই ধ্যানময় ভারতের সুদূর অতীত গর্ভোত্থ সনাতন ধ্বনি "সত্যং শিবং সুন্দরম্"; আজ ভারতের ধ্যান শুদ্ধ তপঃশান্ত অতীত তাঁর যুগান্ত ধ্যানের পর আবার মূর্ত্ত, মুখর হয়ে গান্ধী, রবীন্দ্র, অরবিন্দ, প্রভৃতি বিশ্ব বান্ধবগণের মুখ দিয়ে নবযুগ-মঙ্গল গাইছে—"শান্তং শিবং সুন্দরম্।"

সমালোচনা

রূপমুগ্ধ—উপন্যাস। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক দি বুক কোম্পানী, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০ ভূমিকায় গ্রন্থকার জানাইয়াছেন এই উপন্যাসখানির আখ্যান ভাগ তিনি প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য সাহিত্যিক ওস্কার ওয়াইল্ডের কোন গল্প হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। অসাধারণ শক্তিশালী ভাব ও ভাষার যাদুকর লেখকের লেখা হইতে রূপমুগ্ধের আখ্যান ভাগ গৃহীত হইলেও লেখক নিজ বিশেষত্বের ছাপ বসেই দিতে পারিয়াছেন। বহিখানি পড়িবার আগে আশঙ্কা হইয়াছিল—হয়তো বা বাঙ্গালী লেখক অমন সুন্দর Picture of Dorian Gray মাটি করিয়া ফেলিয়াছেন। সুখের বিষয় তাহা হয় নাই—রূপমুগ্ধের লেখক নিজস্ব বিশেষত্বে উপন্যাসখানিকে পরম উপভোগ্য করিতে পারিয়াছেন। মানুষের ভোগ লালসা, সৌন্দর্য্য তৃষ্ণা কত উগ্র হইতে পারে এবং এই লালসা ও তৃষ্ণা নিবারণের জন্যও মানুষের নিজ ক্ষমতার ব্যবহার কতটা করিতে হয়—চিত্তকে কত দৃঢ় স্থির করিতে হয়—মানুষের ভিতরের শয়তানকে কতটা জাগ্রৎ করিতে হয় রূপমুগ্ধের বিলাস ও তাহার শিল্প পরিমলের চরিত্রে তাহা সুপ্রকাশ হইয়াছে। চিত্রকর সুব্রতের চরিত্র, তাহার প্রেম সুন্দর। যুগ যুগান্ত হইতে মানুষের আত্মার জীবন লীলা—যৌবনের উদ্দাম প্রবাহে আরো অসংযত হইয়া পড়ে—এই উচ্ছ্বসিত প্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আকাঙ্ক্ষা অনেকের প্রাণেই জাগে, কিন্তু সাহস ও মানসিক ক্ষমতার অভাবেই লোকে তাহা হইতে বিরত থাকে। ঝাঁপাইয়া যাহারা সাহস করিয়া পড়িতে পারে তাহারা উদ্দাম বাসনা স্রোতে পড়িয়া—সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, হাসি ও কান্নার ঝঞ্ঝায় অস্থির জীবনকে আরো অস্থির চঞ্চল করিতে পারে,—কিন্তু এক জীবনেই জীবনের চিরন্তন সত্য তাহাদের কাছে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আলোচ্য উপন্যাস খানির ভোগ বিলাস, লালসার ধারার মধ্য দিয়াও মানব মনের সেই শাশ্বত সত্যই বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। বিকাশ ও পরিমলের মত দুনিবার সাহসিকতায় ভরা চরিত্র বিরল। ইহারা জীবনের কাম্য ভাবিয়া যাহাকে বরণ নিতে গিয়াছে সে পথের জ্বালা বেদনা সহিবার সামর্থ্য অনেকের নাই। কিন্তু সে পথের লালসায় ডুবিবার সাধ অনেকেরই আছে। সংসারের প্রলোভন, রক্তমাংসের উত্তেজনা, শয়তানের দুর্নিবার বিক্রমের কাছে যে সংযম আদর্শ—নিজের জীবনে সত্য প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত—বার বার পরাভব স্বীকার করে তাহা পরিমলের সুব্রতের প্রভাব অতিক্রম করিয়া যাওয়ার মধ্যে মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরিমল ও বিকাশের এই শয়তানী বিদ্রোহের কাছে সুব্রত, মনোরমা সুলতা কি ভাবে আত্মাহুতি দিয়াছে তাহা দেখিয়া চিত্ত ব্যথিত হয়। দিনে দিনে আদর্শ চিত্র মনোভাবের পরিবর্ত্তনে কি ভাবে ম্লান ও উজ্জ্বল হইয়া পড়ে পরিমলের চিত্রে তাহা ফুটিয়াছে। মানুষের শক্তি তাহার সাহস জীবনকে কত ব্যথিত করিতে পারে, উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে সে পরিচয় মেলে। তারপর সত্যের প্রকাশে সব অস্থিরতা শান্ত হয়। কিন্তু সে মুহূর্ত্তে প্রাণ শিহরিয়া উঠে—আনন্দও হয়। নারী চরিত্র গ্রন্থে মাত্র চারিটি—তার মধ্যে দু' চারিটি কথায় বিলাসের স্ত্রী সুরমা বাহা ফুটিয়াছে সুন্দর। অভিনেত্রী মনোরমার আত্মদানে চোখে জল আসিলেও মনে হয় সে উদ্ধার পাইল। তাহার দুর্ভাগা চিত্তের প্রেম ক্ষুধা এ জীবনে না মিটিলেও পর জীবনে মিটিবে। জীবনের পূর্ণ আনন্দের মধ্যে প্রথম আঘাতেই সুলতার হার দেখিয়া মনে হয় শয়তানের সঙ্গে শয়তানী তেমন ভাবে করিতে পারে নাই তাই তাহার হার হইল। পল্লীবালা চারু চমৎকার—লালসার উজ্জ্বল মোহ এড়াইয়া লোকে এমনি শান্ত স্থির প্রেমময়ী সঙ্গিনী বুঝি চায়। গ্রন্থকারের লেখা, ভাব বিশ্লেষণ, চরিত্রের ব্যঞ্জনা সুন্দর। চরিত্রগুলির মধ্য দিয়া কাব্য সাহিত্য, জীবনের আলোচনা রূপমুগ্ধে ফুটিয়াছে সুন্দর। রূপমুগ্ধ জীবনের অনেক দিকের অনেক কথাই ভাবিবার অবকাশ দেয়। জীবনের চলিত রীতি নীতি বাধা বিঘ্ন মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে কতটা অন্তরায় হইয়া আছে তাহাও ভাবায়। মনে হয় জীবনের সত্য বস্তুর সন্ধান মিলিবে কোন পথে? রস রসিকতা, কামুকতা লাম্পট্যের শেষ শিখরে উঠিয়াও—বহিখানি এতটা বিচিত্র রসবোধের পরিচয় দিতে পারিয়াছে এইখানেই রূপমুগ্ধের বিশেষত্ব। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ভাল। বন্ধনের মনোরম বাঁধাই গ্রন্থের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।

ফেনের আবর্জনা, কবিতা গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। মূল্য ।৵ ময়মনসিংহ লিলি প্রেসে প্রাপ্তব্য। গ্রন্থকার ব্যারিষ্টারীর প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি ছিলেন। মাতৃভূমির অ-সহযোগ আন্দোলনে লিপ্ত হইয়া তিনি স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন। কারাগারে তাঁহার মনে যে ভাব ও চিন্তা আসিয়াছে ইহাকেই তিনি কবিতার রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমানের দেশ, সমাজ, দেহ মন, আশা আকাঙ্ক্ষা কিরূপ গ্রন্থের কবিতাগুলিতে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার 'মজার দেশ,' মন ও দেহ, কৃপণ, প্রণয় সঙ্গীত, নদীর ঘাটে, যাত্রা, শ্রাবণ সন্ধ্যা, সিন্ধি, কালু, ছুটি, ঈশ্বরতারার প্রতি, আমির বিবাদ প্রভৃতি কবিতাগুলি সুন্দর। ব্যর্থতার 'তৃপ্তিতে' এই অ-সহযোগী নেতা গাহিয়াছেন—

ব্যর্থতার তৃপ্তি বুকেতে লইয়ে চেয়ে আছি পথপানে,
আসে কিনা পুন জোয়ারের জল, মরা গাঙে কোন দিনে।

একটা যুগের যুক্ত মানব মনের কতকটা অংশ এই শ্রেণীর কবিতাগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে।

'মাতৃ-মন্দির' নারী জাগরণ বিষয়িণী মাসিক পত্রিকা। কলিকাতা ৩৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র। আমাদের বাংলার পুরুষদের পত্রের প্রচার বৃদ্ধি যথেষ্ট হইলেও সম্পূর্ণ নারীদের জন্য প্রকাশিত পত্রাদি নাই বলিলেই হয়। বরঞ্চ কিছু দিন পূর্ব্বেও এ ধরণের পত্র যাহা ছিল তাহাও আর নাই। নারী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের পত্রিকাগুলি উঠিয়া গেল কেন ইহা ভাবিবার বিষয়। নারীরা আজকাল বিবিধ মাসিক সাপ্তাহিকে নানা বড় বড় সমস্যার কথা লইয়া আলোচনা করিতেছেন কিন্তু নারীর প্রথম শিক্ষা ও জীবনের একান্ত গৌরবের স্থান যে সংসার সেই সংসারে কি করিয়া তাঁহারা সু-প্রতিষ্ঠ হইবেন কি করিয়া বহু-সংসার তাঁহাদের শ্রী মাধুর্য্যে উজ্জ্বল হইবে তেমন আলোচনা বড় বেশী দেখিতে পাই না। কি করিয়া নারী পুরুষের সত্য সঙ্গিনী হইবেন, তেমন আলোচনা জানিবার প্রয়োজন যেন আমাদের দেশের নারী ও পুরুষের নাই। অথচ ইহার অভাব পদে পদে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ আমরা অনুভব করি। পাশ্চাত্যের নানা দেশ স্ত্রী-শিক্ষা ও স্বাধীনতায় বহু অগ্রসর হইলেও তাহাদের দেশের নারীদের পত্রে ও পুরুষ চালিত অনেক বড় বড় পত্রে নারীদের প্রধান কর্ত্তব্য এই ঘর সংসারের আলোচনা, বিবাহিত জীবনের, সাংসারিক জীবনের কর্ত্তব্যের অনেক কথা থাকে। তাহাতে অনেক-জিনিষ জানা যায়, শেখা যায়। অথচ আমাদের দেশ এমন একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে কেন উপেক্ষা করিতেছে বোঝা যায় না। মাতৃ-মন্দির সেই অভাব পূরণের চেষ্টা করিবে আশা রাখি —যদি পারে তবে মাতৃ-মন্দির নামে সার্থক হইবে।

কানাইলাল। একদিন বাংলা, বাংলা কেন, ভারত এই নামে বহুকালের জড়তা ঝাড়িয়া জাগিয়া উঠিত; একদিন আসিয়াছিল যেদিন বাংলার পবনে পবনে আত্মত্যাগী বীর কানাইলালের নাম সঞ্চালিত হইত। অধিক দিনের কথা সে নয়, বাঙ্গালী জাতি তাহার একটি নগণ্য ক্ষুদ্র ভাই-ভাবের এক অলৌকিক পরিচয় পাইয়াছিল। আজ কিঞ্চিদধিক ১৪ বৎসর হইবে, ভারতের মুক্তি-মন্ত্রের সাধক, স্বাধীনতার উপাসক কানাইলাল দেশহিতে জীবন দান করিয়াছেন; কানাইলাল দেশবাসীকে এক স্বদেশদ্রোহীর ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করিতেই অকালে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া জাতির মুকুটমণি হইয়া রহিয়াছেন। বাঙ্গালী সে-দিনের কথা এত শীঘ্র ভুলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

নিরীহ, অল্পভাষী, অতি ধীর প্রকৃতির যুবক কানাইলাল হঠাৎ কেন নরহত্যার পাপে লিপ্ত হইয়াছিল, জীবনের সে কি মহান্ সাধনা পূর্ণ করিতে নরশোণিতে কানাইলালের হস্ত রঞ্জিত হইয়াছিল, কানাইলালের বন্ধু খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় 'কানাইলাল' নামক গ্রন্থে তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। বাংলার স্বদেশী যুগের ইতিহাস, বাঙ্গালীর তখনকার যুবক—বিপ্লব-পন্থীদের কার্য্যের ও হৃদয়ের পরিচয়ে এই গ্রন্থ সমুজ্জ্বল। ইহার প্রতি পত্রে, প্রতি ছত্রে বাংলার, বাঙ্গালীর অতীতকালের উজ্জ্বল বর্ণ প্রতিভাত। বহিখানির ছাপা, সৌষ্ঠব, ছবি সমস্তই মনরঞ্জক। চন্দননগর প্রবর্ত্তক পাবলিসিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা। বাঙ্গালী পাঁচ সিকার বিনিময়ে যে অমূল্য সম্পদ লাভ করিবেন, তাহা যেমন সুন্দর, তেমনি ভাস্বর।

লালা লাজপৎ রায়

পিত্তরোগে পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায় অকস্মাৎ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছেন,—আর উঠিয়া বসিতে পারেন না। সমগ্র ভারত উৎকণ্ঠ হইয়া 'আমেরিকা-সেবার' কৃতকর্মা-পুরুষ, দেশবাসী তাঁহার এই বিপদের আসন্ন মৃত্যু রোধকল্পে কি প্রকার চিকিৎসা অবলম্বন করিবেন না ?

মহাত্মা সম্পর্কে জাপানী সংবাদ-পত্র

সাম্প্রতিক প্রায় ৫০,০০০ জাপানী আছে তথায় তাহাদের দুইখানি দৈনিক ও বহু সাপ্তাহিক ও মাসিক-পত্রও আছে। তন্মধ্যে "দি সাম্বাই নিচি নিচি" নামক পত্রে প্রায়ই মহাত্মাজীর লেখা জাপানী ভাষায় অনুদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। চীনের জাপানী সংবাদপত্রগুলি প্রায়ই মহাত্মাজীর লেখার স্থান প্রদান করে। এই সকল দেখিয়া স্বভাবতই মনে হয় যে, যদিও মহাত্মাজী এক্ষণে জেলে তথাপি তাঁহার শিক্ষা বহুদূর দেশের জনসাধারণের মধ্যেও দ্রুতগতিতে প্রচারিত হইতেছে।

আনন্দবাজার

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলেন—

কেবিনেট মিশন ব্যর্থ হওয়ায় শেষ অভিব্যক্তি। যে জাতির কিছুমাত্র আত্মমর্যাদা জ্ঞান আছে এইরূপ ঔদ্ধত্যের ফলে তাহারা এই বৈদেশিক শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া উঠিতে পারে।

এই ঔদ্ধত্য নিষ্ক্রিয় করা ভারতীয়দিগের, তাহাদের জীবনের প্রত্যেক বিভাগে, অসহযোগনীতি অবলম্বন করা উচিত।

মিঃ হলিম্যান "বোম্বাই ক্রনিকেল" পত্রে লিখিয়াছেন যে এখনকার পরিস্থিতির দরুণ প্রত্যেক ভারতীয়ের মত এই যে তাঁর দেশ-শাসনের সমস্ত ইম্পীরিয়াল অধিকারগুলির পুনঃ তাঁর করা উচিত। মিঃ পাটেল ইহা সমর্থন করেন। মিঃ সাহা ব্যারেস্টার গাডিনার ও অন্যান্যদিগের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন ভারতের সমস্ত চাহনী ও ব্যবসা ইংলিশদের নিকট বন্ধ করা উচিত এবং ভারতীয়দিগের সাম্রাজ্যিক প্রদর্শনী ও সাম্রাজ্য সমিতীর সর্বপ্রকার সাহায্য বর্জন করা উচিত। তিনি বলেন যে বীর আর দেশনেতা ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতা ভারতীয় হওয়া উচিত। তাঁর বয়সিদের পক্ষে সর্ত পীড়কে প্রত্যেক করায় ভারতীয়রা অন্যান্য অনেকই হইয়াছেন। ইহার ফলে কেবল এক পৃথকসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তীত অন্য সমস্ত নিষ্ক্রান্তেই ভারতের দাবী বর্জন করা হয় নাই।

মিঃ সেক্রেটরি আমার বলিয়াছেন, যদিও এখনও কোন দিন মীমাংসা হয় নাই, তথাপি প্রতিবাদকল্পে নিম্নলিখিতভাবে কার্য্য করা হইবে—প্রথমতঃ এদেশে দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত আমদানির উপর খুব বেশী ট্যাক্স বসান হইবে। দ্বিতীয়তঃ সেখ বাসন্দার দাবীকে সাম্রাজ্য সমস্যা বলা হইতে দেওয়া হইবে না। তৃতীয়তঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রদর্শনী বয়কট।

সমস্ত শুনিয়া যে সম্রাটের সংগ্রামকে জয়ে করিবার উদ্দেশ্যে প্যাটেল আতাবাদকে দুই এক দিনের মধ্যে প্রেরণ করা হইবে। প্যাটেল আতাবাদ পৌঁছিলে অনেক সত্যাগ্রহীর মুক্তিলাভের সম্ভাবনেক এতদ্ভিন্নে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন স্থির করিয়াছেন। এক গুজরাট হইতে এ পর্যন্ত মোট ১৭১ জন স্বেচ্ছাসেবক বারদৌলি সংগ্রামে যোগদান করিয়াছেন। এখনও আরও অনেকে প্রস্তুত হইয়া আছেন। এই সকল গুজরাটী স্বেচ্ছাসেবকদিগের মধ্যে ছাত্রগণ, উকিল প্রভৃতি বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তিও আছেন। বাঙ্গালা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, তামিল নাড়ু প্রদেশ হইতেও বীতিমত স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করা হইবে স্থির হইয়াছে।

সেদিন যে স্বেচ্ছাসেবক কমিটির ডুপাক্লিকেটগুলি জানাইয়াছেন যে বিজাপুর জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট খবর লইয়া জানিতে পারা গেল যে, মৌলানা মহম্মদ আলী আগামী মাসের শেষভাগে কারামুক্ত হইবেন। পূর্বে জানা গিয়াছিল যে, মৌলানা সাহেবকে ১১ই আগষ্ট মুক্তি দেওয়া হইবে।

মর্ড হার্ডিং, নবনগরের মহারাজা এবং সৈয়দ হাসান ইমাম, লাভিসনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করিবে।

'হিন্দুস্থান'

"আমরা শান্তি রক্ষা করিতেছি, তোমাদের কোন ভয় নাই" এই বৃথা রাজপুরুষগণ ঘোষণা করিলেও প্রজা সে কথায় আর ভরসা করিতে চাহে না। তাহারা প্রতি পদক্ষেপে অশান্তির বিভীষিকা দেখিয়া চমকিত হইতেছে। রাজধানীর মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে সশস্ত্র সিপাহী পরিবৃত্ত পাহারাওয়ালা পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে গুলী করিয়া যে নিষ্ঠুর হত্যা করিয়াছে, তাহাকে আদৌ ন্যায় সঙ্গত বলিয়া কোন ব্যক্তি মনে করিতে পারে না। কখন কোন্ দুর্ঘটনা ঘরে আগুন লাগাইয়া পুরুষ-পুরুষানুক্রমে গড়া সংসার ধ্বংস করিবে, এই ভয়ে আজ যে বেলওয়েটেক ফ্রেমওয়ার্কের সিপাহী কর্তৃক স্ত্রীলোকদিগকে রাখিয়া তাহাদের অভিভাবকগণ অফিসে কাজে যাইতে পারে না, অথচ আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এখন যেরূপ পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে ভারতে পূর্বে কখনও সেরূপ ছিল না।

'হিতবাদী'

ন্যাশনাল ভ্যারাইটি ষ্টোর্স

ন্যাশনাল ভ্যারাইটি ষ্টোর্স—বেণীর দরাজির ব্যবসা। অল্প দিন হইল এই নব ভাণ্ডারটি বাজারে বিশেষ নাম ও খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। এখানে সাধারণ খদ্দরের মোটা কাপড় হইতে আতি সূক্ষ্ম বেনারসী, জামদানী, টসরসিল্ক, শান্তিপুরী মূল্যবান কাপড় পাওয়া যায়। বেণীর নিজ হাতে ও ঘরে বোনা সর্ব প্রকার কাপড় ও ছিট এখানে সর্বদা অল্প পরিমাণে বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে—দাম ন্যায্য ও সুলভ। পরিচালকদের ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রশংসনীয়। আশা করি, খদ্দরের ইহারা ক্রমশঃ যথেষ্ট অর্জন করিতে পারিবেন।

বাসন্তী—

অনন্তশয্যা।

আরত চিত্র-মন্দির কোলকাতা।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

২য় বর্ষ] ২৬শে শ্রাবণ শনিবার ১৩৩০, ইং ১১ই জুলাই। [৬ষ্ঠ সংখ্যা

জলে বাঘ, ডাঙ্গায় কুমীর।

"কবি কি বাবা ?"

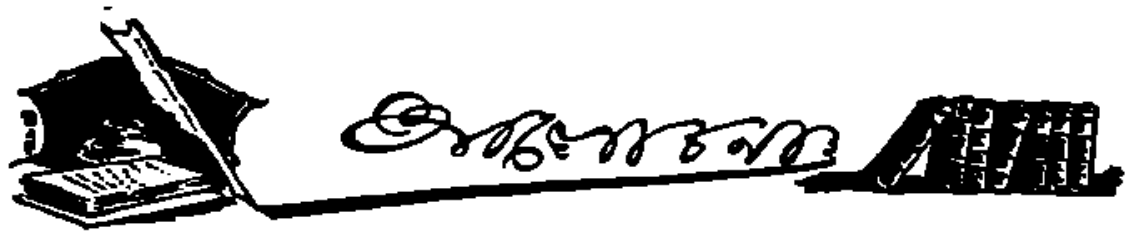

বাংলা দেশের রাজধানী কলিকাতা সহর। আঁধার রাতও নাকি এখানে দিন বরাবর। দিনে সূর্য্য আলো দেন রাত্রে অজস্র গ্যাসালোকে সহরের পথ ঘাট অলি-গলি আলোকিত হয়। হাজার হাজার লোক পথে চলে। এমন রাজধানী সহরের বুকের উপরেও আজকাল সূর্য্যাস্তের পরেই লোকজন পথ চলে প্রাণ হাতে করিয়া। কি জানি কখন কে আসিয়া একখানা ছোরা বা পিস্তল দেখাইয়া সঙ্গে যা থাকে সব দাবী করিয়া বসে। দাবীর সঙ্গে সঙ্গে জিনিষ দাও ভাল—নইলে ছোরার আঘাতে বা পিস্তলের গুলিতে প্রাণটি তোমার যাইবে। প্রাণ লইয়া যে সহরের পথে ঘাটে এমন ছিনিমিনি খেলা চলে সেখায় লোকের মনের অবস্থা যে কেমন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

• • • • •

দেশের লোকে অত্যাচারী বা প্রাণঘাতকদের বাধা দিতে পারে না। অতর্কিত আক্রমণে বাধা দেওয়াও সব সময় সম্ভবপর নয়। দেশের লোকে লাঠি বা প্রতিরোধের কোন রকম অস্ত্র লইয়া—এখন আর বড় পথ চলে না। সহরে পুলিস ও পুলিসের প্রাচুর্য্য থাকিলেও বিপদকালে দু-ই ছিল সমান মূক। কিন্তু ব্যাপার সম্প্রতি এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে পুলিস তাহার মূকভাব যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়াও এই শ্রেণীর গুণ্ডাদের হাত হইতে সহরবাসীকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না। এত বড় সহরের এক একটা দিকে রাহাজানী যখন মাত্রা ছাড়িয়া উঠে পুলিস তখন কড়া পাহারা দিয়া সে দিকে লোকজনের চলা ফেরা বন্ধ করিয়া দেয়—কিন্তু অস্ত্র আর একদিকেই তখন তার চেয়েও ভীষণ রাহাজানী আরম্ভ হয়।

• • • • •

শাঁকারীটোলা পোষ্টাফিসের পোষ্টমাষ্টার বেলা তিনটার সময় ক্যাশ গুণিতেছেন—তিন চারজন লোক পিস্তল লইয়া পোষ্টাফিস ঘরে ঢুকিয়া হাঁকিল—হাত টাকা—নইলে গুলি। ছোট-খোপা বাঙ্গালী প্রৌঢ় পোষ্টমাষ্টার। ডাকাতের ধমকিতে টলিলেন না, প্রাণের ভয়েও কর্ত্তব্য ভুলিলেন না। গুলিতে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ভদ্রলোকের প্রাণ গিয়াছে। ডাকাত ধরিতে তাঁহার ছেলে, পোষ্টাফিসের পিয়ন যে সাহস দেখাইয়াছে প্রশংসনীয়। তাহারা প্রাণের ভয় করিয়া কিছু তাড়া যদি না করিত তবে ডাকাত ধরা পড়িত না। পোষ্টমাষ্টারের সংসার চালাইবার ভার সরকার নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন। ডাকাত একটা যখন ধরা পড়িয়াছে তখন আরও যে ধরা পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

• • • •

পুলিস কমিশনার টেগার্ট সাহেব এসব দমনে কৃতকর্ম্মা পুরুষ। কিন্তু তাঁহার সময়েই এই সব উপদ্রব বাড়িয়াছে। পুলিসের প্রধান কর্ত্তব্য—শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের নিরাপদ রক্ষণ। যে কারণেই হোক কর্ত্তব্যের পরিচয় পুলিস তেমনভাবে দিতে পারে নাই—তাই এ বিভাগের গলদ যাহা আছে তাহার সংস্কারের প্রয়োজন। জনসাধারণেও এই অত্যাচার নিবারণের জন্য তেমন কোন ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। দু'পক্ষের ত্রুটিতেই আজ দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচার এত বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ হইয়া এই উপদ্রবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে—এমন ভীষণ অত্যাচার যাহাতে লোকের ধন প্রাণ নিরাপদ নহে যত শীঘ্র তাহা দূর করা যায় সে দিকে সকলেরই সজাগ হইতে হইবে।

• • • •

রাজধানী বা সহরের অবস্থাই এই—এদিকে বাংলার পল্লীগুলির অবস্থা তার চেয়েও ভীষণ। পল্লীতে চোর ডাকাতের উপদ্রবে রাত্রে গৃহস্থেরা শান্তিতে ঘুমাইতে পারে না। গৃহস্থ বধূদের কুল মান ইজ্জত দুর্ব্বৃত্তদের হাতে নষ্ট হয়। এগুলির প্রতিকারের জন্য গ্রামবাসীদের দলবদ্ধ হওয়াই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। গ্রামের যুবকগণ যদি সমবেত হইয়া এই অত্যাচারের প্রতিরোধকল্পে দাঁড়ান তবে দুর্ব্বৃত্তেরা দু'দিনেই সায়েস্তা হইতে পারে। নারী-

দেরও বেশ সাহস ও মনের বল দরকার। দেশের এ অবস্থায় তাঁহাদের মহিষ-মর্দ্দিনী হইতে হইবে। লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া অস্ত্র লইয়া পাষণ্ডদের আক্রমণ করিতে হইবে। বাঙ্গালীর মেয়েরা অতিমাত্রায় লজ্জাশীলা বলিয়াই তাহাদের লজ্জার সুযোগ লইয়া দুর্বৃত্তেরা তাহাদের লজ্জা ও মান নাশ করিবার সাহস পায়। মেয়েরা যদি তেমনভাবে দাঁড়ান তবে আর এ অত্যাচার নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে না। বাংলার পুরুষদের ভীরুতাও দূর করিতে হইবে। দেশবাসীর অতি ভীরুতা হইতেই দেশের উপর এ অমঙ্গল উপদ্রব জাঁকিয়া বসে।

• • • •

পুলিশ অপ্রতিহত ক্ষমতা লইয়া আছে। তাহাদের তৎপরতার সহিত এমন অত্যাচার রোধ করিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। রংপুর গাইবান্ধার বরদা সুন্দরীর অত্যাচার ঘটিত ব্যাপারে পুলিশের ইন্‌স্পেক্টারের সম্বন্ধে যে কাহিনী শোনা যাইতেছে ইহা অত্যন্ত লজ্জাকর। ইহা মিথ্যা হইলেই আমরা সুখী হইব। কিন্তু দেশবাসী শিক্ষিত কেহ যদি হাতে রাজশক্তির অপ্রতিহত ক্ষমতা লইয়া তাহারাই এমন অসদ্ব্যবহার করেন তবে ন্যায় বিচারের যে কিরূপ বিড়ম্বনা ঘটে তাহা সহজেই অনুমেয়।

• • • •

অল্প কয়দিনের মধ্যে দেশের কয়েকজন বিখ্যাত মৃত ব্যক্তির স্মৃতি উৎসব হইয়া গেল। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক, ঈশ্বর সাগর বিদ্যাসাগর ও মোসলেম সমাজের গৌরব রসুলের স্মৃতি পূজা দেশবাসী করিয়াছে। ইঁহারা সকলেই খাঁটি লোক ছিলেন—সত্য ভাবিতে পারিতেন ও প্রকাশ করিতে পারিতেন। ইঁহাদের চরিত্রে সত্য বিশেষ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছিল বলিয়াই দেশবাসী সেই সত্যের পানে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সত্যনিষ্ঠদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে তাই দেশবাসী এখনও উন্মুখ। কিন্তু এই শ্রদ্ধা নিবেদন শুধু বৎসরে একদিন করিলেই কোন কাজ হয় না। যেভাবে জীবনযাপন করিয়া ও জীবনের কর্ম্মধারা চালিত করিয়া ইঁহারা আজ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন—মরিয়াও অমর হইয়া রহিয়াছেন তেমন ভাবে দেশবাসী যদি নিজ জীবন ও কর্ম্মধারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে তবে দেশের ভাগ্য অনেকটা ফিরিতে পারে।

নাগপুরে জাতীয় পতাকা লইয়া সত্যাগ্রহ সংগ্রাম চলিয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে স্বেচ্ছাসেবকেরা জাতীয় পতাকা সংগ্রামে যোগ দিতে গিয়া রেল ষ্টেশন হইতেই ধৃত ও বিচারান্তে কারাগারে প্রেরিত হইতেছেন। নিশ্চিত কারাবাস জানিয়াও দেশের লোকে জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষার্থ যাইতেছেন। সংখ্যায় ইঁহারা অসংখ্য না হইলেও ইঁহাদের পেছনে চল্লা নিনাদ অবশ্য না চলিলেও, ফুলমালায় ইঁহাদের কণ্ঠ শোভিত না হইলেও ইহাতে যে প্রেরণা বা উদ্দীপনা নাই এমন কথা বলা চলে না। স্বাধীন দেশে জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষার জন্য লোকে অবহেলায় প্রাণ দেয় আর আমাদের দেশে নীরবে লোক-প্রশংসার অগোচরে আজ এই সত্যাগ্রহী দেশ-সন্তানেরা কারাগারে যাইতেছেন এই যা পার্থক্য!

• • •

ত্রিকর্ষ তরণী চোরাবালীতে বাধিয়া গিয়াছে। লবণ করের সার্টিফিকেশনে বড় বড় মালসীরা সব নাকি বড় অপমান বোধ করিয়াছিলেন। এর উপর আবার কেনিয়া সমস্যা তাহাদের প্রাণে বড় ঘা দিয়াছে। নিজের দেশের উপরেই যাহাদের কোন অধিকার নাই তাহাদের পক্ষে এ দাবী যে কতদূর অসঙ্গত তাহা বুঝাইয়া দিয়াছে ভাল করিয়া এই কেনিয়া সমস্যা!

• • • •

এইবার ভাই শাস্ত্রী সাহেব, সামর্থ কামাতের দল বেজায় রাগিয়া বড় বড় বোল চাল ঝাড়িতেছেন। এতকাল লোকে জানিত বাঙ্গালীরাই বচন সর্ব্বস্ব—বাক্যবীর। কিন্তু এইবার বাঙ্গালী বীরেরা এ অপবাদ যে একান্ত মিথ্যা প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। সারা ভারতের লোক—এমন কি বিলাত প্রবাসী ভারতীয়েরা পর্য্যন্ত কেনিয়া প্রশ্নে অ-সহযোগী হইবেন বলিয়া বাক্যে বিক্রম প্রকাশ করিতেছেন—অথচ বাংলার রাজনীতিকেরা সব নীরব নিথুম! বাঙ্গালী চিন্তাশীল বলিয়া বিখ্যাত তাই বুঝি—বচসা ন প্রকাশয়েৎ!

• • • •

বাংলার লাট বাহাদুর খুব সদাশয়—চক্ষুলজ্জাও আছে দেখিতেছি। তাঁহার পত্নীর বক্ষীদের বাবদ বৎসরে এক

লাখ কুড়ি হাজার টাকা খরচ হইত। ছাটাই কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে তিনি এই টাকার বহর হইতে দশ হাজার টাকা খরচ কমাইয়া দিয়া ব্যয় সংক্ষেপের নমুনা দেখাইয়াছেন।

• • • •

দেশে সরকারের যত রকম বিভাগ আছে তাহার মধ্যে পোষ্টাল বিভাগটিকেই বুঝি সম্ভব নির্খুৎ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অধিকাংশ পোষ্টমাষ্টারই কর্ত্তব্য-পরায়ণ, ধর্ম্মভীরু। অনেকেই মনে করেন ইহারা একটা গুরু দায়িত্বভার স্কন্ধে লইয়া আছেন। কিন্তু পোষ্টাফিসের আয় যথেষ্ট হইলেও সরকার পোষ্টাফিসের কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে তেমন কোন ব্যবস্থা করেন নাই। আগে পোষ্টকার্ড, খাম টিকিট বিক্রির উপর যে কমিশন ছিল তাহাও উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। সাধারণের যথেষ্ট অর্থ ও দায়িত্ব যাহাদের হস্তে থাকে তাহাদের প্রলোভনের হাত হইতে মুক্ত রাখিয়া পেট চালাইবার যোগ্য ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া সঙ্গত।

• • • •

শাঁখারীটোলার পোষ্টমাষ্টার ৺ অমৃতলাল রায় কর্ত্তব্যজ্ঞানের যে পরিচয় ও নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন তাহাতে পোষ্টাল বিভাগ তথা বাঙ্গালীরও মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। দুর্দ্ধর্ষ আততায়ীর হাতে নির্ম্মম ভাবে প্রাণ দিয়াও তিনি একটা উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারীর পরিবার পরিজন যাহাতে অর্থের অভাবে কষ্ট না পায় সরকার তাহার যথোপযুক্ত সুব্যবস্থা করিয়াছেন ইহাতে আমরা সুখী হইয়াছি।

• • • •

গুণ্ডামী, বদমাইসী বা চুরী, রাহাজানীতে যাহারা স্বদেশীকতা, বিপ্লববাদ, বলশেভিজম প্রভৃতির আরোপ করিয়া এই সমস্ত নীচ কার্য্যে একটা ভদ্রোচিত আবরণ দিতে চায় তাহারা আরও নীচ ও জঘন্য প্রবৃত্তির সন্দেহ নাই। এ সব নীচতার দলন ও সমূল উচ্ছেদ তীব্র ভাবে, মৃদু হস্তে করা উচিত। নিরীহ একজন লোককে পিস্তল দ্বারা কঠিন নহে—অত সাহস থাকে দু'একটা বড় ব্যাঙ্কের টাকার গাড়ী লুটিয়া আন না—কেমন বীরত্ব বোঝা যাইবে। বাঙ্গালী পাড়ার গো-বেচারীদের মধ্যেই এমন চলে। মাড়োয়ারী মহলে বা সাহেব বন্দরে এমন পিস্তল দেখাইয়া টাকা লুটের কথা কিন্তু বড় শোনা যায় না—বেশি শক্তের ভক্ত নরমের যম সকলেই!

• • • •

শুনিতে পাই মোটর গাড়ীর গতির বেগের একটা বাঁধা নিয়ম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু রাজপথে বাহির হইয়া তাহার পরিচয় পাই না। বিলাসী মোটর বে-পরোয়া চলে। আবার মোটর লরী গুলিও হইয়া দাঁড়াইয়াছে তেমনি বে-পরোয়া। মোটর যারে যাহুক আর এ গুলো ধাক্কায় রাস্তার ধারের ঘর বাড়ী। এ গুলির গতির সীমাও বাঁধিয়া দেওয়া নিতান্ত উচিত—এবং সেই গতিবেগ রক্ষিত না হইলে যথোপযুক্ত শাস্তির বিধান করা কর্ত্তব্য।

• • •

বৃটিশ উপনিবেশে ভারতের কোন অধিকার নাই। কারণ উপনিবেশগুলি উপনিবেশিকেরা নিজেরাই শাসন করে। এ ছাড়া বৃটিশের নিজস্ব উপনিবেশও আছে। শ্বেত তাহারা, তাহাদের নিজেদের ইচ্ছামত তাহারা উপনিবেশের শাসন প্রণালী চালায়। ভারতবাসীর স্থান বা মর্য্যাদা সেখায় নাই কিন্তু ভারতবাসী কি উদার ভ্রাতৃভাব সম্পন্ন! তাহাদের দেশে আসিয়া সকলেই লুটিয়া খাইতেছে—ইহাদের প্রতাপে ভারতীয়দের অস্থির থাকিতে হয়।

•

পরদেশী আমাদের লাথি ঝাঁটা মারে তাহা আমরা সহি। সামান্য অর্থের জন্য ভিন্ন ধর্ম্মীর পদ লেহন করি। অথচ জাতি বিচার আর ছুঁৎমার্গ নাকি আমাদের মধ্যে বড় বেশী। কি গৌরবে যে জাতির বড়াই এ দেশবাসী এখনও করে তাহা বোঝা যায় না।

• • • •

দেশে পণ প্রথা নিবারণী সমিতি কয়েকটি গঠিত হইয়াছে। যুবকদল এই সমিতির সভ্য। পণপ্রথা আধুনিক বাঙ্গালী সমাজের একটা মহা কলঙ্কের কথা। সমগ্র জাতির উপর, সমাজের উপর, ব্যক্তির উপর একটা মহা লজ্জা ও গ্লানির ছাপ মারিয়া রাখিয়াছে। অথচ তুচ্ছ ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহে দেশ হইতে ইহা দূর হইতেছে না। দেশের যুবকেরা যদি এই প্রথা বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হন—যদি মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারেন তবে এ প্রথা দু'দিনও সমাজে চলিতে পারিবে না। ইহাতে যুবকদের যদি বিদ্রোহী আখ্যা পাইতে হয় তাহা গৌরবের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। বিবাহযোগ্যা নারীদেরও শুধু বিক্রয়ের পণ্য হিসাবে অর্থ দিয়া বরের গলায় ঝুলাইয়া দিতে চাহিলে চলিবে না। তাহাদের শিক্ষিতা ও সংসার চালনে যোগ্যা করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছা ও চিন্তা জাগাইতে হইবে। জীবন্ত মানুষের মত অধিকার চাহিতে হইবে—অধিকার পাইতে হইবে। তবে সমাজের এ গ্লানি দূর হইবে।

ভারতীয় নাট্য-শিল্প

জ্ঞানে বিজ্ঞানে, চিন্তায়, কল্পনায় ইয়োরোপিয়ানরা যে বর্ত্তমান জগতে সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই এবং ইহা মানিয়া লইতেও আমরা সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি। তাঁহাদের এই উন্নতি বিশ্বের অধিবাসীদের এতই বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে যে সকলেই তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বা উদাহরণের অনুকরণের প্রয়াসী, এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক, ইহাতে লজ্জার কোন কারণ নাই।

আমাদের দেশের নাট্যশালাগুলি কিছিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দী কাল দেশের মাটীর উপর স্থাপিত হইয়াছে। ইয়োরোপিয়ান অথবা ইণ্ডিয়ান কোন্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যে এই নাট্যমঞ্চের সৃষ্টি এদেশে হইয়াছিল এবং পরিচালিত হইতেছিল তাহার সম্যক পরিচয় প্রদান করা এখানে সম্ভব হইবে না তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে বঙ্গের আধুনিক কালের নাট্যশালাগুলি বঙ্গেরই বিশেষত্ব ও জাতিত্ব লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ইয়োরোপিয়ান অথবা ইণ্ডিয়ান কোন একটা আদর্শই ইহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত ছিল না।

যখন যে নাট্যশালা নাটকীয় সৌন্দর্য্যে, নট-নৈপুণ্যে দৃশ্যপট বা বেশ ভূষার পারিপাট্যে দর্শককে আনন্দ দিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই নাম ও অর্থ দুই-ই অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, আনন্দ-পিপাসুত্ব তাঁহাদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন; যাহারা এই সকল বিষয়ে যথেষ্ট সুষমা ও সৌন্দর্য্য দেখাইতে পারিয়াছেন, এ কালে তাঁহাদেরই নাট্যশালা ইয়োরোপিয়ান আদর্শে পরিচালিত—এই খ্যাতি লাভ করিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু এই সন্তুষ্টি, এই খ্যাতি প্রীতি জাতির নিজস্ব প্রতিষ্ঠানকেও চিনিতে দেয় নাই, বরং সর্ব্বথাজ্ঞান করিয়া রাখিয়াছে; পরের অনুকরণ বলিয়া গ্রহণ করাইয়াছে। জাতিত্ব ইহাতেও যে কতখানি ক্ষুণ্ণ তাহা বলা যায় না।

প্রথম যেদিন আমি নূতন নাট্যশালা—ষ্টার থিয়েটারে 'অর্দ্ধাঙ্গিনী' অভিনয় দেখিতে যাই, সেদিন অন্য হাজার দর্শকের মতই রঙ্গমঞ্চের সৌন্দর্য্য, পারিপাট্য, দেখিয়া মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়াছিলাম। সৌন্দর্য্যবোধহীন ব্যক্তির কি হইয়াছিল জানি-না, অনেককেই বিস্ময়োৎফুল্লকণ্ঠে এই 'ইয়োরোপিয়ান' অথবা বিলিতি থিয়েটারের আদর্শে গঠিত নূতন দেশীয় প্রতিষ্ঠানটির প্রশংসা করিতে শুনি। নব-গঠিত ষ্টার থিয়েটারের আদর্শ যে ইয়োরোপিয়ান আদৌ নহে এবং সম্পূর্ণই অন্যদেশীয় নাট্যশাস্ত্রানুমোদিত, তাহাতে তিল মাত্র সন্দেহ না থাকিলেও যাঁহারা তুলনায় বিলিতির উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দোষ দিবার কিছু নাই। আমরা তুলনা করিতে হইলে, বড়র উল্লেখই করি, ইংরাজ এ জাতির কাছে সেই বড়। দেশনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি—সকল দিকেই ইংরাজ আমাদের সম্মুখে আদর্শ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা সকল শিক্ষনীয় বিষয়ই তাঁহারা আমাদের গুরুর স্থান অধিকার করিয়া আছেন, কোন একটা বিশেষ বিভাগে তাঁহারা নাই যদি কিছু করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদেরও যেমন অগৌরব নাই, আমাদেরও তেমনই সেই বিশেষ ভেদ করিবার ইচ্ছা বা উদ্যোগ ছিল না।

কিন্তু ইংরাজের কাছে নাট্য-শাস্ত্রে আমাদের হাওলাত লইবার আবশ্যকতা যে কত কম তাহা ভারতীয় নাট্য-শাস্ত্রের আলোচনা করিলে গভীরভাবে অনুভূত হয়। বিংশ শতাব্দীর এই ঢঙ্গালয়, এই দৃশ্যপট, এই প্রেক্ষাগৃহ, বসিবার আসন- খৃঃ পূঃ দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতে বর্ত্তমান ছিল। শুধু বর্ত্তমান ছিল বলিলে সম্যক বলা হইবে না, সুরুচি সম্পন্ন ও খুব উন্নত অবস্থাতেই ছিল। নাট্যাগার যে শিল্প, কলা, কাব্য, সাহিত্য সৌন্দর্য্যের চর্চ্চার শ্রেষ্ঠ স্থান, তাহা এ যুগের নাট্যব্যবসায়ীগণের চেয়ে সে কালের অধ্যক্ষগণ ভাল রকম জানিতেন। কথালয়ে অভিনীত নাট্যাভিনয়ের সৌন্দর্য্যে, মনোহারীত্বে যাহাতে আপামর সাধারণ মুগ্ধ হয়, তাহার জন্য তাঁহারা যাহা করিয়াছিলেন, কেবল মাত্র তাহা এখনকার কালে কল্পনাতীত এবং অদ্ভুত। সেকালে থিয়েটারের ইমারত গঠনের কার্য্যেও কুৎসিৎ-দর্শন, বিকলাঙ্গ বা বিকৃতাঙ্গ মজুর লাগাইতে নিষেধ ছিল; বিকৃতাঙ্গ, কুৎসিৎ দর্শন ব্যক্তির রুচি যে শুদ্ধ হইতে পারে না, এবং সে রুচির ফল যে সৌন্দর্য্য সম্পন্ন হইবে না, তাহা সে কালের শিল্প-অনুশীলনকারীরা জানিতেন বলিয়াই এই নিষেধ বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। মঠবাসী, 'বাবাজী' ও উদাসীনদের নাট্যাগারে দিক্ মাড়াইতে দেওয়া হইত না। যাহাদের সৌন্দর্য্য জ্ঞান আছে, শিল্প, কলা, সঙ্গীত এ সকলে আকর্ষণ আছে, চর্চ্চা করিতে উৎসুক এবং তাহারাই সমর্থকগণের ছিল নাট্যাগারে অবাধ প্রবেশাধিকার।

আজ সমস্ত রঙ্গমঞ্চে মূল্যের তারতম্যে দর্শকদের বসিবার আসনের বন্দোবস্ত আছে, ভারতীয় নাট্য ইতিহাসের প্রথম যুগেও এই তারতম্য ছিল, তবে তখনকার দিনে জাতিভেদে আসনের ব্যবস্থা হইত। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ প্রথম স্থান পাইতেন; তার পরের আসনে অধিকার ছিল ক্ষত্রিয়ের, তারপর বৈশ্য ও শূদ্র। শূদ্র প্রেক্ষাগৃহের উত্তর পূর্ব কোণে ও বৈশ্য উত্তর-পশ্চিম কোণে স্থান পাইতেন। ভিন্ন ভিন্ন রঙের পিঞ্জার দ্বারা জাতিভেদে আসনের নির্দ্দেশ জ্ঞাপন করিত। সর্ব-পশ্চাৎ ছিল—খালারী। এই খালারীর রেকগুলি যাহাতে প্রত্যেকটি এক হস্ত পরিমাণ উচ্চে স্থাপিত হয়, সে ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল।

বৃহত্তর পটেও যে অধুনা এ দেশের রঙ্গমঞ্চগুলি সে-কালের থিয়েটারকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে তাহাও নহে। কারণ, তখনকার রঙ্গমঞ্চে প্রাসাদ, অট্টালিকা, গৃহস্থের গৃহ, প্রাকৃতিক দৃশ্য, উদ্যান, মন্দির, নদী, পর্বত, বনানী অঙ্কিত দৃশ্যাবলীতে 'ছাইয়া' রাখিবার সংবাদ প্রচুর পাওয়া যায়।

এই পঞ্চাশবৎসরে আমাদের দেশের নাটকীয় শিল্পের অনেক উন্নতি হইয়াছে সত্য কিন্তু তখনকার কালের সহিত তুলনা করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, এখনও ভারতবর্ষীয় নাটকীয় শিল্পের চরমোৎকর্ষতা লাভ করিতে আমাদের অনেক বিলম্ব আছে। আজ নাটকে নৃত্য সন্নিবিষ্ট হয়, নৃত্য ভঙ্গী ও হাব-ভাবের উন্নতি করিবার প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে সত্য কিন্তু এই নৃত্য তখনকার নাট্যমঞ্চে যে কিরূপ অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল এবং তদ্দ্বারা নাটকের সৌন্দর্য্য যে বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইত, তাহারও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনকার নৃত্যে সাধারণতঃ আমরা হাত পা, কটি, পার্শ্ব—প্রভৃতি অঙ্গের পরিচালনা দেখিতে পাই কিন্তু ভারতীয় নাট্য-শিল্পের আইনে কথিত আছে, হাত, পা, কোমর, পার্শ্ব, উরুদ্বয়, উদর, পৃষ্ঠ, শির পরিচালনাও ছিল নৃত্যের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ।

নৃত্যের প্রকার ভেদে এই সকল প্রত্যঙ্গের পরিচালনা দ্রুত ও মন্থর হইত। এই পরিচালনাকে মাতৃকা বা নৃত্যের জননী নামে সম্বোধন করা হইত। তিন চারিটি মাতৃকা একসঙ্গে সম্পন্ন করিতে পারিলে তবেই তাহাকে অঙ্গ-ভঙ্গী বলা চলিত। নাট্য শাস্ত্রে এই অঙ্গ ভঙ্গীর সংখ্যাও বড় অল্প নহে, ১০৮ টির সন্ধান পাওয়া যায়।

দক্ষালয়ে সতীর দেহত্যাগের (দক্ষযজ্ঞ) পর সতীপতি মহাদেব রাগের সহিত বিভিন্ন রকমের ভাব ভঙ্গী সহ নৃত্য করিয়াছিলেন, দেবতারাও মহাদেবের নৃত্যের অনুকরণে নাচিয়াছিলেন। মহাদেব স্বয়ং তণ্ডুকে নৃত্য-কলা শিক্ষা দেন, তখন হইতেই নৃত্যের আর এক নাম—তাণ্ডব হইয়া আছে। আমাদের নাট্যমঞ্চগুলির নানান দিকে উন্নতির সূচনা পরিলক্ষিত হইতেছে, অস্বীকার করা চলে না, কিন্তু এই সর্বমনরঞ্জক বিদ্যাটি এখনও যে বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। নানা কারণে নৃত্য বিভাগের এ দুর্দ্দশা আমাদের ঘুচিতেছে না; আমরা এই প্রসঙ্গে তাহার কয়েকটির আলোচনা করিলে বোধ হয় কাহারই অপ্রীতিকর হইবে না।

প্রথমেই বলা দরকার, ভরত ভারতে নাট্য শিল্পের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। তাঁহার রচিত নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া মহাদেব অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু নাটকে নৃত্যের অভাব মহাদেবকে পীড়া দিয়াছিল; তিনি নাটকে নৃত্য যোজনা করিবার ভার শিব তণ্ডুকে দেন। কিন্তু মুনি-কবিরা ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা বলেন—নৃত্য ত নাটকীয় ঘটনাকে অগ্রসর করে না, আখ্যান বস্তুর সহিতও নৃত্যের কোন সম্বন্ধ নাই, তথাপি নাটকে নৃত্য দেওয়া হইল কেন? ভারত উত্তরে কহিলেন—"নাটকীয় ঘটনাবলীকে সাহায্য না করিলেও করিতে পারে, নৃত্য নাটককে সৌন্দর্য্য পূর্ণ করে।" সহজ বুদ্ধিতেও ইহা বুঝা যায়; মানুষ কোন স্মরণীয় ঘটনা ঘটিলে বা উৎসব কালে নৃত্য করিতে ও নৃত্য দেখিতে চায়; নিজেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তাহার এমনই বিন্যাস যে আনন্দে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি এমনভাবে খেলিয়া উঠে যে সামাজিক বাধা, নিন্দা অপযশের ভয় না থাকিলে সকলেই একটু নাচিয়া আনন্দ বেগ প্রকাশ করিতে চাহিত।

যে নৃত্য নাটকীয় সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি-কল্পেই নাটকে সংযুক্ত হয় বলিয়া নাট্য-শাস্ত্রকার কহিয়া গিয়াছেন, মানুষকে সর্ব-কালে ও সর্ব সময়ে আনন্দ দিতেই, যে নৃত্যের সৃষ্টি সেই নৃত্যের শোচনীয় অবস্থা বাঙ্গালার নাট্যশালা গুলিতে প্রদর্শিত হয়। রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষগণ নৃত্যটিকে যদি ভরতের মত নাটকীয় সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান বলিয়া মনে করিতেন, তবে এদিকেও যে উন্নতি না হইত এমন নয়। দুঃখের বিষয় অতি অল্প বেতনে, কয়েকটি 'পিঠ-মাতৃহীনা' অভাগিনীকে সারারাত বাঁদর নাচ নাচাইয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে চাহেন। থিয়েটারে পরিশ্রম করিতে হয়, ইহাদের সকলের বেশী, আহার পায় ইহারা সকলের কম, দয়ার, করুণার সহিত দেখা সাক্ষাৎ ক্বচিৎ ইহাদের ঘটে,—অবস্থা প্রায় বায়ুনের গরুটির! নাট্য-শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে সস্তার কিস্তি পাইয়া কৈকালাবাদ ভ্রমণ করিবার শুভাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতেই হইবে। ইয়োরোপে নৃত্যের উন্নতি যথেষ্ট হইয়াছে; ক্রমশঃ আরও হইতেছে। তাহাদের এমন-এমন নাটকের সংবাদ আমরা জানি, যে গুলি কেবল-মাত্র নৃত্য-লীলাতেই সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। আমাদের দেশে নাট্যাগারগুলি যে ইয়োরোপিয়ান-দের অনুকরণ-প্রয়াসী হন্ নাই, ইহাও তাহার আর এক প্রমাণ!

এ দেশের দর্শক দুইখানা সুসজ্জিত দৃশ্য দেখিলে বিলিতি ষ্টেজের উপমা দেন; অন্যেমত পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিলে বিলিতি রুচির প্রশংসা করেন; প্রেক্ষাগৃহের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য্য দেখিলে বিলিতি থিয়েটারের কথা বার বার বলে, ইহার কারণ বিলিতি থিয়েটারগুলা এবিষয়ে উন্নতির উচ্চ সোপানে উঠিয়াছে, তাই লোকে ইহাদের উপমা দেয়—কথাটা সত্য অথবা মিথ্যা সে তর্কের প্রয়োজন নাই, আমাদেরও যে উন্নতি হইতেছে, তাহা হইতেই

বুঝা যায় কিন্তু আজ পর্য্যন্ত নৃত্য-কলা বিলিতিত বহু দূর দেশের কথা, অসভ্য বর্ব্বর সাঁওতালদের নৃত্যের আদর্শের নিকটে ও পৌঁছিতে পারিয়াছে কি-না সন্দেহ।

বিলিতি থিয়েটারগুলার সম্মুখে বসিয়া বাঙ্গকরগণ মন্তব্য করিয়া থাকেন, অধুনা রঙ্গমঞ্চকেও ঐরূপ করা হইতেছে কিন্তু আমরা যদি বলি সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতের নাট্যাগারে এই বিধি ব্যবস্থা ছিল, তাহা হইলে অতিমাত্রায় বিলিতি-ভক্তগণ কি বলিবেন জানি-না, নিজ দেশের অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রীতি-লাভ করিবেন। কণ্ঠযন্ত্র ও যন্ত্রবাদ্যের বিরাট আয়োজন সে-কালে রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষগণকে করিতে হইত; আজিকার মত তখনও এই বাদ্যধ্বনি অভিনয়ের সূচনা ঘোষণা করিত।

কাজেই, ভারতের নাট্যশাস্ত্র যে পরানুকরণে সৃজিত ও বর্দ্ধিত ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ভারতের অতীত যখন উজ্জ্বল ছিল, ভারত যুদ্ধবিগ্রহে, ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, শিল্প, কলা প্রভৃতিকেও উপেক্ষার চক্ষে সে দেখে নাই। তারপর গ্রহ বৈগুণ্যে রাজ্যসম্পদ হারা ভারতের অধিবাসী যখন পরাধীনতা হইয়াছিল, তখন হইতেই ভারতের গৌরবগরিমা, নিজত্ব, বিশেষত্ব, জাতিত্ব সমস্তই হারাইয়াছিল। তারপর, পরাধীন জাতির উদ্যম, উৎসাহ, স্পৃহা চিরদিন যেমন লোপ পাইয়া থাকে, তেমনই লুপ্ত হইয়াছিল।

অতিবড় দুঃখের কথা হইলেও সকলকেই আজ স্বীকার করিতে হইবে এত বড় দেশটায় দেশের নিজত্ব বলিয়া কোন আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায় না। কি শিল্পে, কি স্থাপত্যে—কিছুতেই বাঙ্গালীর 'নিজত্ব' ছাপ নাই। এই কলিকাতা সহরে ধনী, লক্ষপতি, রাজা মহারাজার গৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ গৃহস্থের কত প্রাসাদ, অট্টালিকা, বাড়ী ঘর ত আছে, কোনটাতেই কিন্তু দেশের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ধনী বলুন, নির্ধন বলুন, কাহার গৃহের আসবাব-পত্র এ দেশের রুচি অনুযায়ী নির্দ্মিত হয় না; সাজ-সজ্জাতেও নিজের দেশের আদর্শ রক্ষিত কোনমতেই বলা যায় না; ললিত-কলা, চারু শিল্প প্রভৃতি বিভাগেরও এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, সৌভাগ্যের বিষয় প্রবুদ্ধ অবনীন্দ্রনাথের মত একজন চিত্র-শিল্পী এই যুগে জন্মিয়া ভারতের এই লুপ্ত গরিমা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। অবনীন্দ্রনাথ, তাঁহার যন্ত্রশিষ্য নন্দলাল বসু প্রমুখ শিল্পীগণ ভারতীয় চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতিতেই চিত্র আঁকিতেছেন, হয়ত একদিন শীঘ্রই আসিবে যেদিন ভারতের নিজত্ব শিল্পকেই দেশের লোক একমাত্র অনুকরণীয় শিল্প বলিয়া মনে করিবেন। সে শুভদিনের সূচনা দেখা দিয়াছে। আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-মন্দির এ-দেশের স্থাপত্য-আদর্শে নির্ম্মিত হইয়াছে; বাঙ্গালী আজ বেশ-ভূষা, গৃহের সাজ-সরঞ্জামেও দেশের আদর্শ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় চেষ্টান্বিত হইয়াছে—মনে হয়, শুভ দিন সমাগত!

আমাদের নাট্যাগারেও কোন আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মত যখন যে-দিকে স্রোত, সেই দিকেই ছুটিতেছিল; বাধা পাইলে শুদ্ধ হইত, অনুকূল স্রোত মুখে ভাসিয়া যাইত। এই কারণেই নাট্যমঞ্চকে জাতির প্রতিষ্ঠান মধ্যে পরিগণিত করিয়া লইলেও রঙ্গমঞ্চ জাতির ইতিহাসে তেমন করিয়া ছাপ দিতে পারে নাই। না পারিবারই কথা, জাতির নিজস্ব ছাপ ইহাতে ছিল না। যাহাতে নিজস্ব ছাপ নাই, জাতি সামগ্রিক ভাবে জাতি তাহা গ্রহণ করিলেও তাহার গর্ব করিতে পারে না।

এই প্রথম দেখিলাম যে ভারতবর্ষীয় নাট্য শাস্ত্রানুমোদিত উপায়ে একটি নাট্যাগার বাঙ্গালায় স্থাপিত হইল। আমাদের ভারতীয় নাট্য শাস্ত্রে নাটকীয় অভিনয় সুসম্পন্ন ও সৌন্দর্য্য-পূর্ণ করিবার যে সকল উপদেশ পূর্ব-পুরুষগণ বিধি বদ্ধ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার কয়েকজন সুশিক্ষিত, শিল্পানুরাগী ব্যক্তি রঙ্গমঞ্চ পরিচালনে সে-সকল উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা স্টার থিয়েটারের কথা বলিতেছি। কি-কি বিষয়ে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পন্থা গ্রহণ করা হইয়াছে বলিবার পূর্বে ভারতে কখন্ ও কিরূপে নাট্যাগার ও নাটকের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার একটু আভাষ দেওয়া সঙ্গত মনে করি।

কোন এক সময়ে স্বর্গরাজ্যের অধিবাসীরা অত্যন্ত বিমর্ষ ও ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল; দেবরাজ ইন্দ্র প্রজাদের তদবস্থায় দেখিয়া ব্রহ্মার নিকটে ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা তখন চতুর্বেদের সহিত মিলাইয়া পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করিলেন। ঋগ্বেদ হইতে ভাষা, সামবেদ হইতে সঙ্গীত, যজুর্বেদ হইতে আবৃত্তি, অথর্ববেদ হইতে রস সংগৃহীত হয়। পঞ্চমবেদ রচিত হইলে, ভরত ব্রহ্মার নিকট হইতে নব বেদের শিক্ষাভার গ্রহণ করিলেন। এই পঞ্চমবেদের অন্য নাম—নাটক।

ভরত প্রস্তাবনা সঙ্গীতাদির পর নাটকের অভিনয় আরম্ভ করাইলেন। সেই নাটকে দেবাসুরের যুদ্ধ ও পরাজয় কাহিনী বিবৃত হইয়াছিল। দেবতারা এই নাটকের অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং রঙ্গমঞ্চের সাহায্যার্থ সকলেই কিছু-না-কিছু উপহার দিয়াছিলেন। কিন্তু অসুর-রা অত্যন্ত চটিয়া উঠিল! তাহারা দেখিল, দেবতারা যুদ্ধ-জয় করিয়াই ক্ষান্ত নহে, অসুরদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিবার, মর্ম্মপীড়া দিবার জন্যই এই এক নূতন উপসর্গ জুড়িয়াছে—অমনি তাহারা নানা-রকমে রঙ্গমঞ্চের বাধা বিঘ্ন ঘটাইতে লাগিল।

দেবরাজ ইন্দ্র অসুরদের আসুরিক অত্যাচারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; তিনি তাঁহার পতাকা-যষ্টি দ্বারা অসুরদের খুব উত্তম-মধ্যম দিয়া দিলেন। যে যষ্টি দ্বারা অসুরদের তিনি দমন করিয়াছিলেন, তখন হইতে সেই যষ্টির নাম হয়—জর্জর। সুতরাং, ইন্দ্রের এই অস্ত্রটিও তখন হইতে রঙ্গমঞ্চের নিদর্শন বলিয়া পরিচিত হয়।

সে-কালে রঙ্গমঞ্চে প্রত্যেক অভিনয়ের পূর্বে এই জর্জরের পূজা করার রীতি প্রচলিত ছিল। জর্জর সাধারণতঃ কাঠের অথবা বাঁশের তৈয়ার হইত। ইহার, ছয়টি গাঁট এবং গাঁটের মধ্যে আবার পাঁচটি ঘর (inter spaces) থাকিত; প্রত্যেক ঘর বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া দেবতাদের নামে উৎসৃষ্ট করা হইত। প্রথম ঘরটি শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত করা হইত, ব্রহ্মা এখানে অধিষ্ঠিত ছিলেন; দ্বিতীয়টি নীলবর্ণের বস্ত্রে,এবং বিষ্ণুর স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল; তৃতীয়টি পীতবর্ণের বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হইত, এখানে শিব বসিতেন; চতুর্থটি রক্তবর্ণে রঞ্জিত ও কার্ত্তিক ছিলেন এই স্থানের অধীশ্বর; পঞ্চমটি বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত করিয়া নাগকুলের আসন করিয়া দেওয়া হইত। এই জর্জর অধিকাংশস্থলেই বংশদণ্ডে নির্মিত হইত। ইহা হইতেও ভারতীয় নাট্যাগারের উদ্ভব ভারতের যে প্রদেশে বাঁশ প্রকৃত পরিমাণে জন্মিত, সেইখানেই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সে যাহা হউক, ভরত, ইন্দ্র কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেও, নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তিনি ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া নাটকাভিনয় যাহাতে নষ্ট না হয়, তাহাই করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা তখন স্বর্গের প্রসিদ্ধ স্থপতি বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া ইহা গড়িতে বলিলেন। বিশ্বকর্মা নাট্যাগার নির্মাণ করিলেন, ব্রহ্মা ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদের নাট্যাগারের ভিন্ন ভিন্ন অংশ রক্ষার ভার দিলেন। তিনি এই সময়ে অসুরদেরও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে দেব হউক বা অসুর হউক, কাহাকেও উৎপীড়ন করা, বা দুঃখ দেওয়া নাট্যাগারের উদ্দেশ্য নহে; ইহা সকলের আনন্দের ও শিক্ষার স্থান, ইহা দেবতারও জন্য নির্মিত হয় নাই, অসুরদের জন্যও হয় নাই, হইয়াছে-সকলের জন্যই!

সব-উল্লেখিত ইন্দ্রের থিয়েটারে ভারতের নাটকীয় নিদর্শন—জর্জর রক্ষিত হইয়াছে দেখিলাম। লাল মখ্‌মলের যে যবনিকা আছে, তাহার ঠিক পশ্চাতে দুইদিকে দুইটি অর্দ্ধচন্দ্র বংশদণ্ড স্থাপিত আছে, ইহাদের পাঁচটি গাঁটে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ও নাগ-মূর্ত্তি অঙ্কিত করা হইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় এই শিক্ষিত সম্প্রদায় অধুনা-লুপ্ত ভারতীয় নাট্যশিল্পের পুনরুদ্ধার করিয়া নাট্যাগারকে পূর্বের মত জাতির প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে পারিবেন।

সে-কালে নাটকাভিনয়কালে আরও কতকগুলি মাঙ্গলিক কর্মের অনুষ্ঠান করা হইত। সকলগুলির উল্লেখ করার আবশ্যকতা এখানে দেখি না; তবে যে-টি এ যুগের ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, সেইটিরই উল্লেখ আমরা করিতেছি। রীতি ছিল, নাটকাভিনয়ের পূর্বে ম্যানেজার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্ররোচনা আবৃত্তি করিতেন; এই প্ররোচনায় তিনি দর্শকদিগকে দেখিবার, শুনিবার আমন্ত্রণ দিতেন; প্রদেয় বিষয়টি গল্প কথায় বুঝাইয়া দিতেন। আমাদের মনে হয় এই প্রথাটি আজও আমাদের রঙ্গমঞ্চে প্রবর্তিত করা চলিতে পারে। ইহা-দ্বারা দর্শকগণের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শিত হয়; ইহাতে দর্শক ও নাট্যাগার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে একটা গাঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যাহা উভয় পক্ষেরই হিতকর।

তবে এই পূর্ব-কর্মগুলি দীর্ঘ বক্তৃতার দ্বারা পূর্ণ করা কখনই উচিৎ হইবে না, তাহাতে দর্শকের বিরক্তি উৎপাদিত হইবার সম্ভাবনা আছে। খুব সহজ ভাবে ও ছোট ছোট কথায় অল্প সময়ে এই কার্য্যটি সারিয়া লইলেই ভাল হইবে। যদি কেহ বলেন, রোজই এক-কথা বলিয়া লাভ কি হইবে? একই অভিনয় দর্শনে নিত্য নূতন দর্শক যদি জুটিতে পারে, এই সাময়িক প্ররোচনাই বা পুরাতন কেন হইবে, তাহা ত আমরা বুঝি না!

আমাদের বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চগুলি জাতিত্ব হারাইতে বসিয়াছিল; আবার লুপ্ত গরিমা ফিরিয়া পাইতেছে বলিয়াই মনে হইতেছে। ভারতীয় নাট্য কলাকে যাহাতে কেহ বৈদেশিক বলিয়া ভ্রম না করেন, তজ্জন্যই এই নিবন্ধের অবতারণা। ভারতীয় নাট্য-শিল্প যে ভারতবর্ষেরই নিজস্ব সম্পত্তি, ইহাতে বিদেশীর ছাপ কিছুমাত্র নাই, জাতীয় জাগরণের দিনে ইহা মনে করিতেও গর্ব আছে, সন্তোষ আছে।

---

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই লিখিত The Origin of Indian Drama হইতে কিছু সাহায্য পাইয়াছি,—লেখক।

লতা বিতান

বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট

মিঃ কলভিন কুলিজ।

আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট

পরলোকগত মিঃ হার্ডিং।

শাঁখারীটোলা পোষ্টাফিসের পোষ্ট মাষ্টার

স্বর্গীয় অমৃতলাল রায়।

কুমারী লণ্ডে।

১। অপরিচিতা কিশ্র অভিনেত্রী শ্রীমতী নাজিমোভা সম্প্রতি ছায়া-চিত্রের মূক অভিনয় ছাড়িয়া নাট্যজগৎ আলো-করিতেছেন। 'অ্যাগমার' নাটকে নাজিমোভা তাঁহার স্বামীর সঙ্গে অভিনয় করিতেছেন।

২। শ্রীমতী নাজিমোভা ও তাঁর স্বামী চার্লস ব্রাকেট। সৌন্দর্য্য ও অভিনয়ে সমখ্যাতি সম্পন্না নাজিমোভা নিউইয়র্ক প্লেহাউস থিয়েটারে স্বামীর সঙ্গে অভিনয় করিতেছেন।

নাজিমোভার অবসর চিন্তা।

ব্যালেট—নৃত্য।

প্যালেডিয়ামে নিনা ওয়ার বার্টন, এ্যালেটা ডেরিক ক্যাথলিন মেয়র, আলফ্রেড হেইন প্রভৃতি বিভিন্ন অভিনয়ে নৃত্য করিতেছেন।

বসন্ত-প্রভাতে।

(কুমারী হাসিরাশি দেবী অঙ্কিত)

প্রেম

[শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী বি-এস্-সি]

প্রত্যূষে উঠেই আমি সেদিন মমতাকে চিঠি লিখতে বসলাম। মুক্ত জানালার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে তখন প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীর তার মৃদু স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছিল আমার সবেমাত্র স্নাত দেহটার সর্ব্বাঙ্গে ; বাইরের সবুজ ক্ষেতের উপর তখন সদ্য উদিত তরুণ সূর্য্যের স্বর্ণ কিরণ রাশি ছড়িয়ে প'ড়েছিল। নব বসন্তের আগমনে সদ্য বিকশিত কচিপাতাগুলোর ফাঁক থেকে পাখীর দল তখন সানন্দে থেকে থেকে ভৈরবীর গান গাইতে সুরু ক'রেছে।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি—মমতাকে আমি ভালবাসি। মমতা ছিল আমার এক বন্ধুর ভগ্নী ; বয়স তা'র পোনের কি ষোল ; রং তার প্রায় ফরসা ; চোখ দুটি তা'র বেশ বড় বড় উজ্জ্বল, মুখ তা'র বেশ সুশ্রী। ঘোটের উপর যে টুকু রূপ থাকলে মেয়েদের সুশ্রী বলা যেতে পারে, তা' তা'র বোধ করি থাকেই ছিল।

সকাল বেলা চিঠি লিখতে ব'সে আমার যতখানি সময় নষ্ট হ'ল তা'তে বোধ হয় ঔপন্যাসিকদের একখানা ছোট উপন্যাস লেখা সম্পন্ন হয়। কিন্তু তবু আমার ৭।৮ খানা চিঠি লিখে পুনঃ পুনঃ ছিঁড়ে ফেলার পরও যখন আর নূতন ভাব মাথায় আসল না তখন অত্যন্ত সহজ সরল সাদা ভাষায় মাত্র কয়েক ছত্রে একখানা চিঠি লিখে ফেললাম এবং তা'তে সব চেয়ে বড় কথা হ'চ্ছে এই যে তা'কে আমি আসতে অনুরোধ ক'রেছি ; এবং দিন ও সময় নির্দ্ধারিত হ'ল—সেদিনই সন্ধ্যাবেলা।

যে বেহারা মমতার কাছে আমার চিঠি নিয়ে গেল সেই তা'র উত্তর নিয়ে এল ; সে উত্তরও অবশ্য মাত্র কয়েক ছত্রে—তা'তে না আছে ভাবুকতার লেশ, না আছে প্রেমের অভিব্যক্তি। তা'তে লেখা আছে এই —তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হ'য়েছি ;—আমি আজই সন্ধ্যেবেলা যা'ব।" সামান্য চিঠি হ'লেও এবং তাহাতে অলঙ্কার বানান ভুল থাকলেও সেই ক্ষুদ্র কয়েক ছত্রই যে আমার মনের কোণে একটা অসীম তৃপ্তি ও আনন্দের সৃষ্টি ক'রেছিল তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। তখন বুঝেছিলাম—প্রেমিকের কাছে, প্রেমিকার সামান্য হস্তলিপি টুকুই কত প্রীতিপ্রদ, কত তৃপ্তিদায়ী, কত আনন্দ ও পুলকের সৃষ্টি করে।

• • • •

যথারীতি মমতা সন্ধ্যার সময় আমার বাড়ী এসে উপস্থিত হ'ল বাড়ীতে সেদিন আমি ভিন্ন আর কেউ-ই উপস্থিত ছিল না। তাই আমাদের সে মধুর মিলনের মধ্যে কোনও বাধা বিপত্তি বা সঙ্কোচ অনুভব কর্ত্তে হয় নি ; সে মিলন ছিল আমার মুক্ত অবাধ, বিপত্তিহীন মধুর মিলন। কিন্তু এ মিলনে আমি যে সুখ, যে তৃপ্তি যে আনন্দ অনুভব ক'রেছিলাম, মমতা কি তা ক'র্ত্তে পেরেছিল! বয়সে সে যৌবনের রঙ্গিন দুয়ে প্রবেশ কর্লেও অন্তরখানি ছিল তার কচি কোমল—সারল্যে পরিপূর্ণ। আমি যখন তার সম্মুখে আমার যৌবনের উচ্ছ্বসিত প্রেমের স্রোতকে বাঁধ-ভাঙ্গা কল্লোলিত তরঙ্গিনীর মত মুক্ত ক'রে দিয়েছিলাম, সে তখন সহজ সরল ভাষায় এমন কতকগুলো অর্থহীন বাজে প্রশ্ন আরম্ভ কর্লে যে সত্য সত্যই আমি মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ ও বিরক্ত হ'য়ে পড়েছিলাম। আমি যখন তাকে বললাম, "মমতা আমি তোমায় প্রাণের চেয়ে ভালবাসি"—সে তখন তা'র উত্তরে সহজভাবে আমায় বলতে লাগল—আমার ঘরে কি কি পুস্তক আছে, কি কি খেলার জিনিষ আছে ইত্যাদি। আমার গভীর প্রেম তার রক্তিম গণ্ডে অঙ্কিত ক'রে দেবার জন্য আমার তৃষ্ণার্ত্ত অধর উদ্যত আগ্রহে তা'র সুন্দর মুখখানির দিকে অগ্রসর হ'য়েছিল, সে তখন তা'র কচি কচি হাত দুখানির ব্যবধান তুলে আমার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষাকে একটা চরম ব্যর্থতায় পরিণত ক'রে ব'লে—আ, ছি তুমি যেন কি! আচ্ছা বলনা ঐ ছবি

কোথা থেকে পেয়েছ? বাঃ চমৎকার ছবিখানা ত।" সঙ্গে সঙ্গে সে সজোরে আমার বক্ষ নিবিড় আলিঙ্গনের পাশ ছিন্ন ক'রে স্বাধীন বন্য মৃগ শিশুটির মতই সেই ছবিখানির দিকে ছুটে গিয়ে একদৃষ্টে তা'র পানে সাগ্রহে চেয়ে রইল। আমার সমস্ত কার্য্যকলাপের মধ্যে সে আনন্দের চেয়ে বিস্ময়টাই অধিক অনুভব কর্ত্তো।

আগে ভাবতাম—প্রেমিকার কাছ থেকে প্রেমিক তা'র প্রেমের প্রতিদান না পেলে ক্ষুব্ধ হয়, অভিমান করে এমনি আরও কত কি। প্রেমে পড়ার পূর্ব্বে আমিও তাই মনে কর্ত্তাম বটে। কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে আমার সে সমস্ত ভাবই নিঃশব্দে মুহূর্ত্তে কর্পূরের মত অদৃশ্য হ'য়ে গেল। তা'র রক্তিম অধরের সামান্য মৃদু হাসিটুকু আমার সমস্ত অভিমানের বোঝা মুক্ত ক'রে দিত,—তা'র ক্ষণিকের স্পর্শ আমার সমস্ত ক্ষোভ কেমন যেন এক যাদুমন্ত্রেরবলে ভুলিয়ে দিত; তা'র বাঁশীর মত মধুর কণ্ঠস্বর আমার প্রাণের তারে কি এক অনুভূত তান জাগিয়ে তুল্‌তো যা' আমি সময় সময় নিজেই সম্যক বুঝে উঠতে পার্ত্তাম না। জানিনা এ সমস্তই প্রেমের অদ্ভুত অদৃশ্য শক্তির পরিচয় কিনা।

মমতা লেখা পড়া জান্‌তো খুব সামান্যই; আর অধিক জান্‌তো না ব'লেই সে তার সেই সামান্য জ্ঞান টুকুকেই সর্ব্বদা সকলের সাম্‌নে প্রকাশ ক'রে দিতে গিয়ে অনেক দিন আমার অনেক আবশ্যকীয় এবং মূল্যবান বই ও কাগজের পৃষ্ঠাগুলিকে অস্পষ্ট হস্ত লিপিতে ভরিয়ে তুলেছে। তা'র জন্য আমি যদি কোন দিন তিরস্কার কর্ত্তে গিয়েছি, তবে তা'র উত্তরে সে শুধু তা'র সারল্যে ঢল ঢল বড় বড় চোখ দুটীর অর্থহীন বিস্মিত দৃষ্টিখানি আমার মুখের উপর তুলে ধরে শুধু একটু হেসেছে মাত্র; ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না তা'র এ অজ্ঞান অত্যাচারে আমি সত্য সত্যই বিরক্ত হ'তাম, কি মনে মনে পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌তাম।

• • • • •

সৌভাগ্যক্রমে এবং প্রজাপতির অসীম অনুগ্রহে মমতা আজ আমার পত্নী, হৃদয়রাণী—গৃহিনী। কিন্তু সতের বৎসর বয়সে পদার্পণ ক'রেও তা'র স্বভাবের ত' একচুলও পরিবর্ত্তন হয় নি। তেমনি চপল মৃগশাবকের মতই সে চঞ্চল চরণে আমার গৃহের সর্ব্বত্র ছুটে বেড়ায়; লজ্জার বাঁধন জানে না—লৌকিকতার অর্থ বোঝে না, মান অপমানের ভয় করে না—প্রাণ তা'র যখন যা' চায় আমার বিনা অনুমতিতেই সে তাই করে বসে। আমি তার অপরাধের জন্য তিরস্কার ক'র্লে সে তিরস্কারের বাক্য-বাণগুলি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'য়েই তা'র এক কাণ দিয়ে প্রবেশ ক'রে নির্ব্বিবাদে আর এক কাণ দিয়ে সেই মুহূর্ত্তেই বেরিয়ে যায়। মুহূর্ত্তের জন্যও তার মনের মধ্যে কোনও আঘাতের চিহ্ন অঙ্কিত কর্‌তে পারে না।

শিলাবৃষ্টির সময় সে আমার ছোট ভাই বোনগুলির সঙ্গে ছোট দিয়ে দিল কুড়িয়ে ছুটে বেড়ায়—দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রে সে উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে "কুমীর কুমীর" খেলা করে—বিকেলে বাগানের মধ্যে আমাদের পোষা হরিণটার সঙ্গে সে পাল্লা দিয়ে ছোটে এবং পরাজিত হ'য়ে যখন অত্যন্ত পরিশ্রমে হাঁপিয়ে ওঠে তখন সে ক্ষুদ্র শিশুটির মত ধূলিমলিন বাঁধান ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ে।

পাড়ার লোক তা'র এই অসঙ্কুচ এবং অসংযত বয়সের অনুপযোগী ছেলেমানুষী দেখে আমার কাছে আড়ালে অভিযোগ ক'র্লে আমি যখন সে বিষয়ে তা'কে জানিয়ে শাসন ক'র্ত্তে যাই—সে অত্যন্ত নির্ব্বিকার ভাবে জবাব দেয়—বল্‌বেনা—যা'র যা' ইচ্ছে হয়! আমার শোন্‌বার জন্যে তারি বার প'ড়ে গেছে।" আমি বুঝ্‌তাম তা'র সেই কচি সবুজ নরম মনটাকে—শুধু শাসন, চোখ-রাঙানি ও কড়া তিরস্কারের দ্বারা পাকিয়ে শুষ্ক কঠোর ক'রে তোলার সাধ্য মানুষের নেই। মানুষ ভুলে যায় যে তা'র চেয়ে প্রকৃতির শক্তি অনেক প্রবল!

একদিন অপরাহ্নে আমি সবেমাত্র আপিস থেকে ফিরে এসেছি; মমতা একটা কাঁচের রেকাবীতে ক'রে আমার জন্য খাবার ও চা নিয়ে ঘরে ঢুকেলো। আস্তে আস্তে সেগুলিকে টেবিলের উপর রেখে পাশে একটা চেয়ার টেনে সে যেমন বস্‌তে যাবে অম্‌নি ধাক্কা লেগে টেবিলটা নড়ে উঠ্‌তেই খাবারের রেকাবী ও চায়ের পেয়ালা সশব্দে মাটিতে পড়ে চূর্ণ হয়ে গেল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ও

এমন সুখার আমার সমস্ত শরীর উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছিল; তার উপর মমতার এই চপলতা ও অসাবধানতা দেখে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠ্‌লো। রুদ্ধকণ্ঠে ব'লে উঠলাম "ছিঃ তুমি কি চিরকালই এমনি অকর্ম্মণ্য থাক্‌বে মমতা, জ্ঞান কি কোনদিনই হবে না তোমার? লেখা-পড়ায় ত একেবারে পণ্ডিত! কাজে কর্ম্মেও এমনি! কোন গুণটা আছে তোমার বলত শুনি! একেবারে দিন দিন যেন বিবি হ'য়ে উঠছো, দেখছি! চেয়ে দেখলাম মমতার চোখদুটি অল্প সিক্ত হ'য়ে উঠেছে। আমার তিরস্কারে মমতার চোখে আজ এই প্রথম অশ্রুর আবির্ভাব দেখ্‌লাম। তার পরদিন থেকে দেখলাম মমতা একখানা ঈশ্বরচন্দ্রের তৃতীয় ভাগ নিয়ে পুনরায় পড়া আরম্ভ ক'রেছে। নূতন খাতা বেঁধে হাতের লেখা সুরু ক'রেছে—কাজ কর্ম্মও শিখতে আরম্ভ করেছে! কিন্তু সমস্ত কাজেই যেন তার কেমন অন্যমনস্কতা, অসাবধানতা। যেন কিছুতেই তার একটা আন্তরিকতা নেই।

মমতা সহস্র অপরাধ করলেও আমি যে আমার মনের সম্পূর্ণ অগোচরেই তা'কে কখন ক্ষমা করে ফেলতাম, তার সমস্ত অক্ষমতা, সমস্ত অজ্ঞতা যে কোন মায়া মন্ত্রের বলে আমি বিস্মৃত হ'তাম—তা আমি আজও বুঝে উঠ্‌তে পারি না। জানিনা বাস্তবিক আমি তা'র মত স্ত্রী পেয়ে সুখী হ'য়েছিলাম, কি অসুখী হ'য়ে ছিলাম, আনন্দ পেয়েছিলাম, কি দুঃখ পেয়েছিলাম—তবে এইটুকু আমি স্পষ্ট ক'রে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে ব'লতে পারি যে হাজার অপরাধী, হাজার মূর্খ, হাজার অজ্ঞ হ'লেও মমতার ক্ষণিকের বিরহেই আমি কেমন উন্মনা, কেমন ব্যথিত হ'য়ে উঠ্‌তাম! আমার মনে হয় এর একমাত্র কারণ "প্রেম" আর সত্যই যদি প্রেমই এর কারণ হয় তবে আমি মুক্ত কণ্ঠে ব'ল্‌বো জগতে প্রেমের বাড়া আর কিছুই নেই।"

শেফবের অনুসরণে।

কামনার ব্যর্থতা

[শ্রীলীলা দেবী]

মন্থন করা সার হ'ল শুধু
নবনী উঠিল কই?
বন্ধন বৃথা বন্দিত জন
তৃপ্ত না হওয়া বই।
মন্ধার গিরি আলোড়ন শুধু
অন্তরের হ'ল সার,
বিদ্যাই মিছা হ'ল না বিনয়
ভ্রম শুধু অনিবার।
তীর্থের ঘোরা সার শুধু ক্লেশ
মিলিল না তো খোঁ হরি!
যোগের কৃচ্ছ্র সাধনাই সার
ব্যর্থ কামনা করি!

গ্রীষ্মের দিনে

স্নানের আরাম পাইতে, শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে, আমাদের আইডিয়াল্ ষ্টীলেরিন্ এবং মেসিনে প্রস্তুত :—চন্দন, রয়েলকুল মাখ ও ভায়লেট সাবান ব্যবহার করুন।

ইণ্ডিয়ান্ সোপ কোম্পানী

৬৪।১এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন ২৪২৬

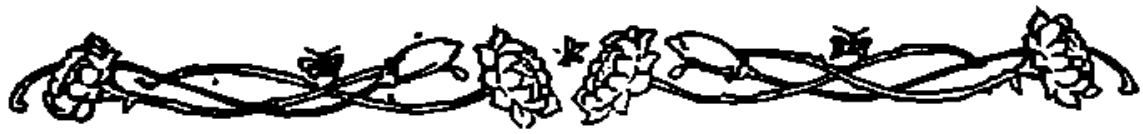

গ্রহের ফাঁদ

(উপন্যাস)

[শ্রীসরলীবালা বসু]

৯

"প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্ত যাবতীয় পাপ হইতে আমাদিগকে শুচি করে, তিনি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, এবং মানুষ তাঁহার মধ্য দিয়া পরমেশ্বরের নিকট পৌঁছিবে।"

পুস্তক পাঠ বন্ধ করিয়া মিস্ ফ্লোরা শ্রোত্রীর দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "পার্ব্বতী তুমি বড় অমনোযোগী আছ, আমি এতোক্ষণ প্রভুর প্রেমের কথা তোমার নিকট কহিয়া শুনাইতেছি, তুমি শুনিতেছ না।" সলজ্জভাবে পার্ব্বতী মৃদু হাসিয়া মুখ নত করিল, আপনার অমনোযোগীতার অভিযোগ সে অস্বীকার করিতে পারিল না। অলক্ষিতে তাহার চক্ষু দু'টি ছল ছল করিয়া উঠিল। মুখখানি মেঘাবৃত আকাশের মত ম্লান হইয়া গেল।

মিস ফ্লোরা পুস্তক বন্ধ করিয়া আবার কহিলেন "পার্ব্বতী, তুমি বড় দুঃখী আছ, আমি বুঝিতেছি তোমার মৃত পিতামাতার জন্য তোমার অন্তঃকরণ খুব কাঁদিতেছে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ, ইহার কোনো প্রতিকার নাই। একমাত্র যীশুর প্রেমে তোমার হৃদয় শান্ত হইতে পারে, প্রিয় ভগিনী,তুমি সর্ব্বদা প্রভু যীশুকে স্মরণ কর।" পার্ব্বতী এবারেও কথা কহিল না, মিস ফ্লোরা একখানি প্রভুর প্রেমের কাহিনীসম্বলিত পুস্তক পার্ব্বতীর হাতে দিয়া কহিলেন—

"তোমার দুর্ভাগ্যের জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত, প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, তুমি সত্য পথ দেখিতে পাও, এই বইখানি বিশ্বাসের সহিত তুমি পাঠ করিও, পরশু আমি আবার আসিব।"

মেম উঠিয়া দাঁড়াইলেন, পার্ব্বতীও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল "আবার আসতে ভুলবেন না।"

কাতরতা অনুনয়বাণী মেমের হৃদয় স্পর্শ করিল, মেম সাদরে পার্ব্বতীর চিবুক ধরিয়া মমতা ভরা কণ্ঠে কহিলেন, "নিশ্চয় আসিব। আচ্ছা ভগ্নী, একলা থাকিতে নিশ্চয় তোমার ভয় করে, তুমি তোমার স্বামীর নিকট চলিয়া যাও না কেন?"

পার্ব্বতী স্বামীর প্রসঙ্গ উঠিলেই চুপ করিয়া যায়, যেহেতু এ প্রসঙ্গের উত্তর দিবার মতো সম্বল তার কিছুই নাই, মেম ভূষণের পিসীর নিকট যাহা কিছু শুনিয়াছেন তাহাতেই বুঝিয়াছেন এই বালিকার স্বামী খুব সম্ভব ইহাকে লইতে ইচ্ছুক নয়, মিস ফ্লোরা আজ দীর্ঘ পনেরো বৎসরকাল মিশন বিভাগে বাস করিতেছেন, গ্রামে গ্রামে দেশীয় প্রচারিকাদিগের কর্ম্মক্ষেত্রগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিদর্শন করা উপলক্ষে তিনি অনেক হিন্দুপরিবারে যাতায়াত করিয়াছেন এবং বহু বিপন্না কন্যা ও বধূকেও তিনি এই সূত্রে আপনার ধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছেন; সুতরাং হিন্দুর পারিবারিক ইতিহাসে তাঁহার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। এবারে এ গ্রাম পরিদর্শন করিতে আসিয়া অন্ধকার হইতে আলোকে লইবার মতো পাত্রী তিনি একমাত্র পার্ব্বতীকেই খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, সেজন্য কথাগত তাহার নিকটে আসিয়া প্রভুর প্রেমের কাহিনী শুনাইয়া যাইতে তাঁহার ক্লান্তি নাই, পার্ব্বতীও বেশ সহিষ্ণু শ্রোতা, সুতরাং মিস ফ্লোরার উৎসাহ প্রদীপে তৈলসেক হইতেছে ভালোই।

পার্ব্বতীকে নিরুত্তর দেখিয়া মেম কহিলেন—

"তোমার স্বামী—নিষ্ঠুর আছে,উহার অন্তঃকরণ নাই; এইরূপ স্বামীর প্রতি তুমি আদৌ নির্ভর করিতে পার না, আমার কথা তোমার কাণে কঠিন লাগিতেছে, কিন্তু কি করিব, আমি সত্য কথা বলিতেছি। আজ শুভ্রবাই, তুমি প্রভুর প্রেমের বিষয় চিন্তা করিও, তিনিই তোমায় শান্তি দিবেন। শান্তি বাচনান্তে মেম চলিয়া গেলেন। পার্ব্বতী আবার ভাঙ্গা বারান্দায় বসিয়া পড়িল। দীর্ঘ ঘাটীর

গৃহ বহুকাল সংস্কার অভাবে জরাজীর্ণ, অতি বর্ষার প্লাবনে আঙিনার প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে, বেচারাম বাবুদের পড়ো বারেন্দাটি সেখান হইতে স্পষ্ট চোখে পড়ে, এবং সেই পড়ো বারেন্দাটি এখন পাড়ার চ্যাংড়া ছোকরাদের পাশ তামাক খাইবার সিদ্ধি খাইয়া গান গাহিবার আড্ডা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য যোগমায়া যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততোদিন ঐ পড়ো বারেন্দাটি শৃগাল কুক্কুরদেরই একচেটিয়া আস্তানা ছিল। মা মরিবার পর পার্ব্বতী বড়ই বিপন্না হইয়া পড়িয়াছে অথচ পাড়ার সহানুভূতিকারিণীদিগের প্রতিও সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই তাই নিজের এই ভাঙা কুটীরকেই আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে একমাত্র বৃদ্ধা ভুবনের পিসীর সাহায্যে। বিজয়ের মা, দীনেশের পিসী, প্রভৃতি পল্লীমহিলারা পার্ব্বতীকে যতদিন স্বামী না লইয়া যান তাহাদিগের অন্ন আত্মসাৎ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু উঁহাদের প্রত্যেকেরই আত্মীয় যে সব যুবক বা পুরুষ আছেন, তাঁহাদের চাহনি দেখিয়া পার্ব্বতী এতো ভয় পাইয়াছিল যে ওসব বাড়ীতে আশ্রয় লইতে তার এতোটুকু সাহস কুলাইল না। অথচ তার এই দেমাকের মূলেশনিশ্চয়ই একটা গুপ্ত ইতিহাস আছে পল্লী ললনারা সেইদিনই তাহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং পড়ো বারেন্দার আড্ডায় সেদিন "ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে"; "সুখে থাক বিধুমুখী, আমি তোমার সুখের সুখী" প্রভৃতি টপ্পাগুলি খুব জোর গলায় গীত হইয়াছিল, আর অভাগিনী পার্ব্বতীর বুকের ভিতরে দুরু দুরু কাঁপনও বাড়িয়া গিয়াছিল।

ভুবনের পিসী নিজের ঘরে রান্নার কাজকর্ম সারিয়া সকাল বিকাল পার্ব্বতীর কাছে দুইবার আসিয়া বসিত; সমস্ত রাত্রি তাহাকে আগলাইয়া পড়িয়া থাকিত, পাড়াপ্রতিবাসীরা তাহাকে যে ধান ভানিতে দেয় তাহা সে পার্ব্বতীর ঢেঁকিতেই ভানিয়া লইয়া যাইত, যেহেতু ইহাতে পার্ব্বতী তাহার পারিশ্রমিক পাইতে পারিত, কিন্তু এই একটানা ভাবেই এই তরুণী নারীর চিরদিন যে কিছু চলিবে না তাহা সে বেশ জানে, জানে বলিয়াই সে পার্ব্বতীর ভবিষ্যৎ ভাবনায় চঞ্চল হয়, আর তার এই চঞ্চলতা পার্ব্বতীর হিংসেহারা দৃষ্টিতে তবু এতোটুকু স্নেহামৃত মাখাইয়া দেয়, যার মঙ্গলামঙ্গল ভাবিবার জন্য দুনিয়ায় আজ কেহ নাই এই দরিদ্র দীনহীন নারী যে তাহারই জন্য স্নেহকাতর হৃদয় লইয়া তাহারি মলিন মুখখানির পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, একি কম কথা?

সুখেরই দিন হউক, দুঃখেরই দিন হউক, দিনের গতি ক্ষণেকের জন্যও স্তব্ধ হয় না, কাল কাহারও মুখাপেক্ষী নয়, পার্ব্বতীরও দুর্ব্বহ জীবনের দুঃসহ দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছে তবে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সেও দিনের পর দিন বড়ই উন্মনা হইয়া উঠিতেছে। স্বামীর আশা এখনো তার কোমল বুকখানি জুড়িয়া আছে, সেই এক রাত্রির জন্য দেখা—সে দেখার কাহিনী, সে প্রতিমার স্মৃতি এখনো তার তরুণ চিত্তখানি ভরিয়া আছে, প্রতি উষার উন্মেষ এখনো তার কাছে সেই আকাঙ্ক্ষিতের মিলন আশার বাণী বহিয়া আনে, এমন কি দিন রাত্রির প্রতি মুহূর্ত্তই প্রিয় সমাগম সম্ভাবনায় ভরিয়া তার কাছে দেখা দেয়, বর্ত্তমান অতীতে ভরিয়া পড়ে। অনাগত ভবিষ্যৎ আশার রঙে রঙিন হইয়া আবার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, এমনি মহাবিষ ভাবে পার্ব্বতীর দিনগুলি একে একে কাটিয়া চলিতেছে, তরুণ হৃদয় সহজে কি ভাঙিয়া পড়িতে চায়, না সহজে সে সংসারের নিষ্ঠুর আঘাতকে স্বীকার করে?

৯

বেলা বারোটার পর দুটী ভাতেভাত মুখে দিয়া দুঃস্বার্থ পার্ব্বতী এক ঘটী জল গড়াইবার জন্য কলসীর কাছে গিয়া দেখিল, কলসিটি কোনো রকমে গড়াইয়া পড়িয়া সব জল পড়িয়া গিয়াছে; অগত্যা পুকুর হইতে এক কলসী জল না আনিলে আর উপায় নাই। দুপুরবেলা পুকুরের পথ একটু বেশী রকম নির্জ্জন হইয়া পড়ে,সেজন্য পার্ব্বতী এসময় ঘাটে পথে বাহির হইত না, তাহা ছাড়া রান্না খাওয়ার জন্য যে দু তিন কলসী জল তার আবশ্যক হইত তাহা সে ভুবনের পিসী বাড়ীতে থাকিতে থাকিতেই আনিয়া লইত।

আজ কিন্তু ব্যাপার অন্য রকম দাঁড়াইয়াছে, পার্ব্বতী একবার ভাবিল, এখন না হয় জল নাই আনিল, বৈকালে ভুবনের পিসী আসিলেই আনিবে, আবার ভাবিল, এমনি

কি কথা যে দরকার হইলে এক কলসী জল সে আনিতে পারিবে না? সে চোর নয়, বা কিছুই অন্যায় কাজ করিতে যাইতেছে না, পুকুর হইতে নিজের তৃষ্ণার জন্য এক কলসী জল আনিতে যাইবে ইহার জন্য আবার এতো অগ্রপশ্চাৎ ভাবনা কিসের? আজ যেন আসিবার দিন,তিনি আসিলেই জল চাহিয়া পান করেন, আজ সে কোন মুখে তাঁহাকে বলিবে যে ঘরে এক গ্লাস জল নাই? পার্ব্বতী আর ভাবিল না, কলসী উঠাইয়া লইয়া তখনি ঘাটের পথে যাত্রা করিল।

কিন্তু যাহা ভয় করিয়াছিল তাহাই ঘটিল। প্রথমে এক-জন, তারপর আর একজন, হুকাহোয়ীর ন্যায় এমন কাশি আরম্ভ করিল যে শুনিলেই মনে হয় যে হতভাগারা কাশির ধমকে নাড়ী ছিঁড়িয়া না মরে। পার্ব্বতী সেদিকে না তাকাইয়া সরাসর ঘাটের পথে চলিয়া চলিল, তখন আরম্ভ হইল হাঁচি—আর সঙ্গে সঙ্গে কে বলিয়া উঠিল "হাঁচি, টিক্‌টিকী, বাধা, যে না মানে সে গাধা ওগো খেয়ে যাও মো, হোঁচট খেয়ে মরবে, নয় তো বুলগাছে খাঁচল বাধবে।"

পার্ব্বতী ভয় পাইল না, ঘাটে নামিয়া জল ভরিয়া সে ফিরিয়া আসিল, তখন ছোকরারা গান আরম্ভ করিয়াছে, কেহ বা কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গী করিয়া পার্ব্বতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেছে, তার মধ্যে সাহসী একজন তড়াক করিয়া এক লাফে পার্ব্বতীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পার্ব্বতী সত্য সত্যই এবার ভয় পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল বটে, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য,—তখনি দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—

"রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াও বলচি, নইলে চেঁচিয়ে এখুনি লোক জাকুব।" ছোকরা সে কথা শুনিয়া ভয় পাইল না বটে তবে একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া দুই পাটি দাঁত বাহির করিয়া রসিকতার চোটায় কহিল "সুন্দরী আমি ভিখারী তোমার প্রেমেরি!"

পার্ব্বতী চলিয়া আসিল, পিছনে শিয়াল কুকুরের হল্লার মতো হতভাগাদের কুৎসিৎ বিদ্রূপ ও হাসির লহরা বিষাক্ত তীরের ন্যায় পার্ব্বতীর দুই কাণ ভেদ করিয়া বিঁধিতে লাগিল, কোনো রকমে আঙিনায় ঢুকিয়া পড়িয়া কলসীটি নামাইয়া রাখিয়াই সে শ্রান্ত ভাবে মাটীতে লুটাইয়া পড়িল, আর তার সংযম রহিল না; অসহ্য গ্লানি ভরে দুই চক্ষু দিয়া তার জল ধারা বহিল, মন তার গুমরিয়া কহিতে লাগিল—"ওগো স্বামী, ওগো আমার ইহকাল পরকালের দেবতা, শুনেছি, নারীর স্বামী যদি একমাত্র তুমি, তুমিই তার লজ্জানিবারণ, তুমিই তার অপমানের পরিত্রাতা, আমার জ্ঞান হতে পর্য্যন্ত শাস্ত্রের এই আদেশ শুনেছি, মার মুখেও এই শিক্ষা পেয়ে এসেছি, আর প্রাণ দিয়েই তা বিশ্বাস করে আসছি, এ বিশ্বাসের কি কোনো সফলতা নেই গো? হে আমার দেবতা, তুমি পাষাণ নও, তবে তুমি উত্তর দাও না কেন? আর কতকাল নীরব থাকবে তুমি? ডেকে নাও প্রভু, তোমার দাসী, তোমার সেবিকারে তোমার কাছে ডেকে নাও।" কিছুক্ষণ পরে প্রার্থনায় শান্তি আসিল, অবিরাম ক্রন্দনে ক্লান্তি জন্মিল, তখন বিপন্না, নারী অবসাদ গ্রস্ত প্রাণে আপনার ভবিষ্যৎ জীবনা ভাবিতে চাহিল, পার্ব্বতী যখনি চোখ বুজিয়া নিজের ভবিষ্যৎকে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে গভীর অন্ধকারের মধ্যে তখনি সে একটি অস্পষ্ট জ্যোতির আভাস লক্ষ্য করিতে পারিয়াছে, তার তরুণ হৃদয়ের আশাই সেই জ্যোতিঃর প্রতিরূপ, আজ সে চক্ষু মুদিয়া যখন আবার একবার আপনার অনাগত ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ দেখিবার চেষ্টা করিল, দেখিল—কালো, সব কালো, সেই অবিচ্ছিন্ন নিবিড় কালো অন্ধকারের বুক চিরিয়া কোথাও এতোটুকু আলোর আভাস জাগিয়া নাই; শিহরিয়া পার্ব্বতী স্তম্ভিতের মতো পড়িয়া রহিল। এই সময় ফুলের পিসী বাড়ী ঢুকিয়া পার্ব্বতীকে সেই অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—

"ওমা একি কাণ্ড, মাটীতে পড়ে আছিস কেন গা দিদি, অসুখ করেচে না কি?" পার্ব্বতীর অশ্রুধারা থামিয়াছিল, এখন ফুলের পিসীর স্নেহ সম্ভাষণে আবার তাহা নূতন করিয়া পড়িতে সুরু হইল। ফুলের পিসী কাছে আসিয়া পার্ব্বতীর অশ্রু ধৌত মুখ খানি তুলিয়া ধরিয়া স্নেহ ছল ছল কণ্ঠে কহিল, "কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ লাল করেচিস্ কিসের লেগে গো, জামাইবাবুর চিঠি

পত্তর কিছু এলো না কি? কি হয়েচে বল না শুনি?"

পার্ব্বতী আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, "এমন করে একলা ঘরে আমি আর কতদিন থাকব পিসী?" ভূষণের পিসী মুখে কহিল বটে—নিজের ঘরে থাকবি তা কার কি, কার পত্তরে খাচ্ছিস না, কার পয়সায় পরচিস্ না তবে কিসের ভয়?" মনে মনে কিন্তু কহিল—সে কি আর আমি ভাবতে কসুর করচি, তবে ভেবে যে কিছু ঠিক্ পাচ্চি না দিদি! এই ছুপ্!" পার্ব্বতী তখন তার জল আনিতে যাইবার কথা এবং প্রতিবাসী যুবকদের রসালাপ কাহিনী ভাঙিয়া বলিল, ভূষণের পিসী তৎক্ষণাৎ সেই পোড়ো বাড়ীর বারেন্দার দিকে লক্ষ্য করিয়া "গত্তর খেকো" রক্ষা রোগীদের চতুর্দ্দশ পুরুষের পর্য্যন্ত উদ্দেশ করিয়া এমন সব কটূক্তি সুরু করিল যে সে গুলির আকার থাকিলে তৎক্ষণাৎ যাহাদের উদ্দেশে বর্ষিত হইতেছে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই, অপর পক্ষ হইতে কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না, ভূষণের পিসী সাহস পাইয়া সহজে কহিল—

"দাঁড়াও তো যাচ্ছি—এখুনি দত্তদের বাড়ী, তাঁর বোনপোটিতো হচ্ছে সবার অন্ধ, আর সিংহিদের বাড়ীর মনে ছোঁড়া, এই দুটোকে জব্দ কত্তে পারে—"

পার্ব্বতী এতোক্ষণে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইতে পারিয়াছিল, সে সমনো মুখ ভূষণের পিসীর হাত ধরিয়া টান দিয়া কহিল—"যেয়ো না পিসী, ওঁদিকে বল্‌লে কোন ফল হবে না; সেবারে বল্‌তে গিয়ে শোনোনি কি বল্‌লেন? বল্‌লেন যেটা ছেলেদের অমন একটু এদিক ওদিক চাওয়া হবেই মেয়েতে যদি রা না কাড়ে তো কার সাধ্যি কাছে এসোয়?"

"ব্যাটাদের চাউনী মারের চোটে ঘুচিয়ে দিতে হয়", বলিয়া ভূষণের পিসী ফিরিয়া দাঁড়াইল। যে বাউলার বা, জেঠাইয়া, সিদীমার দল স্বচক্ষে দেখিলেও সন্তানদের দোষ সস্নেহে উপেক্ষা করিয়া "বয়স দোষ" বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাঁহাদের কাছে অভিযোগ করিতে যাইলে হিতে যে বিপরীত হওয়াই সম্ভব তাহা সে না মানিয়া পারিল না। এই সময় ভাল আছে পার্ব্বতী!—বলিতে বলিতে একটি ছোট ব্যাগ ও একটি ছোট ছাতা হাতে লইয়া বেব আসিয়া বাড়ীতে ঢুকিলেন। "ভাল আর আমার ছাই, ওর তো আর মরণ নাই, না আমারি মরণ আছে, তাই ওর এই লাঞ্ছনা দেখতে হচ্ছে—বলিয়া ভূষণের পিসী বেবকে সব কথা শুনাইয়া দিল, তারপর পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া কহিল "বেব সাহেব এসে বসেচেন, এখন তো আর ভয় নেই, তুই একটু থাক্ দিদি, আমি একবার ঘরকে হয়ে আসি আর বউটাকে কাজের বরাত দিয়ে আসি আজ আর রাতকে ভাত খেতে যাব না—এই ঠেঁয়েই থাকব ভাত সে ঘরে দিয়ে যাবে।"

পার্ব্বতী ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইতেই ভূষণের পিসী চলিয়া গেল, মিস ফ্লোরা সযত্নে পার্ব্বতীর হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—এমন অসহায় ভাবে তুমি কতকাল আর থাকিবে পার্ব্বতী, যে সকল 'বিষ্টু' তোর পিছনে উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে উহাদিগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এখনি তোমার কোনো নিরাপদ স্থানে যাওয়া আবশ্যক। তুমি আমার সহিত আসিবে কি? আমি তোমায় ভগ্নী স্নেহে সকল রকম বিপদ ও অন্যায় হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব—প্রভু যীশু আমায় বল দিবেন।" বলিয়া স্নেহপূর্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। পার্ব্বতী সহসা এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবে? ধর্ম্ম সমাজ, সব কিছুতে জলাঞ্জলি দিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের আশ্রয়ে তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, এ কি ভয়ঙ্কর কথা এ যে কল্পনার অতীত। উচ্চ ব্রাহ্মণ কন্যা সে প্রাণ দিয়া সে আপনার বংশ গৌরব ও সনাতন আচার রীতি এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান গুলিকে মানিয়া যাবে আজ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এ সমস্তকেই জলাঞ্জলি দিয়া কেমন করিয়া সে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আশ্রয় লয়? অদৃষ্টে কি তার অবশেষে ইহাই ছিল? না, না, কখনই সে খ্রীষ্টান হইয়া আপনার ধর্ম্মে পতিতা হইবে না, পিতৃ পিতামহের ভাঙা বাস্তু ভিটাটিকে সে যেমন দেহ মন দিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া পড়িয়া আছে, আপনার ধর্ম্মকেও সে আপন জীবনের চরম দুর্দ্দিনেও তেমনি করিয়া আঁকড়াইয়া রহিবে, ধর্ম্মই তাহাকে রক্ষা করিবেন।

কিন্তু কিন্তু—পার্ব্বতীর মনে পড়িল দুর্বৃত্ত যুবকদের

সেই লালসা বর্ষী দৃষ্টি—কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গী আর অজস্র রসালাপ—অভাগিনী, অসহায়া নারী তো প্রাণের সহিত আপনার ধর্ম্মে বিশ্বাসবতী; সমাজকে সে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি জ্ঞানে বিশ্বাস করে কিন্তু হায়, ইহারা তাহাকে অজ্ঞ দানবের পাশব অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতেছে কই? কোনো দিক হইতেও তো এক আমার জন্য মাতৈঃ বাণী তার কাণে আসিয়া পৌঁছিতেছে না, তবে? কান্না, কান্না, কান্না, কান্নার কি আর শেষ নাই গো, দুঃখিনী বালিকা কি এসংসারে শুধু অশ্রুজলই পাথেয় লইয়া আসিয়াছে? দেবতা কি আর তাহাকে কোন দান দেন নাই? অসার অশ্রু ভাণ্ডারই কি তার একমাত্র সম্বল? আবার পার্ব্বতী কাঁদিতে লাগিল, সেম বিচলিত কণ্ঠে কহিলেন "কেঁদো না ভগ্নী, তোমার মঙ্গলের জন্যই এ প্রস্তাব করিয়াছি, তুমি বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ! তোমার যদি এমন কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় থাকেন, যিনি তোমার দৈহিক ও আত্মিক উভয় প্রকার মঙ্গল করিতে মনোযোগী, আমি নিজে তোমাকে তাঁহার নিকট রাখিয়া আসিতে প্রস্তুত আছি।"

সহসা আঙিনার দ্বার খুলিয়া গেল; এক সুদর্শন যুবক বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সেম সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তব বিহ্বলা পার্ব্বতীর অস্পষ্ট চীৎকার ধ্বনি মোটেই কণ্ঠভেদ করিয়া বাহির হইতে পারিল না, যতীশ ব্যাপার বুঝিয়া বলিয়া উঠিল—তয় পাবেন না বৌদি, আমি আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে এসেচি, আমি আপনার ঠাকুরপো——যতীশ।"

অতল সমুদ্র নীরে নিমজ্জমান যখন কাঠের ভেলার আশ্রয় পায় তখন যে তার মনের কি অবস্থা হয় তাহা লেখনীর মুখে ফুটাইবার প্রয়াস দুরাশা মাত্র, পার্ব্বতীর অন্তঃকরণ মুহূর্ত্তের মধ্যে কাণায় কাণায় ভরিয়া গেল। স্বামীর প্রতি আজ আর তার কোনো অভিযোগ রহিল না, দেবতার প্রকাশ ভক্তের কাছে দুর্দ্দিনেই হইয়া থাকে, তাই আজ পার্ব্বতীর অকরুণ দেবতা এতোদিন পরে তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন, পার্ব্বতীর সব চিন্তাকে ছাপাইয়া কেবল এই কথাটির আভাসেই মনের তারে ঘা দিতে লাগিল; পতি-প্রেম হতভাগা নারীর বল কল্পনা করিতে পার কি এই আহ্বান টুকুর জন্য পার্ব্বতীর সমস্ত ইন্দ্রিয় কতখানি উন্মুখ হইয়া অবস্থান করিতেছিল? (ক্রমশঃ)

চাট্‌নি

[শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু]

আগে না পরে

ডাক্তার রোগী দেখে বাড়ী ফিরলেন। একজন বি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে জিজ্ঞেস্ করলে, একটা কথা বলবেন্ ডাক্তারবাবু?—কি কথা!

মাঠাকরুণের পায়ের ঘায়ের ঐ যে ওষুধটা দিয়েছেন, ওটা কখন লাগাতে হবে? খাবার আগে, না পরে?

সুন্দর শিক্ষা

হাদু তার ছেলেকে টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে বল্লে তুই আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়্! ভয় নেই, আমি ঠিক ধ'রে ফেল্‌ব।

দৈবক্রমে হাদু ধর্‌বার আগেই ছেলে ধপাদ্ ক'রে মাটিতে পড়ে গেল। হাদু তাকে তুলে ধ'রে বল্লে, তোমাকে এই শিক্ষাটি দেবার জন্যে ফেলে দিলুম যে, কখনো কারুর কথা বিশ্বাস কোর না!

দয়ার অবস্থায়

একবার এক দানবীর ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি মোটা লোক দেখা ক'রে বল্লে, শুনেছি, আপনি অনেককে সাহায্য করেন। সম্প্রতি একটি গরীব পরিবার বড় কষ্টে পড়েছে, তাদের সাত মাসের বাড়ীভাড়া পাওনা হয়েছে; এই মাসের মধ্যে সব চুকিয়ে দিতে না পার্‌লে, এই দারুণ শীতে তাদের পথে দাঁড়াতে হবে। আপনি একটু বিবেচনা ক'রলে ব্রাহ্মণের বড় উপকার করা হয়।

ভদ্রলোক বল্লেন, 'তাদের ত' বড়ই বিপদ, আপনি কে? বক্তৃতাটি বার ক'রে মোটা লোকটি জবাব দিলে, আজ্ঞে আমার নাম শ্রীনিবাস, আমারই বাড়ীতে তারা ভাড়াটে রয়েছে।

কাঁচা-পাকা

(গল্প)

[শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল্]

রাত্রি দশটায় দিল্লী প্যাসেঞ্জার হাবড়া ষ্টেশন ছাড়িয়া দিল। পূজার কিছু দেরী আছে—আর এখানা অত্যন্ত 'স্লো' প্যাসেঞ্জার বলিয়া যাত্রীর ভিড় এটায় কিছু কম।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিবামাত্র সেকেণ্ড ক্লাশের তরুণ যাত্রী নীরদ গাড়ীর একমাত্র তরুণী সঙ্গিনী স্নেহর পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল,—এইবার!

স্নেহর পাশে তার এগারো মাসের খোকা শুভ্র শয্যায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; খোকার বী পাশের 'সার্জেণ্ট'-মার্কা ছোট্ট সুটকীর মধ্যে—নীরদই তাকে সেই সুটকীতে উঠাইয়া দিয়াছে—রাত্রে খোকী ঘুমাইয়া নিক্, যদি বেশী দরকার হয় তখন, নয়তো সেই ভোরে তাকে এ গাড়ীতে আনিলেই চলিবে। স্নেহ তখনই তরুণস্বামীর ফন্দী বুঝিয়াছিল—কিন্তু সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে শাস্তিভঙ্গ হইবে ভাবিয়া কোন আপত্তি তোলে নাই! এখন স্বামীর মুখের ঐ ছোট্ট কথায় কতদিনকার কত যে বিস্তারিত আলোচনা বিদ্যুতের মত তার সমস্ত প্রাণটাকে ছুঁইয়া' রহিয়া গেল! সে শুধু চোখের দৃষ্টিতে কটাক্ষ করিয়া হাসিয়া জবাব দিল,—তুমি কম দুষ্টু!

—না, সত্যি, কথা রাখতে হবে এবার। তুমি তো বলেও ছিলে—বলিয়া নীরদ বেঞ্চের তলা হইতে সুটকেশটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল, ও নিজে তাহার মধ্য হইতে বাহির করিল, একজোড়া মেয়েদের মোজা ও লেডিস্ সু।

সেগুলা বাহির করিয়াই স্নেহর পা টানিয়া নীরদ বলিল,—মোজা পর।

—আঃ, কি কর,—পায়ে হাত দাও কেন? যাও! বলিয়া স্নেহ পা সরাইয়া উঠিয়া, নীরদের পা ছুঁইয়া সে হাত মাথায় ঠেকাইল।

নীরদ বলিল,—নাও, পর্—।

—এখনি? এই রাত্রেই? এখন তো ঘুমোতে হবে। তা এই মোজা জুতো পরেই ঘুমোব! এমন পাগলও দেখিনি।

স্নেহ-ভরা স্নেহর এই ভর্ৎসনার পর নীরদের মুখে এমন একটা কাতর ভাব ফুটিল যে স্নেহ তা দেখিয়া তখনই বলিল,—পরছি, দাও। কাল সকালে ট্রেণ থেকে নামবার সময় পরলেই হতো না? তোমার সব বাড়াবাড়ি!

নীরদ বলিল—তাই পোরো!

—অভিমান হলো অমনি! দাও বাবু, পরি! স্নেহ স্বামীর হাত হইতে মোজা ও জুতাজোড়া টানিয়া লইয়া বেঞ্চের উপর রাখিল—ও মোজা পায়ে দিতে দিতে স্বামীর পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। নীরদের মুখের উপর হইতে বেদনার কালো মেঘখানা সরিয়া গিয়া সেখানে আনন্দের জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিতেছিল!

মোজা-জুতা পায়ে দিয়া স্নেহ দাঁড়াইল—ট্রেণ চলিতেছিল। নীরদ বলিল—একটু চলে বেড়াও দিকি।

স্নেহ চলিয়া বেড়াইল। লজ্জায় তার পা কেমন বাধিয়া যাইতেছিল—স্বামীর পানে হাসিয়া চাহিতেই সে দেখিল, স্বামীর মুখে চোখে কি সে মুগ্ধ ভাব! আঁচলের একটা কোণ মুখে পুরিয়া বাকীটায় পা ঢাকিয়া সলজ্জ হাসির ভঙ্গীতে সে বসিয়া পড়িল, বলিল,—যাও, ভারী লজ্জা করছে! নীরদ তাহাকে ধরিয়া তুলিল, ও একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া তার মুখে বারবার চুমা দিল।

হঠাৎ স্নেহ চমকিয়া তাহাকে ঠেলিয়া সরিয়া গেল, বলিল,—আঃ, ছাড়ো, ছাড়ো—ষ্টেশন যে—।

হতভম্বের মত নীরদ মাথা নীচু করিয়া দেখে, গাড়ী আসিয়া লিলুয়া ষ্টেশনে থামিয়াছে।

২

এই তরুণ দম্পতীর এই অদ্ভুত জায়গায় এই অপরূপ প্রেম-লীলার একটু ইতিহাস আছে।

নীরদ সদ্য কলেজ হইতে বাহির হইয়াছে—সব কটা পাশ দিয়া এবং সব পরীক্ষাতেই বেশ সুনাম লইয়া। পড়া-শুনার সঙ্গে সঙ্গে এই জীবনের বসন্তে সে ফুলের গন্ধ, পাখীর গান, দখিণ হাওয়া এগুলার বিরুদ্ধে

কোনদিন প্রাণের কপাট বন্ধ রাখে নাই। কীট্‌স্‌-শেলির কবিতা, কালিদাস-সেক্‌স্‌পীয়রের নাটক, তাদের সাল-তারিখ, আর নির্ঘণ্টের খোলস ছিঁড়িয়া ভিতরকার সুধারস নীরদকে আকণ্ঠ পান করাইয়াছিল—তাই পরীক্ষার-ক্ষেত্রে ঐ সব কাব্য-নাটকের খুঁটীনাটী তর্ক-বিতর্ক তাকে যেমন পরাস্ত করিতে পারে নাই, জীবনের ক্ষেত্রেও তেমনি তাদের অপ্রত্যক্ষ নীরদের প্রাণে এক মায়ার রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। অর্থাৎ ফ্লাসে ভালো ছেলে হইয়া সে চোখে ঠুলি দিয়া অন্ধ হইয়া বসিয়া ছিল না—প্রথম যৌবনের অপরূপ মাধুরীর বর্ণসুষমাকে বাহিরের বিশ্বকে সে বিচিত্র রঙে রাঙাইয়া তুলিয়াছিল।

বি-এ পাশ করিবার পর তার বিবাহ হয় স্নেহের সঙ্গে। স্নেহ একেবারে রবীন্দ্রনাথ ও কীট্‌স্‌-শেলির কাব্য হইতে সমস্ত রূপের হিল্লোল তুলিয়া যেন তার চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল! ঠিক যেন বসন্তের প্রাতে ঘুম-ভাঙা হাওয়ার প্রথম স্পর্শে কোটা ফুলের কুঁড়িটির মতই!

কিন্তু সে ফুলটিকে ভালো করিয়া চোখে দেখিবার তার অবসর কোথায়? বাড়ীতে এক-বাড়ী লোক,—বাড়ীর আইন-কানুনও সেই কোন্ যোগল-আমলের কড়া পর্দার কাপড়ে ঘেরা! স্নেহও মুখের ঘোমটা খুলিতে লজ্জায় কাঁটা হইয়া ওঠে! রাত্রে অস্ফুট কণ্ঠস্বর ছাড়া তার প্রেম প্রকাশের রূপ পায় না! অথচ বাহিরে মুক্ত জীবন-হিল্লোল দেখিয়া নীরদের প্রাণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত! ঐ যে বায়োস্কোপে তরুণদম্পতী একত্র বসিয়া ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে কি সুখ ভোগ করিতেছে,—ঐ চলন্ত মোটরে জীবন আর যৌবনের চপল খেলা,—আর তার অদৃষ্টে.....! অথচ জীবনটাকে উপভোগ করিবার যত উপাদান তার হাতে যেমন আছে.....

নৈরাশ্যের তীব্র নিশ্বাস আগুনের ঝাঁজ তুলিয়া তার প্রাণটাকে যেন পুড়াইয়া দিত। স্নেহ তো অবুঝ নয়! সে নীরদের দুঃখ বুঝিত, কিন্তু সে কি করিবে? বাড়ীতে ঠাকুরঝি আছে, তাছাড়া সম্পর্কে বড় মা, ননদের দলে বাড়ী একেবারে ভর্ত্তি...তারা যদি এদিকে সাহায্য না করে, তবে সে বৌ-মানুষ, নিজে হইতে কি করিয়া...সে যে বড় নিরুপায়!

নীরদ তাহা বুঝিত। তার মনে হইত, সে যেন পাথরের কারাগারে বন্দী আছে—লোহার কঠিন শৃঙ্খলে হাত-পা বাঁধা, প্রাণখানার উপর অবধি ভারী পাথর চাপানো! এক-একবার মনে হইত, মরিয়া হইয়া বিপুলবলে এ শৃঙ্খল সে ছিঁড়িয়া ফেলে, বুকের উপরকার পাথরটাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া সরায়! শুনিয়া স্নেহ বলিত,—ছি!

দুইজনে কতই না প্ল্যান খাটাইত, রাত্রির স্তব্ধ নির্জ্জনতায় নিজেদের ঘরে শয্যায় শুইয়া।...যদি কখনো পশ্চিমে যাওয়া যায়—শুধু দুইজনে—আর-কেহ সঙ্গে থাকিবে না—শুধু নীরদ আর স্নেহ! আঃ!...কিন্তু তাই বা কি করিয়া হয়! বাড়ীর আইন-কানুন যে-রকম, তাহাতে সে আশা করা বাতুলতা।...নীরদ ঠিক করিল, সে ডেপুটিগিরি চাকরি লইবে, তাহা হইলে কেমন বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইবে, তখন...

কিন্তু বিধাতা অন্য বিধান করিলেন। পিতা বলিলেন,—ডেপুটিগিরিতে সুখ নেই, বাপু। তুমি হাইকোর্টে যাও! নীরদ বিরক্ত হইল—কিন্তু বাপের মুখের উপর কথা বলিবে, এমন সাহস, এমন শিক্ষা কখনো হয় নাই। তাই সে মনে মনে গুমরিয়া হাইকোর্টে সেল ওকালতি করিতে!...

সে কি ভালো লাগে! কতকগুলা নীরস কাগজ পড়িয়া বই মিলাইয়া পেন্সিল ধারিয়া খরচাও লেখা! কোর্টে ঘণ্টা দুই ঘুরিয়া সে ইডেন গার্ডেনে গিয়া বসিত—বোটানিকাল গার্ডেনে যাইত,—ষ্টীমারে চড়িয়া কোনদিন ছুটিত রাজগঞ্জে, কোনদিন বা শিবতলায়।

দু' তিন বছর এমনি ঘোরার পর মাঠে-জলে ভিজিয়া ম্যাচ্ দেখিয়া নীরদের জ্বর হইল। দেখিতে দেখিতে জ্বর বাড়িয়া গেল—শেষে প্রাণ লইয়া টানাটানি। ডাক্তারে প্রাণটা রক্ষা করিল—কিন্তু মনটা ক্রমেই যে ঘেঁতো হইয়া যাইতেছিল নৈরাশ্যে ঝাঁজিয়া, ডাক্তারের সাধ্য ছিল না, তার দাওয়াই দিবে!

শেষে একদিন নীরদ একটা ফন্দী ঠাওরাইল। সে ডাক্তারকে ধরিয়া বসিল। এবং ডাক্তারও নানা অছিলায় কথা পাড়িলেন, নীরদকে কোর্টে আবার বাহির করিবার পূর্ব্বে উহাকে একবার পশ্চিমে যান-হুয়েরের

অন্তও ঘুরাইয়া আনা দরকার। নহিলে এ শরীরে কোর্টের ঝাঁটুনি সহ্য হইবে না।

এ ব্যাপার লইয়া বাড়ীতে তখন দোরগোল পড়িয়া গেল—এ যে বিচিত্র বিধান! ডাক্তার তাগিদের পর তাগিদ দিলেন—বাড়ীর কর্ত্তা ভাবিলেন, তাই তো! কিন্তু কার সঙ্গে যায়!

মাকে ধরিয়া নীরদ একদিন বলিল—আমার কেমন মাথা ঘোরে মা, প্রায়ই!

মা শিহরিয়া উঠিলেন, যাই, যাই!

তখন মা-ই বলিলেন, নীরদকে পশ্চিমে পাঠাও! কিন্তু পাঠানো যায় কার সঙ্গে!

বাপ সঙ্গে যাইতে পারেন না,—তাঁর হাতে বিস্তর কাজ, বিশেষ পূজার মরশুম আসিতেছে। আত্মীয়-জাতির ঘরের অবস্থাও তাই! কে এ বস্তি সয়।

নীরদ একা যাক্! নীরদ বলিল, তা হয় না। শেষে স্থির হইল, বাড়ীর পুরানো ঝী দাসুর মা আর পুরানো পাচক সঙ্গে যাইবে, আর যাইবে পুরানো ভৃত্য রাম-চরণের ভাই বিষণ! এখন তো উহারা বাহির হইয়া পড়ুক—তারপরে এখানকার বন্দোবস্ত পাকা করিয়া আর কাহাকেও পাঠাইলে চলিবে। নীরদ ঠিক করিল, মিহি-জামে যাইবে—এক বন্ধুর বাড়ীও সে সংগ্রহ করিল। জায়গাটা কলিকাতার কাছে বটে, যাইতেও বেশী সময় লাগে না। অসুখ-বিসুখ হইলে চট্ করিয়া ফেরা যাইতেও পারে—ডাক্তার পাঠানোও শক্ত ব্যাপার নয়। মা বলিলেন—অসময়ে দেশ—ভালো লাগে না যেতে!

জগত্যা মার যাওয়া হইল না। নীরদ ও স্নেহ ভৃত্য, পাচক ও দাসী লইয়া যাত্রা করিল।

যাত্রার পূর্ব্বাহ্নে নীরদ চুপিচুপি স্নেহর পায়ের মাপ লইয়া তার জন্ম মোজা-জুতা কিনিয়া আনিয়াছে—এবং কথা হইয়াছে মিহিজামে লোক-চক্ষুর আড়ালে গিয়া স্নেহ পর্দ্দা খুলিয়া বেশ করিয়া তার সঙ্গে মিশিবে—কোনখানে এতটুকু আড়াল বা গোপনতা রাখিবে না। ট্রেণ হাবড়া ছাড়িতে তাহারই সূচনাটুকু আমরা দেখিয়াছি।

৩

মিহিজামে নীরদের বাসা ছিল, সুন্দরপাহাড়ীতে। নানা ফুলে-ভরা বাগানের মধ্যে পরিচ্ছন্ন বাংলা; কাছা-কাছি দুই-তিনটা ছোট ছোট পাহাড়ও দেখা যায় আর দিগন্তবিস্তৃত মাঠ—সবুজ ঘাসে ছাওয়া! বাঙলার সামনে লাল মাটীর পথ—দুইধার গাছে ছায়া-করা, ভারী মিষ্ট। বাড়ী দেখিয়া নীরদ ও স্নেহ মুগ্ধ হইয়া গেল। প্রাণ অসহ্য পুলকে উছলিত হইয়া উঠিল—মনে হইল, তারা দুটি খাঁচার পাখী এতদিন খাঁচার মধ্যে বন্ধ ছিল। খাঁচার বাহিরে এতখানি মুক্তিও ছিল! এ যে তারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই!

আসিয়া দুই-তিন দিন ঘর গুছাইতেই বেলা কাটিয়া গেল, সেদিনও সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময় নীরদ তাড়া দিল, একদিনও বেরুনো হল না। আজ বেরুবো, চট্ করে তৈরী হয়ে নাও!

স্নেহ মা দুইতে গেল; নীরদ সজ্জিত হইতে লাগিল। স্নেহ যখন শাড়ী মোজা জুতা আঁটিয়া বাহিরে আসিল, তখন দিনের আলো মিলিয়া গিয়াছে। নীরদ বলিল—হোক্ গে সন্ধ্যে—এসো, একটু বেড়িয়ে আসি।

দুইজনে বেড়াইতে বাহির হইল। একটু গিয়াই রেলোয়ে ষ্টেশন। ষ্টেশনের কাছে কতকগুলা দোকান—খাবারের দোকান, পানের দোকান, মাংসের দোকান! দুইজনে প্লাটফর্ম্মে গেল। সিগন্যাল পড়িয়াছে—কলি-কাতার গাড়ী আসিতেছে। দুইজনে গিয়া প্লাটফরমের সীমায় আসিয়া দাঁড়াইল। রেল-লাইন এখানে অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে ঘুরিয়া গিয়া দূরে পাহাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে। ঐ দূরে ধোঁয়া! ট্রেণ আসিতেছে! ঘণ্টা পড়িল, দেখিতে দেখিতে ট্রেণও আসিল—এক-গাড়ী লোক। একটা হট্টগোল, দৌড়াদৌড়ি, পুলিশ, গাড়িপাড়ে চীৎকারে মিনিটখানেকের জন্ম স্থানটাকে মুখরিত করিয়া দিয়া ট্রেণ তার দীর্ঘ দেহ লইয়া চলিয়া গেল। ষ্টেশন আবার যেমন ছিল তেমনি নীরব হইল—শুধু টিকিট-ঘরে টেলিগ্রাফের বাবু টকাটক্ টকাটক্ অত্যন্ত ভক্ত করিয়া কাজ করিতে-ছিলেন। স্নেহ বলিল—যেন একটা স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল—না?

নীরদ বলিল—ঠিক তাই! আমাদেরও জীবনটাকে

এখানে ঘর দিয়ে গন্ধে তুলি, এসো। এ ঘর কিছুতে বিসুবে না।

বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতে ভৃত্য বলিল—গোয়ালা দুধ দিয়া যায় নাই। মরদাও না আনিলে লুচি ভাজা হইবে না।

নীরদ বলিল—মালী কোথায় গেল?

পাচক বলিল, তার বাড়ীতে কাজ আছে বলিয়া সে একেলা ছুটী লইয়া গিয়াছে।

নীরদ ধমক দিল—কার কাছে ছুটী নিলে?

পাচক বলিল—কেন, বৌমার কাছে বলেছিল তো।

স্নেহ অপ্রতিভভাবে বলিল—হ্যাঁ, বলেছিল বটে!

নীরদ বলিল—কেন! গোয়ালার বাড়ী কে জানে? আর ময়দাইবা কোথায় পাওয়া যাবে, তাওতো জানি না।

পাচককে বলিল—তুমি জানো?

পাচক বলিল—না, মালী বলেছিল, আজ আমায় দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে।

নীরদ বলিল—কুছ্ পরোয়া নেই!

স্ত্রী হাসিয়া বলিল—খোকা যাবে কি? দুধ নেই—

নীরদ বলিল—হরলিক্স্ দাও গে—

স্ত্রী বলিল—হরলিক্সের নতুন বোতল তিনটে কেলে আসা হয়েছে!

—বেশ! বলিয়া নীরদ মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল; পরে বলিল—আচ্ছা, বিমল, তুই আয় আমার সঙ্গে। ষ্টেশনে দেখি গে খোঁজ করে, একটু দুধও মেলে কিনা!

নীরদ বিমলকে লইয়া চলিয়া গেল ও ষ্টেশন-মাষ্টারকে বলিয়া-কহিয়া তাঁর ঘর হইতে রাত্রে খোকার ব্যবহারের জন্য এক পোয়া দুধ চাহিয়া আনিল। বাড়ী আসিয়া শুনিল, গোয়ালা দুধ দিয়া গিয়াছে। উহাদের কি না কি পরব ছিল, তাই দেরী হইয়াছে!

নীরদ বলিল—বিমল, যা,এ দুধটা ফিরিয়ে দিয়ে আয়—বল্‌গে, দরকার নেই।

স্নেহ হাসিয়া বলিল—রাত্রে তুমি কি খাবে? ময়দা অনেক দূরে পাওয়া যায়, গোয়ালা বলছিল।

নীরদ বলিল—তখন বললে না কেন, ঠাকুরকে নিয়ে দেখিয়ে দাও?

স্নেহ বলিল—সে দাঁড়াতে পারলো না,বাড়ীতে কাজ।

নীরদ বলিল—তাতে কি! যাব—মোটা কচুরি আলু সেদ্ধ দিয়ে খাব। লুচির চেয়ে কি নীরেশ সে? আমরা দুজন বৈ তো না, কি বল? ভালো কথা, ষ্টেশনের কাছে দোকানে বেশ জিলিপি ভাজছিল, সেই জিলিপি আর বেঁধে কিনে আনুক।

চারিদিক গোছগাছ করিয়া ঠিক-ঠাক হইয়া বসিতে আরো পাঁচ-সাত দিন কাটিয়া গেল। গোছ-গাছ হইলে সেদিন সকালে নীরদ ও স্নেহ বরাবর বেড়াইয়া ষ্টেশনে আসিল। বেলা তখন প্রায় আটটা। এখনি কলিকাতার ট্রেণ আসিবে। ঐ যে সিগন্যালও দিয়াছে।

দুইজনে দাঁড়াইল, ট্রেণ চলিয়া গেলে বাড়ী ফিরিবে। সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর ঐ যে দূরে পাহাড়টা আছে, ওখানে যাইবার কথা আছে। ঠাকুরকে বলিয়া আসা হইয়াছে—সে যেন দুপুরের টিফিনের জন্য লুচি ও তরকারী, ভাজা তৈয়ার করিয়া ফেলে—আর সঙ্গে যাইবে—ষ্টোভ কেটলি প্রভৃতি চায়ের সরঞ্জাম। ওখানে ঘুরিয়া টিফিন সারিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিবে। অর্থাৎ, আজ হইতেই জীবন-গ্রন্থ কাব্যের পৃষ্ঠা খোলা হইবে।

সশব্দে ট্রেণ আসিয়া পড়িল। আবার সেই গোল-গোল...স্নেহ ট্রেণের পানে চাহিয়া ছিল—আজ অনেক লোক নামিতেছে—উঃ, কি ভারী ভারী মোট-ঘাট!

নীরদ বলিল—এইবারে যাত্রী আসা সুরু হলো আর কি!

স্নেহ কোন জবাব দিল না; একজন যাত্রী নামিতে ছিল—সে তাহাদের দেখিতেছিল। তিনটা, পাঁচটা, সাতটা ছেলেপিলে সব লইয়া—উঃ, এ যে একটা মস্ত দল। মোটা-সোটা স্ত্রীলোক একজন, বোধহয় গৃহিণী! আর ঐ বোতাম-খোলা কোট গায়ে, হাতে হুঁকা, ভুঁড়ি ওয়ালা কর্ত্তা...এ কি, এ যে...

স্নেহ শিহরিয়া উঠিল। এ যে...তারু সিনে-মহাশয়!

যাত্রীরা সেই বিপুল মোটঘাট ও প্রকাণ্ড দল লইয়া যাত্ত, ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। ওরে, কুঁজো কুঁজো—"খাবারের চাঙারী কৈ? আমার? সীতেভোগ ছিল যে!—

'আর-সীতেভোগ! যত বলি, গুছিয়ে রাখো—এমনি নানা কলরব-গুঞ্জনায় একটা ঢেউ উঠিল।

নীরদ বলিল,—চল—আবার ওদিকে চট্‌পট্ সব সেরে নিতে হবে—আজ পাহাড়ে পিক্‌নিক মনে আছে তো!

স্নেহর মন হইতে সব মুছিয়া গিয়াছিল। সে কেমন নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া ছিল; হঠাৎ বজ্রের মত দুইজনের মধ্যে আসিয়া পড়িল, যাত্রীর দল হইতে একটি ছেলে। সে আসিয়াই—'মেজদি' বলিয়া স্নেহর গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। যাত্রীরা অমনি তাহাদের পানে চাহিল।

স্নেহর আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল—পিসিমা, পিসে-মশায় এই দিকেই আসিতেছেন; তাহাকে দেখিয়াছেন—সর্বনাশ! তার পায়ে যে জুতা, মোজা, এই বেশ...!

একটা বারো বছরের বুড়ো-ধাড়ি মেয়ে আসিয়া বলিল, মেজদি কেমন সেজেছে দেখ, মেমেদের মত! পায়ে জুতো মোজা—ওমা...মা...মেয়েটি হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে দলের কর্তা ও গৃহিণী আগাইয়া আসিলেন। স্নেহ তাঁহাদের প্রণাম করিল—মোটা গৃহিণীটি নীরদকে দেখিয়া এক গাল ঘোমটা টানিয়া বলিল—জামাই, বুঝি?

স্নেহ ঘোমটা টানিতে পারে না—রুচ আঁটা! সে যেন মাটির মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল—তার মুখে কথা নাই!

কর্তা বলিলেন,—তুমিই নীরদ?.. তোমার এখানেই এলুম বাবা। ক'মাস ধরে ছুটী চাইছিলুম—এবারে শেষ মেজমাস ছুটী মিললে। ভাবলুম, কাশী যাব না বৃন্দাবন যাব! বেয়াই মশায়ের সঙ্গে হঠাৎ সেদিন দেখা! তিনি বললেন, তোমায় একলা এখানে হাওয়া খেতে পাঠিয়ে তিনি তারী ভাবী আছেন—ছেলে বাহুষ—কর্তা-ব্যক্তি কেউ নেই—কষ্ট হচ্ছে! শুনে তখনি ঠিক করলুম—তবে তোমাদের এখানেই আসি। বাড়ীভাড়াটা বেঁচে যাবে তো। —আমার খরচ-পত্র আমিই করবো, তবু...কি জানো বাবা, ছাপোষা বাহুষ—সংসারটি তো কম নয়!—ঐ মাইনেয়... তা, এ বেশ হলো! কোথায় খুঁজতুম! তা দেখি, তোমরা ফ্রন্টনেই এসেছ ···তোমার বাবা টেলিগ্রাম করেছিলেন, বুঝি?

—আজ্ঞে না,—বলিয়া নীরদ কাঠের পুতুলের মত একটা প্রণাম করিল, পরে পিসশাশুড়ীকেও প্রণাম করিয়া কোনমতে বলিল,—চলুন। কথাটা যেন কতদিনকার ঘুণপীড়িত দুর্বলের কণ্ঠস্বর!

কর্তা বলিলেন,—মালটালগুলো তাহলে দেখে-শুনে আনো। আমরা এগুই! বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—দুটো ছেলে নয় সঙ্গে থাক,—কেষ্টা আর বিনে। স্নেহ, চল মা আমাদের পথ দেখিয়ে।

স্মৃতির রেখা

[শ্রীপ্রভাময়ী মিত্র]

গ্রামের সীমায় ওই যে রে যায় দেখা,
তাঁর চরণের রাঙা স্মৃতির রেখা।
দুর্বার দিনে, নিঝুম রাতে,
জাগরণে ঘুমের সাথে
সবখানেই যে আঁখির পাতে
যে জেগে তার রূপের মোহন লেখা।
তাহা বুকের নিবিড় আঁধার মাঝে
সেই যে আমার আশার অরুণ রেখা।

দুই দিক

[শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ]

পান থেকে চুণটুকু খসিলেই বীরবর
লাফটে ঝাপটে ওঠে—কাঁপে বপু থর থর।
কোথা লাগে সেকেন্ড নেপোলিঅঁ, বাইজার

ঘরে

হেন বীর কত শত ঘরে ঘরে বাংলায়।
পৌরুষ তাঁহাদের নাই—তাহা কে বলে?
বীরত্ব যত সব অন্দর মহলে!

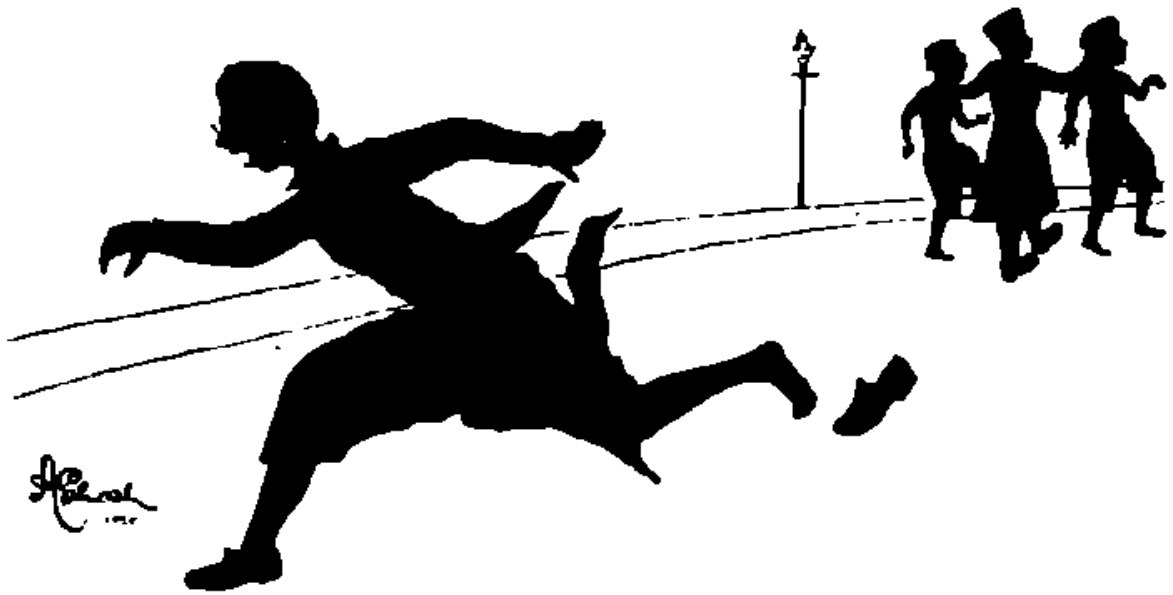

বাইরেতে একি পাপ! একি জ্বালাতন!
গুণ্ডোও তি হরদম্—সব দুষ্মন!
লিস দিয়ে হেলে দুলে পথ চলা দায়,

বাইরে

ঐ বুঝি ধরলরে—ওই নিয়ে যায়!
কাজ নাই বাইরেতে—চল্ ঘরে চল্,
দুহকোণে পৃথিবীর আঁচলের তল।

মালা

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

(১) যাহার রসবোধ নাই সে জীবন্মৃত।

(২) সেবা অপেক্ষা কাজই মানুষকে সজীব রাখে।

(৩) দুঃখ মন্থন করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় তাহাই জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা।

(৪) প্রাণখোলা হাসিই পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী আনন্দ-দায়ক।

(৫) আত্মস্বরিতাকে কখনও প্রতিভা বলিয়া ভুল করিও না।

গ্রন্থ আলোচনা

জলধর গ্রন্থাবলী—প্রথম ভাগ। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। মূল্য দুই টাকা। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের পুস্তকগুলির সহিত বাংলা দেশের অনেকেই পরিচিত এবং তাঁহার ভক্ত পাঠক পাঠিকার সংখ্যাও যথেষ্ট আছে। জলধর গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগে লেখকের বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী হিমালয়, প্রবাস চিত্র ও 'চোখের জল', 'পাগল', 'আশীর্ব্বাদ', প্রভৃতি কয়েক সুন্দর উপন্যাসগুলি আছে। ইহার প্রত্যেকখানি গ্রন্থই বাজারে পূর্ব্বে যেন টাকা দু'টাকায়কমে পাওয়া যাইত না। তাই পাঠক-পাঠিকারাও অনেকে ইচ্ছা করিলেও এত মূল্য দিয়া এই প্রিয় পুস্তকগুলি কিনিবার সুবিধা করিতে পারেন নাই। বিদেশে এইরূপ জনপ্রিয় গ্রন্থের নানারকম সংস্করণ হয়। কোনটা দামী কোনটা খুব সাধারণ। আমাদের দেশেও জনপ্রিয় গ্রন্থগুলি এইরূপ সংস্করণ হইতেছে ইহা সুখের বিষয়। যার চৌদ্দ টাকার বই যদি এক সঙ্গে দু'টাকায় পাওয়া যায় তার চেয়ে আনন্দের বিষয় পাঠকপাঠিকার আর কি হইতে পারে? জলধর গ্রন্থাবলীর ছাপা কাগজ বেশ সুন্দর—গ্রন্থাবলী বলিতেই যে মোটা, ছিমছাম বহি আমাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে, সুখের বিষয় এই জলধর গ্রন্থাবলী তেমন কাগজে ছাপা ও বাঁধা হয় নাই। ইহা সাধারণ বহির আকারে প্রকাশিত করা হইয়াছে। আমরা আশা করি এই সুন্দর সুসম্পাদিত গ্রন্থাবলীটির দেশে বিশেষ সমাদর হইবে—ও দেখিতে দেখিতে ইহার প্রথম সংস্করণও নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

শুভ-দৃষ্টি—উপন্যাস। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী, মূল্য ১৲। উপন্যাসের সরলা ও শৈবালের চরিত্র মন্দ ফোটে নাই। ইহারা দুইজনে সপত্নী। ছোট সতীন শৈবাল সরলাকে দিদি বলিয়া গ্রহণ করিল এইখানেই শুভ-দৃষ্টির সমাপ্তি। গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাই ভাল। দাম ১৲

'বঙ্গ সাহিত্য' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বারাণসী শাখা হইতে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্র। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র এই তিন মাসে যে প্রথম সংখ্যা বাহির হইয়াছে তাহাই আমরা পাইয়াছি। পত্রিকাখানির বার্ষিক মূল্য ৷৷৹ প্রথম সংখ্যার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ আছে। বাংলার বাহির হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গ-সাহিত্যের' উন্নতি কামনা করি।

'ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক রিপোর্টার' ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ এম-ডি সম্পাদিত। ২৯, দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত। এই হোমিওপ্যাথি পত্রখানি ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইয়া মাসে মাসে প্রকাশিত হইতেছে। ইংরেজী অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথীর ভক্ত চিকিৎসক, ছাত্র ও সাধারণ ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় পাইবেন।

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীনরেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত সম্পাদিত

বাসন্তিকা

প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ভারতের নারীশক্তির নিকট গান্ধী-সেবেনীর আবেদন

(হিন্দী 'নবজীবন' হইতে)

নাগপুরে আমাদের ভাইয়েরা তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, করিতেছেন। কিন্তু ভগ্নীগণ কি করিবেন? এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিকট কোন আহ্বান আসে নাই। আমি জানি, অনেক ভগ্নী আমার ন্যায় প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে এই আশ্বাস-সংবাদ প্রদান করিতেছি যে, আগামী ১৮ই আশ্বিন পুণ্য-বিজয়ী আমি তাঁহাদিগকে লইয়া নাগপুরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি। শ্রীযুক্তভাইএর নিকট আমি সম্মতি পাইয়াছি। কলিকাতা ভগ্নী তাঁহাদের নাম ইতিপূর্ব্বেই আমাকে দিয়াছেন। শ্রীমতী পেরিন ভগ্নীর সহিত এ বিষয়ে আমার পত্র ব্যবহার চলিতেছে। যে ভগ্নীরা এই দুষ্কৃতি সংকার্য্যসাধনের জন্য উৎসর্জিত হইবেন, তাঁহারা আমার নিকট সত্যাগ্রহাশ্রম' সম্বন্ধেই এই উপলক্ষে তাঁহাদের নাম প্রেরণ করুন। এখন সুযোগ পুনঃ পুনঃ আসে না। দক্ষিণ-আফ্রিকার মত এখানেও আমি ভগ্নীদের পশ্চাতে সমর আকারে সংবাহিনীরূপে পাইব। এরূপ ভরসা, বেশী করিও না।

গত ৩রা আশ্বিন প্রাতে পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই কেশরেকের মৃত্যুতে পঞ্জাব একজন যোগ্য নেতা হারাইল। কিছুদিন হইল পণ্ডিতজী দুরারোগ্য পৃষ্ঠরোগে ভুগিতেছিলেন। সাধ্বী বিধবা পত্নী সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার লাট লর্ড সিডেন দুঃখিত পরিবর্ত্তনে শিল্প ব্যবসায়ের অধিবাসিগণের নিকট যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে নূতন কথা কিছুই নাই। সেই বাসুলী কথা "তহবিলে টাকা নাই" লাট সাহেবের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে। দুঃখিত্বের বিউনিসিপ্যালিটি যেমন রোড এবং আনুষঙ্গিক লাট সাহেবকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়া ওখানকার পানীয় জলের অভাব, রাস্তা সংস্কারের অভাব, চিকিৎসার অপ্রতুলতা, জল নিষ্কাশনের অব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারের আবশ্যকতা ইত্যাদি আবশ্যকীয় অভাব অনটনের প্রতি লাট সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সর্ব্বত্র অভাবের সমস্ত ফেলুটিসনের উত্তরে মোটের উপর একই জবাব দিয়াছেন এই যে—'তহবিলে টাকা নাই।'

'গাইড'

ইউরোপে কিম্বা আমার সভ্য দেশে লোকে পুলিসকে যে দৃষ্টিতে দেখে, এদেশের লোক পুলিসকে এখনও সে দৃষ্টিতে দেখে না। অবশ্য দেশের লোক পুলিসকে বিশ্বাসের চক্ষে, সহায়ক এইরূপই বিবেচনা করিয়া থাকে, কিন্তু এদেশের লোক সহজে পুলিসের মুখ দেখিতে চাহে না, এড়াইয়া দূরে দূরেই থাকিতে চায়। পুলিস ও এদেশের জনসাধারণের মধ্যে—এই যে সম্পর্ক এদেশে চলিয়া আসিতেছে, এটাকে স্বাভাবিক করিতে চলিবে না।

এরূপটা কেন হয়, দোষ দুঃখের কিছু কিনারই পায় না, পুলিস বিভাগের প্রধান গলদ এইখানেই। এই গলদ দূর করিতে না পারিলে দেশের লোকের সাহায্য না পাইলে, পুলিস বিভাগের সাফল্য লাভ সম্ভবপর হয় না।

বিদূষক।

টেরিটোরিয়াল সৈন্যদলে যাহাদের আপনা আপনি আরও এগোনোর লোক অধিক পরিমাণে যোগদান করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। কথাটা সত্য হইলে দেশবাসী জাতির পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা যাহা শাসন চাই, কিন্তু শোষণকে করিবার ক্ষমতা আছে কিনা সে কথা ভাবিয়া দেখিনা। নিজের দেশকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা যে জাতির নাই, সে জাতি যতই শিক্ষালাভের সৌভাগ্য করুক না কেন, সে পৃথিবীতে নিতান্ত অসহায় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। তাই আমরা বাঙ্গালার যুবক-হৃদয়কে টেরিটোরিয়াল সৈন্য দলে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। জাতির যাহারা ভরসাস্থল, তাহারা যদি দেশের শক্তি-সংগ্রহ ব্যাপারে যোগদান করিতে বিরত হয়, তবে ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? চরকা প্রকাশ।

স্বরাজলাভই হউক, আর কংগ্রেসই হউক, নিজেদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করিলে তখন, যদি বিলাতের অট্টহাস্য দেখিয়া কথাগুলি ভিজে। কিন্তু এই কলহ-প্রিয়তা দেখিয়া মনে হয় না কেহ দেশটাকে ঘর হইতে বড় করিয়া দেখেন।

* * * * *

সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখা যায়, দেশের জোর কাজা লইয়া কিম্বা দুর্ব্বৃত্তের শাসনের অত্যাচার করে। এই ব্যাপার বাঙ্গালায় কম হয়, অন্যত্র কম হয় না। বাঙ্গালার নারী ভারতের অন্যান্য নারীদের অপেক্ষা অধিক দুর্ব্বল বলিয়াই কি ইহা সম্ভব হয়? আর একটা বিষয়ে লক্ষ করিবার আছে। যে সমস্ত দুর্ব্বৃত্ত নারীদের জোর করিয়া নিয়া পাশবিক অত্যাচার করে, তাহারা অধিকাংশই মুসলমান। ইহার কারণ কি? বাঙ্গালার মুসলমান সমাজের ও কথাটা ভাবিবার।

'আরাম'

নিখিল ভারত-রাষ্ট্রীয় সমিতি গত কয়েকবৎসর দেশবাসীর রাষ্ট্রীয়-কর্ত্তব্যপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিতে যিয়া যেভাবে পরিচালিত হইতেছে,—তাহার উপর যদি গঠনের ঘরি পড়ন্ত সরত না হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কংগ্রেস যে কোথায় গিয়া পৌঁছিবে, তাহা স্পষ্ট বুঝিবার উপায় হইতেছে না।

'অনিলবরণ রায়'

এবার ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় বেথুন কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী বাণী চাটার্জ্জি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নম্বর পাইয়াছেন। ইহারই বাণী দুইটি বাসিক বৃত্তি লাভ করিবেন।

সেই বহুতলবিশিষ্ট বোটি এবার বর্ষা আরম্ভে চড়ার হয় কিন্তু কেহই নীলাম ডাকে নাই। মোটরবাসি ১০০৲ টাকা এবং বর্ষা গাড়ীখানি ১০৲ টাকায় ডাকিবার লোকের অভাব হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র মজুমদার প্রণীত নূতন উপন্যাস "প্রেমবতী" বাহির হইয়াছে। মূল্য ১৷০

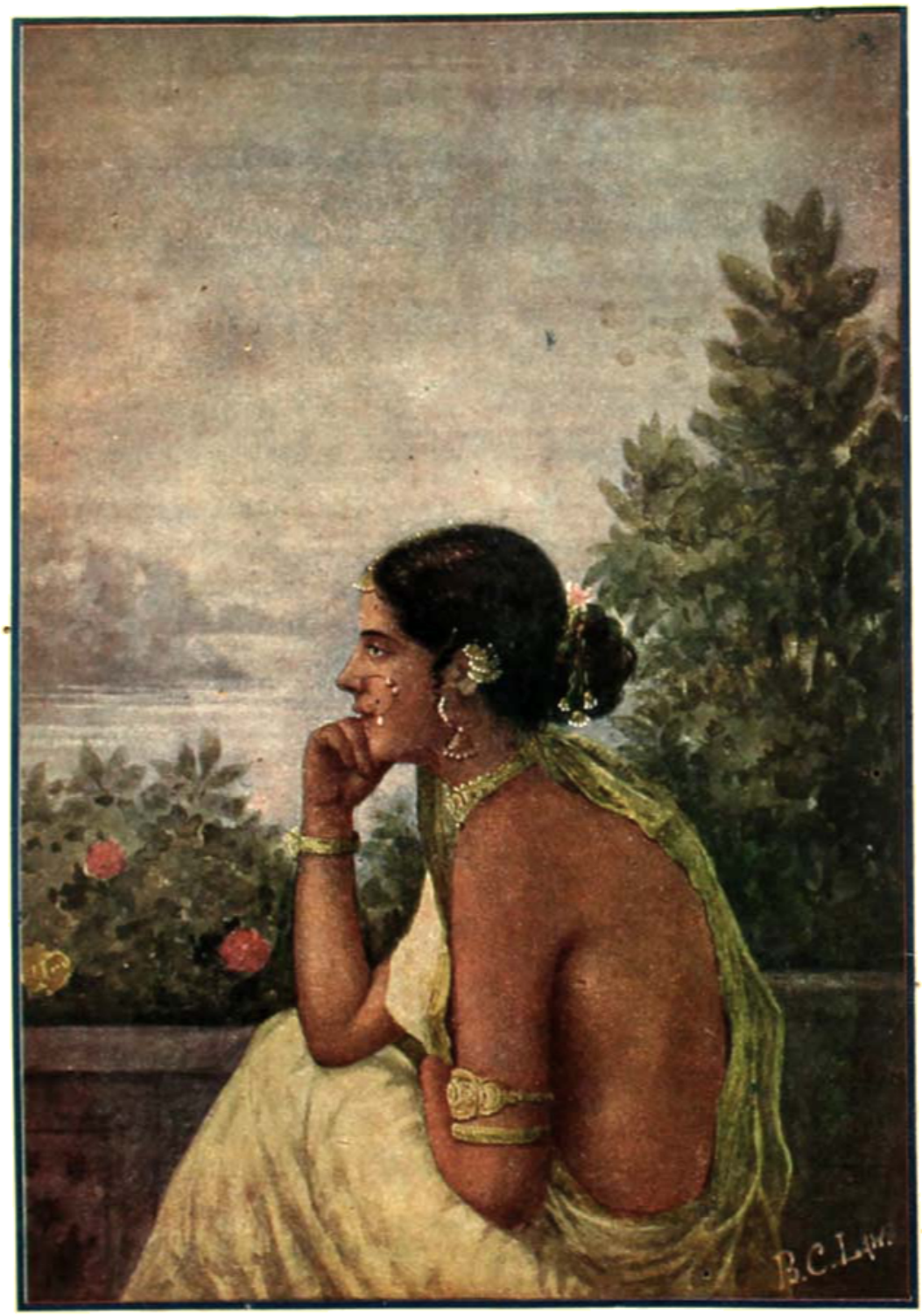

"এ ঘরা বাদর এ মাহ বাদর—শূন্য মন্দির মোর।"

শিল্পি—শ্রীভবানীচরণ লাহা।

("প্রবাসী" সৌজন্যে)

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

২য় বর্ষ] ১লা ভাদ্র শনিবার ১৩৩০, ইং ১৮ই জুলাই। [৭ম সংখ্যা

টীকা অনাবশ্যক।

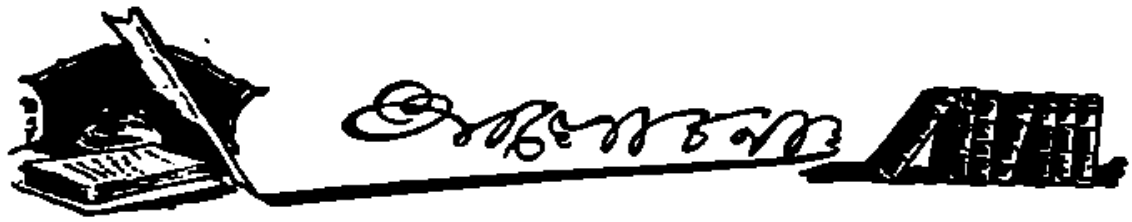

গত ৩০শে শ্রাবণ বুধবার বাংলার অরবিন্দের জন্মোৎসব তিথি গিয়াছে। বাংলার আত্মবোধের বরেণ্য পুরোহিত অরবিন্দ আজ দৈনন্দিন বিস্মৃতির জঞ্জাল সরাইয়া আত্ম-বোধ প্রতিষ্ঠার সাধনায় সমাহিত। কে জানে কবে দেশের এই বিস্মৃতি জঞ্জাল অপগত হইবে—কে জানে কবে বাংলার এই মরমী পুরুষ আবার দেশের কোলে ভাস্বর হইয়া ফুটিয়া উঠিবেন! আশায় মানুষ বাঁচে—বার বার নিরাশা—অপমান লাঞ্ছনা—তবু দূরে বহুদূরে ক্ষীণ আশার জ্যোতি। তাই মানুষ ভাবে—তাই মানুষ বাঁচে। অরবিন্দকেও দেশবাসী বোধ হয় সেইভাবেই ভাবিতেছে।

• • • • •

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি আন্দোলনে সমগ্র ভারতের হিন্দু সমাজের মধ্যে একটু চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। জড় স্থবির—মৃতবৎ কোন সমাজের মধ্যে একটু চাঞ্চল্যের বাতাস বহিলে তাহা জীবন ও আগরণের লক্ষণ ভাবিয়া আনন্দ হয়। জাতি হিসাবে হিন্দু যে ক্রমশঃ মরণের পথে চলিয়াছে এবং এমনভাবে চলিলে দু'তিন শতাব্দীর মধ্যে হিন্দু নাম যে ভারত হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু সমাজের লোকসংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে—সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরা ক্রমে দুর্ব্বল, সাহস, আশা ও শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। চোখের উপর হিন্দুর ব্যক্তিগত, সমাজগত ও জাতিগত স্বার্থ নিত্য লাঞ্ছিত ও ক্ষুণ্ণ হইতে দেখিয়াও হিন্দুসমাজ ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা না করিয়া ধীরে ধীরে অপমানিত মরণকে বরণ করিতেছে। অন্তরে দেহে সব দিকে নীচতাকে অবলম্বন করিয়া হিন্দু তাহার পূর্ব্ব গৌরব, তেজ ধর্ম্মকে বিকৃত করিতেছে—ইহা দেখিয়া এবং ইহার বিষময় ফল অনুভব করিয়া প্রাণবান হিন্দু কিছুতেই সুস্থ স্থির থাকিতে পারেন না। তাই হিন্দুর জাতীয় গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার এই শুদ্ধি আন্দোলন ও হিন্দু ধর্ম্ম মহা সভার ভারত ব্যাপী প্রতিষ্ঠা আয়োজনকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। এই সব আন্দোলনের প্রবাহে যদি হিন্দু জাগে—হিন্দুর মনুষ্যত্ব বোধ মর্য্যাদাজ্ঞান যদি আবার সজাগ হইয়া উঠে। হিন্দুর প্রাণের সাড়া পাইলে—এ আন্দোলন দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনেক সমস্যারই সু-মীমাংসা করিতে পারিবে। আর যদি হিন্দু তাহার প্রাণ নামক বস্তুটিকেই হারাইয়া ফেলিয়া থাকে তবে দেশের অন্যান্য নানা মনুষ্যত্ববোধক আন্দোলনের মতই ইহাও হাওয়ায় উবিয়া যাইবে। প্রাণ নাই দেশের—তাই আগে চাই প্রাণ প্রতিষ্ঠা—প্রাণের সাড়া এ সমাজদেহে একবার যদি লাগে—তবে মনুষ্যত্বের গৌরব-মুকুট মাথায় পরিয়া ইহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে। মন ইহাদের দৃঢ় উন্নত হইবে। হস্ত পদের শিথিলতা চলিয়া যাইবে—নয়নের দৃষ্টিশক্তি প্রখর হইবে। অত্যাচার লাঞ্ছনাকে ইহারা বুক ফুলাইয়া বাধা দিতে পারিবে—বাধা দিতে জানে ও শক্তি আছে দেখিয়া এসব উপদ্রব ভয়ে দূরে পলাইবে। আশ্রিতকেও ইহারা রক্ষা করিতে পারিবে। যে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না সে আশ্রিত রক্ষা করিবে কোন উপায়ে! হিন্দুর সব দিক হইতেই বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন আজ বড় বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এই বোধ যদি এই সভা ও আন্দোলন হিন্দুদের দিতে পারে তবেই এ আন্দোলনের সার্থকতা।

• • • •

হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যোগ্যতা ও সার্থকতা আজ আর কিছুই নাই। সব শুধু নীচ দুঃখমার্গে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজগৌরব, ক্ষত্রিয়ের তেজ বীর্য্য, বৈশ্যের বাণিজ্যস্পৃহা, শূদ্রের নিষ্ঠা ও সহনশক্তি কিছুই নাই আজ। সমগ্রের মধ্যে আসিয়াছে এক স্ব-বৃত্তের স্পৃহা, তাহাই জাতির কাম্য ও মোক্ষ। নিজ নিজ ধর্ম্ম কর্ম ভুলিয়া জাতি মরিতেছে—আর তার আস্ফালনে নিজেরাই নিজেদের মাংস ছিঁড়িতেছে। পরকে দেখিয়া তাহাদের তেজ বীর্য্যে আমরা ভীত হই—অথচ নিজেদের দুটি

কামড়াইয়া ধরিয়া কাজরুত্তির সাথ মেটাই। দুঃশাসনই আজ হিন্দুজাতির বড় সমস্যা নহে—জাতির সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা আজ সব দিকে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। যে যেমন ভাবে পারিতেছে অপরকে লাঞ্ছিত করিয়া নিজে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছে। আজ এই হীন বাঁচিবার পন্থা ছাড়িয়া উচ্চভাবে মানুষের মত বাঁচিবার পথ জানিতে হইবে। হিন্দু মহাসভা যদি ক্রমে বিপথে চালিত জাতির সর্ব্বাঙ্গীন নীচতাকে দূর করিতে পারে তবেই তাহার সার্থকতা।

• • • •

সমগ্র দেশময় দেশকর্ম্মের বিরাট রেখা নিরাশায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছি। বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর জীবনে এই বিরাট ছুটিয়া উঠিয়াছে বোধ হয় অতি তীব্র ভাবে। মহাত্মা গান্ধীর সময় তাঁহার অপূর্ব্ব প্রভাবময় মন্ত্রশক্তির পরিচালনে দেশের কর্ম্মধারা নূতন জীবন পাইয়া আবার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গপ্রবাহে দুকূল ভাসাইয়া চলিয়াছিল। দেশের বন বনানি, নদ নদী, সীমাহীন প্রান্তর, নীল আকাশ আবার দেশবাসীর প্রাণে একটা নূতন প্রচণ্ড শক্তি আনিয়া দিতেছিলল দেশবাসী ভাবিতেছিল তারাও মানুষ, তাদেরও দুর্ব্বার শক্তি প্রচণ্ড প্রভাব আছে। কিন্তু সেই প্রেরণার উৎস স্রোত বন্ধ হইতেই কোথায় ভাসিয়া গেল এই নবভাবের বিকাশলীলা—কোথায় গেল সে জীবন্ত আগ্রহ বোধ—মনে হয় সেদিনকার কথা হইলেও সে স্বপ্ন। আজ দেশবাসী সেদিনকার প্রাণ-শক্তির লীলাখেলার কথা ভাবিতেও বোধ হয় শঙ্কিত হইতেছে। নিমজ্জিত অবসাদে সমগ্র দেশ আবার কাহার পানে চাহিয়া সকাতরে রুদ্ধকণ্ঠে কহিতেছে—কবে—কবে—কবে!

• • • •

কংগ্রেসকে দেশকর্ম্মের কেন্দ্র-উৎস ভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী! সেদিনকার হিন্দু মুসলমান সমস্যা, জাতীয়তার বোধ, দুঃশাসন—সব জাতীয় কর্ম্মকেন্দ্র কংগ্রেসকে অবলম্বন করিয়া চালিত হইতেছিল। মহাত্মাকে অপসারিত করিতে না করিতেই এসব বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। যে কংগ্রেস একদিন বিধানের নিয়ন্ত্রা ছিল—আজ তাহার নিজের চলিবার যোগ্যতা নাই। দেশবাসী ভাবিয়াছিল মহাত্মার পরেও দেশে যোগ্যতর কংগ্রেসের তেমনি প্রভাব প্রতিষ্ঠা আছে। তাই আশাতরে অনেক দিন—সেই দিক পানে চাহিতে চাহিতে দেশের লোক আজ হয়রাণ নিরাশ হইয়াছে—বিশ্বাস হারাইয়াছে। দেশ-বাসীর এই লুপ্ত বিশ্বাসকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার যোগ্য লোক আবার দেশে আসিবে কি?

• • • •

জীবনের নানা বিভাগে বার বার অকৃতকার্য্য, অপ-মানিত লাঞ্ছিত হইয়া আমরা যদি দলাদলি মতভেদ ছাড়িয়া দিয়া এক যোগে কার্য্য করিতে হইবে। আমা-দের সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। কিন্তু মূল গলদ আমাদের রহিয়াছে ঐখানে—কিছুতেই আমরা একত্রিত সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারি না। সমস্বরে সম্মিলিত ভাবে দেশের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার সুর দিতে পারি না। তাই কোন জিনিষই আমাদের হাতে রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না। ধোঁয়ায় মিলাইয়া যায়। দেশ যদি তেমন সম্মিলিত ভাবে নিজ আকাঙ্ক্ষার রূপ দিতে পারিত তবে দেশের অবস্থা ফিরিয়া যাইত—নূতন শ্রী বিকশিত হইত। কিন্তু সে একতা এ দেশে আসে না কেন? দেশ আত্ম-সর্ব্বস্ব হইয়া সর্ব্ব সাধারণের অহিত ও নিজের মরণ এমন করিয়া ডাকিয়া আনিতেছে কেন?

• •

দেশের সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে অভাব আজ এমন তীব্র ভীষণ ভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে যে দেশের লোকে হিতাহিত কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান ক্রমশই বিস্মৃত হইতেছে। অভাব বিশেষ ভাবে নীচতার জন্মদাতা। অভাব উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তিকে দাবাইয়া রাখে কোন দিক দিয়া মাথা তুলিতে দেয় না—যাহার ঘরে আজিকার চলিবার যোগ্য অন্নের সংস্থান নাই সে নিজের ও পুত্র পরিজনের আসন্ন অনাহার মৃত্যুর কথা ভাবিবে না উচ্চ কোন বিষয়ের আলোচনায় মনোনিবেশ করিবে? অভাবের তাড়নায় দেশের ব্যক্তিগত—সমাজগত অনিষ্ট যথেষ্ট নিত্য হইতেছে। অনাচার, ব্যভিচার, অভাব জনিত লোভে দেশে যত হইতেছে অপর কিছুতেই বোধ হয় তত নহে

দেশ-গত কার্য্যও এই দেশের লোকের অতি অভাবে বার বার কি ভাবে প্রতিহত হইতেছে তাহা যাঁহারা খবর রাখেন তাঁহারা ভাল জানেন। প্রকৃত কর্ম্মী যাঁহারা আজ সুখ পারিবারিক সুখ হেলায় বিসর্জ্জন দিয়া দেশ কর্ম্মে আত্ম নিয়োগ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকে আজ না খাইতে পাইয়া মরিতেছেন।—আবার অনেক এমন আছে যাহারা উহার মধ্যেও বেশ কিছু গুছাইয়া লইয়াছে। তাহারা দেখিতেছে অভাব জাত দোষ আজ তাহাদের চলিবার উপায় করিয়া দিয়াছে। তাই আজ দেশটার জরের মধ্য দিয়া মিলিত জাতির পরম পরাজয়ের বিকট আর্ত্তনাদ ফুটিয়া উঠিতেছে।

• • • •

দেশ কর্ম্মে আত্মত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রয়োজন। নির্লোভ চিত্ত হওয়া দরকার। এমন কর্ম্মীর অভাব দেশে এক-জন নেতার প্রভাবে একদিন মিটিয়াছিল—আবার তাহা ঘটিতে পারে। কিন্তু পরিচালনার যোগ্য নায়ক দেশে নাই—তাহার অভাব যথেষ্টই আছে।

• • • •

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কর্ম্ম আলোচনায় দেখা যায় বাংলা আজ সব দিক হইতেই অনেক পেছনে পড়িয়া আছে। কাউন্সিলের দিক দিয়াই হউক বা অ-সহযোগের দিক দিয়াই হউক কিম্বা দেশের অর্থ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির দিক দিয়াই হউক বাংলার প্রচেষ্টা আজ কোন দিক হইতেই প্রশংসনীয় নহে। মাঝে মাঝে দেশের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে হয় বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া আসিয়া এ দেশটাকে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলে না কেন! আবার যদি সেই জলোচ্ছ্বাসের পর নূতনভাবে নূতন দেশ গড়িয়া উঠে! আজ দেশের নূতন সমাজ নূতন প্রাণ এই নিরাশার মধ্যেও দেশের আশা—কিন্তু কে ইহাদের চালক হইবে!

• • • •

ব্যয় সংক্ষেপ ও আয় বাড়াইবার জন্য নিত্য নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইতেছে। ব্যয় সংক্ষেপ কোনদিকে কতটা হইল তাহার পরিচয় আমরা বড় বড় ব্যাপারে তেমন কিছু না পাইলেও ছোট ছোট ব্যাপারে পাই। যেমন কোন বড় আফিসে ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হইবে—সেখ গরীব অল্প বেতনের কতকগুলি কেরাণীর অন্ন মারা। আর বড় বড় পদে বেশী মাহিনায় যাঁরা আছেন তাঁদের মাহিনা পূর্ব্বের চেয়ে কিছু বাড়িল। তাই অন্নহীনের দল ব্যয় সংক্ষেপের সংবাদে শিহরিয়া উঠে।

• • • •

আয় বাড়াইবার অনুষ্ঠানেও যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হইতেছে তাহাতেও দেশের লোকের প্রাণ কণ্ঠাগতই হইতেছে। দু'দিন পূর্ব্বেই হাসপাতালে দরিদ্র রোগীদের উপর দর্শনী কি চাপানো হইল—আবার কলিকাতা বাদ্য-যন্ত্রের দর্শকদের উপর দর্শনী বসিয়াছে। ইহাতে নাকি আয় বাড়িবে! দেশের লোকের অসন্তুষ্টি ও অসুবিধা ঘটাইয়া এমনি আয় বৃদ্ধির সব হাস্যকর পন্থা দেশে অনবরত চলিতেছে!

• • • •

এক সময়ে—সে খুব বেশীদিন পূর্ব্বের কথাও নহে—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজটি বাংলা দেশের বিদ্যামন্দির গুলির মধ্যে বিশেষ গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছিল। আজ শুনিতেছি এই বিদ্যামন্দিরটি নাকি উঠিয়া যাইবে। একশ বছরের পড়িয়া সংস্কৃত কলেজটি আজ উঠিয়া যাইবে কেন? বিশ্ববিদ্যালয় বলিতেছেন কলেজে যতটি অধ্যাপক রাখিবার নিয়ম তাহা নাই—গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন ছাত্র জোটেনা কলেজে—তাই অধ্যাপক রাখা পোষাইতেছে না। বাংলা দেশে এত পাশকরা ছাত্র কলেজে স্থান না পাইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর সংস্কৃত কলেজে ছাত্র জোটে না! আশ্চর্য্য ব্যাপার! সংস্কৃত কলেজটি তবে কি ছাত্রেরা বয়কট করিল!

• • • •

আমরা অনেক দিন হইল সংস্কৃত কলেজের নানা অব্যবস্থার কথা শুনিয়া আসিতেছি। সেই সব অব্যবস্থার জন্যই কি ছাত্রেরা ওখানে যাইতে চাহে না! একশ বছরের এই গৌরবময় প্রতিষ্ঠানটি উঠাইয়া দেওয়া গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বা দেশবাসী সকলের পক্ষেই একটা পরম লজ্জার কথা হইবে। উহার অবস্থা বর্ত্তমানে যাহা হইয়াছে, যে গলদ ঢুকিয়াছে তাহা দূর করিতে হইবে। শিক্ষাময়ী

ও ভাইস চ্যান্সেলর সংস্কৃত কলেজের গলদ গুলি দূর করিয়া আবার ইহার পূর্ব্বগৌরব ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করুন।

• • • •

ভারতীয়েরা শাসন সংস্কার শাসন সংস্কার করিয়া যতই গর্জ্জন ও চীৎকার করুক না কেন—শেষ কালে বৃটিশ জাতির মুখপত্রগুলি ভারতীয়দের সব সময়ই কিন্তু চরম কথা শুনাইয়া দিতে কসুর করে না! তাহারা বলে—'আমরা তরবারি দ্বারা ভারত জয় করিয়াছি—তরবারির দ্বারাই তাহা শাসন করিব।' কার্য্যকালে গণতন্ত্র কয় কিছু নয়—শক্তের যে সকলেই ভক্ত, নরমের যে সকলেই যম ইহাই পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

• • •

এদেশের লোকের ঘরের ঘোর কিন্তু কিছুতেই কাটে না। অমন আলিয়ানওয়ালাবাগে মেটে নাই—মধ্যযুগের মত লোকের কারাদণ্ডে মেটে নাই—সমরকরে মেটে নাই—তাহার উপর আবার কেনিয়া সমস্যা! তাহাও তো আশানুযায়ীই হইয়াছে।

• • • •

আলিগড় কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের বিবাদ বাধিয়াছিল। বিবাদে দু'পক্ষেই জখম হইয়াছে। বিচারে পুলিশের অল্পাধিক সাজাও হইয়াছে। পুলিশদের প্রভাব ও ঔদ্ধত্য এদেশে সর্ব্বত্রই এত বেশী কেন? কোন্ বলে ও কোন আইনে পুলিশ এমন ভীতির কারণ হইয়া বিরাজ করে?

• • • •

মহাত্মার অসহযোগে যাহারা একদিন বড় বিভীষিকা ও রাজনীতিক ভূলের গন্ধ পাইয়াছিলেন সেই সব সহযোগীরাই আজ আবার বার বার অপমানিত ও আশাভঙ্গ হইয়া অসহযোগী সাজিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতেছেন। ব্যক্তিগত সুবিধার খাতিরে যে যত সহযোগীই সাজ না কেন ঠুনকো কাচ দু'দিনেই ভাঙ্গিবে। তবে মনকে ফাঁকি ঠারিয়া যতদিন সম্মান ভোগ করা যায়!

• • • •

অসহযোগী সত্যাগ্রহী লোকদের কারাদণ্ড হয়, সঙ্গে সঙ্গে আবার অর্থদণ্ডও হয়। যে আত্মপক্ষ সমর্থন না করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করে সে যে অর্থদণ্ডও না দিয়া অতিরিক্ত কারাদণ্ডই গ্রহণ করিবে সে আর বিচিত্র কি? কিন্তু অর্থদণ্ড দিতে না চাহিলে কি হইবে। মোটর, ঘড়ি, অস্থাবর যাহা যার বা মেলে তাই প্রকাশ্য সরকারী নীলামে চড়াইয়া অর্থ আদায় করা হয়। এই সব জিনিস আবার দেশবাসীরাই কেহ কেহ সস্তায় কিনিয়া আনন্দিত হন। শেঠ যমুনালাল বাজাজের মোটরও নীলামে তোলা হইয়াছিল—কিন্তু ক্রেতা একজনও জোটে নাই। অমন ভাল মোটরের ক্রেতা যখন জোটে নাই তখন বোঝা যাইতেছে দেশবাসীর মনুষ্যত্বের জ্ঞান একটু জাগিয়াছে।

পঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়

* ১৯২১ খৃঃ ৩রা ডিসেম্বর পঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় গ্রেপ্তার হন। ১৯২২ খৃঃ ৭ই জানুয়ারী এক বৎসর সশ্রম ও ছয় মাস বিনা-শ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জেলে লালাজী পীড়িত হয়পাপর হন—গত ১৬ই আগষ্ট সন্ধ্যা ছয়টার সময় লালাজী মুক্ত হইয়া নিজ গৃহে ফিরিয়াছেন। এখনও তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই।

শিল্প মঞ্জুরী

[শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়]

প্রথম পর্য্যায়

(৪)

ফ্রক :—ছেলে মেয়েদের হাঁটিবার পূর্ব-অবস্থা হইতে ৫,৬ বৎসর পর্য্যন্ত ফ্রক আর একটী আরাম দায়ক জামা

ফ্রকের মাপ :—

লম্বা—২৪″ ছাতি—২২″ কোমর—২০″ পুট—৫″ পুটহাতা—১৫″ সেন্ত—৭″ মোহরী—৯″

ফ্রক কাটিবার নিয়ম :—প্রথমতঃ সেন্তের মাপে লম্বা দিক ডবল ভাঁজ করিয়া এড়ো দিকে ডবল ভাঁজ করিতে হইবে এইটী লক্ষ্য থাকে যেন, ছাতির ½ অংশ+৩″ ইঞ্চি ভাঁজ অবস্থায় যেন থাকে। তার উপর পাইপিন দাগ

১০ম চিত্র

কাটিতে হইবে। এই পাইপিন কাটিবার সময় সেন্তের মাপের ২″ ইঞ্চি বাদ দিয়া বা কিছু কম বাদ দিয়া কাটা যায়। মনে করুন ক ও খ সেন্তের মাপের ২″ ইঞ্চি বাদ দিয়া রেখা হইল অর্থাৎ ক ও খ ৫″ ইঞ্চি। ক ও গ ছাতির ½ অংশ বাদ ½″ ইঞ্চি (ছাতির ½ অংশ ৫½—½″—৫″) গ ও ঘ ছাতির ½ অংশ+২″ ইঞ্চি (ছাতির ½ অংশ ৫½″+২″—৭½″ ইঞ্চি) ক ও চ কোমর ½ অংশ+১½″ (কোমরের ½ অংশ ৫″+১½″—৬½″ ইঞ্চি) ঘ ও চ সংযোগ করিয়া ক ও ছ পুট মাপ ৫″ ইঞ্চি+½″ ইঞ্চি ছ, ঙ সোজা মোহড়ার লাইনের সঙ্গে সংযোগ করিয়া ছ, ঘ চিত্রানুযায়ী বাঁকা ভাবে সংযোগ করিতে হইবে।

ফ্রকের অনেক রকম গলার কাঁট ছাঁট (Cutting) হয়। কেহ বা গোল কলার (Round Collar) কেহ বা চৌকা কলার (Square Collar) কেহ বা পেন্টীর গলার কলার পছন্দ করে। এইখানে চৌকা কলারের ফেসন দেখাইব। ক ঝ ছাতির ½ অংশ অর্থাৎ ৩″ ইঞ্চি ঝ, ট ও ঝ, ঠ ১½″ ইঞ্চি নীচে রাখিয়া দাগিয়া লইতে হইবে। তারপর ঠ, ট, ঝ, ছ ঘ, চ ও ঘ চিহ্নিত দাগে কাটিয়া লইলে পেছন কাটা শেষ হইল। অর্থাৎ দুই টুকরা কাপড় চারি ভাঁজে কাটা শেষ হইল। এখন উপরের মোড়া দাগ রেখা যে দুই ভাঁজ কাপড় আছে তাহাতে সামনার সামান্য দাগিয়া লইতে হইবে। ঠ ও ১ চিহ্ন ১″ ঝ ও ২ চিহ্ন ৩″ অর্থাৎ ট ও ২ চিহ্ন ১″ ইঞ্চি নীচে দাগ দিয়া ১, ২, ঝ দাগে কাটিয়া লইলে সামনার চৌকা কলার কাটা শেষ হইল। এখন ছ, ঙ, ঘ, ড ট (বিন্দু) রেখা অংশে কাটিয়া লইলে সামনার মোহড়া কাটা শেষ হইল। তারপর লম্বা মাপের পাইপিন এর অংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট যত ইঞ্চি রহিল তার সঙ্গে নীচের পটির জন্য ৩″ ইঞ্চি কাপড় বেশী রাখিয়া ১½″ ইঞ্চি পরিমাণ কাপড় নীচের পটির জন্য তার ২½″ ইঞ্চি উপরে সরু পটী দিবার জন্য অতিরিক্ত ১½″ ইঞ্চি কাপড় রাখিয়া কোমরের মাপের ডবল কাপড় মেরের জন্য কাটিয়া লইলে ফ্রক কাটা হইবে।

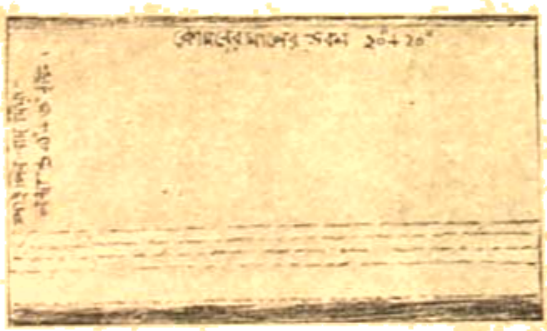

১১শ চিত্র

হাত কাটিবার নিয়ম :—কাপড়ের লম্বা দিক পুট বাদ দিয়া পুট হাতার মাপ অনুযায়ী কাপড়কে ডবল ভাঁজ করিয়া এড়ো দিকে ছাতির ½ অংশ অর্থাৎ ৫½″ ইঞ্চি ভ ও ত ১½ ইঞ্চি ভিতরে রাখিয়া চিহ্ন করিতে হইবে। ঢ ও ণ সোজা লাইনে

চিহ্ন করিয়া ত ধ চিত্রানুযায়ী বাঁকা ভাবে সংযোগ করিতে হইবে। ত ও থ মোহরী ৬″ ইঞ্চি অর্দ্ধেক + ১½″ ইঞ্চি অর্থাৎ ৭½″ ইঞ্চি স্থানে দাগ করিয়া ত, ধ, থ ও ত দাগানুযায়ী কাটিয়া লইলে হাত কাটা শেষ হইবে।

১১নং চিত্র

ফ্রক সেলাই :—প্রথমতঃ দেখিতে হইবে ফ্রক সেলাই করিবার সময় কি অনুপাতে করিলে সুবিধা হইবে। ফ্রকের পেন্ডীর মত পেছন দিকে বোতাম ঘর বা আই হুকের কাজ বসান যায়। পিছনের যে পাইপিন কাটা হইয়াছে, তাহার মাঝামাঝি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া কাটা অংশে একটী ½″ ইঞ্চি পরিমাণ পটী বসাইয়া অপরটি এক ইঞ্চি পরিমাণ পটী বসাইয়া নিয়া সেলাই করিয়া লইতে হইবে। তারপর সাম্‌নার কাপড়ের বুকের উপর কয়েকটী সরু পটী দিতে হইবে। সাম্‌না ও পেছনের চৌকা গলার গলা যে কাটা হইয়াছে তার উপর ১½″ ইঞ্চি পরিমাণ ফ্রিল বসাইয়া চিত্রানুযায়ী বসাইবার সময় ফ্রিলের দুইধারে যে কাপড়ের ফ্রক হইবে তার বিপরীত অর্থাৎ যদি সাচ্চা হয় রঙীণ কোন রকমের সরু ফ্রিলের ভিতরে সাদাস্থ দেখা যায় মত রাখিয়া বসাই করিয়া লইলে দেখিতে সুন্দর দেখাইবে। এখন পাশ ও কাঁধ জুড়িয়া সেলাই করিয়া লইতে হইবে। পাইপিনের সেলাই হইয়া গেল। বুকের কাপড় যে কাটা হইয়াছে তাকে কুঁচি দিয়া অর্থাৎ পাইপিনের কোমরের সঙ্গে সমান কুঁচি দিয়া সেলাই করিয়া তার উপর ফ্রিল বসাইয়া দিলে সুন্দর হয়, যেমন গলায় ফ্রিল বসান হইয়াছে। তারপর নীচের ১½″ ইঞ্চি পটী সেলাই হইবে। সেলাই করিবার পূর্ব্বে মনে থাকে, যেন—লম্বা মাপ ঠিক থাকে।

১২নং চিত্র

হাত সেলাই :—যদি সোজা সুদ্ধি হাত সেলাই করিতে হয় তা'হলে পেন্ডীর হাতের মত সেলাই দিতে হইবে। যদি ফুলো হাত করিতে হয় যে হাত কাটা হইয়াছে, তার উপর এই হাতের ওজন এক টুক্‌রা সে মত কাটিয়া এই দাগ দেওয়া হাতের উপর কুঁচি দিয়া সেলাই করিয়া যাহাতে মাঝখানের ফুলা অংশ সরিয়া না যায়—মাঝখানে কয়েকটী সেলাই দিতে হইবে, সেলাই হইয়া গেলে ফ্রকের বুকে ও পেছনের যেরূপ ফ্রিল দেওয়া হইয়াছে সেরূপ ফ্রিল বসাইয়া দিলে হাতের মোহরী সেলাই হয়; অথবা ফ্রিলের সঙ্গে লেস দিয়া সেলাই দিলে দেখিতে আরও সুন্দর হয়। এখন হাতের দুই দিক জুড়িয়া ফ্রকের মোহেড়ার সঙ্গে হাতের মোহড়া জুড়িয়া নিলে ফ্রক সেলাই সম্পূর্ণ হইবে।

এখন পেছন দিকে যে কাজঘর ও বোতাম পটী ঘর হইয়াছে তাহাতে চারিটী বোতাম ঘর করিয়া বা হুক বসাইয়া নিয়া বোতাম পটীতে সমস্থানে বোতাম বা আই বসাইয়া লইলে ফ্রক সম্পূর্ণ হইবে।

এর পর ফ্রকও অন্য বিষয় থাকিবে।

সওগাত

ফ্রান্সে এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত একটি সাবানের কারখানা এখনও বর্ত্তমান আছে।

• • •

গড়ে প্রত্যেক ইংরেজ বৎসরে ৮৩ খানা পত্র লেখেন এবং প্রত্যেক আমেরিকাবাসী ১১ খানা চিঠি লিখিয়া থাকেন।

• • •

মাকড়সার ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত চক্ষু থাকে।

সাইবিরিয়ার 'ভোমদকান'ই পৃথিবীর প্রাচীনতম নগরী।

• • • •

গড়ে ইঁদুর একদিনে ১০৪ মাইল দৌড়াইতে পারে।

• • • •

১৭৭৫ সনে Machine-gun আবিষ্কৃত হয়।

• • • •

যুক্ত সাম্রাজ্যে ১১৩ খানা সংবাদ পত্র ও ১৪ খানা সাময়িক পত্র নিগ্রো কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়।

(Tit bits)

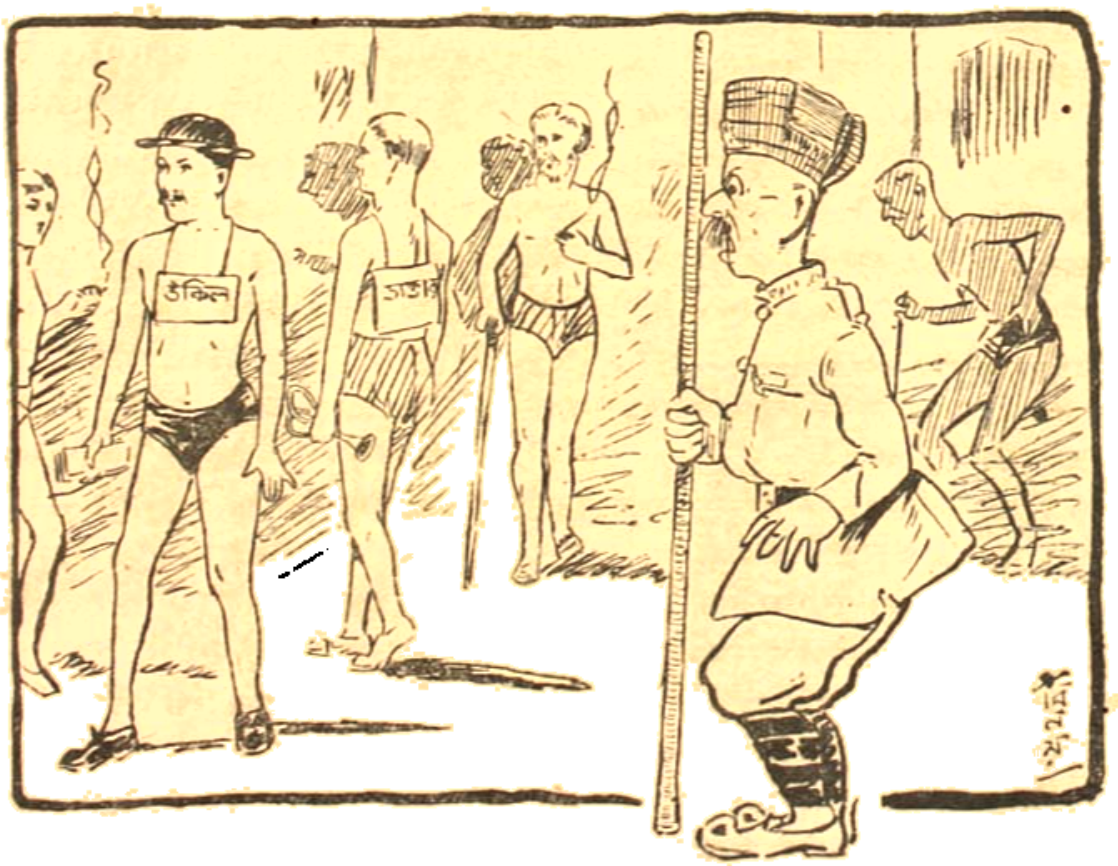

এই কলেই সব দিক রক্ষা হয়।

করবী

[শ্রীলীলাদেবী]

"অতীন বাবু!"

—"কে? মিস্ রায় নাকি?"

—"হ্যাঁ আমিই—আপনি ক'রেছেন কি আজ? সন্ধ্যা হ'ল যে, এখনো চা খেতে এলেন না?"

—"আপনারা চা খাওয়া সেরে ফেলুন—আমার জন্যে মিথ্যা অপেক্ষা ক'রবেন না—আমার একটু দেরী হবে আজ!"

—"এত কি কাজ আপনার পড়'ল? আচ্ছা, আপনাকে আর বিরক্ত ক'রব না—কাজ সেরে ড্রইং রুমে আসবেন, সেখানে চা ঠিক ক'রে রাখলুম।"

এই ব'লে করবী ড্রইং রুমে গিয়ে একখানা গানের খাতা বের ক'রে music stoolএ ব'সে অর্গ্যানের ঢাকাটা খুলে ফেল্লে। সাম্নেই একটী টিপয়ে দুজনের উপযোগী চায়ের সরঞ্জাম সাজান ছিল। করবীর বাবা মা, ভাই, বোনরা সবাই চা খেয়ে যে যার নিয়মিত ব্যায়াম, খেলা, সান্ধ্য-ভ্রমণ বা নিমন্ত্রণ রাখতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন শুধু করবীই বাড়ী ছিল। অতীন বাবুনি ব'লে তার খাওয়াও হয়নি, কারণ অতীন বাবু প্রথমতঃ অতিথি; দ্বিতীয়তঃ তার গানের গুরু!

খোলা অর্গ্যানের সাম্নে ব'সে করবীর দৃষ্টি জানালার বাইরে আকাশের গায়ে শেষ সূর্য্য-রশ্মির রক্ত রঙে ডুবে গেলো। আহা কি সুন্দর! পাখীরা দলে দলে বাসায় ফিরছিল, হাস্নাহানার তীব্র গন্ধ বাতাসের হিল্লোলে কেঁপে কেঁপে ঘরে এসে করবীর গানের বইএর খোলা পাতা উড়িয়ে দিচ্ছিল। তার সুন্দর ললাটের চূর্ণ কুন্তল উড়ে উড়ে তার গালে এসে পড়াতে তারী সুন্দর দেখাচ্ছিল, একখানি সাদা প্রতিমা—দিকে নীল রঙের সাড়ীখানি চুড়ীর রোচ্ দিয়ে কাঁধের উপর আঁটা গায়ে বেগুনি রঙের হাতকাটা জ্যাকেট, গলায় কোয়ারা প্যাটার্নের হার, কাণে দুটী চুণীর দুল্ ও সুগোল মণিবন্ধে দু'গাছি সোণার চুড়ী, এর বেশী গহনা যদিও তার গায়ে ছিল না।

করবীর উদাস দৃষ্টি এবার আকাশ থেকে নেমে এলো—পাশের জান্লা দিয়ে সে দেখতে পেলে ওধারে চাঁদ উঠেছে—বাগানের সবুজে তরল রূপালী, পরীরাজ্যের স্বপ্ন মায়ার ফাঁদ পেতেছিল। তারই কুহক মদির এক নিঃশ্বাসে করবীও খানিকটা যেন পান ক'রে ফেল্লে—কিন্তু সে বুঝি তার অজ্ঞাতে! ওঃ! অনেকক্ষণ সময় তো সে মিথ্যাই ভেবে কাটিয়েছে, গান অভ্যাস তো হ'ল না একটুও।

চাঁদের আলো ঘরের এক কোণে রাখা ফুলদানীর উপর এসে প'ড়েছিল—একটি নিঃশ্বাস ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে করবী বিজুলী বাতির সুইচ্‌টা টেনে দিলে। দিতেই ঘরখানা উজ্জ্বল আলোয় ভ'রে উঠ্‌লো। করবীর আকাশ চাওয়া মনটাও যেন কতকটা বাস্তব জগতে নেমে এলো বিজ্ঞান যন্ত্রালোকের সম্ভ্রম প্রভায়। টীপয়ের উপর সাজান চায়ের সরঞ্জামের দিকে চেয়ে সে চাকরকে ডেকে হুকুম দিলে নতুন ক'রে চায়ের জল নিয়ে আসতে। তারপরে খানিকক্ষণ গলা সেধে গান সুরু করে দিলে—

কামনা মোর কুসুম হ'য়ে
উঠুক ফুটে
লালসা থাক্ বিরাম হ'য়ে
হৃদয় পুটে
সকাম কাজের মোহ আমার
কিরণ চূড়া মণি চাপার—
—পরাগ হ'য়ে সুবাস বিলাক্
পাপড়ি টুটে—

গাইতে গাইতে অকারণে কি সকারণে কে জানে, করবীর চোখের পাতা ভিজে উঠ্‌লো। সে তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে চোখ মুছে ফেলে গানটা শেষ ক'রতে যাচ্ছিল ঠিক্ সেই সময় গানের তৃতীয় কলি গাইতে গাইতে অতীন্দ্র ঘরে এলেন—অতীনের গলার সুরে করবীও তার গলা মিলিয়ে দিলে—

আমার বাঁধন, মিথ্যা কাঁদন,
ব্যথার ভার
হয় হ'য়ে যাক্, গান হ'য়ে যাক্,
তোমার দ্বার
যাযাবরা মনের কালো
হ'ক্‌না ক্ষণিক্ চাঁদের আলো
সুধা তাহার বিশ্ব চকোর
নিক্‌না লুটে!

২

জোর করা হাসি হেসে করবী ব'ল্লে—"সত্যি গানটা এমনি জমে গিয়েছিল যে তাল ভঙ্গ হওয়ার ভয়ে আপনাকে চা খাওয়ানর দেরী হ'য়ে গেলো—কি ক'রলেন বলুন দিকি আজ সেই কোন সকালে ১১টায় ভাত খেয়েছেন আর এ পর্য্যন্ত—" ব'লতে ব'লতে করবী চায়ের পেয়ালা সাজিয়ে দু' পেয়ালা চা তৈরী ক'রে অতীনের হাতে এক পেয়ালা দিয়ে তারপর পেয়ালাটী নিজের হাতে তুলে নিলে। বিস্মিত হ'য়ে করবীর দিকে চেয়ে অতীন্ ব'লে উঠ্‌লো—"এ কি আপনিও খাননি না-কি এখনো? কি অন্যায় বলুন দিকিন্? আমি ভারী লজ্জিত হ'য়েছি! এ ভারী অন্যায়—"

—"আর আপনার এতক্ষণ উপোসী থাকাটা বুঝি অন্যায় নয়?"

"—না না আমার যে এ সব অভ্যাস আছে। মনে করুন খেটে খাই, চাইলে খাবার খাওয়া কি আর সব সময়ে জোটে! আপনাদের এখানে আছি তাই। আমার কিন্তু মনেই ছিল না যে আমার খিদে পেয়েছে—"

—"তাহলে খিদে পাওয়াটা মনে করিয়ে দেবার জন্যে আপনার একজন লোক দরকার বলুন? তা সে চেষ্টা—"

—"না—না—আপনার সঙ্গে গাইতে গাইতে সে কথা একেবারে—"

—"তাহলে গান গেয়েই পেট ভরে গেছে বলুন?"

হাসতে হাসতে অতীন ব'ল্লেন—"তা গানের এমন সঙ্গী পেলে না খেয়েও থাকা যায় বইকি।"

চায়ের খালি পেয়ালাটা টেবিলে রেখে দিয়ে গানের খাতার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নিরুত্তর করবীর মুখের দিকে চেয়ে অতীন আবার ব'ল্লেন—"এবার কি নতুন গান শিখবেন বলুন? এ গানটা আর শিখে কাজ নেই—এত বৈরাগ্যের গান আপনার মুখে এখন মানাবে না।"

সলজ্জ হাসির সঙ্গে করবী ব'ল্লে—"না, না, ওটাই আর একবার গাই আমি, গানটা ভালো ক'রে শেখা যাক্ এটা আমার ভারী ভালো লেগেছে।"

হাসতে হাসতে অতীন ব'ল্লেন—"ছেলেদের যেমন বুড়ো হ'তে সাধ যায়, আপনার তেমনি নতুন অনুরাগের পালায় বৈরাগ্যের গান ভালো লাগ্‌ছে বুঝি?"

—"আপনি বেশ লোক তো! নতুন অনুরাগের পালা কে ব'ল্লে আপনাকে?"

—"আমি নাই বলি সবাই তো ব'লছে—বিমলেন বাবুর সঙ্গে তো আপনার বিয়ের ঠিক হ'য়ে গেছে!"

ব'লতে ব'লতে জোর করা হাসি হেসে অতীন চেয়ে দেখলে করবীর মুখখানি হঠাৎ বিমলিন হ'য়ে গেছে; এক মুহূর্ত্ত ভেবে নিয়ে অতীন ব'ল্লেন—"আচ্ছা আর ঠাট্টা ক'রব না আপনাকে! আপনি ভারী ছেলেমানুষ ঠাট্টা বোঝেন না। নিন্ আরম্ভ করুন—কি গান চান বলুন?"

—"আজ আর গাইবো না, ভালো লাগ্‌ছে না।"

অন্যমনস্ক ভাবে অতীন ব'ল্লে—তবে কি করা যাবে আর! এমন সন্ধ্যাটা একটা কিছু না ক'রলেও—"

—"আপনার বাড়ীর গল্প করুন একটু শুনি—পাড়া-গাঁয়ের গল্প শুনতে আমার ভারী ভালো লাগে।"

—"আমি তো দেশে আজকাল বছরে দু'তিন মাসের বেশী থাকতে পারি না; কলকাতায় গানের চাকরী নিয়েই থাকতে হয়—তবু যখন যাই এত ভালো লাগে। সেখানে এ সব গোলমাল কোলাহল কিছুই নেই, নিশ্চিন্ত শান্তিতে

গ্রামখানি ঘুমিয়ে থাকে। আমাদের বাড়ীর পুকুরের বাঁধান ঘাট আছে, ভালো জল, তাই গ্রামের মেয়েরা অনেকেই জল নিতে আসে। গরমিকালে সন্ধ্যাবেলা আমি আমার মা তাই বোনরা সবাই মিলে ঘাটে ব'সে গল্প করি, চাঁদের আলোয় পল্লীর তখন কি শোভা!" করবী তাড়াতাড়ি ব'লে—"আলোটা নিবিয়ে দেবো অতীনবাবু? আমাদের ঘরেও ত চাঁদের আলো এসেছে।"

—"না আলো নিভিয়ে কাজ নেই"—এই কথাই অতীন ব'লতে যাচ্ছিলেন কিন্তু করবীর অনভিজ্ঞ সারল্যে মুটীল অভিজ্ঞতার সতর্কতা দেখাতে অতীনের মন কুণ্ঠায় ভ'রে গেলো। সে ব'লে—"বেশ তো দিন্‌না।"

করবী এতক্ষণে বুঝলে আলো নিভিয়ে সে ভারী ভুল ক'রেছে, কিন্তু এখন বিনা ওজরে আলো জ্বালাটাও অভদ্রতা—যেন অতীনের সম্বন্ধে তার বিশ্বাস নেই! তাই করবী সহজ ভাবেই ব'লে—"তারপরে আর কি করেন? আপনাদের দেশের গল্প খানিকটা বলুন।"

এর উত্তর করবী পেলে না—অতীন তখন গুণ গুণ ক'রে গাইছিল, তাই করবীর কথা শুনতে পায়নি—

— গানটি আমার গিছল যে আজ
রাজার সভা ঘরে—
ঠাঁই মিলে না মিললো যে তাই
গভীর হতাদরে
সবার গানের মালাগুলি
ছিল-রতন মণির মুলি
আমার গানের মালায় ছিল
কুসুম থরে থরে!
চ'লতে পথে কিরণ পাতে
শুখালো ফুল প্রখর তাতে
তাইতে তারে চাইলে না কেউ
রাখলে না কেউ ধরে!
তুমা ওরে, ওরে ও গান!
শুখনো ঝরা নিরাশ ও প্রাণ
আজকে তোরে আসিয়ে দেবো
শ্রোতের মুখে ঝড়ে
সে নীল সুকে মিলবে রে তোর
পরম সমাদরে।

মুগ্ধ শ্রোতা গান শেষের সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠ্‌লো—"কি সুন্দর গলা আপনার অতীন বাবু!"

—"সত্যি ব'লছ করবী?"

এই প্রথম করবীর মধুর নামটী অতীন উচ্চারণ ক'রে ফেলেন, তাই তাড়াতাড়ি তাঁকে ত্রুটী স্বীকার ক'রতে হ'ল। করবী তার উত্তরে সরল ভাবেই ব'লে—"নাম ধ'রে ডাকবেন এ সাধ যে কতদিনের তা জানলে আর এ কথা ব'লতেন না।" ব'লতে ব'লতে করবীর চক্ষু আবার সজল হ'য়ে উঠ্‌লো।

"করবী!"

—"কি বলুন?"

—"আচ্ছা আমাদের এ বন্ধুত্ব কতদিন থাকবে মনে হয়?"

—"যতদিন চন্দ্র সূর্য্য আছে।"

"মিথ্যা কথা!"

—"সেটা আপনার বোঝবার ভুল। প্রত্যক্ষ সত্যকে মিথ্যা বলবার অধিকার আপনার নেই!" ব'লতে ব'লতে উত্তেজনায় করবীর স্বরটা একটু কেঁপে উঠ্‌লো। অতীন কিন্তু ধীর ভাবেই ব'লেন—"আমি না ব'লেও একদিন তুমি নিজেই বুঝতে পারবে—ধরো তোমার বিয়ে হ'য়ে গেলে তারপরে কি আর আমরা এমন ভাবে মিশ্‌তে পারবো?"

—"কেন পারবো না? বিয়ে হ'লেই কি মানুষকে বন্ধুত্ব রাখবার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হ'তে হয়? এমন অদ্ভুত কথা তো কখন শুনেছি ব'লে মনে হয় না।" ব'লতে ব'লতে করবীর মুখে একটু বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠ্‌লো। ব্যথা পীড়িত মুখের দৃষ্টি করবীর মুখে নিবদ্ধ ক'রে অতীন ব'লেন—"তা হয় না করবী!"

—"তাহ'লে এও দেখে নেবেন, এ বন্ধুত্ব নষ্ট করার সাধ্যও কারো নেই!"

৩

তারপর দিনও অতীন ঘরের ভিতর নিজের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত রইলেন যে সকালে চায়ের টেবিলে তো তাঁর দেখাই পাওয়া গেলো না, দুপুরেও সকলের খাওয়ার শেষে যখন তিনি ঘরে ঢুকলেন তখন এই বেলা

হওয়ার দরুণ লজ্জায় ওঁর কাণ ও কপাল লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। যে করবী দু'দিন বাদে পরের ঘরে চ'লে যাবে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের মায়ায় জড়িয়ে চির-বিরহ ভোগ করবার জন্যে নিজেকে ধূপের মত জ্বালিয়ে দিয়ে নিঃশেষে ছাই হ'য়ে যাবার জন্যে যে তিনি করবীর সংসর্গ এড়িয়ে চ'লছিলেন—তা নয়—নিজে না এর ছাই হয়েই বা বিরহের দাহন শেষে ধূলো গুঁড়ো হ'য়েই যাওয়া গেলো তাতে তো কিছু এসে যায় না; কিন্তু এ যে সরলতার প্রতিমা, করবী! যে মা জেনে না বুঝে আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হ'য়েছে তাকে তো বাঁচাতে হবে। সেই জন্যেই খাবার সময়ে না এসে অন্যদিকে চুপি চুপি খেয়ে নিয়ে নিজের কাজ নিয়ে থাকবার চেষ্টা ক'রছিলেন —যাতে না করবীর সঙ্গে মিশতে হয়। কিন্তু তাকে এড়িয়ে চলবার জন্যেই যে অতীন্দ্র এ ব্যবস্থা করে নিয়েছেন তা করবীর সরল মন ভেবে উঠ্‌তে পারেনি কারণ তার মন কোনদিনই দূরদর্শীতার অণুবীক্ষণে ভবিষ্যতের ঘটা-ঘেরাচ্ছন্ন জীবনাকাশের দিকে চেয়ে দেখেনি। আর এও তার সহজ মনের কোনখানেই কোনদিন ফুটে ওঠেনি যে নির্মল বন্ধুত্বের মধ্যেও অনুরক্ত দহন-জ্বালার বীজ লুকিয়ে থাকতে পারে।

বিকেলে অতীনের ঘরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে করবী ব'ল্লে—"আজও কি আপনার চা খেতে সন্ধ্যা হবে না কি? আচ্ছা, এত কি ভারী Despatch নিয়ে আপনি ব্যস্ত বলুন তো?"

ঘরের ভিতর থেকেই চেঁচিয়ে অতীন্দ্র ব'ল্লেন—"বাস্তবিক! আজ প্রায় ৫।৬ পাতা লম্বা চিঠি লিখতে হ'য়েছে দু'তিন খানা, তাছাড়া মাইনের জন্যে তাগাদা ক'রে দশ বারো জায়গায় লিখতে হ'ল। তার পর বাড়ীতে একটা বেনো জমি নিয়ে মকর্দ্দমা হ'চ্ছে, সে সম্বন্ধেও এখানকার উকীলদের মতামত লিখতে হ'ল। তুমি আমার জন্যে কেন মিথ্যা wait ক'রছ—আমার এখনো অন্ন বেলা আছে—"

তার খানিকটা পরে অতীন্দ্র যখন একেবারে বাইরে যাবার সাজে তৈরী হ'য়ে দুইং রুমের পাশ কাটিয়ে বাগানে নামতে যাচ্ছেন তখন তাঁরই প্রতীক্ষায় একলাটি বাগানের দিকে চেয়েই করবী ব'সেছিল—হঠাৎ তাঁকে বেরিয়ে যেতে দেখে অবাক্ হ'য়ে করবী চেঁচিয়ে ব'লে ফেল্লে—"কি ভয়ানক লোক আপনি! আপনার জন্যে আমি আজ সারা বিকেলটা বাড়ীতে ব'সে আছি। মিসেস্ ঘোষের গার্ডেন পার্টিতে পর্য্যন্ত গেলুম না, আর আপনি কিনা বিনা দ্বিধায় আমাকে একটা কথা পর্য্যন্ত না ব'লে লুকিয়ে পালাচ্ছেন! ভয় লোক যাই'ক "

ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জায় অতীন্দ্রের চোখ মুখ লাল হ'য়ে উঠেছিল, তিনি তাড়াতাড়ি মিনতির সুরে ব'ল্লেন—"আমি জানতুম না তুমি একলাটি থাকবে করবী! আমি ভেবেছিলুম এখনি বুঝি তোমার সঙ্গে সদ্ভালাপ ক'রতে দ্বিজেনবাবু আসবেন তাই আমি আর তার মধ্যে থেকে বাধা হ'তে যাবো কেন—তাই ভাবলুম একটু বেড়িয়ে আসি—জান তো "Two is company three is none"

করবীর রাগ তখন একটুও পড়ে নি সে কাঁপা ঠোঁটে ও ছলছল্ চোখে ব'লে ফেল্লে—"এঁরাই নাকি আবার স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্যে বক্তৃতা দিচ্ছেন। নারীর অধিকার তাকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে কাগজে কলমে লড়াই লাগিয়েছেন! স্ত্রীলোককে ফাঁকি দেওয়াই যাদের ধর্ম্ম এবং আনন্দ, স্ত্রীলোককে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করেই যারা বীরত্বের গর্ব্বে বুক ফুলিয়ে বেড়ায় সেই জাতই নাকি আবার ভারতের সব জাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ শক্তি সম্পন্ন চিন্তাশীল মনীষী ও কবি আখ্যায় ভূষিত!" করবীর এই উত্তেজিত ভর্ৎসনা ঘাড় হেঁট ক'রেই অতীনকে মেনে নিতে হ'ল—এর বিরুদ্ধে তার তো কিছুই বলবার নেই! ব'লতে গেলে যে অনেক কথাই এসে পড়ে, তাই সে প্রতারক নামের লজ্জাকে নীরবেই বহন ক'রে নিলে। একটু পরে করবীর রাগটা প'ড়ে এলো তখন সে লজ্জিত অতীনের দিকে চেয়ে নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জা বোধ ক'রছিল, সেটাকে কাটিয়ে ফেলবার জন্যে একটু হেসে অতীনের মুখের দিকে চেয়ে ব'ল্লে—"আচ্ছা আপনি দিনরাত কি ভাবেন বলুন তো? এত গুরুতর বিষয় নেগার আপনাকে—আজ আরো বেশী দেখাচ্ছে—"

অতীন্দ্রের বুকের ভিতর থেকে একটা উষ্ণ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো, জোর ক'রে হেসে ব'ল্লেন—"ভাবনা যে অনেক রকমের করবী! বিধবা মা আছেন, আমিই তাঁর বড় ছেলে, দুটি অবিবাহিতা বোন আছে, তাদের তো বিয়ে দিতে হবে! তার উপর বিধবা এক পিসী আছেন, তাঁর আবার এক মেয়ে আছে, সেও বিয়ের যোগ্য হ'য়ে উঠেছে, তারও তো বিয়ে আমাকেই দিতে হবে। আমাদের হিন্দু ঘরে তো আপনাদের মত বিয়ের ভাবনা বর-ক'নে ভাবে না, কর্তৃপক্ষকেই ভাবতে হয়। এই সব নানা ঝঞ্ঝাট!"

একটু থেমে অতীন আবার ব'ল্লেন—"আচ্ছা, আপনাদের Engagementএর দিনটা তাহলে কবে ঠিক হ'ল?"

(আগামী বারে সমাপ্য)

'দে'র দান সাগর

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি এ]

দে দে বলে ঘোর ভেঙে দেয়
কাবুলী ওলার দোস্ত সে
কারবারী সে শুদ্ধ টাকার
ব্যবসাদার ও মস্ত সে।
হুণ্ডি পেতে রয় সে বসি
তাগিদ্ পাঠায় অহর্নিশি,
বন্ধ ভাষার রুদ্ধ ভূমে
ফকির অবরুদ্ধ সে।
বর্ণমালার অগ্রদানী
ভাট ভিখারী সাহিত্যের,
শব্দমরুর এই বেদুইন
ধার ধারে না দারিদ্র্যের।
নদীর সম দিন ফুকারে
চায় সদা চায় যারে তারে,
মৎস্য পুরাণ হয়নি লেখা
উহার পূরা মাহাত্ম্যের।
ভাষার ভীষণ ভস্মলোচন
দর্পণে নাই দৃষ্টিটা,
আকাঙ্ক্ষা তার গ্রাস করে ভাই
গ্রাস করে এই সৃষ্টিটা।
"মুই ভুঁখা হুঁই বলছে জোরে,
দে রামা দে মানুষ দেরে"
ফকির সাথে চাদুতা চায়
চাল কলা আর মিষ্টিটা।
এমন 'দে' এর দান সাগরে
হস্তী ঘোড়া মিলবে কি?
হায় ভাষা 'দ'র ভাগর পেটে
জোয়ার ভাটা খেলবে কি?
দানবদেবী বংশ ওটা
ইচ্ছা উহার স্বর্গ লোটা।
হচ্ছে লোটা ওই দরবেশ
'হেথায় দে রাম' ভুলবে কি?

গ্রীষ্মের দিনে

স্নানের আরাম পাইতে, শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে, আমাদের আইডিয়াল্ গ্রীসেরিন্ এবং ভেসিলে প্রস্তুত সুগন্ধি—চন্দন, রজেলবকুল বাসুন ও ভায়লেট সাবান ব্যবহার করুন।

ইণ্ডিয়ান্ সোপ ফ্যাক্টরী

৩৪।১এ বেচুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন ২৪৯৬

বাল-বিধবা

(গল্প)

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

১

বাবা ছিলেন রেল কোম্পানির চাকর। সাহেবকে ঘুঁষ দিতে না পারায় কলকাতা থেকে পাড়াগাঁয়ের একটি ছোট ষ্টেশনে তাঁকে বদলি হ'তে হ'ল। সে বার তিনি একটি ভাল ছেলে পেয়ে দেশের জমি-জমা বিক্রী ক'রে সর্ব্বস্ব খুচিয়ে আমার বিয়ে দিলেন। তাই ঘুঁষের টাকা সময়মত সাহেবকে দিতে পারেন নি।' বারো পেরিয়ে তেরোয় পা দিতে-না-দিতে আমার হাতের শাঁখা কপালের সিঁদুর ঘুচে গেল। আমার স্বামী পরীক্ষার পড়া পড়তে গিয়ে রাত জেগে অসুখ ক'রে হঠাৎ মারা গেলেন। সেই শুভ-দৃষ্টির সময় দেখেছিলাম—জীবনে আর দেখা হ'ল না। আজ যৌবনের প্রথম উন্মেষে সেই কন্দর্প-বিনিন্দিত চেহারাখানির কথা কেবলই মনে পড়ে। আজ আমার এই বিপুল রূপযৌবন সে দেবতার পায়ে নিবেদন করতে পারলাম না। তাঁর অভাবে মরণের মধ্যে ঝাঁপ দিতেও তো পারলাম না!

২

কামারখালি ষ্টেশনের চারিদিকে যে কয়খানি গ্রাম আছে, সবগুলিতেই মুসলমানের বাস। ষ্টেশন দিয়ে যখন বরযাত্র, বিয়ের ক'নে দেখতো—আমি বাজনার শব্দে ছুটে বেরিয়ে এসে দেখতে যেতাম। আমাদের দুধ-ওয়ালীর মুখে শুনতাম তাদের মুসলমান সমাজ হ'লে আমার মত মেয়ের আবার বিয়ে হ'য়ে যেতো, আর আমার রূপ নাকি এতই ছিল যে নবাব-বাদশার ঘরে আমাকে সেধে নিয়ে যেতো। রাতে শুয়ে শুয়ে যখন শূন্য বুকের হাহাকার ধ্বনিতে সমস্ত প্রাণটা কেঁপে কেঁপে উঠতো—তখন এক একবার মনে হতো আমি যদি মুসলমানের ঘরেই জন্মাতাম!

৩

বছরের পর বছর মা ষষ্ঠীর কৃপায় আমার এক একটি ভাই বোন বাড়ে—মা একা তাদের মানুষ ক'রে উঠতে পারেন না; আমি বাপের বাড়ী থাকতে মায়ের কষ্ট অনেকটা লাঘব করতে পারতাম। ভগবান গরীবের ঘরে কেন এতগুলিকে পাঠালেন, ভেবে বড় দুঃখ পেতাম। বলতে কি আমাদের দু'বেলা দু'মুঠো ভাতই জুটতো না —তো আর দুধ কোথায় পাবো।

আমার বিয়ের যৌতুক বাবার টাকার সুদ টানতে টানতেই বাবার প্রাণান্ত হ'ত। ছোট ষ্টেশন উপরি পাওনাও তেমন কিছু ছিল না। বড় ষ্টেশনে বদলি হ'তে গেলে যে পরিমাণ ঘুষ লাগে, সে টাকা জোগাড় করা বাবার সামর্থ্যের মধ্যে ছিল না। বড়ই কষ্টে দিন-গুলি কাটতে লাগলো। বাবার এক মক্কেল জুটলো—সে ইটের কারবার করেছিল—করলা আনার সুবিধা হবে মনে ক'রে বাবাকে একটা গরু কিনে দিতে চাইল। বাবা দুধ বিনে ছোট খোকার কষ্ট দেখে, চোখ কান বুজে গোরুটা নিয়ে নিলেন।

৪

বাছুর গাইটি দেখলে সকলেরই লোভ হ'ত। আমি ষ্টেশনের কাছে আমাদের ছোট্ট বাসার আঙ্গিনাতেই গরুটাকে নিজেই দিগ্‌ড়ে দিয়ে আসতাম। গাঁয়ের সকলের দৃষ্টিই গরুটির উপর পড়েছিল। তবে তখন জানতাম না যে, গরুর সঙ্গে সঙ্গে আমার উপরও অনেকের কৃপাদৃষ্টি-সঞ্চারিত হয়েছিল। বকরিদের সময় গ্রামের মুসলমান জমিদারের বাড়ীর কয়েকটা ছেলে এসে বাবাকে বললো যে তারা গরুটি কিনতে চায়। বাবা বললেন—"গরুটি না হ'লে আমার চলে না—ছেলেপিলে ওর দুধটুকু না পেলে মারা যাবে, আমার স্ত্রী তো যক্ষ্মারোগে প'ড়ে ভুগছেন, আপনারা দয়া ক'রে অন্য গরুর খোঁজ দেখুন।" কিন্তু সাহেবেরা বললেন তাঁরা দুধ খাবার জন্যই গরুটা কিনতে চান—মাষ্টার যেন অন্য কিছু মনে না করেন। আর দামটা তাঁরা পাওনা টাকার সুদ থেকেই কাটিয়ে নেবেন। বাবা আমার বিয়ের যৌতুক টাকা ওঁদের কাছে ধারতেন—আসলের একপয়সাও এ পর্য্যন্ত দিতে পারেন নি। তবুও হিন্দু হ'য়ে কি ক'রে মা ভগবতীকে

বকরিদের কোরবানীর জন্ত দিবেন—এই ভেবে কিছুতেই রাজি হ'লেন না। দিদ্দাসাহেবরা বাবাকে শাসিয়ে দিয়ে সেই দিনের মত প্রস্থান করলেন।

৫

বকরিদের আগের দিন সন্ধ্যের সময় মাঠে গরু আনতে গিয়ে গরু পেলাম না।... আজ এত দিন পরে মনে পড়ে সেই সন্ধ্যার কথা। কতক্ষণ অজ্ঞান হ'য়ে ছিলাম, জানি না—চেতন হ'য়ে দেখি একটা বাগানে প'ড়ে আছি, আমার মুখে মদের গন্ধ, কাছে একটা মদের বোতল প'ড়ে—কাপড় রক্তে ভেসে গিয়েছে, সমস্ত শরীর ব্যথায় অবসন্ন। স্বপ্নের মত একটা অস্পষ্ট স্মৃতি মনে জাগছে—কিসের পর কি হ'ল ঠিক মনে পড়ে না, তবে অত ব্যথা, ভয় এবং লজ্জার মাঝেও কি একটা জিনিসের আস্বাদ পেয়েছিলাম—সে-কথা খুলে বললে তোমরা আমায় নরকের কীট বলে সাব্যস্ত করবে। কিন্তু আজ জীবনের সত্য অনুভূতির কথাই বলতে বসেছি—তা না হ'লে বায়ুনের বিধবার কথা আজ কাগজে লিখে প্রকাশ করবার প্রয়োজন ছিল না। যে সমাজ সত্যকে স্বীকার না ক'রে চোখ বুঁজে তার ভীমকান্ত মূর্ত্তিকে এড়াতে চায়, তাকে আমি আমার প্রাণের কথা সেই সত্যস্বরূপ অন্তর্যামীকে সাক্ষী ক'রে শোনাবোই।

৬

যে বাঘ একবার মানুষের রক্ত খেয়েছে, তার যেমন আর কিছু ভাল লাগে না, আমারও হ'ল তাই। বাবা আমার খোঁজ পেয়ে সমস্ত জানতে পেরে গোলমালের ভয়ে কোনও কথা না তুলে আমাকে কলকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি দূরসম্পর্কীয় দাদা হ'তেন—পুলিসে বড় চাকরি করতেন—অল্প বয়সেই বিপত্নীক হয়েছিলেন। সংসারে স্ত্রীলোক কেউ ছিল না ব'লে আমাকে দাসরে গ্রহণ করেছিলেন। আমি রাঁধা-বাড়া করতাম—তিনি আপিসে গেলে এক-টি বোতলার জানলার ধারে ব'সে রাস্তার লোকজন দেখতাম। মধ্যে মধ্যে দুটির দিন সন্ধ্যায় ইয়ার-বন্ধু নিয়ে দাদা আমার বৈঠকখানায় দাল পার্টি জমাতেন, কোনও কোনও দিন খুসীমত তেমন বেশী রকম পেলে বাইজী নাচও করাতেন। আমার উপোষী প্রাণ সেই কাল সন্ধ্যার নৈশার ঘোরের স্মৃতিকে খুঁচিয়ে তুলতো।

৭

বাবা সকল কথা ঠিক পেয়ে দাদার কাছ থেকে আমায় সরিয়ে আনলেন। কিন্তু সে অবস্থায় আমায় বাড়ীতে রাখা কঠিন হ'ল। নবদ্বীপের মাতৃমন্দিরে আমায় রেখে আসা হ'ল। দাদাই মাসে মাসে খরচ পাঠাতেন। ছেলে হওয়ার পর থেকে আমার প্রাণের ব্যথার যেন লাঘব হ'ল। দিনরাত তার চাঁদ মুখখানা দেখতাম—তারই আদর যত্ন নিয়ে দিনগুলি কেটে যেতো। আমি দাদাকে বললাম, তাঁর কাছে তাঁর ছেলে নিয়ে ফিরে যাবো—কিন্তু তিনি ভয় পেলেন। ইতিমধ্যে তিনি বিয়ে করেছিলেন—আমার খরচও বন্ধ হ'য়ে গেল। রূপ থাকতে অসহায়া যুবতীর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা যে কি বিপদ তা অনেকেই অনুমান করতে পারবেন। আমি তো নিরুপায় হ'য়ে আবার বাবার কাছে গেলাম। বাবা সাথি মেরে আমায় বিদায় করলেন—মা আজ বেঁচে থাকলে হয় তো এক রাত্তিরের জন্তও আমায় লুকিয়ে রাখতো!

৮

পথের ধারের সেই বাগান খানায় ছেলেটা কোলে ক'রে কাঁদছি—সন্ধ্যে প্রায় হ'য়ে এসেছে, এমন সময় কামারখালির মুসলমান জমিদারের ছেলে গাড়ী ক'রে যাচ্ছিলেন। আমায় দেখে তিনি গাড়ী থেকে নামলেন—খানিকটা কথাবার্ত্তার পর বুঝতে পারলেন আমি কে। পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্তে তিনি আমায় মুসলমান ধর্ম্মে আসতে অনুরোধ করলেন, আর প্রতিশ্রুত হ'লেন আমায় তাঁর ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করবেন। আমি অবশের মত যন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর সঙ্গে গাড়ীতে উঠে চললাম।

৯

আজ নুৎফুন্নিসা বিবি যে সংসারের গৃহিণী, তাতে অভাব কিছুরই নেই। ধনদৌলত, লোকজন, সুন্দর রূপবান স্বামী তার সকল আকাঙ্ক্ষা মিটিয়েছে। প্রাণের ক্ষুধা না মিটলে, মানুষ সমাজের শুকনো হাড় চিবিয়ে বাঁচতে পারে না। যে সমাজ তা অস্বীকার করে, তাকেই গুপ্ত বা প্রকাশ্যভাবে সর্ব্বদা অস্বীকৃত হ'তে হবেই।

তোড়া

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

বেতারে বিবাহ

বেতারে শুধু দূর দূরান্তরের সংবাদ আদানপ্রদান করে জানিতাম কিন্তু সে আবার দু'টি জীবনে বীণার তারে মিলনের সুরও দিতে পারে।

যুক্তরাজ্যের ডেট্রয়েট নামক স্থানে ছিলেন ক'নে এবং দূর সমুদ্রে জাহাজে ছিলেন নাবিক বর, অথচ নিরাপদে তাহাদের মধুর বিবাহ ব্যাপারটী শেষ হইয়া গিয়াছে—বেতারের ঘটকালিতে। ডেট্রয়েটের একটি গির্জ্জার মেয়ে, তাহার আত্মীয়-স্বজন এবং একজন পুরোহিত সহ উপস্থিত ছিলেন। জাহাজে বর, জাহাজের পুরোহিতের নিকটে বিবাহের মন্ত্র পাঠ করেন এবং উহা তখনই বেতারে ডেট্রয়েটের গির্জ্জার ক'নে প্রভৃতির নিকটে প্রেরিত হইল এবং বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। অবিবাহিত চাকুরে বাবুরা (যাহাদের ছুটি পাইতে বড়ই বেগ পাইতে হয়) বিবাহের এই সহজ উপায়টা মনে রাখুন।

শুভদিন

ফ্রান্সের ত্রয়োদশ লুই এবং বিখ্যাত লেখক ভিকেন্স শুক্রবারটিকে শুভদিন বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু লর্ড বায়রণ শুক্রবারের নাম শুনিলেই ভয়ে কাঁপিয়া উঠিতেন। ক্লা সেপ্টেম্বর তারিখটিকে ক্রমওয়েল শুভকর মনে করিতেন এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখটিকে পঞ্চম চার্লস জীবনের একটি স্মরণীয় দিন বলিয়া মনে করিতেন। লর্ড কিচেনারের নিকটে ৪ই জুন এবং নেপোলিয়নের নিকট মাসের ২রা তারিখটি শুভ বলিয়া গৃহীত হইত।

স্মরণশক্তি

পার্কার নামক একজন শ্রমজীবী "ম্যাক্‌বেথ," "হ্যাম্‌লেট" ও "ওথেলো" নাটকের সমস্তটা মুখস্থ বলিতে পারিত। মিল্টনের সমগ্র যোগারের রচনা কণ্ঠস্থ ছিল। মেকলে "লে অফ্ দি লাষ্ট মিনিষ্ট্রেল", "প্যারেডাইস লষ্ট" ও "পিলগ্রিমস প্রগ্রেস" আবৃত্তি করিতে পারিতেন। রিচার্ড পরসন শৈশবেই তদানীন্তন বিখ্যাত লেখকদের রচনা মুখস্থ বলিতে পারিতেন। ম্যাক্‌ষ্টোন ও ভিসূবেলীর অসাধারণ স্মরণ শক্তি ছিল। একবার মাত্র পড়িলেই যে কোন রচনা অনায়াসে আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

অন্ধের কৃতিত্ব

মিস্ মেরী এণ্ডারসন জন্মাবধি অন্ধ। তিনি ছয় বৎসর বয়সে এডিনবরার অন্ধদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া ক্রমে ২৫ বৎসর বয়সে লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ উপাধি লাভ করিয়াছেন। শিক্ষায় এইরূপ কৃতিত্ব অন্ধের পক্ষে বোধহয় এই প্রথম। সম্প্রতি বাংলা দেশেও এইরূপ অন্ধ একটি যুবকের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; তিনিও বি-এ পাশ করিয়াছেন।

অতীতের ঘড়ি

সুদূর অতীতে সম্রাট একেজেরের সময়ে যখন ঘড়ি আবিষ্কৃত হয় নাই, সে সময়ে যোষ বাজিই ঘড়ির কাজ করিত। ঘোষবাজি জ্বালাইয়া তখন সময় নিরূপণ করা হইত।

(Tit bits)

গ্রহের ফাঁদ

(উপন্যাস)

[শ্রীসরসীবালা বসু]

৬

দোল পূর্ণিমা।

কমলাক্ষ ও নীলকণ্ঠবাবু তেজেশের গায়ে পিচকারী করিয়া রঙ দিয়া লালে-লাল করিয়া দিলেন। তেজেশ দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল, মৃদুকণ্ঠে শুধু বলিল—"নেহাৎ অবেলায় চান্ করালেন মশাই, সকাল বেলা এ পর্ব্বটা সারলেই ভাল ছিল।" নীলকণ্ঠবাবু কহিলেন—"বৈকালীন স্নান না হ'লে দোল খেলার অঙ্গহানি হয় যে,—এখন চলুন, ঠাকুরমা আপনার মুখ চেয়ে বসে আছেন।" তেজেশ কহিল—"আবার ঠাকুরমার সঙ্গেও খেলতে হবে? আমার মতন অযোগ্য"—মুখের কথা শেষ হইল না, যেহেতু পর্দ্দানশীন ভাবে একটি গরুর গাড়ী সুমধুর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে চারিদিক মুখরিত করিয়া কলস বাহিনীর মন্থর গতিতে অনেকক্ষণ হইতেই আপনার আগমন ঘোষণা করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল, কার-না কার বাড়ীর আত্মীয় সমাগম হইতেছে মনে করিয়া তেজেশ প্রভৃতি সে দিকে লক্ষ্য করেন নাই, এখন গাড়ীখানি একেবারে তেজেশের খিড়কীর দ্বারে সংলগ্ন হইল, তেজেশেরই কোনো আত্মীয়া আসিয়াছেন জানিয়া আপাততঃ নীলকণ্ঠ ও কমলাক্ষ সরিয়া গেলেন, আর কি এক অপূর্ব্ব পুলক শিহরণে তেজেশের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল! তার বাড়ীতে এমন অসময়ে আসিয়া পড়িবার মতো আত্মীয়া আর ত কেহ নাই, নিশ্চয় তবে মণিমালা আসিয়াছে, যতীশ রহিয়াছে সঙ্গে, সুতরাং মণি না হইয়া যায় না। যতীশ মণির কাছে যাইতে চাহিয়াছিল, তেজেশ অবশ্য নিষেধ করিয়াছিল। যতীশ নিশ্চয় তাহা শোনে নাই, গ্রীষ্মের ছুটিতে নেহাৎ একা একা থাকিতে বাসার কষ্ট হইবে বলিয়া বন্ধু দিদিকে লইয়া আসিয়াছে। মণি একমাত্র দেবরটিকে খুব স্নেহের চক্ষেই দেখে, তাই সে যতীশ যাইবামাত্র চলিয়া আসিয়াছে। প্রিয়তমাকে সাদর সম্ভাষণ করিবার জন্য তাড়াতাড়ি তেজেশ বাড়ী ঢুকিয়া ভিজা গামোছা লইয়া নিজের রঙ রঞ্জিত হাতমুখ মুছিতে সুরু করিল। এখনি মণি তার চেহারা দেখিয়া সঙ সাজা হইয়াছে বলিয়া ঠাট্টা করিতে ছাড়িবে কি? অতঃপর সে ঘরে ঢুকিয়া আরসীতে মুখ দেখিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে যতীশ গাড়ীর পর্দ্দা সরাইয়া হাত ধরিয়া পার্ব্বতীকে নামাইয়া লইল, তারপর তাহাকে সঙ্গে লইয়া দাদার শয়ন গৃহের নিকট আসিয়া কাণের কাছে কতক-গুলা ফিস্ ফাস্ করিয়া কি বলিয়া কহিয়া, এক রকম প্রায় ধাক্কা দিয়াই তাহাকে ঘরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিল।

পার্ব্বতী কম্পিত চরণে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যতীশের হাতের ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া মাথার কাপড় সরাইয়া সরাসর তেজেশের পায়ের কাছে গিয়া প্রণাম করিল।

পার্ব্বতীকে দেখিবামাত্র তেজেশের চমক হইল, এ কি, কাহাকে সে মণিমালা বলিয়া ভুল করিতেছে? এ তো তার রত্নাভরণ বিভূষিতা, মূল্যবান জ্যাকেট, সাড়ী পরি-হিতা, এসেন্স পমেটম সুবাসিতা মণিমালা নয়, এ যে সাজ সজ্জা হীনা, নিতান্ত দীন বেশা নারী, কে এ ভিখারিণী?

পার্ব্বতী প্রণাম শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, রক্ত কিসলয়ের মতো ঠোঁট দুটি তার কি কথা বলিবার আবেগে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। মেঘমুক্ত চাঁদের ন্যায় ঘোমটা খসা মুখখানি ঝলমল করিতেছিল, তেজেশ চমকিয়া কহিল—"তুমি, তুমি কোথা থেকে এলে পার্ব্বতী?"

চির ভক্তের প্রতি উপাস্য দেবতার এ কি সম্ভাষণ! ওগো অকরুণ উপাস্য দেবতা, উপাসিকার প্রাণপণ আরাধনা তবে কি এক দিনের জন্যও তোমার অন্তর স্পর্শ করে নাই? তার নিত্য অশ্রুজলে গাঁথা পুষ্পহার কি তোমার অর্ঘ্য রচনা করিতে পারে নাই? পার্ব্বতীর

প্রণয় বিনিন্দী চক্ষু দুটি অশ্রু-ভরে টলটল করিয়া উঠিল, আরতির প্রদীপের মতো সেই চক্ষু দুটি তুলিয়া ধরিয়া সে স্বামীদেবতার মুখের পানে চাহিল—হেরেশ শিহরিয়া উঠিল। এ কি দৃষ্টি, এ দৃষ্টি কি যাদু জানে? একবার এই যাদুতে মুগ্ধ হইয়াই সে বিচার শক্তিকে জলাঞ্জলি দিয়াছিল। আর না—এক লাফে সে ঘরের বাহির হইয়া দরোজার শিকল তুলিয়া দিয়া চটি জুতা কট্ কট্ করিতে করিতে একেবারে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। দরোজার বাহির হইতে শিকল পড়ার শব্দে পার্ব্বতী ভয় চকিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিল, স্বামী তাহার এ ভাবে অনধিকার গৃহ প্রবেশের জন্য পুলিশ ডাকিতে গেলেন নাকি, অবশেষে তাকে কি আজ পুলিশের হাতে বন্দিনী হইতে হইবে? এই বুঝি তবে তার অদৃষ্টে ছিল!

কিছুক্ষণ পরে কলাৎ করিয়া শিকলটা খুলিয়া গেল, যতীশ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ধপ্ করিয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়া পড়িয়া বিস্ময় ও ভয়ে হতবুদ্ধি পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা বোকা তুমি বটে, এতো ক'রে লিখিয়ে পড়িয়ে দিলাম যে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েই দাদার পা দুখানা চেপে ধরে বলবে যে আমি তোমার দাসী, তোমার পায়ে আমায় ঠাঁই দাও, না দিলে কোথায় যাই আমি।' তা কি না ভক্তি গদগদিয়ে ঘরে ঢুকে পেন্নাম করতে গেলে, দাদা অমনি লাথ মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে শেকল তুলে দিয়ে আমার খোঁজে গেছ্‌লেন, আমি কি আর তখন দেখা দিই, সরে পড়েছিলাম।"

পার্ব্বতী কোন উত্তর দিল না, নতমুখে দাঁড়াইয়া পায়ের নখ দিয়া মাটী খসিতে লাগিল, দেহ তার লতার মতো স্থির থাকিলেও বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় চলিতেছিল, তারই দোষে সে স্বামীর চরণে আশ্রয় পাইল না? সত্য বটে,—নারী জীবনে, প্রথম যৌবনে এই তার প্রথম স্বামী সম্ভাষণে আসা—কাঁপিলই বা পা দুখানি, করিলই বা হৃদয় দুরু দুরু, আধা লাজ, আধা ভয়ে শিহরিলই বা সর্ব্ব দেহ—সব স্বাভাবিকতাকে ছাপাইয়া অস্বাভাবিক ঘটনার অধীনে কেন সে ছুটিয়া গিয়া স্বামীর পা দুখানি দুই হাতে চাপিয়া ধরিতে পারিল না? কেন বলিল না "আমি তোমার দাসী, আমায় তোমার চরণে আশ্রয় দাও?" যতীশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নতমুখী বউ দিদির পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"কি ভাবচ এখন?"

অস্ফুটস্বরে পার্ব্বতী কহিল—"পুলিশ ডাকবেন না তো?"

যতীশ আর না হাসিয়া পারিল না, কহিল—"এমনিই বুদ্ধি তোমার ঘটে—পুলিশ ডাকবেন কেন শুনি, আমরা চোর না ডাকাত?"

পার্ব্বতী ইহার উত্তর দিতে পারিল না, যতীশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"বসে থাক এখন, কাল থেকে নাওয়া খাওয়া নেই, এখন তার একটু জোগাড় দেখি, তারপর দাদা ফিরে আসুন, আর একবার চেষ্টা বেষ্টা করা যাক্। এবারে কিন্তু আর বোকামী ক'রে কাজ হারিও না, দাদা আমার সদাশিব, একেবারে পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলো—"আমি তোমার দাসী, তোমার পা ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।" তখন কিছুতেই আর তিনি তোমায় ফেলে যেতেন না।"

যতীশ বাহির হইয়া গেল, পথশ্রান্ত, চিন্তাক্লান্ত পার্ব্বতী আর একবার ভূমিতে বসিয়া ভাবিতে সুরু করিল, ওগো মোহাগিনী পরিণীতা নববধূর দল, পার্ব্বতীর এমন পায়ে পড়িয়া, যাচিয়া সাধিয়া কাঁদিয়া স্বামী সম্ভাষণে আসা দেখিয়া লজ্জায় তোমরা রাঙা হইয়া উঠিতেছ কি? পার্ব্বতীও কি হয় নাই? হইয়াছে বৈকি, কিন্তু অবস্থার আঘাতের কালশিরা তার লজ্জার লালিমাকে কালো করিয়া দিয়াছে, তার অবস্থার কল্পনা একবার কেহ করিতে পার কি? যদি স্বামী আজ তাহাকে আশ্রয় না দিয়া কুকুর বিড়ালের ন্যায় তাড়াইয়া দেন—কুকুর বিড়াল! না, না, দুনিয়ায় তাহাদেরও আশ্রয় আছে, কিন্তু অভাগিনী পতি পরিত্যক্তা নারী—সংসারে তার নিরাপদ আশ্রয় নাই। তার জীবন দুর্ব্বহের বিড়ম্বনা—তার সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের বিপুল সজ্জা শুধু নারীত্বের লাঞ্ছনা—যে হেতু সমাজ তাহাকে যার ভোগের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছে, সে যদি মুখ ফিরাইয়া থাকে তো তার পরিবর্ত্তে সহস্রের

গোলুপ ভোগ বহ্নি তার দিকে প্রসারিত হইতে থাকিবে, পতঙ্গের ন্যায় নারী তাহাতে ভস্ম হউক, অনন্ত নরক তার জন্য বদন বিবর মেলিয়া থাকুক, দুঃখ কি? নারীর জীবনের আর অন্য পন্থা বিশ্বতে আছে না। পতি গতি, পতি মুক্তি, পতিই সর্ব্বস্ব, সে পতি যার হইলে তার শোচনীয় পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, সে পরিণাম ঠেকাইবার সাধ্য কার?

পার্ব্বতী আপনার দুঃখ চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিল, যতীশ আহারের সন্ধানে ভাঁড়ার ঘরে আসিয়া দেখিল, ভাঁড়ার তালা বন্ধ, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তার উদর জ্বলিতেছিল, গলা শুকাইয়াছিল, সে এদিক ওদিক চাহিয়া রান্নাঘরের বারেন্দায় সাঁড়াশী পড়িয়া আছে দেখিয়া উঠাইয়া আনিয়া তারই চাড়ে ভাঁড়ারের শিকল খুলিয়া ফেলিল, অতঃপর চিনি ও সের্ লইয়া সবরৎ পান করিয়া তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। ইতিমধ্যে "ওমা, ভাঁড়ারের শেকল কে খুললে গো, ওমা এ যে ছোটদাদাবাবু, কখন এলেন আপনি?"

বলিতে বলিতে ঝি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, যতীশ কহিল—"ঠাকুর কোথা আছে ডেকে আন্‌তে পার ঝি, দুটি ভাত চাপিয়ে দেবে, গাড়ীতে দুদিন খাওয়া হয় নি।"

ঝি কহিল—"আজ ষোল পুণিমে, রাতে ভাত খাবে কি দাদাবাবু, দুখান লুচি ভেজে দেব?"

যতীশ বিরক্ত হইয়া কহিল—"তোমায় বিধান দিতে হবে না ঝি, বিদ্যে আমার প্রাণ যাচ্ছে, তুমি ঠাকুরকে ডেকে আন।"

ঝি যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াও আপনার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল। দাদাবাবুর মেজাজ ভাল নাই দেখিয়াও সে সাহসে ভর করিয়া প্রশ্ন করিল—"ও বউটি কে ছোটদাদাবাবু, সুখোলেম তো রা কাড়লেক নি?"

যতীশ এক ছড়া পাকা কলা আবিষ্কার করিয়া আপাততঃ তাহারই দ্বারা ক্ষুধা শান্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। ঝির প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া একবার সে ঝির মুখের দিকে তাকাইল, তারপর বলিয়া উঠিল—"উটি তোমাদের বাবুর ছোট বউ, শোনো নি বাবু আর একটি বিয়ে করেছেন?"

চিবাইয়া রস গ্রহণ করিবার মতো খবর বটে, শুনিয়া সুখ, শুনাইয়া সুখ, রসজ্ঞ ঝি তখনি বাড়ীর বাহির হইয়া ঠাকুরকে খুঁজিতে গেল, আর এ-বাড়ী ও-বাড়ীর মেয়ে মহলে খবরটি শুনাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

নিদাঘ স্মৃতি

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

কোথা সাধের ভবন, সোনার স্বপন!—
　　হৃদয় জুড়াবো?
দিয়ে গাছের তলায় বৈকালী ফুল
　　বকুল কুড়াবো!
খেলায় মেতে', ছায়ায় ফিরে,'
সন্ধ্যা হ'তে ধীরে ধীরে
সেই শীতল-দীঘির অ-থই নীরে
　　অঙ্গ বুড়াবো!

কবে চাইবো কেমন চন্দ্রালোকে
　　সুনীল আকাশে,
মধু জ্যোৎস্না সনে গানের ধারা
　　মিলবে আভাসে!
পালে শুধু বাতাস ভরি'
নদী বেয়ে' চল্‌বে তরী,—
পুনঃ পল্লী-মায়ের অঙ্কোপরি
　　স্বপ্না উড়াবো!

"পুরাণো বন্ধু"

[শ্রীশচীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী]

হাসপাতালের চাকরী ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় বেরুতেই ভ্যান্সা বুঝ্‌তে পার্‌লো সে যেমন মনে করেছিল এ সংসারটা মোটেই তেমন নয়।

এমন অবস্থায় সে আর কোন দিন ও পড়েনি—মাথা রাখ্‌বার স্থানটুকু নেই, ওদিকে আবার শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত ব্যয় হয়ে গেছে। এখন উপায়? ···

প্রথমেই সেল সে এক মহাজনের দোকানে। শেষ সম্বল আংটীটী বাঁধা রাখ্‌তে তার খুবই কষ্ট হচ্ছিল—মহাজন কিন্তু তাকে একটী টাকার বেশী আর কিছুই দিলেনা।

একটী টাকায় কি আর হবে?—ওতে না হয় একটা জ্যাকেট, না হয় বড় গোছের একটা টুপী, না হয় এক-জোড়া জুতা, কিন্তু এসব যে তার চাই-ই।...

হঠাৎ পোষাকের দিকে নজর পড়্‌তেই মনটা তার আরও দমে গেল; ভদ্রঘরের মেয়েদের এমন পোষাকে রাস্তায় চলাও মোটেই সুরুচির পরিচয় নয়। তার মনে হচ্ছিল রাস্তার কুকুর গুলিও যেন তার পোষাকের দিকে চেয়ে চেয়ে হাস্‌ছে। খাওয়ার, বাসার কথা ভুলে গিয়ে সব চিন্তা পড়লো তার এখন পোষাকের উপর।

যদি এখন একজন বন্ধুর দেখা পেতেম!—আমি জানি আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ আমায় সাহায্য করতে অস্বীকার কর্‌বেনা।"...

"কিন্তু কই কোন পরিচিত লোক ত এ রাস্তায় যাচ্ছেনা—বোধ হয় "পিক্‌-আউট" গেলে দু'এক জনের সঙ্গে দেখা হতেও পারে; কিন্তু এই বিশ্রী পোষাকে আমায় সেখানে ঢুকতে দেবে কি? তবে কি করা যেতে পারে?

ভেবে ভেবে তার বিরক্তি ধরে গেছিল; ভ্যান্সা তখন ভাবলে বরাবর কোন বন্ধুর বাড়ী যেয়ে উঠবে—যদি কিছু হয় ত হবে কি?

...বিলার বাড়ী যাওয়া না যাওয়া সমান, সেই বিল্‌টে বুড়ো নিশ্চয়ই এখন আফিসে।

ভ্যান্সার তখন মনে পড়লো বহুদিনের বন্ধু ফিকেল ডাক্তারের কথা—জার্মান ক্লাবে যার মাথায় সে এক গ্লাস বিয়ার ঢেলে দিয়েছিল, ফিকেল দিয়েছিল তার বদলে তাকে একটা "ব্রেন্‌লেট"।

রাস্তায় চলতে চলতে ভ্যান্সা ভাবছিল ফিকেল কি আর তাকে সাহায্য না করে থাকতে পারে! আর যদি প্রথমে অস্বীকারই করে, তবে সে ডাক্তারের ঘরের বাড় লণ্ঠন সব গুলো ভেঙ্গে দিয়ে আসবে। ডাক্তারের বাড়ীর দরজায় পৌছবার আগেই সে ঠিক করে ফেলেছিল কি ভাবে তাকে কাজ হাঁসিল করতে হবে।—প্রথমতঃ সে বাড়ীর দরজায় পৌছেই এক দৌড়ে উপরে যাবে, ছুটে ফিকেলের ঘরে ঢুকেই তার চোখ দুটো কসে চেপে ধরবে—অন্ততঃ বিশটি মুদ্রা না পেলে ছাড়বেনা।...

নাচ গানের মজলিসে তার মত সাহসী মেয়ে সে সময় খুব কমই ছিল। কিন্তু আজ যতই সে ফিকেলের বাড়ীর কাছে যেতে লাগলো, ততই যেন তার সাহস কম্‌তে লাগলো—এমন ত আর কখন হয়নি!

বোধ হয় সে এতদিনে আমায় ভুলে গেছে—আর এ পোষাকে ভিক্ষুকের মতো তার কাছে যাইই বা কি করে?

চিন্তার পর চিন্তা তাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল—হঠাৎ অন্যমনস্ক ভাবে সে ঘণ্টার দড়ি ধরে টানলে—

কি বেরিয়ে এলো।

"ডাক্তার বাবু আছেন?"

"আপনি একটু বসবেন কি? ডাক্তার বাবু এখুনি আসছেন।"

একখানা বেঞ্চে বসে বসে ভ্যান্সা দেখছিল ঘর-খানার পারিপাট্য—সৌখিন, সুন্দর জিনিসের অভাব, ছিলনা সেখানে, কিন্তু বিশেষ করে তার চোখে পড়লো; বড় আয়না খানা যাতে তার পোষাকের কদর্য্যতা ও হীনাবস্থা প্রকাশ পাচ্ছিল।...

ফিকেল ঘরে ঢুকে কোন দিকে না চেয়েই বললে

"কি চাই আপনার ?" ভ্যান্দা অবাক হয়ে গেল—একি সেই ফিকেল ?—লজ্জায়, অভিমানে, গ্লানিতে তার মুখখানি গোলাপী হয়ে উঠলো, অস্ফুটস্বরে সে বলে ফেললে

দাঁতটা বড়ই বন্ বন্ কচ্ছে—যদি দয়া করে একটু দেখেন ডাক্তার সাহেব ?"

"শ্চ, তাই বলুন। কোন্ দাঁতটা বলুন ত ? কোন জায়গাটায় ?

"নীচে, এই ডান দিকটায়"—একটা দাঁতে তার ছোট একটি ছিদ্র ছিল ভ্যান্দা সেইটে দেখিয়ে দিল।

ভ্যান্দা যখন ভাবছিল ফিকেলকে সব কথা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত কি না—ফিকেল তখন তার যন্ত্রের সাহায্যে দাঁতটা তোলবার চেষ্টায় ব্যস্ত—"এই হতভাগা চাকরটাই সব মাটী করলে—ওখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে ওর ?"

"এ দাঁত আপনার কোন কাজে আসবেনা—সুতরাং ওটাকে তুলে ফেলা যে খুবই উচিৎ তা বোধ হয় আপনাকে বলে দিতে হবেনা ?—বলতে না বলতেই ডাক্তার তার রক্ত মাখানো হাতে একটা দাঁত এনে ধরলো ভ্যান্দার চোখের সামনে—সে একটা আর্ত্তনাদ করে উঠলো।

"আর কোন ভয় নেই। ভেবে দেখুন ও দাঁতটা থাকা না থাকা আপনার পক্ষে সমানই হত। চাকরটা তখন একটা পাত্র ভ্যান্দার মুখের নীচে ধরতেই ডাক্তার বললে—

আর কিছু হবে না—বাড়ী গিয়ে ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলবেন—রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে" বেদনাজড়িত স্বরে ভ্যান্দা বললে—"নমস্কার ডাক্তার সাহেব, আসি তবে ?"

"বন্ধবে।" তবে আসুন—

"ওঃ হাঁ—মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করে ভ্যান্দা তার পুরাণো বন্ধুর হাতে টাকা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।.....

তার কুৎসিত পোষাক আজ তাকে মোটেই লজ্জা দিতে পারছিল না—সে ভাবছিল তখন তার দুর্ব্বহ জীবনের কথা। কি অপমানটাই না আজ তাকে সইতে হলো—হয়তো আরও কত সইতে হবে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত।

ওঃ, সে কি ভয়ানক.....।

জাপানের কিছু

[শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল]

এসিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে জাপান যে আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, দশজনের একজন হ'য়ে উঠেছে, এতে অনেকেরই গাত্রদাহ উপস্থিত হয়েছে, তাই তাঁরা 'অসভ্য' এসিয়ার 'অসভ্য' জাপানকে বড় ভাল চক্ষে দেখ্‌ছেন না, পরন্তু একটা কাল্পনিক ধারণা নিয়ে জাপানের রীতিনীতি সম্বন্ধে ঠাট্টা তামাসা করতেও দুষ্ঠিত হ'চ্ছেন না। যাই হোক্ জাপান আজ নিন্দা-সুখ্যাতির নাগালের বাহিরে দাঁড়িয়েছে।

জাপানীরা চায় শুধু কাজ, বাজে কথার ধার দিয়ে যায় না তা'রা। তাই বোধ হয় তাদের ছবির মত মনোহর গৃহগুলি আসবাব বিরল। আসবাবের মধ্যে একটা গদি,—বসবার জন্যে, আর একটা অগ্নিপাত্র, বেশ পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো। জাপানের প্রত্যেক গৃহের সংলগ্ন একটী ক'রে ছোট ঘাট উদ্যান থাকে ; এতে বোধ হয়,—জাপান ভাবুকও বটে, প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণ খুলে মেলামেশা ক'রতে ও জানে।

জাপানে সরাই-খানা যথেষ্ট, প্রায় প্রতি পল্লীতেই একটী ক'রে। এই সরাইখানাগুলি দিয়ে আমরা জাপানের আদব-কায়দা সম্বন্ধে কিছু ধারণা করিতে সমর্থ হ'ব। ধরুন জাপানে গিয়েছেন। সেখানে অবশ্য বাঙ্গালীর হাতের চারটি রাঁধা ভাত পাবার আশা ক'রতে পারেন না প্রথমে ;—অবশ্য পরিচিত কেউ থাকলে স্বতন্ত্র কথা। কাজেই আপনাকে একটা সরাইখানার আশ্রয় নিতে হবে। জুতা দু'টি খুলে একটা হোটেলে প্রবেশ করুন। একজন 'নিসান্' (দিদি—দাসীকে বলা হয়) নানা ভঙ্গীতে অভ্যর্থনা ক'রে একটী ঘরে নিয়ে যা'বে। এই ঘরটিতে

সৌখীন যুবক পাবেন না কিছুই,—শুধু একটা শূন্যতার গম্ভীর সৌন্দর্য্য ছাড়া। কিছু পরে 'নিসান্', চা নিয়ে এলো প্রথমে। চা-ও আবার দুধ-চর্করা বর্জ্জিত। চা-পানের সঙ্গে সঙ্গেই "চাদাই" অর্থাৎ দামটী ঠিক ক'রে রাখ্‌তে হবে। এই দাম দেওয়ার কাজটীও আবার আমাদের দেশের মত অসভ্য কায়দায় করলে চ'লবে না,—কাগজে মুড়ে অথবা ছোট খামের মধ্যে ক'রে দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক হোটেলেই ছোট ছোট খাম বিক্রয় হ'য়ে থাকে। চা পানের শেষে দামটী 'ট্রে'তে রাখতে হ'বে। কিছু পরে 'নিসান্' এসে 'ট্রে'টী তুলে নিয়ে গেল এরূপ ভাব দেখিয়ে, যেন 'ট্রে'স্থিত দামটী আদৌ লক্ষ্য সে করেনি। তার পর হোটেলওয়ালা সদলবলে উপস্থিত, আপনাকে একটু কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে, মাদুরে হাত রেখে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মাথাটী বারবার মাটীতে ঠেকিয়ে। শুধু এক পেয়ালা চায়ের জন্যে এতটা কৃতজ্ঞতা অতিরিক্ত বিনয়ের পরিচায়ক। জাপান বিনয় দিয়ে কাঁধ সাজ্‌তে জানে।

• • • •

প্রথমে বাহির হবার সময় হাততালি দেবেন, 'নিসান্' অমনি উত্তর দিয়েছে,—'তা দিমা'—অর্থাৎ 'একমিনিট'। এই হাততালি দেওয়াটা জাপানের, ভাক্‌বার সাঙ্কেতিক চিহ্ন। 'নিসান্' এসে হোটেলের একখানি কার্ড দিয়ে গেল। কারণ জাপানের উদ্যানসংলগ্ন হোটেলগুলি এক ছাঁচেই তৈরী, সুতরাং আগন্তুকের পক্ষে হারিয়ে যাওয়াটা খুবই সম্ভব। রিক্‌সাওয়ালারা এই কার্ড দ্বারা ঠিকস্থানে পৌঁছিয়ে দেবে। এই রকমে হারিয়ে যাওয়াটা রিক্‌সা-ওয়ালাদের বাঞ্ছনীয় বটে!

সন্ধ্যার সময় ফিরে এলেন, 'নিসান্' খবর দিলে, 'ওফু' (স্নান) প্রস্তুত। প্রত্যহ গরম জলে স্নান করা এদেশের রীতি। স্নান করাবার উদ্দেশ্যে আবার একটী ক'রে লোক থাকে, তা'দের বলা হয় 'বাস্তো' (স্নান রক্ষক)। তা'রা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উত্তমরূপেই পরিষ্কার ক'রে দেবে। জাপানে উলঙ্গভাবে স্নান করা হচ্ছে প্রথা। কিন্তু কেউ একবার আপনার দিকে চেয়েও দেখ্‌বে না। সমস্ত অঙ্গ পরিষ্কার করার জন্যেই বোধ হয় এইপ্রকার রীতির প্রচলন।

স্নানের কিছু পরে আহার আস্‌বে,—ভাত, ভেজো বাঙ্গালীর মতই, ব্যঞ্জনের মধ্যে মূলা ও কাঁচা মাছের 'গস' (চাট্‌নী) ও মাংস। যতক্ষণ আহার ক'র্‌বেন 'নিসান্' আপনার পাশেই জানু পেতে বসে আছে, হুকুমের প্রতীক্ষায়। আহারের শেষে কিছু ভাত চা মেখে খাওয়া এ দেশের নিয়ম।

শয়ন ক'রতে যাবার সময় হাততালি দেবেন, আলা-দীনের প্রদীপের দৈত্যের মতই 'নিসান্' উপস্থিত! সে এসে বিছানাপত্র ঠিক ক'রে দিয়ে গেল। বিছানার মধ্যে খান কয়েক খড়ের মাদুর, একটা জব্বর রকমের 'কিমানো' আর একটা খান অথবা চারের পাতাপূর্ণ বালিশ। আরাম-প্রিয় বাঙ্গালীর পক্ষে এই কঠোর ব্রতাবলম্বীগণের কঠোর শয্যা আশ্রয় করা শ্রেয়স্কর।

জাপানীরা অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করে। 'নিসান্' এসে নিদ্রাভঙ্গের উদ্দেশ্যে খুব শব্দ ক'রে জানালাগুলি খুলে দেবে। নিদ্রাভঙ্গ হ'লে 'নিসান্' "ওহিও" বলে অভিবাদন ক'র্‌বে। হাত মুখ ধোয়ার জল আন্‌তে বলা বোধ হয় বেয়াদবী ব'লে গণ্য করা হয়; কারণ এই কার্য্যটীতে 'নিসানের' কোন সাহায্য পাওয়া যা'বে না।

হোটেল হ'তে বিদায় নেবার সময় পূর্ব্বকথিত উপায়ে বাকীটা কাগজে মুড়ে দিতে হ'বে। হোটেলও কিছু উপ-হার দেবে,—সাধারণতঃ হোটেলের নামাঙ্কিত একখানি তোয়ালে। এরূপ উপহার বিজ্ঞাপনের নামান্তর মাত্র। সকলেই একে একে আপনার কাছ হ'তে বিদায় নেবে ও একবাক্যে ব'ল্‌বে—"যাতু দোজো ইরাষ্‌সাই" অর্থাৎ "আবার আসবেন"। জাপানের প্রতি কাজে অতিরিক্ত বিনয় জড়িয়ে থাকে। তা'দের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর হ'চ্ছে, তাদের-"কায়দা কানুন"। এখন, জাপান সভ্য কি অসভ্য সেইটেই আপনারা বিবেচনা করে বলুন।

কন্যাদায়ের প্রতিকার

কন্যাদায় বাঙ্গালীর একটা গুরুতর সমস্যা। এ সমস্যা দূর করিবার জন্য বাঙ্গালায় অনেক সভা সমিতি হয়ে গেছে, এখনো হচ্ছে। কোন কোন মহাপুরুষ তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী পরিশ্রমের এর কোন একটা স্থির মীমাংসায় স্থিরে আজ পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারেন নাই। মেয়ে বিক্রয় আইন পরিবর্ত্তন বা রহিত পর্য্যন্ত এর স্থির নিষ্পত্তি কেহ পঁহুছিতে পারবেন বলেও মনে হয় না।

আমিও আজ বারো বৎসর যাবৎ এই কন্যাদায় ব্যাপার নিয়ে বাঙ্গালার মাঠে ঘাটে কম ঘাঘাই দি? গান শুনেছি, বক্তৃতাও এ বিষয় নিয়ে বাঙ্গালায় কম দেই নি, কিন্তু কোন রকমেও এর কোন সিদ্ধান্তে পঁহুছাতে পারি নাই। তবে গান শুনে দু চারটী যুবক বিনা পণে বিবাহ করেছেন বটে, তাঁহাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি (আসাম) গৌহাটি, শিলং, তেজপুর প্রভৃতি স্থানে গান করিতে যাই। সেখানে অনেক দিন আমাকে থাকতে হয়েছিল, আসামী ভাইদের সাথে মেলামেশা করবার তাতেই আমার সুবিধা হয়। সেখানে কামরূপী সমাজের কেতারা কন্যাদায় সম্বন্ধে যে পন্থা অবলম্বন করেছেন আমার মনে হয় সেই পথই বাঙ্গালীর কন্যাদায় থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র পথ বা উপায়। অনেকে বলেন মেয়ের বাবা যদি টাকা নেওয়া বন্ধ করেন তা হলে হয় তো এ সমস্যা দূর হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় তাতেও বেশী কিছু ফল হবে না। যদি হয় তবে এ আসামী ভাইদের পন্থা অনুসরণ করে চলেই আমাদের এ সমস্যার সমাধান হবে। কি করে আসামে তাঁরা এ সমস্যার মীমাংসা করেছেন, এখন আমি তাঁরি আলোচনা করবো।

গৌহাটি সহরে গোস্বামী পরিবার বড় পুরাতনকাল এবং সম্ভ্রান্ত। আমার সে বাড়ীতে একদিন নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমন্ত্রণ হলো। সে বাড়ীখানা ব্রহ্মপুত্র নদীর পারে। সেখানে গিয়ে দেখি স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। বাড়ীর কর্ত্তা আমায় দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন, বাড়ীর ভেতরে আমায় নিয়ে গেলেন এবং সকলে আমায় ঘিরে বসলেন। বাড়ীর মেয়েরা আমার জন্য প্রচুর মেঠাই জলখাবার প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তার কিছু আমায় খেতে হলো। খাবার পরে বাড়ীর কর্ত্তা আমায় বল্লেন আপনাকে বাড়ীতে আনার প্রধান উদ্দেশ্য মেয়েরা আপনাকে ভাল ক'রে দেখবেন, আর তাদের হাতের তৈরী জিনিষগুলি আপনাকে তারা দেখাবেন। এই ব'লে ভদ্রলোক মেয়েদের হাতের তৈরী নানাবিধ মুগা এণ্ডির কাপড় আমায় দেখাতে লাগলেন। কাপড় যা দেখলাম তা মেয়ের হাতে তৈরী ব'লে বিশ্বাস করতে পারলাম না কিন্তু কিছু সময় পরে বিশ্বাস করতে বাধ্য হলাম। মুগা আর এণ্ডির কাপড় যা দেখলাম তা অপূর্ব্ব। বিয়ের বর ক'নে যে কাপড় নিয়ে সাজান হয় তা দেখে একেবারে অবাক হ'য়ে গেলাম, ক'নের কাপড়ের উপরে মুগা দিয়ে কাজ করা হয়েছে, মুগা জিনিষ ওজন করায় তার উত্তর হলো বাজারে এই কাপড়ের দাম তার পঁচ শত সাড়ে চারি শত টাকা। যে সব মেয়েরা এ কাপড় তৈরী করেছেন, তাঁদের গল্পগুলও আমি পেয়েছি, তার মেয়েরা একজন বৃদ্ধা তিনি সব চেয়ে ভাল তৈরী করেন। আসামের প্রতি ঘরেই তাঁত চরকা আছে। অতি দরিদ্র পরিবারের মেয়েরাও মুগার কাপড় ব্যতীত কাপড় পরেন না, সে কাপড়খানা বাজারে গেলে তার দাম হয় আট দশ টাকা। মেয়েদের পাঁচ বছর বয়স হলেই তাদের হাতে তাঁত আর চরকা দেখে ঐ দুইটী জিনিষ আসামের প্রতি ঘরেই আছে এবং ও দুটী জিনিস মেয়েদের ভাল ক'রে আয়ত্ত করাতেই হবে এই হচ্ছে আসামের "সামাজিক আইন," এই আইন তাদের সকলে আদরের সহিত মান্য ক'রে চলে বলেই তাদের কাপড়ের জন্য পরের দিকে চেয়ে থাকতে হয় না, দেখেন আমরা আছি। মেয়েদের হাতের তৈরী কাপড় বিক্রী করে তাঁরা যৌতুক অর্থ সঞ্চয় করেন। মেয়ের বিয়ের সময় নিজের ভিটে বাড়ীখানা পর্য্যন্ত বিক্রী করতে হবে এই ভয়ে বাংলার মেয়ের বাপের বুক শুকিয়ে যায় কিন্তু আসামে তাঁরা মেয়ের জন্য কোনই চিন্তা করেন না কারণ তাঁরা জানেন মেয়ে তার নিজের মুক্তির পাঞ্জা বিয়েই অন্যের বাজারে বিকিয়ে যাবে। বাপের টাকা যা হাতে থেকে পাওয়া যায় না। আসামে এর উল্টো। তাদের যেমন পণপ্রথা নাই। ব্যাপার হচ্ছে এই, যে মেয়ে যত ভাল কাপড় তৈরী করতে পারেন স্বামী শ্বশুর তাকে তত বড় ক'রে ঘরে নেন। এই জন্যই আসামের মেয়েরা বহুকাল থেকে এই চরকা তাঁত বুকে নিয়ে তাঁর সাধন করেছেন, বোধ হয় লক্ষ্মীও এই জন্যই তাঁদের ঘরে অচলা। মেয়ে দেবার সময় শ্বশুর ঘরে কতদূর আমি লক্ষ্মী ঘরে আনলুম মেয়েও ঘরে কতদূর লক্ষ্মী রেখে এসেছি তিনি ঘরে বসেই তাঁর হস্তশিল্পের দ্বারা যখন আমার মনে ৩০৲। ৪০৲ টাকা আয় করে দিতে পারবেন তখন আর ভাবনা কি? বাংলার কোন ঘরকে চলে যাবেই। এ কথা যেন কেউ মনে না করেন যে, সে দেশের পুরুষগুলি সব অলস। তা কিন্তু নয়। তাঁরা মেয়ে পুরুষে মিলে কাজ করেন ব'লেই তাঁদের দেশে বাংলার মতন "অন্নচিন্তা চমৎকারা" এ অবস্থাটা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই, তাঁরা জানবেন। তবে আসামে, মণিপুরে, আর উত্তর বাঙ্গালার মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে কৃতকর্ম্মাই বেশী।

আমাদের দেশে মেয়েদের ঘরে বসে এ শিক্ষার আমার উপায় নেই, কারণ আমাদের ঘরে এ শিক্ষা দিতে পারেন এমন শিক্ষয়িত্রীর যথেষ্ট অভাব, অবশ্য বাহারা "তোমারি রাগিনী জীবন কুঞ্জে" এ শিক্ষা দিবার শিক্ষয়িত্রীর ভোটেই অভাব নাই তাই মেয়েদের হস্তশিল্প শিক্ষা দেবার জন্য আমাদের মেয়ে বিক্রয় না বাস্তুভিটার ঘরে তুলতে হবে।

বাংলার মেয়েরা যদি গৃহশিল্পে আসামের মেয়েদের মতন উন্নতি লাভ করিতে পারেন তবে ঘরে বসেই তাঁরা মাসে ২০৲। ৩০৲ টাকা আয় করিতে পারিবেন। এ শক্তি যদি তাঁদের ফুটে ওঠে সে মেয়ের বিয়ের চিন্তায় বাবার বুক শুকুবে না এ আমি খুবই জোর গলায় বলতে পারি। আমার প্রাজুয়েট ভাই তখন মেয়ের শক্তির কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। চাকুরীর বাজার বড় চড়া। তাই প্রাজুয়েট ভায়ের বড়ই মনে লাগবে যিনি ঘরে বসেই আমায় মাসে ২০৲। ৩০৲ টাকা আয় করে দেবেন তাঁর বাবাকে দু'হাজার টাকার বদ্ধ নাইবা দেবুম। দু'হাজার টাকার চেয়ে ঘরকে ঘিরে করতে যাচ্ছি সে বৃদ্ধিটার দাম অনেক বেশী। এ বুদ্ধিটী ঘরে নিতে পারলে আর আমার ভাবনা নেই, কোন রকমে দাঁড়াবার পথ হবে। একবার এই পন্থা অবলম্বন করেই যদি বাঙ্গালী তাঁর কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন, আমার বিশ্বাস তা হ'লেই বাঙ্গালী এই বর্ত্তমান কন্যাদায় সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পাবেন। বাঙ্গালীর গৃহ আবার ধনে ধান্যে পূর্ণ হবে, গৃহে লক্ষ্মী অচলা হবেন, বাঙ্গালী তাঁর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে বুক উঁচু করে আবার জগত সমক্ষে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

বরিশাল হিতৈষী। শ্রীমুকুল দাস।

কাশীমবাজার রাজ—কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অধিকারী অনেক টাকার ঋণে জড়িত। এই সকল ঋণের সুদও খুব বেশী। এই সকল ঋণ শোধ দিবার জন্য কিনারেন্ট ৬৭৫০০০ পাউণ্ড (প্রায় ১০১২৫০০০৲ টাকা) ঋণ তোলা হইতেছে। শতকরা সাড়ে চারটাকা সুদে এই টাকা ধার করা হইতেছে এবং প্রত্যেক বৎসরের ১লা জানুয়ারী এবং ১লা জুলাই তারিখে ৬ মাসের সুদের টাকা শোধ করিয়া দেওয়া হইবে। ইণ্ডিয়ার কমিশনার মিঃ এফ, এল, লায়ার বর্ত্তমানে মহারাজার অধিকারীর মানেজার হইবেন। বিলাতে ভাইকাউণ্ট হ্যাকেটের, স্যার জর্জ হ্যারাট মারে এবং কলিকাতার বিলাডার্স আয়রনফট কোম্পানীর হেনরী বেটসন্ এই ঋণ গ্রহণ করিতেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচে মুদ্রিত ও প্রকাশিত কলিকাতা রিভিউ পত্রে বাঙ্গালী 'ধবনবিরি' বাঙ্গালীর মুখপত্র পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে অবজ্ঞা জানাইবার গালাগালি দিয়া বাঙ্গালীর গৌরব-বাহক ও দেশভক্তির পরিচায়ক যে প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাহাই হাজারে হাজারে বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচে পুনর্মুদ্রিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়েরই খরচে দেশে ও বিলাতে বাসা-ঘরে পাঠান হইতেছে। মুখোপাধ্যায়-লিখিত-বস্তু ভারতে সমস্ত সংবাদপত্রেই বার-বার ছাপা হইয়া গিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই বস্তুর সমস্ত চিঠি বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচে ছাপা হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচে দেশে ও বিলাতে হাজারে হাজারে বিলি হইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গত বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা পাঁচ মাস বেতন পান নাই। বর্ত্তমান বৎসরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকগণ পারিশ্রমিক পান নাই। অথচ এবার যে লক্ষ টাকা আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী দেখানো হইয়াছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচের অনর্থক মাসী লোকের কুৎসা প্রচার হইতেছে। ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?

"বাসক"

মাদক নিবারণে আমীরের ফরমান—আফগানিস্থানের অধিপতি আমীর আবদুল্লাহ মাদকদ্রব্যের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষেধ করিয়া সম্প্রতি এই ফরমান জারি করিয়াছেন:—"আমার সন্তানগণ প্রিয় প্রজাবর্গ এ কথা যেন জানেন যে, অপকারী ও অভিশাপের দ্রব্যে অভ্যস্ত হইলে উহাতে পশু ক্রমে ক্রমে এবং দৃষিত ও হীন জীবনযাপনের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় ইহাতে কেবল ইহকাল ও পরকালের নহে, পারীরিক ও মানসিক অধিও অনেই করে। এই কারণে আমি আমার প্রজাবিগের সকল প্রকার মাদকদ্রব্যের ব্যবহার হইতে নিষ্মুক্ত করিবার জন্য এই ফরমান জারি করিলাম। তাহাতেও ইহার অন্যথা। তাবাকও যে অপকারী তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অতএব অদ্যকার তারিখ হইতে কেহ কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিবেন না। এই ফরমান জারি হওয়ার পর কেহ যদি ইহার অন্যথা করে তবে তাহাকে ৫০০৲ টাকা হইতে ১০০০৲ হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করা হইবে ও যদি কাহারও গৃহে মাদক দ্রব্য পাওয়া যায় তবে তাহা বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

ইষ্টার্ণ মেডিক্যাল কলেজ—মিঃ সিবের মাতা মর্গেন, এস, সি, সিবে, মর্গেন এস, সি, নামী প্রভৃতি ২৯ জন ডাক্তারের চেষ্টায় ৭০৪ ফি ফুল ষ্ট্রীটে, ইষ্টার্ণ মেডিক্যাল কলেজ নামে একটী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের কায়ক্লেশে মেডিক্যাল কলেজের মত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত এম, বি ইত্যাদি পড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়া ইহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েসিনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। ১লা সেপ্টেম্বর হইতে কলেজের পড়া আরম্ভ হইবে। পাঠার্থীদের ২০শে আগষ্টের মধ্যে সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

যদি রীতিমত লেখাপড়া শিখাইয়া ছেলে পাশ করান হইত তাহাতে কোন কথা বলিবার ছিল না—কিন্তু ছেলেদিগকে কেমন শিক্ষা দিয়া পাশ করান হইতেছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সম্মুখে যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহাদের কথাতেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষা না দিয়া উচ্চশিক্ষার এইরূপ ভূল দিয়া শিক্ষার আদর্শ খাটো করিয়া তার আন্তরোদ্ধারের জন্য এদেশের লিখে কমিটি করিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তার আন্তরোদ্ধার এবং উহার ব্যয়ভার নিজের ঘাড়ে না লইতে পারিলে ঐ কমিটির হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার অন্য উপায় নাই—এজন্য শুদ্ধ লোক চাই, সাহস এবং নির্ভীকতা এবং স্বাধীন-চিন্ততা চাই।

বাঙ্গালা অক্ষরের কমিটির কর্ত্তাদের কলহের জেরটা এখন কোথায় যাইয়া পড়ায় দেখিবার বিষয় বটে। সেদিন যাহারা কংগ্রেস কমিটিই ১০৭ জন সদস্য ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে এক্যুক্ত কমিটির শ্রীযুক্ত ভাবনুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে প্রেসিডেণ্ট পদ হইতে এবং শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার ঘোষ মহাশয়কে সেক্রেটারীর পদ হইতে তাড়াইয়া দিয়া মৌলানা আক্রম খাঁকে প্রেসিডেণ্ট এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র মজুমদারকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সভায় কংগ্রেস কমিটির পূর্ব্বোক্ত প্রাদেশিক কাউন্সিল বাতিল করিয়া দিয়া নূতন কাউন্সিলও গঠিত হইয়াছে।

হিন্দুস্থান।

ভূতপূর্ব্ব কুন্তলে-সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম বি মহাশয় অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

ভাশনাল এসোসিয়েশন কাউন্সিল পাশাকে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিয়াছেন। আমীরুল পাশা সহকারী প্রেসিডেণ্ট, গান্ধী যে প্রথম ভাইস প্রেসিডেণ্ট এবং ইসমেল পাশা সহকারী ভাইস প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

হিন্দু মহাসভা-আগামী ১৯শে এবং ২০শে আগষ্ট তারিখে বারাণসীতে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইবে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য উহার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

বাসন্তী—

যুগল মিলন।

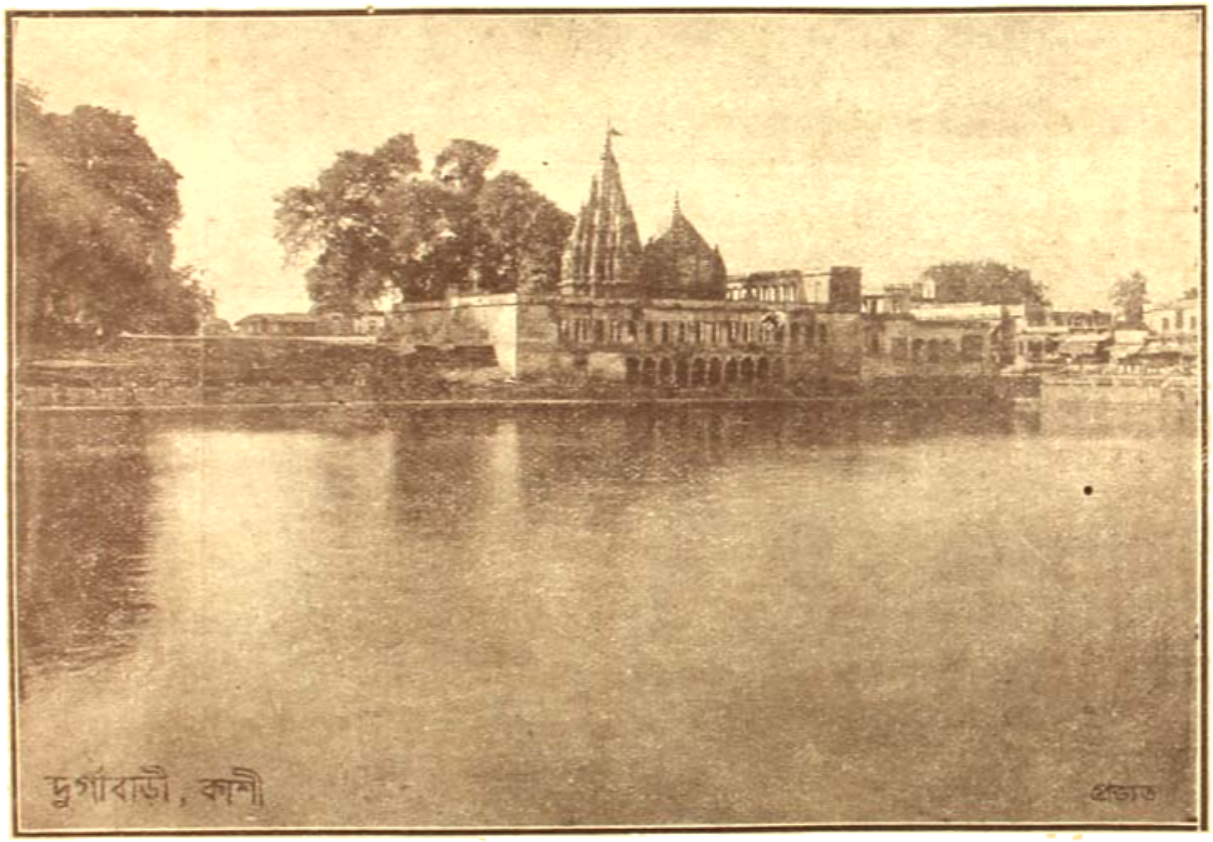

দুর্গাবাড়ী—কাশী।

আলোকচিত্র শিল্পী—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

২য় বর্ষ] ৮ই ভাদ্র শনিবার ১৩৩০, ইং ২৬শে জুলাই। [৮ম সংখ্যা

নারীর সম্মান

বিদেশীর কাছে

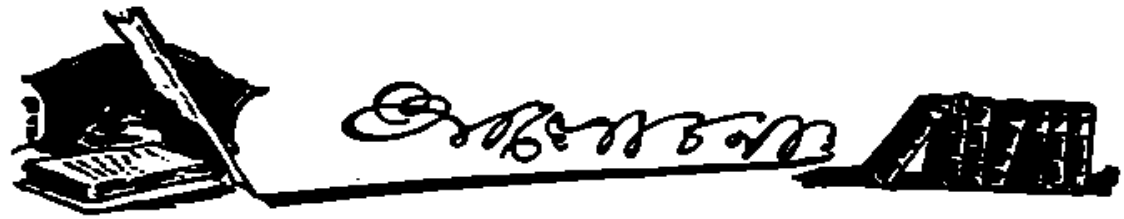

দেখিতে দেখিতে সপ্তদশ গান্ধী পুণ্যাহ চলিয়া গেল। আজ সতের বার হয় নিখিল ভারতের নবপ্রাণ ভাব ও প্রেরণাদাতা মহাত্মা ভারতেরই কারা প্রাচীরের মধ্যে দণ্ডিত অবস্থায় বাস করিতেছেন। আ-সমুদ্র হিমাচল ভারত মহাত্মার কর্মে ও বাক্যে সাড়া দিয়াছিল। ভারতের হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়, উচ্চ, নীচ, ধনী ও নির্ধন সকলেই মহাত্মার প্রভাবে এক দেশবাসী বলিয়া আত্মপ্রত্যয় লাভের সুযোগ পাইয়াছিল। ভারত—ভারতবাসীর। দেশের অখণ্ড স্বার্থের সঙ্গে দেশবাসীর জনজীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্রজীবন সবই জড়িত। দেশের স্বার্থ দেশবাসীর আগে রক্ষা করিতে হইবে—তাহা যে পর্য্যন্ত না দেশবাসী করিতে পারিবে সে-পর্য্যন্ত তাহার জনজীবন, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রজীবন সবই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। নিজ দেশবাসীর জীবনের এই সকল দিকের ব্যর্থতার বেদনাজ্বালা তীব্রভাবে অনুভব করিয়া মহাত্মা ভারতবাসীকে এই ব্যর্থতার মূল উদ্ভব স্থানটি দেখাইয়া দিয়াছেন অতি স্পষ্টভাবে। স্পষ্ট যাহা, সত্য যাহা—তাহা অনেক সময়েই অতি সুতীব্র নির্মম কঠোর হয়। মহাত্মা চাকিয়া ছাপিয়া মনকে স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া কিছু কোনদিন করিতে জানিতেন না—পারিতেন না। অসত্যকে আশ্রয় করিয়া, ছলনা লইয়া তিনি দেশজীবন গড়িয়া তুলিতে গিয়াছিলেন না—নিজেকে বাঁচাইয়া চলিয়া সত্যকে ম্লান করিতে জীবনে কোন দিন তিনি চাহেন নাই। ধোঁয়ার আজব বাক্‌যালে দেশকে কোন দিন বিভ্রান্ত তিনি করেন নাই—দেশকে সুনির্দ্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি দিয়া সেইভাবে তিনি দেশ চালন করিতে-ছিলেন। মহাত্মার কর্মধারার অন্তের অনুকরণ ছিল না কিন্তু আত্মগঠন ও আত্মবোধ সাধনার কঠোর ব্রত ছিল। ত্যাগ ও কর্মের সংমিশ্রণে দেশবাসী জীবনে নূতন রস ও শক্তির সন্ধান পাইতেছিল। সে রস ও শক্তির প্রভাবে দেশবাসী দেশকে আরব করিবার শক্তি অদূর ভবিষ্যতে পাইত। মোহাচ্ছন্ন ঘুমঘোর একবার কাটিয়া গেলে—দেশবাসী হৃত মর্য্যাদার স্বভাবজনীচতা পরিহার করিয়া নিজ বদনে ভূষণে বেশের সজ্জা, বেশাম্বরোধে মনের সজ্জা দিয়া—সত্য যাহা তাহা নির্ভীকভাবে যদি বলিতে পারিত তবে দেশের সম্মিলিত শক্তির নিশ্বাসে সকল অসত্য—দূর হইয়া যাইত। মহাত্মার দেশকর্মে এই সর্ব্বসহায়া দেশবাসীর প্রতি এই সব বিধান দেওয়া ছিল।—দেশবাসী তাহাদের মূল গলদ যে কোথায় তাহা বোধ হয় কতকটা বুঝিতে পারিয়াছে। বুঝিতে পারিয়াও—চারিদিকের পাষাণচাপের প্রভাবে তাহারা মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আগাইতে পারিতেছে না। কে জানে কবে এই বিরাট দেশের অগণিত জনসঙ্ঘ মুক্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিবে। নিখিল ভারত প্রত্যুত্তরে মুক্তি মন্ত্রের ঋষি মহাত্মাকে স্মরণ করিতেছে—কবে আবার মহাত্মা দেশের এই আঁধার নিরাশ্রয়া জীবনে আশা ও আলো লইয়া আসিবেন—কবে আবার দেশবাসী নূতন প্রাণে মানুষের মত অগ্রসর হইতে পারিবে?

• • • •

পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই। কথাটি যে অতি সত্য তাহা পরাধীন ভারতবাসী নিত্য জীবনে নানা দিক দিয়া প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছে। পরাধীন জাতির রাজনীতি না থাকিতে পারে কিন্তু পেট-নীতি আছে। পরাধীন জাতিরও ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগে—তাহারাও পেটে খাইয়া পরিধানের বস্ত্র পরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়—চলিতে চায়। জগতের নীতি শাস্ত্রের আলোচনায় দেখা যায় অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক অতি কঠোর পেটের নীতি হইতেই অন্যান্য যত সব উচ্চাঙ্গের নীতি শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ আগে খাইবার পরিবার ও বাঁচিয়া থাকিবার নীতি জানিতে চাহিবে—তারপর সে অন্য নীতির কথা কহিবে। এই মূল নীতিটাকে নিজ নিজ সুবিধামত প্রাধান্য দিবার জন্যই শক্তিশালী জাতিরা ইচ্ছামত আরও বহু প্রকার

নীতি সৃষ্টি করিয়া ঐ নীতিটিরই ভিত্তি সুদৃঢ় করিতেছে। তাই রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারত নিজ স্থান যতই কিছুমাত্র পাইতেছে না পেটের জ্বালায় সে ততই আরো অস্থির ও বিব্রত হইয়া পড়িতেছে। ভারতের অভাবজনিত দুর্ভোগের মধ্য দিয়া কিভাবে কি নীতি ফুটিয়া উঠিবে কে জানে?

• • • •

আমাদের দেশে খাইবার পরিবার অভাব কোন দিন ছিল না। এখনও দেশের উৎপন্ন শস্য সম্পদ যাহা দেখা যায়, তাহাতে দেশের অর্দ্ধেকের বেশী লোক যে না খাইয়া মরিতেছে—অসহনীয় দারিদ্র্যের জ্বালায় মনুষ্যত্ব হারাইতেছে, দারিদ্র্যজনিত ব্যাধিপীড়ায় দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে—এমন হইবার কথা নয়। দেশের এমন শস্য সম্পদ থাকিতে তবে দেশবাসীর ভাগ্যে তাহা জোটে না কেন—কারণ শুনি Exploitaion. শোষণ—বাহির হইতে এমন ভাবে শোষণ চলিতেছে যে ভারতীয়ের এই শস্য সম্পদ সেই শোষণ যন্ত্রের মধ্যে গিয়া এমন ভাবে পড়িবে যে তাহাতে তাহাদের আর কোন হাত বা আশা থাকিবে না। এই ব্যাপার ভারতে বরাবর চলিতেছে—তাহার ফল ভারতীয়ের নানা দুর্দ্দশার মধ্য দিয়া নিয়ত প্রতিফলিত হইতেছে।

• • • •

ভারতীয়ের ব্যবসায় বাণিজ্য সব পরহস্তগত। নানা বিদেশী পণ্যের ভারতে একচেটিয়া রাজত্ব। পরদেশীয় দ্রব্যাদির এমন প্রাবল্য জগতে আর কোন দেশে বোধ হয় নাই। ভারতীয়ের শিল্প বাণিজ্য পূর্ব্বে যাহা ছিল—দেশের অভাব তাহাতে যথেষ্ট মিটিত, আর দেশের সে সমস্ত শিল্প বাণিজ্য একেবারে লুপ্ত কোথাও প্রায় লুপ্ত ভাবে রহিয়াছে। বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় কিম্বা আমলাতন্ত্র সম্প্রদায়ের পক্ষপাতিত্বে তাহাদের এই দুর্দ্দশা। দেশের বয়ন শিল্প প্রভৃতি এইভাবে গিয়াছে। বিদেশী বণিকদের হাতে অর্থ—তাহারা এই দেশের কাঁচা মাল সব সস্তাদরে ইচ্ছামত কিনিয়া তাহা হইতেই নানা দ্রব্য জাত করিয়া পরিপাটি শিল্প হিসাবে জগতের বাজারে চালাইতেছে—ভারতের বাজারেই আবার তাহার প্রচলন সব চেয়ে বেশী। শস্যের ও পণ্যের ফলন করিবে ভারতবাসী কিন্তু তাহার ফলভোগী হইবে বিদেশী বণিককুল—এ ব্যবস্থা বরাবরই চলিবে—ইহার প্রতিকারের উপায় কিছুতেই হইবে না।

• • • •

ভারতের কয়লা আসিবে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে। অথচ বাংলায় অজস্র কয়লার খনি। সেই সুদূর আফ্রিকা হইতে কয়লা এখানে আসিয়া যে দরে বিক্রীত হইবে বাংলার কয়লা বোম্বাইতে গিয়া বিক্রী হইতে তার চেয়ে বেশী দাম পড়িবে। বেশী জিনিস দেশের অভাব মিটাইবার জন্য চালান দেওয়ার এমনি সুব্যবস্থা! এইভাবে অনেকে দেশীয় জিনিসের ব্যবসায় মাটি হইয়া যাইতেছে। কিন্তু উপায় কি! ট্যাক্স, রেল ভাড়া ইত্যাদির মধ্যে দেশীয় ও বিদেশীয় জিনিসে এমন চমৎকার অসামঞ্জস্য এ মুলে চলিতে পারে কি? কিন্তু তাহাও এদেশে সচল!

• • • •

অন্যান্য দেশের লোক এদেশে আসিয়া নবাবের মত বাস করিবে। অথ সম্পদ অর্জ্জন করিবে—যেমন ইচ্ছা মুক ফুলাইয়া চলিবে—অথচ এ দেশবাসী অপর কোন দেশে গিয়া সামান্য নাগরিকের অধিকারও পাইবে না। ইহা লইয়া এদেশবাসীকে বার বার পরম লজ্জাকর আবেদন নিবেদন করিতে হইবে—ও বার বার কুকুর বিড়ালের মত প্রত্যাখ্যাত হইতে হইবে।

• • • • •

যে দেশবাসী ভারতবাসীদের মানুষের অধিকার দিতে একেবারে নারাজী, ভারতবাসীকে যাহারা ঘৃণা করে, পদে পদে তাচ্ছিল্য অপমান করে, সেই দেশবাসীর অজস্র কোটি কোটি টাকার পণ্য ভারতের বাজারে আসিয়া স্বচ্ছন্দে বিকাইয়া যাইবে—ভারতবাসী তাহাই হাসি মুখে কিনিবে—বিলাস ও আনন্দের দ্রব্য করিবে। তাহাদের পণ্যের বাজার এখানে তাহারা জোর চালাইবে—দেশবাসী বা দেশের বিধি বিধান তাহাদের বাধা দিবে না। এমনি চমৎকার বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ!

• • • •

চোখের উপর এই সব দেখিয়া শুনিয়াও দেশবাসী

চুপ করিয়া থাকে। জাতির ক্লৈব্য ও মোহ ইহাদের জড়তা ভাঙিয়া এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস দেয় না। তাই অন্যায় দেশবাসীর ঘাড়ে আরো আঁকিয়া ক্রমশঃ বসিতেছে। ভারতীয়ের নিজস্ব শিল্প বাণিজ্য লুপ্ত—অথচ সাম্রাজ্য প্রদর্শনীতে পরের শিল্প বাণিজ্যের প্রসার প্রতিপত্তি নিজ দেশে বিস্তার করিবার জন্য তাহাকেই অর্থ ঢালিয়া দিতে হইবে। অভাবের তাড়নায় পরদেশী বাণিজ্যের প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন দেশীয় কাগজে ঘোষণা করিতে হইবে। কৌন্সিলে আবার ইহাই লইয়া দেশীয় কৌন্সিলরদের লাঞ্ছিত ও মর্য্যাদা জ্ঞানের দোহাই দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয়েরা—অর্থ সামর্থ্য প্রাণ দিয়া সাম্রাজ্যের সম্মান রক্ষা করিবে অথচ ভারতীয়দের সম্মান—সম্মান দূরের কথা আজ প্রাণঘাতী নীতি যাহা সাম্রাজিক বিধান অনুসারে অবলম্বিত হইতেছে তাহার এতটুকু ব্যত্যয় কোন প্রকারে হইবার নহে।

• • • •

দেশের শতকরা পাঁচজন লোকেরও সাধারণ শিক্ষা নাই—যে শিক্ষায় তাহারা দেশের অবস্থা বুঝিতে পারিবে। না খাইয়া মৃত্যু—রোগে ভুগিয়া মৃত্যু—সব কপাল! যেদেশে দেশবাসীর অবস্থা বুঝিবার উপযোগী শিক্ষা আদৌ নাই সেই দেশেই উচ্চ শিক্ষার নামে কতকগুলি অত্যন্ত ফুরো জিনিস চলিতেছে। সে শিক্ষা দেশবাসীকে আরও অকর্ম্মণ্য পঙ্গু করিয়া দিতেছে। যে দেশের এম-এ পাশকে ত্রিশটাকা মাসমাহিয়ানার চাকুরী খুঁজিতে প্রাণান্ত ভোগ সহিতে হয়—সেদেশের শিক্ষামন্দিরে ফুরো গবেষণা আর পাঁচতলা কোঠা বাড়ীর আবশ্যক কি। গবেষণা-গোবর খাঁটিয়া আর পিতামাতার অর্থের অর্থে প্রাসাদে বাস ও বিজলী বাতীতে পঠন পাঠন করিয়া দেশের ছুঁড়োখানিও চলার যোগ্যতা অর্জ্জন না করিয়া দেশের ছেলেরা যখন বিদ্যামন্দিরের স্বয়ম্বর এড়াইয়া বাহিরের সভ্যজগতে পৌঁছে তখন তাহাদের হৃদয়ে যে হাহাকার উঠে সে হাহাকার কি বরাবর বাড়িয়াই চলিবে এ দেশে। দশ পোনের টাকা সাহায্যের অভাবে এদেশে পল্লীকে পল্লীর লোক অশিক্ষিত থাকিয়া যাইতেছে আর দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফুরো গবেষণা আর আইন বিদ্যা ক্রমশই দেশবাসীর অর্থে পায়াভারী করিতেছে। লৌহর পর লৌহ উঠিয়া দেশের ব্যর্থ শিক্ষার বাহু প্রকাশ করিতেছে—আর মৌন হাহাকারে দেশ ভরিয়া যাইতেছে। খোড়ো ঘরে মানুষের উপর দেশের যে সাধারণ শিক্ষা চলিত সে শিক্ষা হইতেই দেশবাসী বঞ্চিত, পোনের মুদ্রায় তুষ্ট গুরুমহাশয়ের বেতন দেশে জোটে না—অথচ হাজার হাজার মুদ্রা এক এক জনের উপর বাহুল্য ব্যয় করিয়া তাহাদের পোষণ চলিতেছে—অথচ দেশবাসীর তাহাতে বিন্দুমাত্র লাভও নাই।

• • • •

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, অদ্ভুত আয় ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতি লইয়া আমরা বহু আলোচনা করিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী ১৯২৩-২৪ সনের বজেটে দেখা যাইতেছে যে আয় অপেক্ষা প্রায় দেড় লক্ষ পরিমাণ টাকা অধিক ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 'বোর্ড অব্ এডাউন্টস্' যে আয় ব্যয়ের খস্ড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে ৮৬০০০৲ আয় হইতে বাঁচাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল কিন্তু একজন্যাধিপতি স্যর আশুতোষের দলের সভ্যগণ সিনেট সভায় ইহা পাশ হইতে দেন নাই।

• • • •

যদি বিশ্ববিদ্যালয়কে এই অতিরিক্ত ব্যয়ের হিসাব দিতে বলা হয় তবে কর্ত্তৃপক্ষ চটিয়া লাল হন, কারণ 'গবেষণা'র জন্য সামান্য কয়েক হাজার টাকা বৎসর বৎসর খরচ করা দরকার নতুবা 'গবেষণা'র কার্য্য যে বাংলা দেশ হইতে অন্তর্হিত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতপূর্ব্ব ভাইস্ চ্যান্সেলর তাঁহার বড় আদরের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের অশেষ গুণাবলির ব্যাখ্যা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া থাকেন। প্রতি বৎসরেই হয় কনভোকেশনের বক্তৃতায় নতুবা এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সভাপতির অভিভাষণে তিনি এই বিভাগের-ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি 'আর্টস্ বিভাগ' কি এই প্রশংসার প্রকৃত অধিকারী। সর্ব্বসাধারণের টাকা গ্রহণ করিলে সেই টাকার ব্যয়ের হিসাবটাও তাহাদিগকে দিতে হইবে। চোখ্ রাঙাইলে কি জন-

সাধারণ ভয় পাইবে? 'মৌলিক গবেষণা'র জন্ত বাঙ্গালীর কষ্টোপার্জ্জিত ধন গ্রহণ করা হয়। অথচ বাঙ্গালা মুলুকের লোকে গবেষণার জন্ত অর্থ পায় না। বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিভাগে হরপ্রসাদ, রাখালদাস, রমেশচন্দ্র, রাধাকমল প্রভৃতির স্থান হয় না—তাঁহারা উদরান্ন সংস্থানের জন্ত অন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শরণ লইয়াছেন, আর 'কাশীমুদ্দিনের মার্কা' আবিষ্কারক ঐতিহাসিক প্রবর ভাঁড়ারকর; স্বাবলম্বিক শিল্পকলার সুপণ্ডিত অধ্যাপক! সাধারণের অর্থে হৃষ্টপুষ্ট হইতেছেন। মৌলিক গবেষণার পরিচয় পাইতে হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সব আত্মীয় গবেষণার তালিকা পাঠ করা প্রয়োজন। আর এই গবেষক দুরুদরদের জন্ত মাসিক কি পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাও পাঠকগণের অল্প বিস্তর জানা আছে। আত্মীয় স্বজন চাটুকার প্রভৃতির অন্নসংস্থান করা অবশ্ত কর্ত্তব্য কিন্তু দেশবাসীর খরচে এমনভাবে তাহা বরাবরই কি চলিবে? অতি অল্প খরচে গবেষণার কাজ চালানো হয় বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যে চীৎকার করেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। শিক্ষাদানের রীতিও যে সুবিধাজনক নহে তাহাও সকলে বিশ্বাস করিবেন, কারণ আজ যে বালকটী এম-এ, পাশ করিল কালই সে বিশ্বপণ্ডিত হইয়া শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করে। তা'রা নিজেরাই বা কি জানে আর শিখাইবেই বা কি? সুতরাং এদের জন্ত বাঙ্গালার গরীব দুঃখীর যে অর্থ ব্যয় হইতেছে তাহা কি অপব্যয় নহে? বর্ত্তমানে স্যর আশুতোষ ও তাঁহার অনুগত ও হস্তগত সিনেটসভা যাহা ইচ্ছে তাহাই করিতেছেন। একদল স্বাধীনচেতা লোক যদি ব্যবস্থা পরিষদে দেশবাসী জনসাধারণের পক্ষাবলম্বন না করেন তবে দেশের আরও অমঙ্গল হইবে। প্রত্যেকটী কড়া কাহনের হিসাব লইয়া এবং ধীর স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে টাকা দিতে হইবে, তাহা হইলেই দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে।

জানা চাই

(ইংরেজী থেকে)

[শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়]

কোথায় আমি জন্মেছিলাম, কি কুল তাহা জানি,
কি কুল জানি, কেমন ছিলেন মাতা পিতা মোর,—
পেয়েছিলেন তাঁরা খুবই, দুঃখ ব্যথা গ্লানি,
কিম্বা বিপুল বিত্ত পেয়ে, গর্ব্বে ছিলেন ভোর।
মোর সুতন্তার আলোক শিখা জলছে কি না প্রাণে,
উদার চরিত, বিরাট হিয়া, আছে কি মোর নাই,
বন্ধু আমি সত্য কয়ে, বলছি সত্য জানে,—
সেইটি জানাই চাই!

২

কি কুল জানি দুঃখ পাবে উদ্বেগেতে ভরা
ধরায় মম জীবন প্রদীপ, জলবে কতদিন,
তরুণ দিনেই ছাড়তে হবে আমারে এই ধরা—
কিম্বা দেহ শুষ্ক হবে, পুষ্ট হবে ক্ষীণ!
সাধ্যমত সাধছি কিনা, পরের হিতব্রত,
দৈন্ত মোচন করতে সবার প্রয়াস কিনা পাই,
হাস্ত ফোটাই, মলিন মুখে, মুছিয়ে ব্যথা যত—
সেইটি জানাই চাই!

৩

মরণকালে, শেষ বিছানা কোথায় পাতা হবে,
ঘরের মাঝে কিম্বা অতল সাগর সলিল মাঝ,
স্মরণ পাবে, কিম্বা নহে, তুফান উঠে যবে,
সে সব বাজে কথা ভাবার, নেইকো কোনই কাজ।
আসবে কি না, দেবদূতেরা, মরণ আমার হলে,
তাদের আমি দিই পরশ, পাই কিম্বা না পাই
জয়মাল্য আদর করে, পরায় কি না গলে,
সেইটি জানাই চাই!

সাচ্চা কথা

(দুইবর্ণের ছন্দ-বাণী)

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

১। অপরকে নিজের দুঃখের ব্যথা জানাইবার জন্য বেশী ব্যগ্র হইও না। অনেক সময়ে সে সঙ্গে নিজের অনেক দুর্বলতাও প্রকাশ হইয়া পড়ে।

২। কবি চির আনন্দময়। চারিদিক যখন বেদনার ক্রন্দনে ভরিয়া যায় তখনও সে, সেই বেদনার কাতরতার মধ্যে আনন্দের স্বাদ পায়।

৩। বিবাহটাই পৃথিবীতে চির নূতন, চির রহস্যময় অথচ চির পুরাতন ঘটনা।

৪। নিজের যদি সমালোচনা সহ্য করিবার শক্তি না থাকে তাহা হইলে অপরের সমালোচনা করা তোমার শোভা পায় না।

৫। দারিদ্র্যের তাড়নাতেই অনেক লোক পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছেন।

৬। দুঃখের কথা যতই চিন্তা করিবে, দুঃখটা ততই বড় বলিয়া মনে হইবে।

ষোলর স্বাধীনতা

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

চঞ্চলতার তুফান যে তার প্রাণে
অকূলে আর যায় কি রাখা রুখে
স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে সে যে
মুক্তি তাহার নাচে যে আজ বুকে
আঁখি কোণের এই দামিনী হাসি
কিশোর মনের ঘুচিয়ে দেব' গ্লানি
ঘরে ঘরে চল্‌বে কাণাকাণি
এই অপাঙ্গ খেল্‌বে বিজয় সুখে
স্বরাজ বুকের সুধার স্বরাজ আজি
বন্ধ দিয়ে রাখ্‌বে কে তায় রুখে।

* * *

বদলে আজ যখন প্রাণ নিয়ে
অবদানে আছে যারা কীণ্‌-ই
কাণের কাছে কাঁকণ দুটি তাদের
বাজিয়ে দিতে চাই যে কিনি-কিনি
কিশোরী আজ আমি বিশ্ব বধূ
জানক যত সুপ্ত হিয়া মধু
মধু ঋতুর চিৎ-কমলের মধু
ঝরে কেন আমারি এই মুখে
কাঁকণ গাহে যৌবন-গীতি আজি
বাধা দিয়ে রাখ্‌বে কি তায় রুখে।

চরণতলে শরণ নিতে সবে
নূপুর যে আজ অনুরাগে ডাকে
যৌবনেরি নিমন্ত্রণে আজি
দৌত্য করার দিনু যে তার তাকে
আজ যে সে তাই চ'লছে ঘুরে ঘুরে
বল্‌ছে কেবল নতুন-শেখা সুরে
ধানের সাগর ষোলর অন্তঃপুরে
অভাব সবার নিমেষে যাক্ চুকে
দুঃখীজনের অশ্রু সে আজি
নূপুরে যে যায় কি রাখা রুখে।

* * * *

ফুলের মালা আজ্ যে খোঁপাটিতে
ফুলের রেণু মাখা সারা দেহে
গড়ে যাব্যে কোরকী বরষী ষোলে
আস্‌বে যারা প্রেমে অনোগেহে
প্রণয় শাস্ত্র আছে যাদের লিখা
জানে ঠোঁটের কপট বিভীষিকা
অন্তরে তার সোহাগ আছে লিখা
ক'র্কে কখন অধরের, বুক চুকে
ষোলর আজি আত্ম-নিয়ন্ত্রণ
বাধা দিয়ে রাখ্‌বে কে তায় রুখে।

জনন বিজ্ঞান ও বার্ণার্ডশ'

[শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু]

আজকাল জননবিজ্ঞান সম্বন্ধে বাঙলায় খুব চৈ-চৈ হচ্ছে। এখন, জর্জ বার্নার্ড শ'র দুএকটা মন্তব্য বোধহয় অসাময়িক হবে না?

যেহেতু লোকটা সাহেব, অতএব তার কথা বেদবাক্য এমন কুসংস্কার আমাদের নেই। তবে নাকি শোনা গেছে, যে এ সম্বন্ধে ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সঞ্চয় হয়েছে তাই তাঁর লেখা থেকে কিছু কিছু সংগ্রহ করে দিচ্ছি।

বার্ণার্ডশ'র কথা,—

সাধারণের মধ্যে একথা নিয়ে প্রায়ই তর্ক ওঠে যে যে-সব প্রণালীতে গর্ভ নিরমিত করা সম্ভব, সে সব প্রকাশ করা উচিত কিনা। অনেকের মতে উচিত নয়, কারণ তাহলে অভিজ্ঞতার অপব্যবহারই বেশী হবে। এ থেকে বেশ ভালোরকম বোঝা যাচ্ছে, যে সাধারণ লোকে নৈতিক উপদেশ যেমনটি পায় তেমনটি হজম করে, তা নিয়ে আর বেশী মাথা ঘামাতে চায় না এবং উপরন্তু এ সব বিষয়ে অনভিজ্ঞই থাকতে চায়। এরকম ব্যাপার বাস্তবিকই হাস্যকর!

এ ধরণের আলোচনা নিয়ে পণ্ডিত লোকেরা কখনো সময় নষ্ট করেন না, সুতরাং এ বিষয়ে নিজে নিজে কোন সিদ্ধান্তে আসা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব কথা বলাও আমাদের বন্ধ করতে হয়, কারণ তাতেও অশ্লীল বিষয় এসে পড়তে পারে; আর গর্ভের ব্যাপারটাকে একেবারে থামিয়ে রেখে দিতে হয়, কেননা যত পাপের গোড়া ঐ ত!

তারপর, অপব্যবহারের কথা। বড় বড় সব জ্ঞানেরই ত' অপব্যবহার হ'তে পারে। লেখা, ছাপা, বারুদ আর খবরের কাগজের আবিষ্কার যাঁরা করেছেন, আজ যদি তাঁরা ফিরে এসে দেখেন যে মানুষের উপকারের জন্যে যেসব জিনিস তাঁরা দিয়ে গেছেন, তা থেকে পৃথিবীময় কত রকম উপদ্রবের সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে নিশ্চয় তাঁরা চীৎকার ক'রে বলবেন, এত কাণ্ড না ক'রে ছেলেবেলায় ম'রে যাওয়াই ভালো ছিল!

সুতরাং কোন্ কৌশলে গর্ভ নিয়মিত করা সম্ভব, সে সব লুকিয়ে রাখা উচিত নয়। এটা একটা চিরন্তন সত্য, যে যেখানে যা কিছু অভাব আছে মানুষমাত্রেই তা সংগ্রহ করবার অধিকারী। কিন্তু নিজের এবং দেশের ভালোর জন্যে প্রত্যেক জ্ঞানের ব্যবহারবিধি তাকে ঠিক ক'রে জানতে হবে। আবার, এই ধরণের শিক্ষা যেমন চেপে রাখাও উচিত নয়। এ থেকে যদি কেউ মনে করেন, যে জনন সংযমের বিষয়টা বিশেষ ক'রে অশ্লীল আলোচনার ব্যাপার, তাহ'লে অন্যায় হবে। যে কোন বিষয়ই লোক-বিশেষের হাতে পড়লে এমন হ'য়ে দাঁড়াতে পারে, যে ভদ্রলোকের ধারনায় সে সব আসে-ই না।

মেয়ীর মাতৃমূর্তির মতন স্বর্গীয় জিনিসও খারাপ লোকের কাছে অখদ্য জিনিস হ'য়ে পড়ে।

কিন্তু এ আলোচনাটা যে একেবারে নিষিদ্ধ বস্তু এমন কোন নিয়ম কোনদিন থাকা উচিত নয়, এবং থাকলেও তা মেনে চলা ঠিক নয়। শরীরের কোন কোন জায়গা যেমন খুলে রাখতে লজ্জাবোধ হয়, তেমনি কোন কোন বিষয়ের আলোচনা কারুর কারুর পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। কিন্তু এ-সব রুচি মানতে গেলে চলে না, যেহেতু দেশভেদে রুচিরও পরিবর্তন হয়। এমন কি ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রকম রুচি। আমেরিকানরা উলঙ্গ, শব, এসব কথা উচ্চারণ করে না, অথচ বিলেতের লোকেরা ওতে হাসে। নিষেধ সময়ে সময়ে খুব কড়া রকমের হয়, কিন্তু একবার ভাঙলে তার কথা লোকে ভুলে যায়, আর ক্ষতিও তেমন কিছু হয় না। এক সময়ে ইংলণ্ডে ঘরকন্নার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা নিয়ম বিরুদ্ধ ছিল; তারপর টাইফয়েড আর কলেরার প্রকোপে এদিকে নজর দেওয়া দরকার বোধ হ'ল।

তাতে উপকার বই অপকার কিছু হ'ল কি? এইভাবে গর্ভ সংরক্ষণের নিষেধ ভাঙতে হবে।

অনেকে বলতে পারেন, দৈবে যেটা হচ্ছে, সেটাকে কৃত্রিম উপায়ে থামাবার চেষ্টা করা মানুষের পক্ষে পাপ। তাহ'লে প্রথম যখন জাহাজে বাষ্পীয় বলের সৃষ্টি হয়, তখন লোকের বলা উচিত ছিল, কৃত্রিম উপায়ে জাহাজ চালানোর চেয়ে বাতাসের ওপর নির্ভর করা ভাল! কিন্তু তেমন কোন অদ্ভুত কথা ওঠেনি। স্বভাবের শক্তির ওপর মানুষ যত হাত চালাতে পারবে ততই তার লাভ। কোন মেয়ে যদি নিজের প্রকৃতিকে সংযত করে, তাতে যেমন দোষ হয় না, তেমনি প্রসবের ক্ষমতাকে সংযত করলেও কোন দোষ হবে না।

এ সব মেনে নিলে, কোন্ উপায়টি কি রকম ফলপ্রদ তার আলোচনা চলতে পারে।

অভিনয়ে আমরা দেখেছি, মাতৃত্বের সীমা যখন অতিরিক্ত হ'য়ে পড়েছে তখন ভ্রূণহত্যাই মুক্তি মনে হয়। আটটি সন্তানকে একজনের আয়ে মানুষ হ'তে হ'লে চারজন না খেতে পেয়ে মারা পড়ে, বাকী অকর্মণ্য হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে শুধু চারজন থাকলে চারজনেই মানুষ হবার সুযোগ পেতে পারে। এইজন্যে আমরা প্রত্যেক লোককে পরিবার ছোট করতে বলি; অথচ সেই সঙ্গে রব ওঠে, জাতটা লোপ পাবার যোগাড় হয়েছে, সুতরাং আইবুড়োদের ওপর কর বসাও, ইত্যাদি।

কোন কোন ডাক্তার বলেন, গর্ভ নিয়ন্ত্রিত করার প্রতিষেধকগুলিতে অপকার হয় না, আবার কারুর মত, ওতে স্নায়ুমণ্ডলী খারাপ হয়ে যায়। এই সব বিরুদ্ধ কথা শুনে শুনে আমরা অস্থির হয়ে উঠেছি। সুতরাং কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ আমাদের ঠিক ক'রে বিচার করতে হবে।

সাধারণকে বুঝিয়ে দিতে হবে, যে সন্তান প্রসবের ব্যাপারটাকে সহজে আয়ত্ত করা যায়,কিন্তু সে সব নিয়মের প্রয়োগ স্ত্রী-পুরুষ নিজেরা বুঝে যেন করে।

ভ্রমরের ভুল

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ]

১

ভ্রমর হোমার ভুল,
বনবরাহের পিঠে তুমি
বৃথায় ফুটাও হুল।
হুলের সেথা কাজ নহে ভাই
চেঁচা কিম্বা লড়কী যে চাই
কুনট বাঁশের বেহুয়া ঘেটে
কিম্বা তাল শূল।

২

হে মধুকর একেবারে
কই রাখনা খোঁজ,
কেতকীর ও ফল নহেক
তালের গুড়ির চোচ।
কাটতে ওকে কুড়ুল লাগে
হয় না প্রেমে অনুরাগে
টাঙন দিয়ে মুঁড়তে হবে
দুই বাহুর মূল।

৩

গাবলা ওটা আলকাতরার
নয় সে চিটে গুড়,
ঐরাবতের শুঁড় নহে ও
মরাই বাঁধা ভুঁড়।
নয় মুখী নয় সেফালিকা
ওটা নেহাৎ 'আঁকড়ো' 'এঁকা'
শ্মশান ভূমির কালশেঁচা ও
নয়কো রে বুলবুল।

৪

গোলাপ সেফাল নয়ক ওটী
গোবর গোলা টব,
উহার ভিতর কেবল মাছি—
মশার মহোৎসব।
নাইক সেথা কুসুম কোটা
রক্তশোষার আড্ডা ওটা
দৈত্য মাথার খুলির সাথে
হয় যে উহার তুল।

দান

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

১

পাশের বাড়ীতে গান হ'চ্ছিল—

প্রাণের পথ বেয়ে গিয়াছে সে গো,
চরণ চির রেখা আঁকিয়া সে গো।

তরুণী বোলা জানলার ধারে বসেছিল, গলির মাথার উপরকার আকাশে তখন চাঁদ হাসছিল, তারই আলোটা ঠিক এসে পড়েছিল তার সুন্দর মুখখানার 'পরে, এলো-মেলো চুলগুলো তার হাওয়ায় তালে তালে দুলছিল।

রাত তখনও বেশী হয়নি, আটটা হবে বোধ হয়। পথ দিয়ে চানাচুর, ফুল হেঁকে যাচ্ছিল।

পাশের বাড়ীটায় যার মধ্যে গান হচ্ছিল হঠাৎ একটা আওয়াজ পাওয়া গেল—"ও অবাক জলপান—ওগো-এদিকে এসো।"

অবাক জলপান ওয়ালা হেঁকে যাচ্ছিল, ডাক শুনে সে দাঁড়াল, খানিক এদিক ওদিক চেয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল —কোন বাড়ী?

"ওগো এই বাড়ী—"

বন্ধ দরজাটা খুলে গেল, তার পর দাঁড়াল একটী সুন্দরী মেয়ে। পরণে তার একখানি নীলাম্বরী, গায়ে একটী ফালো ব্লাউস আঁটা। অবাক জলপান ওয়ালা তার কথামত অবাক জলপান দিয়ে পয়সা নিচ্ছিল, সেই সময়ে হঠাৎ হারমনিয়মের সুর থেমে গেল, উপরের জানালা পথে মুখ বাড়িয়ে কে বলে উঠল "রাণু আমার!"

কিশোরী থতমত খেয়ে হাতের ঠোঙা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে উপর পানে তাকিয়ে কিক করে হেসে ফেললে—"আহা কি আমার বিচারক গো, দণ্ড ঠিক করে রাখছো বুঝি?"

"হাঁ রাখছি—এলো তো আগে তারপর দেখা যাবে।"

অবাক-জলপান ওয়ালা চলে গেল, কিশোরী দরজা বন্ধ করে দিলে।

তারই খানিক বাদে, উপরের সেই ঘরটা হতে হার্মোনিয়মের সঙ্গে একটা ভারী বেতালা সুরে গান উঠল। এ গলা যে কার তরুণীটির তাতে একটুও সন্দেহ ছিল না।

লীলা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস আর কোন মতে চাপতে পারলে না। মনে করব না মনে করেও তার মনে সেই অতীত দিনটার কথা জেগে উঠল। ওই যে তরুণ যুবকটী ওই মৃন্ময়—ওরই সঙ্গে না তার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছিল? ছোট বেলায় সঙ্গী ছিল তার এই ছেলেটী, মিহুদা নইলে তার যেমন একদণ্ড চলত না, সে নইলে মিহুদার তেমনি একদণ্ড চলত না। জগতে এরা পরস্পর জানত পরস্পরকে, আর কাউকে চিনত না। একদিন মিহুদা তাকে ট্রামের মুখ হতে কি করেই না বাঁচিয়েছিল! সে কথা মনে করতে কিশোরীর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। মৃন্ময়ের মা এই সুন্দরী বালিকাটীকে পুত্রবধূ করবেন বলে ভারী ঝোঁক করেছিলেন এবং প্রতিবেশিনী লীলার মাকে তা জানিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য—এতে লীলার মা স্বর্গ হাতে পেয়েছিলেন। তিনি স্বপ্নেও আশা করেন নি; জমিদার পুত্র মৃন্ময়ের সঙ্গে তাঁর মত দরিদ্রের মেয়ের বিয়ে কখনো হতে পারে না।

সব ঠিক হয়েছিল, সেই সময়ে পরপারের ডাক এল, মৃন্ময়ের বিধবা মা ইহলোক ত্যাগ করলেন, তাঁর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে কথাটা চাপা পড়ে গেল। মৃন্ময় সেবারে বি-এ ফেল করে' বসল, তার অভিভাবক মামা মাথা নেড়ে বললেন, "ছেলে পাশ না হলে বিয়ে হতে পারেনা।"

ছেলের আশায় লীলার পিতা রাখালরাজ কিছুদিন চুপ করে রইলেন, পাঁচ বৎসরে মৃন্ময় খুব ভাল হয়ে পাশ হয়ে গেল; মামা তখন এই গরীবের মেয়ে নিতে একেবারেই অস্বীকার করলেন। নিদারুণ আঘাতে যাদের বুক ভেঙে গেল, তিনি পন্থা নিলেন, তারপর কোন একদিনে মহা প্রস্থান করিলেন।

রাখালরাজ মেয়ে নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। লীলার

বিয়ে অনতিবিলম্বে হয়ে গেল। জামাইটি পঙ্কজের চেয়েও বছর কতকের বড় ছিলেন, এবং লীলা তাঁর পক্ষম পক্ষ হল।

দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানিনে, বিয়ের মাস তিনেক যেতে না যেতেই লীলার হাতের শাঁখা, লোহা, লীলার মাথার সিন্দুর মুছে গেল, লীলা থান পরলে, লীলার নাম বঙ্গে বিধবার শ্রেণীতে বসে গেল।

বিয়েটাকে সে যেমন নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করেছিল বৈধব্যকেও তেমনি ভাবে গ্রহণ করলে, তার মনে আনন্দও হয়নি, দুঃখও বাজেনি।

কিন্তু বড় দুঃখ বাজলো সেই দিন—যে দিন তার বাপ তাকে কিছুমাত্র না জানিয়ে বেড়াতে যাচ্ছি বলে কলকাতা ছেড়ে গেলেন এবং পাঁচ সাতদিন পরে বিয়ে করে বউ নিয়ে এলেন। বাবার বুক ভেঙে যাচ্ছিল, তবু সে বউকে ভুললো; বউ বাসায় এসেই সংসারটাকে বেশ বুঝে নিলে। বয়স তার বোধ হয় আঠার উনিশ হবে, দুদিনেই সে সংসারটাকে নিজের করে নিয়ে লীলাকে একবারে বাইরের মানুষ করে ফেললে।

সময়ে সময়ে লীলা চোখের জল সামলাতে পারত না। প্রায় প্রত্যহ সে এই জানালাটার কাছে বসে মৃন্ময়ের বাড়ীটার পানে তাকিয়ে থাকত, তার মনটা তখন কোভে দুঃখে কেটে যেত; তার মনে হত, সে কেন মরল না, কেন বেঁচে রইল, এই সব দেখবার জন্যেই কি?

২

ওগো নবাবী কোথা গেলে গো, কথা কাণে যাচ্ছে কি?

শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ খানিক আগে বেশ বৃষ্টি হয়ে গ্যাছে, লীলা ভিজে ছাদে চুপটী করে বসে কালো আকাশ খানার পানে চেয়ে ছিল, মায়ের কথা কাণে যাবা-মাত্র সে চমকে উঠল।

সে নামবার আগেই মন্মা ছাদে এসে দাঁড়াল, একটা আঙুল চিবুকে ঠেকিয়ে মাথাটা বাঁদিকে হেলিয়ে সে যেন কতই বিস্মিত হয়েছে এমনি ভাবে খানিক দাঁড়িয়ে রইল; তারপর বিস্ময়পূর্ণ সুরে বলে উঠল "মাগো মা, খুব আক্কেল তো বা হোক। বাসনের কাঁড়ি পড়ে আছে, মজা করে এসে ছাদে বসে আছ। খেটে খেটে আমার প্রাণটা এদিকে বেরিয়ে গেল।" সকাল হতে আজ লীলাকে বাপ মায়ের কাছে অনেক তাড়নাই সহ্য করতে হয়েছে, তখন বড় কান্না এসেছিল, কোনমতে সেটা চেপে ছাদে এসে লুটিয়ে পড়েছে একবার মায়ের নাম করে কেঁদে তার প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে।

এবার আর সে সহ্য করতে পারলে না, একটু তীব্র সুরেই বললে—"কি কাজ করেছ সকাল হতে—শুনি? সবই তো করে দিয়ে এসেছি। বাসন মাজা পড়ে আছে থাক—যখন খুসি তখন মাজব।"

জ্বলে উঠে মন্মা বললে—বটে লো, বড় সুখ হয়েছে যে তোর দেখতে পাই, কের উত্তর করিসনে বলছি লীলা—তা হলে—"

লীলা তেমনি রুক্ষ সুরে বললে—তা হলে করবে কি তুমি? বাপ যা কখনও না বলেনি তুমি তাও বলছো, যা করিনি কখন, তাও করলুম। এখন আর বাকী আছে কি, মারবে নাকি?

মন্মা একটু স্তব্ধ থেকে বললে—"বাড়ি বসে কি করতে পারবি তুই?"

লীলা তার আগুনের মত চোখ দুটো তুলে ধীর স্বরে বললে—যা করবো তা দেখতেই পাবি।

"আচ্ছা দেখি—"

রাগ যখন কমতে না পেরে মন্মা তার দিকে ছুটে গেল, তার চুল গুলো দু'হাতে ধরে মাথাটা ছাদের গায়ে দু-বার ঠুকে দিয়ে ছেড়ে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বল্লে "দেখ, মারতে পারি কিনা?"

লীলা মুখের উপর হতে চুল গুলো সরিয়ে পেছনে ফেলে মন্মার পানে চেয়ে রইল। সে চোখে একবিন্দু জল ছিল না, তার মুখে একটী কথা বার হল না, সে শুধু চেয়েই রইল।

মন্মা রাগে ফুলতে ফুলতে নেমে গেল। লীলা চোখ ফিরিয়ে আকাশের পানে চাইলে, তার চোখ ছাপিয়ে হঠাৎ ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়তে লাগল, তার পর সে সেখানে আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠল—মা—মাগো।

আজ থেকে থেকে কেবল তার মায়ের জন্ত মন কেমন করতে লাগল। এই অর্থগৃধ্নু পিতার কথা, এই পিশাচিনী মায়ের কথা মনে করতে তার বুকখানা ঘৃণায় ভরে উঠছিল।

তবু কি এখনও বাঁচতে হবে তাকে, তবু কি আবার এই সংসারের কাজ করতে হবে, এই পিতার ঘর গ্রহণ করতে হবে! কখনও না। উৎপীড়িত নারী হৃদয় গর্জে উঠে বললে—না, কখনও না।

সারাদিন সে সেই ছাদের পরে পড়ে রইল।

পরদিন সকালে তাকে বাড়ীতে দেখা গেল না।

৩

অনেক দিন কেটে গ্যাছে তার পর।

বৃদ্ধ রাখালরাজের দিনগুলো যাচ্ছিল বেশ। মন্দার স্নেহ যত্নে তিনি মেয়ের কথা একেবারেই ভুলে গেছিলেন। এই বাড়ীখানি আর দেশে যা কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল সব মন্দার নামে লেখা পড়া করে দিয়ে তিনি সুখে শান্তিতে জীবন কাটাবার মতলব করছিলেন।

ভগবান বিরূপ। এই সময়ে কলকাতায় দেখা দিল প্লেগ, ঘরে ঘরে রোগী, কে কারে দেখে তারই ঠিক নেই। রাখাল রাজের জ্বর হতেই মন্দা ব্যাকুল হয়ে পড়ল। কেউ যেন মনে করবেন না এ ব্যাকুলতা তার স্বামীর জন্তে, সে নিজের জন্তে যতটা ভাবে, স্বামীর জন্ত ততটা যদি ভাবত তা হলে রাখাল রাজের বিয়ে করা সার্থক হতো বটে।

মন্দার সম্পর্কীয় ভাই হরিশ দেশ হতে এসেছিল, উদ্দেশ্ত ছিল চাকরি, মন্দা ব্যাকুল হয়ে তাকেই ধরল—এখন উপায়?

গম্ভীর ভাবে হরিশ বললে,—তাইতো। যেমন দেখা যাচ্ছে তাতে এবে মুস্কিল হবে তাতে সন্দেহ নেই। এ রোগটা ভারী ছোঁয়াচে, সবারই হতে পারে।"

মন্দা আরও ভয় পেলে, বললে, "আমায় দেখে নিয়ে চল।"

তাই হল। জ্বরে মুর্চ্ছিত প্রায় রাখালরাজকে একটা বাসায় ফেলে মন্দা তার গহনা পত্র টাকা পয়সা যেখানে যা ছিল নিয়ে সেখে চলে গেল।

যথাই তার পরদিন সকালে রাখালরাজের সারা গা গরমে ভরে গেছিল। যেদিন তাঁর জ্ঞান হল, ব্যথায় আড়ষ্ট, তিনি ডাকলেন মন্দা। উত্তর নেই। কতবার ডাকলেন, মন্দার সাড়া নেই। তবে কি সে তাঁকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়েছে? তিনি জোর করে উঠতে গেলেন, পারলেন না। হতাশায়, যন্ত্রণায়—লীলা রে—বলে তিনি বিছানায় পড়ে গেলেন।

আজ মনে হল সেই অভাগিনী মেয়েটির কথা। বাবা বলতে তার ছোট বুকখানা ভরে উঠত। তার ঠাণ্ডা ছোট হাত খানা আঃ, এই সময়ে যদি তাঁর কপালের পরে রাখত—সব যন্ত্রণা যেত। ওই যেন সে ডাকছে—বাবা! কোথায় রে—মা আমার, লীলা আমার, কোথায় মা তুই? রাক্ষসীর মায়ায় তোর বাপ যে ভুলে গেছিল মা, রাক্ষস যে তোর বাপের স্নেহটুকু শুষে খেয়েছিল মা, আজ সে আর নেই, সে চলে গ্যাছে। আর মা, তোর বাপের কাছে আজ কেউ নেই, আজ তুই আয়।

নানা রকম বকতে বকতে রাখালরাজ মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

মূর্চ্ছা ভাঙল যখন—মনে হল কার কোলে তাঁর মাথা, কার কোমল হাতখানা তাঁর যন্ত্রণাময় কপাল খানার উপর পড়ে আঃ, এ স্পর্শে যেন সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল।

"কে, মন্দা—?"

"বাবা—আমি—"

টল টল করে দু ফোঁটা জল তাঁর কপালের পরে ঝরে পড়ল।

"কে? লীলা—আমার মা—আমার—"

পিতা আর কথা বলতে পারলেন না, শুধু তাঁর চোখের কোণ বয়ে দর দর করে জল পড়তে লাগল।

"বাবা, কেঁদনা—কেঁদনা বাবা—তুমি ভাল হবে—"

রুদ্ধ কণ্ঠে রাখালরাজ বললে। "না মা, আর ভাল হব না, আর ভাল হতে চাই নে। তোর কোলে মাথা রেখে এখন এমনি শান্তিতে যেন আমি মরতে পাই। একটু চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন না আমায় বাঁচতে হবে, একটা দিনও ভাল হতে হবে। রাক্ষসী ভেবেছে আমি মরে যাব, আমার সব তার হবে।

মায়ার ভুলে বড্ড কষ্ট তোকে দেছি মা, অভাগা বাপ তোর তাই তোরে একটু যত্ন করেনি। ভুইতো ভুলতে পারিস নি মা, তাই তোর সেই বাপের কাছেই আবার ফিরে এসেছিস।"

লীলা বাড়ী হতে বেরিয়ে গিয়ে একটা হসপিটালে নার্সের কাজ শিখছল। সে বাপের খোঁজ নিতে ভুলত না, সেদিন সে হসপিটালের লোকের কাছে যখন খবর পেলে তার বাপের রোগ হয়েছে তাঁকে দেখতে কেউ নেই, তখনি সে ছুটে এল।

তার শান্তিময় কোলে মাথা রেখে বাপের প্রাণটা জুড়িয়ে গেল, দিন দিন তিনি ভাল হয়ে উঠতে লাগলেন। অবশেষে তিনি যখন ভাল হলেন, লীলা তখনি বিছানা নিলে।

দায়ে পড়ে মন্দাকেই আসবার জন্যে টেলিগ্রাম করতে হল। কিন্তু সে জবাব পর্য্যন্ত দিলে না, আসা ত দূরের কথা।

রাখালরাজ দুর্ব্বল রুগ্ন শরীরে মেয়ের পরিচর্য্যা করতে লাগলেন, কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়ে গেল। মৃত্যু একজনকে গ্রহণ করবে—ই, সে যেন প্রতিজ্ঞা করেই এসেছিল। সে উদ্যত বজ্রকে লীলা নিজের বুক পেতে ধরলে, বাপকে বাঁচালে।

সে দিন ছিল শুক্লা একাদশীর রাত, চাঁদের আলোয় সারা ধরা প্লাবিত হয়ে গাচ্ছে। পিতাকে বলে লীলা মাথার কাছের সেই জানালাটী খুলে রেখেছিল; বসন্তের মৃদু বাতাস জ্যোৎস্না-স্নিগ্ধ হয়ে জানালা পথে ঘরে ঢুকে ছুটা-ছুটী করছিল। লীলার চোখ মুদে আসছিল আর সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছিল, সে স্তিমিত নেত্রে তবু সেই জানালা পথে চেয়েছিল, সেই উপরকার জানালাটার দিকে।

সে ঘরে আলো জ্বলছিল, জানালা পথে উজ্জ্বল আলোক রেখা বাইরে ছুটে এসে জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছিল। লীলা একান্ত মনে কামনা করছিল তাকে, সেই তার ছোট বেলার সাথীটিকে, একবার সেইখানে শেষ দেখার জন্যে।

দেখা গেল তাকে, কি করতে সে একবার জানালার কাছে সরে এল, আঃ, বড় শান্তিব্যঞ্জক একটী নিঃশ্বাস লীলার বুক ফেটে বার হল।

মায়ের কাছে বসে পিতা, তাঁর মধ্যে তিনি আর ছিলেন না। মেয়েটীর এই চির বিদায়ের মুহূর্ত্তে তার মনে আসছিল তিনি এর পরে কত না অত্যাচার করেছেন, কখনও কখনও সে খেতেও পায়নি। বুকটা তাঁর দশখা হয়ে যাচ্ছিল, এক একবার আর্ত্তকণ্ঠে শুধু ডাকছিলেন লীলা—মা—লীলা।

ও বাড়ীর সেই ঘরটায় হারমনিয়াম বেজে উঠল, তার সঙ্গে মৃন্ময়ের গান। সে গাচ্ছিল রবিবাবুর সেই গান খানি—

আমার যাবার সময় হল, আমায় কেন রাখিস ধরে।

সে জানতনা যে আজ ও তেমনি ভালবাসে, সে আজ চলে যাচ্ছে তাই তার বুক ফেটে পুরাতন এই গানটাই জেগে এল, সে গাইল—

ফুরিয়েছে জীবনের ছুটী, ফিরিয়ে সে তোর নয়ন ছুটী,
নাম ধরে আর ডাকিসনে তাই যেতে হবে ত্বরা করে।

লীলার মাথাটা উপাধানচ্যুত হয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল, পিতা হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন।

গ্রীষ্মের দিনে

স্নানের আরাম পাইতে, শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে, আমাদের আইডিয়াল্ গ্লীসেরিন্ এবং মেসিনে প্রস্তুত :—চন্দন, গুলেবকুল মাখুন ও ডাজলেট সাবান ব্যবহার করুন।

ইণ্ডিয়ান্ সোপ্ কোম্পানী

৬৪।১এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন ২৪৯৬

স্নেহের ফাঁদ

(উপন্যাস)

[শ্রীসরসীবালা বসু]

৬

সন্ধ্যার সময় ঠাকুরকে ঘটি ঘটি আসিতে দেখিয়া রুক্ষ কণ্ঠে যতীশ বলিয়া উঠিল—"কি ঠাকুর, আমার আসার গন্ধ পেলেই কি তোমাদের বাসায় ভীম একাদশীর যোগাড় হয় ?"

ঠাকুর কহিল—"আপনি আসবেন তা তো আমার জানা ছিল না দাদাবাবু, কখন এলেন ? এই তো বাবুর সঙ্গে পথে দেখা হ'লো তিনিও তো কিছু বল্‌লেন না, শুধু বল্‌লেন—"ঠাকুর, তুমি বাড়ীতেই থেকো, আমি একটু দরকারে আজ মফঃস্বলে যাচ্ছি।"

যতীশ অবাক্ হইয়া গেল, দাদা যে পার্ব্বতীর সহিত মুখোমুখী হইবার ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইবেন তাহা স্বপ্নেও সে ভাবিতে পারে নাই, সুতরাং সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঠাকুর ভিতরের কথা জানিত না, সুতরাং কহিল,—"তাহ'লে উনুন ধরিয়ে এখুনি চাট্টি ভাত তরকারী রান্না ক'রে দিচ্ছি। এই যে ঝিও এসেচে, —ঝি, তুমি একটু বাইনাস যোগাড় করে যাও তো, দাদাবাবুর সারাদিন খাওয়া হয়নি।" ঝি কহিল—"তার জন্যেই তো তখন থেকে তোমায় এ মুদুক সে মুদুক খুঁজে বেড়াচ্ছি, তা কোথাও যদি টিকিটি দেখতে পেলাম।" ঠাকুর কহিল—"আমায় খোঁজ করছিলে বলে তো মনে হয় না বাপু, রসনবিদের দাওয়ায় বসে কল্কে ফুঁকছিলে আর গল্প করছিলে, আমি তো তোমার সাম্‌নে দিয়েই এলাম, কই, একবার চেয়েও দেখলে না তো।" ঝি ঠাকুরের বাক্‌যুদ্ধ শুরু হইল। অবশ্য হাতের কাজও বন্ধ রহিল না, যতীশ সে দিকে কাণ না দিয়া পার্ব্বতীর কাছে আসিল। পার্ব্বতী তখনো পর্য্যন্ত এক ভাবে বসিয়া আছে। যতীশ সযত্নে এক গ্লাস সরবৎ প্রস্তুত করিয়া তাহাকে পান করিবার জন্য দিয়া গিয়াছিল, বেচারী তাহা স্পর্শ করে নাই। চিন্তার উত্তাপে সমস্ত মুখ তার শুকাইয়া উঠিয়াছে, শুষ্ক কণ্ঠতালু সরস করিবার কথা তার এখন স্মরণ নাই। যতীশ ঘরে ঢুকিয়া বলিয়া উঠিল—"সরবৎটা একটু মুখেও দাওনি বৌদি, হায় হায় নেহাৎ শুকিয়েই মরবে যে, তার ভাবনা তো আছেই, তা বলে নিজের দেহটাকেও তো রক্ষা করতে হবে !" গ্লাস উঁচাইয়া নিজেই সে বৌদিদির মুখের কাছে ধরিতে গেল। পার্ব্বতী অগত্যা যতীশের হাত হইতে তাহা লইয়া এক নিঃশ্বাসে সবটুকু পান করিয়া ফেলিল। আজ এই দুর্দ্দিনে যতীশের নিকট যে যত্ন মমতা সে পাইতেছে তার মরুভূমির মতো বিশুষ্ক জীবনে তাই কি যথেষ্ট নয় ? কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে দুই চক্ষু ভরিয়া তার জল আসিল, ভরা আষাঢ়ে সে বলিয়া উঠিল—"তুমি না থাকলে ঠাকুর পো আজ আমার গতি কি হতো ?"

যতীশ শুষ্ক মুখে কহিল—"আমি আর বিশেষ কি কর্‌তে পারলাম বৌদি ? দাদা তখুনি মফঃস্বলে চলে গেছেন. আমার সঙ্গে একবার মুখোমুখী দেখাটাও হলো না। তোমার তাহ'লে কোনো ব্যবস্থাই করতে পারলাম না। বড়ই ভাবনায় পড়ে গেলাম বেখচি, কোথা যে গেছেন তাও তো জানাচ্ছি না যে ধরে আন্‌ব।" পার্ব্বতী কাঁদিতে লাগিল, সংসারে যার কোথাও আশ্রয় নাই, মানুষের চরম ও পরম আশ্রয় মৃত্যু কেন আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লয় না ? কুসুমিত যৌবনে, মুকুলিত সাধ, আশা, বাসনার রাশি বুকে লইয়া পার্ব্বতী একান্ত-মনে তাই মৃত্যুকে স্মরণ করিতে লাগিল, সর্ব্ব দুঃখ নিবারণ, লজ্জাবারণ, লজ্জাহরণ রূপী হে দেবতা মৃত্যু, পতিত্যক্তা অভাগিনীকে আজ তোমারি অঙ্ক কোলে ঠাঁই দাও গো ঠাঁই দাও।

কথান্তরে আহারাদি প্রস্তুত হইলে যতীশ আহার

করিয়া ক্লান্তদেহে বিছানায় শুইবামাত্র ঘুমের স্পর্শে অচেতন হইয়া পড়িল, অনাধিনী পার্ব্বতী নামমাত্র অন্ন স্পর্শ করিয়া নিদ্রাহীন চক্ষে ভূমিশয্যাতেই লুটাইয়া রহিল; ষোলপূর্ণিমার ঝকঝকে চাঁদ জানালার পথে উঁকি দিয়া পার্ব্বতীর কুসুম সুকুমার দেহখানি স্পর্শ করিয়া বুঝি কত সোহাগের কথা কহিতে চাহিল, পার্ব্বতীর দুঃখবধির কাণে তা পৌঁছিতে পারিল না। সে শুধু তার অশ্রু ভরা দুটি মুগ্ধ চক্ষুর দৃষ্টি দিয়া জানালার পথে জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত আকাশের পানে তাকাইয়া, খুঁজিতে চাহিতেছিল; তার বিবাদেহী পিতা মাতার সন্ধান—অন্ত লোকে থাকিয়া তাঁহারা যদি এই দুঃখিনী মেয়ের জন্ত কোনো সান্ত্বনার আভাস শুনাইতে পারেন। হায় রে দুঃখ তাপ দগ্ধ হৃদয়ের নিষ্ফল কল্পনা!

৯

ম্লানমুখী পার্ব্বতীকে আবার তার সেই পরিত্যক্ত ভাঙ্গা কুটীরে ফিরিতে হইল। অধিকন্তু কলঙ্কের পসরা মাথায় লইয়া—যেহেতু পল্লীনারীগণ তখনই তার যাওয়া আসা লইয়া বিরাট সমালোচনা সুরু করিয়া দিল। কেহ কহিল—"দেওর না বাবা যমু, কোথাকার কে এক সোমত্ত ছোঁড়া, বিয়ের সময় তো কারু উদ্দিশ ছিল না; এখন এসে পল্লির দিলে দেওর,—ছুঁড়ি অমনি নেচে উঠে তার হাত ধরে চলে গেল, আ—মর্! সোয়ামী যদি ঘরে নিত তা হলে কি আর কালামুখ নিয়ে ফিরে আসতে হয়? দিয়েচে বাঁটা মেরে বিদেয় করে।" কেহ কহিল—"তখন ছুঁড়ির ভালোর জন্তেই আমার ঘরে ঠাঁই দিতে চেয়েছিনু, বেতো মানুষ, একদাটি সব লোরে উঠি না, ছুঁড়ি মেয়ের মতন থাকৃত, দেখা শুনো করত। খাবার পরবারও দুঃখু পেতো না, আমার নয়, কেমন ছেলে, চোটো চাওড়াদের সঙ্গে মিশে কখন একটুক্ সিদ্ধি টিদ্ধি বুঝি খায়, তা ব্যাটাছেলের ওসব দোষ কি আর ধর্ত্তব্যির মধ্যে। ওতো চাদে কলঙ্ক, তা ছুঁড়ী বেয়াক করে আমার বাড়ী এলো না, তেমনি এখন অবস্থার দুর্দ্দশা হলো।"

কেহ কহিল—"এইবার দেখ না, ভাতের জন্তে যদি গাঙ্গুড়ের না কেঁদতে হয়, কি বলেচি, কপালে লেহাৎ দুর্গতি আছে, আসতে যাওয়ার দেখা কর্ত্তে নেই তা—মেয়েকে ভাল করে কথাই কইতে চায় না। পাঁচটা জিজ্ঞেস করলে একটার যদি জবাব দেয়।" ইত্যাদি—

নিতান্ত অবসাদগ্রস্ত পার্ব্বতীর সত্যই সকলকার প্রশ্নের সদুত্তর দিবার মতো মানসিক অবস্থা তখন ছিল না। তাই সে যতীনের সহিত ফিরিয়া আসিবামাত্র এখন প্রতিবাসিনীগণ যারপর নাই উৎসুকা ভরে তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত সংবাদ জানিবার জন্ত সহানুভূতি দেখাইতে আসিল, সে যথারীতি তাহাদের সে ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিতে পারিল না। ফলে কলঙ্কের তিলক সঙ্গে সঙ্গেই তার শুভ্র ললাটে আঁকিয়া লইতে হইল। যদিচ এ তিলক ধারণ তাকে করিতেই হইত। কেননা ইহাই নারী-জীবনের চরম শাস্তি, বিশ্বের সমস্ত লাঞ্ছনা, সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিবার জন্তই তাহার জন্ম—এতোটুকু ক্ষমা নাই, এতোটুকু অব্যাহতি নাই, নিজের অপরাধ, ত্রুটি, পদস্খালন ছাড়া, পুরুষেরও যাহা কিছু ত্রুটি—সে সবের প্রায়শ্চিত্তের জন্ত একাই সে দায়ী, রাজ বিধি, শাস্ত্র বিধি, সমাজ বিধি মুক্ত কণ্ঠে এই আদেশই ঘোষণা করিয়া আসিতেছে। কে জানে কেন্ অতীত কাল হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত এবং সুদূর ভবিষ্যতে কতদিন পর্য্যন্ত ইহার জের চলিবে!

এই নির্ম্মম শাসনের পেষণে নারীর সমস্ত অনুভূতি সমস্ত বুদ্ধি বিচার শক্তি পর্য্যন্ত পশু হইয়া গিয়াছে। তাই সে নারী হইয়া নারীকে অবাধে লাঞ্ছনা গঞ্জনার হাতে সঁপিয়া দেয়। নির্ব্বিচারে তার নারীত্বের চরম অপমান ঘোষণা করে।

যতীশ দুইদিন বাসার বসিয়া দিন রাত্রি তাঁহার ফিরিবার অপেক্ষায় পথে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কোথায় কে?

এ দিকে দলে দলে প্রতিবাসিনীরা ভিড় করিয়া পার্ব্বতীকে দেখিতে আসিতে লাগিল নানা প্রশ্নে বেচারীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। কেহ-বা অযাচিত ভাবে যতীশকে উপদেশও দিল—"বাবুর মত না নিয়ে একে এনে ভাল করনি বাপু, ব্যাটাছেলের মন, কে বলতে পারে, হিচিকিচি সইতে না পেরে যদি নিরুদ্দেশ

হয়েই যায়। তোমার ভাইটি আসে না বউ দিদিটি আসে।"

যতীনের মন ক্রমেই তিক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, রাগের মাথায় সে পার্ব্বতীর কাছে বসিয়া বসিয়া সমাজকে বিশেষ করিয়া কন্যাদায়গ্রস্ত বাপ মাকে এক চোট খুব গালাগালি দিয়া লইল। যদিও সে গালাগালি শূন্যে বর্ষিত হইয়া শূন্যেই মিলাইয়া গেল, কাহারও একচুল পরিমাণ ক্ষতি করিল না। দাদার উদ্দেশেও সে কতকগুলা কটূক্তি করিল। এইরূপে মনের ভার লাঘব হইলে তার স্মরণ হইল, তার এখন কি করা উচিৎ, দাদা যদি সত্যসত্যই এ প্রস্তাবকে গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে যাহাতে পার্ব্বতী একটু নিরাপদ স্থানে থাকিয়া দুই বেলা দু'মুঠা খাইতে পরিতে পায় তাহার তো একটা ব্যবস্থা তাহাকেই করিতে হইবে। যে হেতু অভাগিনীর দুঃখের কথা শুনিয়া তাহারই মাথার টনক প্রথমে নড়িয়াছে। কিন্তু সে নিজেই তো অন্নবস্ত্রের জন্য এখন দাদার মুখাপেক্ষী, এ অবস্থায় অন্যের ভার গ্রহণ করে সে কোন সাহসে? না,—ভাবিবার চিন্তিবার আর এখন অবসর নাই, চুলায় যাউক তার আর পাশের পরীক্ষায় পড়া—যে যেমনে রকমে দু দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া এই অনাথিনী নারীর অন্ন বস্ত্রের সংস্থান যদি না সে যোগাইতে পারে তবে ধিক্ তার পুরুষ জীবনে।

আগামী সংখ্যা হইতে
সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, মনস্বী পণ্ডিত
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এর
একখানি বর্ত্তমান কালের উপযোগী
সুললিত উপন্যাস বাহির হইবে।

দাদার অবিচারে অত্যাচার ক্লিষ্টা নারীকে অন্ততঃ একটু নিরাপদ আশ্রয়—জীবন পণ করিয়া সে যোগাইবেই।

দাদা সহজে বাসায় ফিরিবেন না, ফিরিলেও হয়তো একটা বড় রকম হাঙ্গামা বাধাইয়া বসিবেন। তার চেয়ে আপাততঃ পার্ব্বতীকে বাসের বাড়ীতে রাখিয়া সে কলিকাতায় গিয়া নিজেই একটি কাজকর্ম্মের যোগাড় করিবে, তারপর বউদিদির তরফ পোষণ ও নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিবেই—অতঃপর খবরের কাগজের আশ্রয় লইয়া সমাজের এই অমানুষিক ব্যবহার ও হৃদয়হীন অবিচার সম্বন্ধে বেশ জোরালো জোরালো আর্টিকেল লিখিবে ব্যস্, আর কি—অবিলম্বে যতীন যেমন তাড়াতাড়ি পার্ব্বতীকে একবার লইয়া আসিয়াছিল, তেমনি তাড়াতাড়ি আবার ফিরাইয়া লইয়া গেল। ভূষণের পিসীকে ডাকিয়া সাবধানে পার্ব্বতীকে রক্ষা করিতে বলিয়া এবং শীঘ্রই নিজে ফিরিয়া আসিবে এই আশ্বাস দিয়া কলিকাতা রওনা হইল। পার্ব্বতীর দৃষ্টি কিন্তু সীমাহীন গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিল। যতীনের অযেষ রকম সান্ত্বনা বা আশার বাণী সে নিবিড় তমসার বুকে এতোটুকু খদ্যোতের দীপ্তিও প্রকাশ করিতে পারিল না।

৯

কৃষ্ণ পক্ষের ষষ্ঠীর চাঁদ আকাশে আসিয়া আসর জমাইবার মোটেই সুবিধা পাইল না। সন্ধ্যা হইতেই মেঘের দল নিজেদের আসর জমাইয়া লইয়াছে, মাঝে মাঝে ডাক হাঁক করিয়া চারিদিক সরগরমও করিয়া তুলিতেছে, চাঁদ ভয়ে ভয়ে মুখ লুকাইল। পৃথিবীর মুখ তখন সূচীভেদ্য অন্ধকারে ঢাকা পড়িল। মধ্যে মধ্যে সে অন্ধকারের বুক চিরিয়া বিকাশ পাইতে লাগিল, চকমা চপলার চকিত দীপ্তি।

ছিন্ন শয্যার উপর চিন্তামগ্না পার্ব্বতীর মৃন্ময়ী দেহখানি নিথর ভাবে পড়িয়াছিল, পাশে ছেঁড়া মাদুর ও চটের উপর ঘুমাইতেছিল সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত ভূষণের পিসী—নিদ্রা সেই দুই জনেরই নিকট যথার্থ উপভোগের বস্তু—তাহাদের একজন কঠিন শারীরিক পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত আর একজন দুশ্চিন্তার আঘাতে জর্জ্জরীভূত—সুতরাং প্রথম রাত্রেই পার্ব্বতী ও ভূষণের পিসী গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়াছিল, খোলা জানালা দিয়া মেঘের স্পর্শশীতল বাতাস উভয়েরই দেহে স্নিগ্ধ হাত বুলাইয়া যাইতেছিল। দুর্ব্বৃত্তের দল সহজেই তাহা জানালার আর

একটা গরাদে সরাইয়া একে একে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই তৃণের পিসীর মুখ ও হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল। একজন তখন মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আর কি, এইবার কেল্লা ফতে—এ মাগী আর চুঁ চাঁ শব্দটি করতে পারবে না, নিয়ে চল্ এইবার ঐ ছুঁড়ীকে—জেগেচে রে জেগেচে,—"

সত্যই পার্ব্বতীর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, ঘুমের ঘোর ভাঙিতেই তাহাদের সে চিনিতে পারিল, তাহাতে তার রক্ত হিম হইয়া গেল। তবুও সে মূর্চ্ছাহত না হইয়া জোড় হাতে আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"সুদর্শন দাদা, তুমি? বিজয় কাকা তুমি? আমি যে তোমাদেরই ঘরের বোন্ তোমাদেরই মেয়ে,—"আর বেশী সে বলিতে পারিল না, বিজয় বলিয়া উঠিল—"ছাকামী রাখ পার্ব্বতী, যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, চুপ-চাপ উঠে চল্, না খেয়ে, না পরে শুকিয়ে মরছিস, এখন থেকে রাজার রাণীর হালে থাকবি।"

দু' একজন অগ্রসর হইয়া অন্যান্য কদর্য্য ইঙ্গিত করিতে লাগিল, পার্ব্বতী আর মুখ তুলিতে পারিল না। উপুড় হইয়া পড়িয়া শুধু হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল।

রমজান আগু হইয়া আসিয়া কহিল,—"ভাই সব, ফিরে চল্। মেয়েটা বড্ড কাঁদচে, ওকে নিয়ে যেতে তোরা পারবি না।" সুদর্শন দাঁত বিচাইয়া কহিল—"তখন যে তারী তাল ঠুকে এসেছিলি, এখন ফিরবি কি করে—শুধু হাতে? আচ্ছায় ফিরে তাহলে মুখ দেখাতে পারবি?"

রমজান কহিল—"খুব পারব, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, এ মেয়েটা নেহাৎ আকুলি বিকুলি [illegible] এ সব জায়গায় মজলিসি আমি কিছুতেই চলাতে পারব না, চলাতে যেয়োও না।" একজন সরিয়া আসিয়া রমজানকে কুনুয়ের গুঁতা দিয়া বলিয়া উঠিল—"নেশাটা পুরো জমায় নি বুঝি? সর্দ্দারগুলোর ওপর হুকুম এখন আবার সাধুগিরি দেখানো হচ্ছে, সরে যা তুই, আমি দেখচি।"

রমজান দুই বাহু বাঁকাইয়া কহিল—"খবরদার, কোন বেটা ওর গায়ে হাত দিস্ না, আমি আজ একলা ওকে রক্ষে করব, দেখি তোরা কি করতে পারিস্, এখুনি চেঁচিয়ে লোক জাগব, আর এক এক বিঘে এক এক জনের মাথার খুলি ভাঙব।" রমজান গুণ্ডার 'যোদ্ধা' যেমন সকলের প্রিয় ছিল, উহার শক্তিকে তেমনি সকলে ভয় করিত, যেহেতু বাহুবল ও গায়েপোলিতে সে দিন সে অঞ্চলে অদ্বিতীয়—বেগতিক দেখিয়া হতভাগারা তৎক্ষণাৎ রঙ্গভূমি হইতে সরিয়া পড়িল। তৃণের পিসী বন্ধন মুক্ত হইয়া হাঁফাইতে লাগিল, বৃদ্ধার মুখ হইতে সহসা তখন আর কোনো কথা সরিতে পারিল না। রমজান এক পাশে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া পার্ব্বতীর বুক ফাটা কান্না দেখিয়া তারপর কহিল—"ভয় নেই বহিন্, আপনার ঘরের দা বহিন্ মেয়ে তোরা—তোদের অপমান আমরাই করচি, আল্লা জানেন এ পাপের শাস্তি কি—আমার মতন মাতালের কথার দাম নেই, তবু তোকে বলে যাচ্ছি, কাল থেকে রমজান্ মিঞা একলা এই গোটা গাঁয়ের বউ ঝিয়ের ইজ্জৎ বাঁচাবার ভার নেবে—গাঁয়ের যতগুলো ইতর জানোয়ার আছে—তাদের হাত থেকে।"

রমজান চলিয়া গেলে, গভীর নিশীথের স্তব্ধ অন্ধকারে, সেই বিজন ভাঙা ঘরে তার গভীর কণ্ঠস্বর যেন গম গম করিতে লাগিল। কিন্তু হৃদয়হীন গুরুদের যে নৃশংস অমানুষিক প্রকৃতি—কুৎসিত লালসার যে পৈশাচিক ক্ষুধার নগ্ন মূর্ত্তি আজ স্বচক্ষে পার্ব্বতী এইমাত্র দেখিয়াছে তাহাতে উহাদেরই একজনের এই গভীর অন্তর বাণীতে তার ক্ষত হৃদয় সাহস কিছুতেই মানিতে পারিল না, শুধু—অন্ধকারে ভীত বালক যেমন করিয়া আলোকের প্রার্থনা করে, স্থির শয্যাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া তেমনি করিয়া সে রাত্রির শেষে দীপ্ত সূর্য্যালোকের দান ভিক্ষা করিতে লাগিল আর সভয়ে যে অকরুণ দেবতার চরণে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য সহস্র আকুল প্রার্থনা জানাইয়াও সাড়া পায় নাই—তাহারই চরণে আর একবার অশ্রুসিক্ত ব্যাকুল প্রার্থনা নিবেদন করিয়া চলিল।

৬

উষার উন্মেষ আবার আকাশের চিত্রপটে—আবীর-কুঙ্কুমের রঙ মাখাইয়া দিল; জয়ন্তী, পাটকীলা, সোনালী, কোনো রঙই বাদ পড়িল না, বসন্তের কোকিল বড় মধুর কণ্ঠে সুর সাধা সুরু করিল, গাছে গাছে কচি কিশলয়গুলি মলয় হিল্লোলে দোল খাইতে লাগিল, ঘন সবুজ পাতার

বুকে বেলা বহ্নিকার হাসি শিশুর মুখের হাসি ফুটাইয়া তুলিল; পল্লীবধূ মৃদুকাজ লাগিতে ব্যস্ত হইল; ঘাটের পথ নব জাগরণের সাড়ায় মুখরিত হইয়া উঠিল; কিন্তু পার্ব্বতীর দেহ মনে আজ কোনো চাঞ্চল্য আসিল না, জড় প্রতিমার মতো অনুভূতিহীন বক্ষে, উদাস চক্ষে সে তাদের দাওয়ায় একটি চুপ চাপ করিয়া রহিল, ভুবনের পিসী রাত্রের ঘটনাই বড় বেশী—ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল, তার আর উদ্বেগের আজ তার অন্ত ছিল না, সে ভোর হইতেই পার্ব্বতীকে বলিল—"এমন ক'রে একলাধরে তোর থাকা হবে না পার্ব্বতী দিদি! আমার সাধ্যি কি হতভাগাদের হাত থেকে তোর মান ইজ্জৎ বাঁচাই, একটু শক্ত আশ্রয় তোর তারী দরকার, দেওরটি যে ক'দিন না আসে—অন্ততঃ সে ক'দিনের জন্তও। আমি একটুক ঘুরে আসি, তুই উঠে মুখে হাতে জল দিয়ে নে।" ভুবনের পিসী বাড়ীর বাহিরে নিয় পদার্পণ করিবামাত্র,—রাত্রের ঘটনাটি মুখে মুখে পল্লবিত হইবার সুযোগ মোটেই পাইল না, যেহেতু ভুবনের পিসীর তত্ত্ব মুহে জন্ম না হইলেও তত্ত্ব ঘরের মেয়েদের সম্মান বাঁচাইয়া চলিতে সে খুব জানিত, এবং নিজের যে অবস্থার চোখে লোক সরিষার ফুল দেখিয়া থাকে ঠিক পক্ষে সেই অবস্থায় মাথা ঘামাইয়া চর্চ্চা করিবার স্পৃহাকে সে একেবারেই সহ্য করিতে পারিত না, সুতরাং পার্ব্বতীর রাত্রিকার বিপদ কাহিনী কাহারও কাণে পৌঁছিল না, এবং সঙ্গে সঙ্গে পার্ব্বতীর দুঃখীরে সহানুভূতি জানাইবার জন্ত দলে দলে গুণানুধ্যায়িনীদেরও আগমন ঘটিল না, বেলা বারোটা পর্য্যন্ত আপনার কাজকর্ম ও তারই ফাঁকে পার্ব্বতীর একটু নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে থাকিয়া ভুবনের পিসী যখন পার্ব্বতীর কাছে ফিরিয়া আসিল, পার্ব্বতী তখনো—শুষ্কমুখে বসিয়া আছে, চোখ দুটিতে জাগরণ ক্লান্তি ও কান্নার বদলে পাকা জালিমের আমেজ লাগিল, বৃদ্ধা তাহা দেখিয়া ব্যস্তভরা স্বরে বলিয়া উঠিল—"হা—আমার কপাল, এখনও তেম্‌নি ক'রে বসি মুখে ঘরে আছিস্ গা, না ঘর দুয়োরে ছড়া কাঁট দিয়েছিস্।" পার্ব্বতী উদাস চিন্তায় বিভোর হইয়াছিল, ভুবনের পিসীর শব্দাবণে চমকিয়া উঠিয়া বিহ্বলভাবে তার মুখের পানে চাহিল—ভুবনের পিসী কহিল—"সোণার বর্ণ যে একরাত্তিরেই কালি মেড়ে দিয়েছে গো, কি কপাল করে এসেছিলি বোন যে তোর অদেষ্টে এতো ভোগ!"

"কেমন আছ পার্ব্বতী?" বলিতে বলিতে মিস্ ক্লোরা আসিয়া আঙিনায় প্রবেশ করিলেন, তারপর তুহিন খিন্ন পদ্মের ন্তায় পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—বাইজোত! তোমার কি অসুখ হইয়াছে পার্ব্বতী, তোমার চেহারা এমন দেখাইতেছে কেন?" তারপর—প্রথমে ভুবনের পিসী, পরে পার্ব্বতীর নিকট সবিস্তারে সকল ব্যাপার শুনিয়া তিনি সিদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—"এরপর এক মুহূর্ত্তও এখানে একা বাস করা তোমার নিরাপদ নয় পার্ব্বতী, তুমি আমার সহিত আইস, আমি প্রভু যীশুর নামে তোমার আমার নিকট ভগ্নী স্নেহে রক্ষা করিব, কোনো অত্যাচার তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।" হতভাগিনী পার্ব্বতীর বিচার করিবার শক্তি শেষ হইয়া গিয়াছিল, জীবনের ঘোর দুর্দ্দিনে সে আজ পথ হারা—বিরাট অন্ধকারে, দৃষ্টি আজ তার অভিভূত—এর মধ্যে বিদ্যুতের চকিত বিকাশে যে পথ, যে আশ্রয় তার চোখে জাগিল, পরম নির্ভরের সহিত সে আজ তাহাকেই গ্রহণ করিল; ভুবনের পিসী কোনো বাধা দিল না, সেই মুহূর্ত্তেই উজ্জ্বল দিবালোকে সমাজের অসংখ্য কুৎসা ও গ্লানির উপহার মাথায় লইয়া পার্ব্বতী ঐ বিধর্মী মহিলার আশ্রয়ে পল্লীর পথ চাহিয়া বিদায় লইল; সমাজ এহেন বিপথগামিনী বালিকার সংস্পর্শ হইতে মুক্তি পাইল ভাবিয়া পবিত্রতা রক্ষার গর্ব্বে বুক ভরিয়া উঠিল, এবং অবিলম্বে সংবাদটি ভেজেন্দ্রের খুড়ার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া নিজের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাইল।

আর ভেজেন্দ্র? যথাসময়ে এসংবাদটি সে পাইল বই কি! পাইয়াই সে মনে মনে কহিল—'সবই গ্রহের ফের—নইলে এমনটি হবে কেন, আমার আর দোষ কি, অদৃষ্টের লীলা সব!" অতঃপর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিধান লইয়া সে ছোট রকম একটি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নিজের শুচিতা বজায় রাখিল, হাজার হউক, ঐ বিপথগামিনীকে একদিন যখন সে অগ্নি ও শালগ্রাম সাক্ষী করিয়া বিবাহ করিয়াছিল, তখন পাতিব্রত্যের যোক্ত তাহাকেও কিছু স্পর্শ করিয়াছিল তো, সেটুকু ঝাড়িয়া মুছিয়া ফেলিয়া শুদ্ধ হওয়াই যখন।*

সমাপ্ত

* মূলে একটি সত্য ঘটনা লিখিত আছে।

কেনারা সিদ্ধান্ত

দেশবাসীর প্রতি বাই আমার নিবেদন—হে ভারতমাতার সন্তানগণ! আমি তোমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিতেছি। তোমাদের জড়তা ত্যাগ করিয়া জাগ্রত হও এবং কেনারা সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহার এরূপ তীব্র প্রতিবাদ কর, যেন সেই প্রতিবাদের ফল সমস্ত জগৎ উপলব্ধি করিতে পারে। আমাদের এই পরাধীন জাতির বক্ষকে চিরকাল দলিয়া যে অপমান ও অবিচার স্তূপীকৃত করা হইয়াছে, কেনারার অপমানও তাহারই একটী। আমরা নিজবাসভূমে যতদিন দাসত্বের পৃঙ্খল পরিয়া অশ্রুপ্লাবন লাভ করিব, ততদিন আমাদের প্রতি এই অত্যাচার ও অবিচার চলিবে। পাঞ্জাবের অত্যাচার ও খেলাতের প্রতিকারের জন্য যেরূপ স্বরাজই একমাত্র উপায়, সেইরূপ কেনারার অপমানের প্রতিকারেরও একমাত্র উপায় স্বরাজ। কেনারা সিদ্ধান্তের প্রতিবাদার্থে আমরা ২৭শে আষাঢ় এরূপ হোম হরতাল করি, যাহা পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। হে দেশবাসীর সন্তানগণ! "তোমাদের চিরকিষ্ট মাতার প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন কর! ত্রুটি, ছাড়া এবং সম্পাদনে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইও না।—(অরেল অব ইণ্ডিয়া)

ভারতের বাহিরে ভারতবাসীর অবস্থা—বর্ত্তমান ভারতের একটা প্রধান সমস্যা। ইহাতে প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সম্বন্ধ জড়িত। পাশ্চাত্য প্রাচ্যের সঙ্গে সত্যই মিলিতে পারে কি না,—অর্থাৎ মোটা পৃথিবীটাই দুইটী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইবে,—এবং যেত ও অ-যেত জাতিরা মিলিয়া যোর ফল সম্বন্ধে প্রশ্ন হইবে,—ইহা বাস্তবিকই ভাবিবার সময় আসিয়াছে। আর কেনারার ব্যাপারে এই কথাটাই আমাদের সম্মুখে স্পষ্টরূপে উপস্থিত হইয়াছে।

—"সি, এফ, এণ্ড্রুজ।

বাঙ্গালী যাবে ভারত-হিন্দু-মহাসভা বসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই "কলিকাতা বর্ণ সমাসভা" অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় তথাকথিত সমাজসংস্কারীরা অনেক গভীর তত্ত্ব কোলাহল-সহকারে আলোচনা করিয়াছেন। অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিলে যে অপূর্ব্ব সমাজন যাহা বজায় থাকে, তাহার ব্যাখ্যা আমরা শুনিয়াছি,—আর শুনিয়াছি, সর্ব্বজাতীয় হিন্দুকে একত্রে কূপ হইতে জল তুলিতে দিলে এবং দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে দিলে সনাতন ধর্ম্ম রসাতলে যাইবে।

'আনন্দবাজার'

গান্ধীপুরের সত্যাগ্রহ সংগ্রাম অনুকূল হইল। জাতীয় পতাকা লইয়া দেশবাসীরা সহরে বাহির হইয়া অনেক ফেরেঙ্গিঙ্গাদের, এমনকি দেশের লোকে জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষার জন্য জেলে যাইতেছিলেন। সরকার ও দেশবাসীর মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসা হইয়াছে। তাহার ফলে জাতীয় পতাকা লইয়া দেশের লোকের চলিবার পথে আর বাধা হইবে না। মিটমাটের সর্ত্ত এখনও জানা যায় নাই।

১৯১৯—২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ-এ ক্লাসের ইতিহাস বিভাগে ১৮০ জন ছাত্র ছিল। ইহাদের এক প্রতিবাসে ৪৫৭৫৲ টাকা খরচ হইয়াছে অর্থাৎ ১৮০ জন ছাত্র পড়াইবার জন্য বৎসরে ৪৫,৭০০৲ টাকা কেবল বেতন বাবদ খরচ করা হইয়াছে। এই টাকার মধ্যে শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ একাই ১৪০০০৲ টাকা টেঁকে গুঁজিয়াছেন। গড়পড়তা এক-জন ছাত্রের পিছনে এই বৎসর ২৫৲ টাকা বিশ্ববিদ্যালয় খরচ করিয়া-ছেন। পর বৎসর ইতিহাস-বিভাগে মোট ১২৮ জন ছাত্র ছিল, ইহাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতি মাসে বেতন বাবদ ১১৭৫৲ খরচ করিতে হইয়াছে অর্থাৎ কেবল ইতিহাসে শিক্ষা দিবার জন্য ১৯২০-২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ১,১০,১০০৲ টাকা খরচ করিয়াছেন। এই হিসাবে এই বৎসর একজন ছাত্রকে শিক্ষা দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবল বেতন বাবদ ৮৩৲ টাকা বার্ষিক ব্যয় হইয়াছে। এই ইতিহাস-বিভাগের কর্ত্তাই জগদ্বন্ধুবাবুর আবিষ্কারের জন্য যাহা এবং মালদহের জন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা ব্যারিষ্টার উকিল শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিভাগেরই একজন অধ্যাপক। জামাতা বাবাজীবন ব্যারি-ষ্টারেই ওকালতি করিয়া পরে ইতিহাস ও আইন শিক্ষা দেন, আইন বিভাগের জন্য ১১৫৲ টাকা ও ইতিহাস বিভাগের জন্য ২০০৲ টাকা দিয়া মূলীকন্যাজামাতায় মর্য্যাদা-রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। 'শারথ'

বরদাপ্রসাদ নাইডু বাঙ্গালী ছেলে প্রায়োপবেশনে আছেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে বল দিতেছে। ডাক্তার নাইডুকে অতি মলিন কাপড় পরিতে দেওয়া হয় সপ্তাহে কেবলমাত্র একদিন তিনি ঐ কাপড় কাচিতে পান।

জেল কর্ত্তৃপক্ষগণ এইভাবে তাঁহাকে ও অন্যান্য বন্দী দিয়া তাঁহাকে কথা প্রার্থনা করাইতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

গত ১৭ই তারিখে শ্রীযুক্তা বরদাপ্রসাদ নাইডু উচ্চকোর্টের ফারা-বিডায়ের ইন্সপেক্টর জেনারেলের নিকট তার করিয়াছেন যে, আমার স্বামী বন্দী রোগগ্রস্ত ও তাঁহার স্বাস্থ্যও সবল নহে, এরূপ অবস্থায় জেল কর্ত্তৃপক্ষগণকে আমার স্বামীর প্রতি এরূপ দুর্ব্যবহার করিতে দেওয়া তাঁহারা এক অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছেন। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, আমি আমার স্বামীর উপর কোনরূপ অনুরোধ প্রয়োগ করিবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি না, কেবলমাত্র তাঁহার এই অন্যায় কারাবাসের উপরের যেন এরূপ দুর্ব্যবহার করা না হয়।

'হিন্দুস্থান'

মাইকসিয়ে জেনার টাদাইল মহকুমা হইতে 'টাদাইল হিতৈষী' নামে একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র বাহির হইয়াছে। কার্যকারিতা, প্রবন্ধ ও স্থানীয় অভাব অভিযোগের সংবাদ আদি একাদশের ব্যবহার আমরা প্রথী হইয়াছি। টাদাইলের মত বড় মহকুমা হইতে 'টাদাইল হিতৈষী' প্রকাশিত হইলেই সুখের কথা।

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

২য় বর্ষ] ১৫ই ভাদ্র শনিবার ১৩৩০, ইং ১লা সেপ্টেম্বর। [৯ম সংখ্যা

আলোচনা

ভারত গৌরব—আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের এক ভ্রাতা মৌলানা মহম্মদ আলি, পূর্ণ দুই বৎসর কারাগারে নিগ্রহ-লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া আজ আবার কারাগৃহের বাহিরে দেশের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। গত বুধবার তিনি কারামুক্ত হইয়াছেন। স্বাধীনতা এই পুরুষ সিংহের কাম্য—তাই কারা ভীতি মৃত্যু ভীতি ইনি জীবনভর অবহেলা করিয়াছেন। হিন্দু মুসলমানের বিরোধের মধ্য দিয়াই দেশের এই দাসত্বশৃঙ্খল আসিয়াছে—ইহাই ভারতমাতার প্রিয় সন্তানের মত। আজ দেশের এই অবসাদ লাঞ্ছনার সময়ে আমরা পুরুষ সিংহ মৌলানা মহম্মদ আলিকে স্বাগত অভিনন্দন করিতেছি। মহাত্মার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ প্রিয়তম শিষ্য—স্বরাজ সাধক—আবার দেশে প্রাণের সাড়া জাগাইয়া তোল—সত্য-ও কর্ম্মের বিকাশে ভারতের ভীত মূর্চ্ছিত, মূক জনসঙ্ঘকে ভাষা দাও—তাহাদের মর্ম্মকথা ফুটাইয়া তোল। তাহাদের আশা দাও—ভাষা দাও।

• • • •

আমাদের জীবনের উচ্চ আশা কল্পনা, কামনা বাসনা সবই নিষ্ফল। আমাদের মধ্যে যাহারা ভাবিতে পারে তাহারা নিয়ত অনেক জিনিস ভাবে, অনেক জিনিসই পাইতে চাহে—কিন্তু কোন জিনিসই তাহারা পায় না। জীবনের আশা আকাঙ্খার দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমাদের জীবনটাই একটা মস্ত বড় crime, একটা দুর্ব্বিসহ জ্বালার ভার।

• • • •

দেশের যাহারা ভাবিতে পারে এমন একশ' একশ' লোককে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করা হউক তাহাদের মধ্যে কয়জন তৃপ্ত সন্তুষ্ট—জীবনে কয়জন সুখী! কি উত্তর পাওয়া যাইবে—দেশের কয়জন লোক বলিতে পারিবে যে সে সাধারণভাবেও সুখী? সুখের উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তর, কিম্বা জীবনের উপভোগের উচ্চ স্তরের কথা ছাড়িয়াই একেবারে দেওয়া হউক। এমনি অতি সাধারণ ভাবের জীবন যাপনের উপযোগী সুখই বা পাইতেছে ক'জনা? নাই—তেমন লোক দেশে খুব অল্প মিলিবে।

• • •

দেশে অর্থাগমের কোন পথ নাই। সামান্য যাহা আছে পেষণের মুখে পড়িয়া এক মুহূর্ত্তে তাহা উবিয়া যায়। দেশে লোকসংখ্যার অনুপাতে কর্ম্মক্ষেত্রের সীমা ক্রমশই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রহিয়াছে—বিশ্বের ভাব ভাবনা, আশা আকাঙ্খার সঙ্গে পরিচিত আমরা ক্রমেই হইতেছি। আর এ দিকে আমাদের ঘরের দৈন্য হাহাকার ক্রমেই ফুটিয়া উঠিতেছে। খাইবার পরিবার, কি করিয়া দিন চলিবে এই ভাবনায় দেশের লোকে অস্থির বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। নিজ নিজ তৃপ্তি আনন্দ—ভোগ বিলাস বাসনা লোকে মিটাইবে পরের কথা, আপন আপন দেহ ও পরিবার পরিজন কি করিয়া অতি সাধারণভাবে খাওয়াইয়া পরাইয়া বাঁচাইয়া রাখিবে সেই ভাবনাই এখন সকলের বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মনের মধ্যে একদিকে নানা উচ্চভাব কল্পনা আনন্দ ও বিলাসের স্বপ্ন আর এ দিকে অন্নের ভাবনা হাহাকার। চমৎকার অবস্থায় পড়িয়া দেশ হাবুডুবু খাইতেছে!

• • • •

দেশের এক শ্রেণীর অবস্থা এইরূপ—ইহারা ভাবিতে পারে। অপর এক শ্রেণী আছে, তাহারা মানুষ হইয়াও দেশের অধিবাসী হইয়াও অনেক কথা ভাবিতে ও বুঝিতে পারে না। সংখ্যায় ইহারাই বেশী, ইহারা দেশের অশিক্ষিত মূক জনসাধারণ। অভাব দৈন্যের জ্বালা ইহারা নীরবে সহে, দহনে তিল তিল করিয়া আত্মদান করে,—বুঝি তেমন মৃত্যুযন্ত্রণা সুগাল কুকুরও করে না। ইহারা অশিক্ষার প্রাণের বেদনার ভাষা দিতে পারে না—আর শিক্ষিত জনসাধারণ লজ্জায় প্রাণের বেদনার ভাষা দিতে পারে না। লজ্জা ও মানের ভয়ে ও সত্য কহিবার ও সত্য প্রকাশের ভীতিতে তাহারা যথার্থ অবস্থার রূপ দিতে ভয় পায়। তাই ভাবিতে যাহারা পারে তাহাদের অন্তরও যেমন মলিন ও ক্ষত বিক্ষত, ভাবিতে যাহারা পারে না তাহাদের মনও তেমনি নিষ্পন্দ, অসাড় হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে একটা তৃতীয় শ্রেণীও দেশে আছে—যাহারা এই মূক জনসাধারণ ও শিক্ষিত সাধারণের মাথায় হাত বুলাইয়া কোনরূপে সুখ স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতেছে।

• • • •

দেশের পুরুষ নারী সকলেই মৃতবৎ। মানুষের কাঠামোটা মাত্র ইহাদের আছে। দেহে প্রাণ বস্তুর সন্ধান আদৌ মেলে না—রস অভাবে প্রাণ শুকাইয়া গিয়াছে। ইহারা চলিতে ভীত, বসিতে ভীত, লজ্জা সঙ্কোচ ইহাদের একেবারে পাইয়া বসিয়াছে—সা এলাইয়া দেশের লোকে ভাগ্যকে তিরস্কার করিতেছে। ভাগ্যকে অমানুষের মত তিরস্কার করাতেই ভাগ্যলক্ষ্মী আগাইয়া না আসিয়া বার বার পিছাইয়া পড়িতেছেন কি না—কে বলিবে। এই অভাব বেদনা নিত্যজীবনে সহস্রভাবে ফুটিয়াও সমস্বরে এই বেদনার, অভাবের ভাষা লোকে দিতে পারিতেছে না। ইহার প্রতিকারের উপায় ভাবিয়া তাহা অবলম্বন করিতে পারিতেছে না। লজ্জা ভয় স্বার্থ—এই জিনিসগুলির আবরণে ও প্রভাবে আমরা সত্যকে বরাবর চাপিয়া আসিতেছি, আজ দেশের রুগ্ন ম্লান, কঙ্কালসার বীভৎস মূর্ত্তি আর এভাবে চাপিয়া রাখিয়া লাভ নাই। ইহাতে দেশ জীবন্তভাবে ক্ষতিগ্রস্তই হইতেছে। দেশের সত্য মূর্ত্তিতে দৈন্য কতটা—ইহার কোন খানেই যে এখন গৌরবের কিছুমাত্র নাই তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দেশের বাহ্য চাকচিক্য দূরে সরাইয়া ফেলিয়া মিথ্যার মোহ এড়াইয়া আজ সত্য স্বরূপ মূর্ত্তি দেখাইতে হইবে।

• • • •

দিনের দিন দেশের দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। দু'দিন পূর্ব্বেও যে ভাবে যে আয়ে লোকে দিন চালাইতে পারিত আজ আর তাহা পারিতেছে না। অন্ন সমস্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। খাদ্য-দ্রব্য, প্রয়োজনীয় প্রত্যেক জিনিষের দামই নিত্য বাড়িয়া চলিতেছে। জীবনের প্রয়োজনীয় সকল জিনিসের মূল্যই যেমন বাড়িতেছে দেশের আয় তেমন কোন দিক দিয়াই বাড়িতেছে না। অর্থাগমের পন্থা দেশের ক্রমেই যেমন লুপ্ত হইতেছে—দেশের অর্থ ব্যয়ের পন্থা তেমনি নানা দিক দিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। দেশময় আজ বেকারের প্রাধান্য। অভুক্ত আধা-মৃত প্রাণের হাহাকারে দেশের আকাশ বাতাস ছাইয়া ফেলিতেছে। এমনভাবে দেশের অবস্থা যদি একই পন্থাই চলিতে থাকে তবে অতি নিকট ভবিষ্যতেই কি হইবে!

• • • •

কেনিয়ায় ভারতীয়দের উপর অত্যন্ত অমানুষের ব্যবহার হইয়া থাকে। ভারতীয়েরা তথায় মানুষের ন্যায্য সম্মান, সুখ সুবিধা হইতে বঞ্চিত। ভারতও যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত, কেনিয়াও তাই। ভারতে সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও সাম্রাজ্যের বাহিরেরও বহু জাতীয় লোক সম্পূর্ণ রাজার হালে সুখ সুবিধা সম্মান লইয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে—বাণিজ্য করিতেছে। নানাভাবে অর্থার্জ্জন করিয়া ভোগ বিলাসের চূড়ান্ত করিতেছে। ভারতীয় অপর কোন দেশে সম্মান পাইবে না—অথচ ভারতে, ভারতীয়ের দেশে সকলেরই প্রতিপত্তি। ভারত সাম্রাজ্যের কাজে অর্থ সাহায্য করিবে, জন দিবে প্রাণ দিবে, তখন সে মুখের শুদ্ধ বন্যবাদ পাইবে। কিন্তু অপর দেশের মত সুখ সুবিধা চাইতে গেলেই সে পাইবে গলা ধাক্কা। এই ব্যবহার প্রতিবাদে ভারতীয়েরা গত মোম-

বার নিখিল ভারতীয় হরতাল করিয়াছিল। হরতাল দেখিয়া মনে হয় ভারতীয়েরা যে এ অপমান একেবারে না বুঝিয়াছে তাহা নহে। কিন্তু এ অপমান লইয়া শুধু নীরবে ভাগ্য ভাবিয়া চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। ইহার প্রতিকার ভারতীয়ের হাতে যাহা আছে ভারত যদি মানুষের মত তাহা অবলম্বন করিতে পারে তবে দু'দিনেই অপরাপর দেশের চক্ষুস্থির হইতে পারে। যেখানে ভারতীয়ের জন্য শুধু অপমান সেই খানেই ভারতের বাজারে চালাইবার জন্য কোটি কোটি মূদ্রার পণ্য তৈরী হয়। সেই পণ্য ভারতের বাজারে অবাধ বিক্রয় করিয়াই তাহাদের এত বিলাস গর্ব্ব ও চাকচিক্য। মানুষের মত ব্যবহার যদি ভারতীয়েরা পাইতে চাহে তবে এই সব পণ্য ভারতের বাজারে যাহাতে একেবারে চলিতে না পারে তাহাই এ দেশবাসীকে করিতে হইবে। বিদেশীয় জিনিস আমরা স্পর্শ করিব না। কুকুর বেড়ালের জীবন যাহাদের তাহারা যদি তাঁতী ও কৃষাণ সাজিয়া মনে প্রাণে সেই ব্রত লইয়া পরদেশী দ্রব্যের বিলাস মোহ ছাড়িতে পারে তবেই দেশের নষ্ট গৌরব, পদে পদে এই অপমানের প্রতিকার হইতে পারে। নতুবা মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়া কিম্বা করুণা চাহিয়া মানের দাবী চলিবে না। বিধান দেখাইবার সম্মান পাইবার বিধি নিজেদের হাতে। তাহার অপব্যবহার করিয়া সম্মান দাবী করিতে গেলে বার বার এমনি বিফল মনোরথ হইতে হইবে।

• • • •

এই অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য হরতাল হইয়াছে। দেশীয় প্রত্যেক খবরের কাগজে প্রতিবাদ চলিয়াছে। ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিবিশন বয়কট করা এই প্রতিবাদের আর একটি অঙ্গ। সাম্রাজ্যে যাহাদের কোন স্থান নাই তাহারা পরদেশী পণ্যের প্রভাব নিজদেশে চালাইবার ব্যাপারে কেন সহায় হইয়া নিজ সর্ব্বনাশের পথ আরও উন্মুক্ত করিবে—কেন অপমানকে আরও সস্তার ফাঁসী করিয়া জড়াইবে? বাংলা দেশীয় সংবাদ পত্র সঙ্ঘের সভায় প্রস্তাব হইয়াছে দেশীয় পরিচালিত কোন সংবাদ পত্রে ব্রিটীশ এম্পায়ার একজিবিশনের কোন বিজ্ঞাপন ছাপা হইবে না। অনেক ব্যবসায়ী যাঁহারা সাম্রাজ্য প্রদর্শনীতে নিজ নিজ দ্রব্যাদি পাঠাইতে প্রস্তুত তাঁহারা আমাদের জিজ্ঞাসা করিতেছেন—প্রদর্শনী বয়কট করা স্থির কিনা? সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত বুঝি প্রদর্শনীতে ব্যবসায়ীরা স্থানের জন্য আবেদন করিতে পারেন। সুতরাং ইহার মধ্যেই দেশীয় কাগজওয়ালাদের স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেওয়া উচিত যে এই প্রদর্শনীর সহিত এ দেশীয় লোকের কোন সম্পর্কই থাকিবে না। দেশীয় দু'একখানি কাগজে এই প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন ছাপা হইতেছে কিন্তু ইহা দেশীয় সংবাদপত্রের পরদার দোষে আর একদিনও ছাপা উচিত নহে। সমগ্র দেশকে যে জাতীয় কলঙ্ক ও অপমান সম্বন্ধে সজাগ করিতে হইবে—অপমানের স্থানে উপস্থিতি হইতে বিরত করিতে হইবে সেই কলঙ্কের পসরার প্রশংসা গীতি দেশীয় সংবাদপত্রে আরও বাহির হইবে কি! আগামী কল্য সংবাদপত্র সঙ্ঘের সভা হইবে এই বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য। দেখি ফল কি হয়?

• • • • •

ফরিদপুরের চরমাইনারে পুলিশ যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিল—নারীদের পর্য্যন্ত তাহারা যথেষ্ট লাঞ্ছিত করিয়াছিল—এমন খবর আমরা সংবাদপত্র মারফৎ বহু পাইয়াছি। সরকার পক্ষ হইতে পুলিসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের প্রতিবাদ হইয়াছে। ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সংবাদপত্রে ঘোষণা জানাইয়াছেন ইহা অসহযোগীদের কারসাজী—সব মিথ্যা কথা। এই ব্যাপার রটনায় অসহযোগীরাই সর্ব্বথা দোষী! এ কথার প্রতিবাদ যদি কিছু করিবার থাকে তবে অ-সহযোগীদের তাহা করা কর্ত্তব্য। শুনিয়াছিলাম কংগ্রেসের তরফ হইতে এ বিষয়ে তদন্ত হইয়াছে—ও বহু প্রমাণ তথ্য তাহারা পাইয়াছেন। সেগুলি প্রকাশ করিতে এত বিলম্ব কেন? এক পক্ষ বলিতেছে অত্যাচার হইয়াছে অপর পক্ষ বলিতেছে হয় নাই। তবে ঠিক খাঁটি সত্য কোনটা?

• • • •

দেশের বর্ত্তমান চুরী ডাকাতী, গুণ্ডামীর উপর কর্ত্তারা রাজনৈতিক দলাদলি ও বলশেভিজম চাপাইতে এত ব্যগ্র কেন? দেশে চুরী ডাকাতী ক্রমশ বাড়িতেছে। এমন কি বন্য জন্তু ও অপরাপর প্রাণীও এ দেশের লোককে একবার হইতে সাফ্ করিতে সুরু করিয়াছে—দেশের এই সহস্র প্রকার দুর্দ্দশা সবগুলির সঙ্গেই কি রাজনীতি ও বলশেভিজমের সম্বন্ধ আছে না কি? দেশের লোকের খাইবার নাই—আত্মরক্ষার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ হইতে তাহারা বঞ্চিত, বন্দুক বা অস্ত্র রাখা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ—মানুষের পরিচয় দিবার সব পথ তাহাদের রুদ্ধ, এ অবস্থায় দেশের এমন অবস্থা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। এ দেশের লোকের অত্যাচারীকে বাধা দিবার সকল রকম শক্তি হরণ করিয়া লইয়া—তাহাদের মানুষ নামের অযোগ্য করিয়া রাখা হইয়াছে। তাই নিজের মা বোনদের লাঞ্ছনা চোখের উপর হইতে দেখিয়াও তাহারা স্থবির পঙ্গু। ইহাদের সর্ব্বস্ব চোখের উপর লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়াও ইহারা নির্ব্বাক অচল। তাই বুঝি দেশের লোক দেশের লোকেরই ধন প্রাণ, নারীর মর্য্যাদা হরণ, মা বোনের মর্য্যাদা হরণ করিয়া রাজনীতি ও বলশেভিজমের সঙ্গে

হীন অপরাধের সমর্থন স্থাপন করিতেছে? অপরাধ সব সময়ই অপরাধ—দেশের লোকের অত্যাচারীর অপরাধকে বাধা দিবার শক্তি নাই—তবে তাহারা কাঁদে, কখন কি ভাবে প্রাণ যাইবে—আরো বেশী অপমানিত হইবে সেই ভয়ে সদা শঙ্কিত—এ অবস্থায় বিধানের কর্ত্তারা যে নীতি ইচ্ছা অবলম্বন করিয়া অপরাধ দমন করিতে পারেন।

• • • •

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ব্যয়ের বিবরণী যথাসময়ে মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় না। এই জন্য উপযুক্ত সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবশ্যকানুযায়ী ব্যয় হইতেছে কি না তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের মতানুসারে অধিক ব্যয়ের প্রয়োজন কিন্তু তদনুরূপ আয় না থাকায় তাঁহারা উচ্চ-শিক্ষার প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করিতে পারেন না। গত তিন বৎসর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ অর্থের জন্য রাজার দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং রাজাও অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে গত বৎসর সার্দ্ধলক্ষাধিক মুদ্রা মঞ্জুর করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সরকারী তহবিলের টাকা বিদেশী রাজা যখন বিদেশ হইতে আমদানী করেন না তখন ইহা দেশের লোকের অর্থ। এই অর্থ কিরূপে ব্যয় হয় তাহা জানিবার অধিকার নিশ্চয়ই এদেশের লোকের আছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ১৯১৯-২০ সালের কার্য্য বিবরণীতে মুদ্রিত হইয়াছে যে উক্ত বর্ষে ২১৪ জন ছাত্রকে ইতিহাস শিক্ষা দিবার জন্য মাসিক ৭৭৭৫৲ টাকা অর্থাৎ বার্ষিক ৯৩০০৲ টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। অর্থাৎ একজন ছাত্রকে ইতিহাস শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে এই বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের ৪৩২৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। পর বৎসর ইতিহাস বিভাগে মোট ১৮ জন ছাত্র ছিল এবং ইহাদের শিক্ষার জন্য বেতন বাবদে মাসিক ৯১৭৫৲ টাকা বা বার্ষিক ১,১০,১০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ছাত্রের সংখ্যা হ্রাস হইলেও এইরূপ অপব্যয় কখনও করা উচিত নহে এবং ব্যয়ের কর্ত্তা মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী হইলেও দেশের লোকের এইরূপ অপব্যয় প্রশ্রয় দেওয়া কোনমতেই উচিত নহে। ১৯১৯-২০ সালে একজন ছাত্রের ইতিহাস শিক্ষার ব্যয় ছিল ৪৩৩৲ টাকা—কিন্তু পরবৎসর এই একজন ছাত্রকে ইতিহাস শিক্ষা দিবার ব্যয় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে অর্থাৎ ১৯২০-২১ সালে ইতিহাসের ছাত্র প্রতি ৮৬০৲ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ১৯২১-২২ সালের গোইগ্রাজুয়েট বিভাগের কার্য্যবিবরণী এখনও প্রকাশ করা হয় নাই। এই বৎসরে দরিদ্র দেশবাসীর কষ্টার্জ্জিত অর্থ কিরূপে ব্যয় করা হইয়াছে তাহা জানিবার অধিকার বঙ্গদেশবাসী মাত্রেরই আছে। বার্ষিক কার্য্যবিবরণী প্রকাশে বিলম্ব দেশবাসীর নিকট হইতে প্রকৃত কথা গোপনের চেষ্টা মাত্র। যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ দেশের ও দশের নিকটে প্রকৃত সংবাদ গোপন রাখিবেন ততদিন তাহাদের অপব্যয়ের প্রশ্রয় দিয়া সরকারী তহবিল হইতে একটি পয়সাও মঞ্জুর করা উচিত নহে।

স্নেহ

[শ্রীচণ্ডিচরণ মিত্র]

প্রতি ছোট-কথার মধু পৌঁছে প্রাণে গিয়ে,
অনুরাগ এক-সুরা যেন প্রতি-কথার সাথী;
বড়-বড় কথা ও তাই ছেড়েছুড়ে দিয়ে
ছোট কথা প্রচলনের সবাই পক্ষপাতী।
একটি ছোট কথা, যেমন ধ'রনা এই,—'স্নেহ'
বল্‌লে মনে উছ্‌লে ওঠে কতই মায়া স্নেহ।

যেমি বলি 'স্নেহ' মোরা অমি আসে মনে,—
সহিষ্ণুতা, প্রেমের কথা,—তার সিঞ্চনের সুখ;
কথার আড়ে লুকায়িত কতই সুখোপনে
সকল দরদ, সকল ব্যথা—প্রিয়ার হাসি-মুখ।
ছেলে-মেয়ে ভাই-ভগিনী মায়ের বাপের স্নেহ,
একটি কথায় বুঝতে পারি, যখন বলি,—'স্নেহ'।

ব্যতিক্রম

(উপন্যাস)

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ]

প্রথম পরিচ্ছেদ

"আমাদের বাড়ী গেলিনি ভাই!" প্রেসিডেন্সি কলেজের ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুইজন ছাত্র কথা কহিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন গৌরবর্ণ সুপুরুষ আর তখনকার ফ্যাসানে সুসজ্জিত। খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতা ছাত্র মহলে কাপড়ের উপর কামিজের ব্যবহার একরকম উঠিয়া গিয়াছিল, তখন তাহারা সবেমাত্র চুড়িদার আস্তিন চিনা সিল্কাই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দ্বিতীয় ছাত্রটীর হা ভাব দেখিলেই বোধ হয় যে তাহার নিবাস পল্লীগ্রামে। তাহার পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য ছিল না, তাহার অঙ্গের বর্ণও উজ্জ্বল নহে কিন্তু তাহার চোখে একটা দীপ্তি ছিল। সে দীপ্তি তাহার ভবিষ্যত জীবনের পরিচয় দিতেছিল। দ্বিতীয় ছাত্রটী বলিল 'কাল মাঠে থেকে আসতে রাত্রি হয়ে গিয়েছিল তাই যেতে পারি নাই। আজকের সন্ধ্যাবেলা যাবো'। তাহার বন্ধু বলিয়া উঠিল "সে হবেনা ভাই" মা বলে দিয়েছেন তোমাকে এখনই ধরে নিয়ে যেতে হবে। "তা নইলে তুমি যাবে না"। দ্বিতীয় ছাত্রটী আপত্তি না করিয়া বলিল "মা বলেছেন যখন" "তখন যেতেই হবে" "বিনয়, যেতে হলে অসুবিধা হবেনা ত"? বিনয় বলিল "অসুবিধা আর কি ভাই" মাঠে খেলা দেখতে যাব মনে করেছিলাম—"তা নয় কাল যাবো"। প্রথম ছাত্রটী বিনয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া ফটকের বাহিরে আসিল, বিনয় বলিল বইগুলি রেখে আসি। দেখ নির্ম্মলেন্দু! ইন্দুকে শকুন্তলাখানা রেখে বলেছিলুম, তুমি একটু দাঁড়াওনা ভাই, আমি "মেস্ থেকে বইখানা নিয়ে আসি"। নির্ম্মলেন্দু বলিল "কেন আমার গাড়ীখানা কি কম হয়ে যাবে মেস অবধি গেলে"? "তাতো বলিনি ভাই, তবে তোমাদের ঘোড়াটা আবার কষ্ট করে এজুর যাবে তাই বলছিলুম"। "দেখ বিনয়! মেসতো সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে, আমাদের বাড়ী জোড়াসাঁকো, এখানে দাঁড়িয়ে তর্ক না করে চল না ততক্ষণ গাড়ীতে উঠি, যতক্ষণে তর্কটা শেষ হবে ততক্ষণে বাড়ী পৌছে যাবো, বিনয় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে বলিল 'তবে চল যাই'।

গাড়ীতে উঠিয়া দুই বন্ধু চলিয়া গেল। নির্ম্মলেন্দু যখন বাড়ী পৌছিল তখন বেলা পাঁচটা বাজিয়াছে, বলে বলে লোক আফিস হইতে ফিরিতেছে, বড় বড় রাস্তাগুলা ট্রামে আর গাড়ীতে ভরিয়া গিয়াছে, জোড়াসাঁকোর একটা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সম্মুখে গাড়ীখানা গিয়া দাঁড়াইল। নির্ম্মলেন্দু তাহার বন্ধুকে লইয়া প্রকাণ্ড সদর মহল ছাড়াইয়া একেবারে অন্দরে উঠিল। আনন্দের বড় উঠানটী একটী ছোটখাট বাগান; নানারকমের চিনামাটীর টবে বেল, জুঁই চামেলী রজনীগন্ধা প্রভৃতি বিলি ফুলের গাছ বসান ছিল, তাহার মধ্যে চামেলী আর রজনীগন্ধাই প্রচুর পরিমাণে ফুটিয়াছিল। তের চোদ্দ বছরের একটী কিশোরী ছোট ছোট চামেলী ফুল তুলিয়া নীলাম্বরী সাড়ীর আঁচলে রাখিতেছিল, সে নির্ম্মলেন্দুকে দেখিয়া দৌড়াইয়া আসিল, আসিতে আসিতে তাহার আঁচল হইতে ফুলগুলি পড়িয়া গেল। নির্ম্মলেন্দু তাহা দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, কিন্তু বিনয় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। উপরে উঠিয়া নির্ম্মলেন্দু যখন দেখিল বিনয় আসে নাই, তখন সে একটু আশ্চর্য্য হইয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইল। দেখিল যে বিনয় ছড়ান ফুলগুলি কুড়াইয়া তাহার ভগিনীর অঞ্চলে উঠাইতেছে। নির্ম্মল তাহা দেখিয়া বলিয়া উঠিল "ইন্দি! তুই বুঝি বিনয় ছাড়া ফুল কুড়াবার লোক পেলিনা"? ইন্দু জড়সড় হইয়া বলিল "আমি কি বলেছি? উনি কুড়িয়ে দিচ্ছেন তাই আমি নিচ্ছি"। বিনয় লজ্জিত হইয়া বলিল "উনি ত

বলেন নি, ফুলগুলো পড়ে গিয়েছিল তাই আমি কুড়িয়ে দিচ্ছি"। উপর হইতে নির্ম্মলেন্দু বলিল "ও ফুল আর কুড়তে হবে না, বাগান থেকে নানী ফুল দিয়ে গেছে নেবে এসো"। বিনয় কিন্তু বন্ধুর কথা শুনিয়াও শুনিল না, সমস্ত ফুলগুলা কুড়ান শেষ হইলে শেষের একমুঠা ফুল সে নীলাম্বরী শাড়ীর অঞ্চলে না দিয়া নিজের পকেটে রাখিল—ইন্দু তাহা দেখিতে পাইল। তখন বিনয় বলিল 'অভিজ্ঞান শকুন্তলাখানা এনেছি, এতে ইংরাজী আর বাংলা অনুবাদ দুই-ই আছে : আপনার বুঝতে কোনই কষ্ট হবে না"। তখন দৃষ্টি ভূমিতে ন্যস্ত করিয়া বিনয় আস্তে আস্তে উপরে চলিয়া গেল।

নির্ম্মলেন্দু তখন অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে একখানা সূচির দিকে তাকাইয়াছিল, সে বন্ধুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল "ভাই কি ভয়ানক সংযমী তুমি—আমি ইস্কুল থেকে এসে সূচির বিরহে অস্থির হয়ে উঠি। এই দেখ তোমার ফুল কুড়তে কুড়তে একখানা সূচি ঠাণ্ডা হয়ে গেল, মা আবার ভাজতে গেলেন"। বিনয় অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া বলিল "আবার কেন ভাই আমার ঠাণ্ডা সূচি খাওয়া অভ্যাস আছে, তুমি মাকে ডাকোনা ভাই ? এস এই সূচি আমরা দুজনে ভাগ করে খাই"। অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া মাথা নাড়িয়া নির্ম্মলেন্দু বলিল "দেখ ভাই সব জিনিষে ভাগ দেওয়া যায় গরম সূচির ভাগ দেওয়া যায় না, আর শুনেছি আর একটা জিনিষের ভাগ দেওয়া বড় শক্ত"। বিনয় হাসিয়া বলিল "সে জিনিষটা তো শিগ্‌গীরই আসছে এলে, না হয় ভাগ বাটোয়ারার কথা হবে"। এই সময় নির্ম্মলেন্দুর মা আসিয়া পড়ায় বন্ধুদ্বয়ের রসালাপ ভঙ্গ হইল। মা আসিয়াই নির্ম্মলেন্দুকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তুই কি আক্কুটে ছেলে বাপু তোর সব জিনিষ গরম চাই ? এই দেখ দেখি কেমন ছেলে, মুখে কথাটি নাই যা দিচ্ছি তাই খাচ্ছে, যা বলছি তাই শোনছে, তুই অমন হতে পারিসনি নির্ম্মল" ? নির্ম্মল সূচির থালাটা টানিয়া লইয়া বলিল 'পারি মা বুঝলে—কিন্তু বেশী দিন নয়। আমি যখন বিনয়দের বাড়ী যাবো, তখন বিনয়ের মা যা যা দেবে তাই খাবো"।

তখন নির্ম্মলেন্দু সূচির অর্দ্ধেক ধ্বংস করিয়াছে দেখিয়া মা বলিয়া উঠিলেন, কি অসভ্য ছেলে তুই নির্ম্মল ? তোর বন্ধু বসে রইলো আর তুই রাক্ষসের মত গিলতে লাগলি" ?

নির্ম্মলেন্দু একটু লজ্জিত হইয়া বলিল—"কি যে বাও না ? তোমার জন্য যে আমি মারা যাই ?" অনুরুদ্ধ হইয়া বিনয় সূচির থালাখানা টানিয়া লইল এবং খাইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহার একখানা সূচি খাওয়া হইবার পূর্ব্বেই নির্ম্মলেন্দু তাহার থালাখানা শূন্য করিয়া বলিল—"মা, সূচি !" মা বলিলেন—"দাঁড়া বাপু ভেজে আনি।" মা চলিয়া গেলেন ; বিনয় তখন দ্বিতীয় সূচিখানি আরম্ভ করিয়াছে, 'তোর সূচিগুলো যেনা ভাই ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, তোর ওখানা খেতে খেতে মা গরম সূচি নিয়ে আসবে।' বিনয় কথা না কহিয়া সূচিগুলি তুলিয়া দিল, নির্ম্মলেন্দুও বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া তাহাতে মনঃসংযোগ করিল। মা আসিয়া দেখিলেন যে কাহারও পাতে সূচি বা তরকারি নাই। বিনয় কোন দিনই খাইতে পারিত না এবং তাহার পাতে সূচির অপব্যয় দেখিয়া নির্ম্মলের মাতা দুঃখ করিতেন। আজ বিনয়ের থালা খালি দেখিয়া মা মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। মা বলিলেন—"বাবা বিনয়, আজ বুঝি খিদে পেয়েছিলো ? ও ইন্দি ! আর একটু তরকারী নিয়ে আয়।" মা যখন ইন্দুকে ডাকিতে পিছন ফিরিয়াছেন সেই অবসরে নির্ম্মল বিনয়ের থালা হইতে এক খোছা সূচি উঠাইয়া লইয়াছে। চুরিটা কিন্তু মার নজর এড়াইল না। "তিনি দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন ওরে রাক্ষস ও হতভাগা নিজে তো খেয়েছিস্ আবার বিনয়ের সূচি চুরি করে খাচ্ছিস ?" সেই জন্যে বুঝি বিনয়ের সূচি আজ ফুরিয়ে গেছে ?" বিনয় হাসিল, কিন্তু নির্ম্মলেন্দু কোন কথা কহিল না। এই সময়ে ইন্দু একবাটী তরকারী লইয়া আসিল এবং অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বাটীটা বিনয়ের থালার ডিন হাত তফাতে রাখিল। মা তাহা দেখিয়া বলিলেন—"বাটীটা একটু এগিয়েই দে বাছা ?" ইন্দু অগত্যা কম্পিত পদে বাটীটা সরাইয়া দিতে গেল, তখন নির্ম্মলেন্দু বলিয়া উঠিল—"বোনটা কি এক চোখো দেখ দেখি মা ? আচ্ছা, আমি কি তরকারী খেতে জানি না ? আমায় একটু দিলে কি দোষ হ'তো ? বাটীটা ভদ্র বিনয়ের পাতের কাছে ধরে দেবার মানেটা

কি ?" ইন্দু ভ্রাতার কথা শুনিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। মা তাহা দেখিয়া বলিলেন —"তরকারী চাই বল্লেই তো হয় বাপু, অত খোঁটা দেবার দরকার কি ?" নির্ম্মলেন্দু উত্তর না দিয়া বাটীটা টানিয়া লইল, তাহা দেখিয়া মা বলিয়া উঠিলেন—"ওরে ওকে একটু দে।" নির্ম্মলেন্দু বলিল—"মা তোমাদের বুঝি তরকারী আর নাই ?" "থাকবে না কেন ? তবে আমি বাজার নষ্ট করে এনেছি ওকে তুই খেতে দিবি না ?" "ও কি ও-সব খায় মা ? ও খায় টেনিসনের কবিতা, গ্রিসদেশের ইতিহাস ইত্যাদি ইত্যাদি।" বিনয়ও বলিল —"আমি আর তরকারী চাই না মা।"

মা গড় গড় করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেলেন, দুই বন্ধু তখন নির্ম্মলের পাঠাগারে ঢুকিয়া গল্প করিতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ পরে বিনয় একখানি বই লইয়া বসিল আর নির্ম্মল ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"দাদা, এ বইখানা বুঝতে পারলাম না।" বলিয়াই নিতান্ত অপরাধীর মত ইন্দু নির্ম্মলের পাঠাগারের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইল। নির্ম্মল একেবারেই হুঙ্কার করিয়া উঠিল "আবার এসেছিস পোড়ারমুখী ! কে তোকে লেখা পড়া করতে বলেছে ? তুই মেয়ে মানুষ, বাটনা বাটবি, তরকারি কুটবি আর রাঁধবি ? তোর শকুন্তলা পড়ে আর কি হবে ?" রাগে অভিমানে ইন্দুর ঠোঁট ফুলিয়া উঠিল, সে বলিল, "তুমিই তো পড়তে বলেছো দাদা। আমি তো বলেছিলুম ও সংস্কৃত বই আমি বুঝতে পারবো না।" বিপ্লবীর সুন্দর চোখ দুটীতে জলের ছায়া দেখা গেল, তাহা দেখিয়া নির্ম্মল হাতের ছবিখানা নামাইয়া রাখিল আর বিনয়ের হাত হইতে বইখানা সশব্দে মাটীতে পড়িয়া গেল, ইন্দু অশ্রুধারা লুকাইবার জন্য মুখ ফিরাইল। তখন নির্ম্মল বলিল "আবার কাঁদতে আরম্ভ করলি রাক্ষুসী পোড়ারমুখি ! আমি কি বিদ্রোহপূর্ণ তোকে সংস্কৃত বই পড়াবো ? পণ্ডিতের বটীর ন্যায় পালিয়ে নৈত্যের দোকানে তামাক খাই। কাঁদলে কি হবে ভাই। শকুন্তলা বেটা ছেলে না মেয়ে মানুষ তাই আমি জানি না।" শেষের কথাটা শুনিয়া বিনয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তখন নির্ম্মল বলিল 'এত কষ্ট করে চিত্ত সংযত করে ইন্দিরার ছবিখানা আঁকছিলুম তুই পোড়ারমুখী এসে মুখের ভাবটা একেবারে মাটী করে দিলি। ঐ শকুন্তলার মাষ্টার বসে আছে, বিনয় একটু পড়ানা ভাই।'

বেশ ইন্দি। দুষ্মন্তের সভায় শকুন্তলার বিচার পড়তে গিয়ে বিনয় একদিন কেঁদে ফেলেছিল. সুতরাং শকুন্তলা পড়াবার এমন উপযুক্ত মাষ্টার আর মিলবে না।' বিনয় বলিয়া উঠিল "শকুন্তলা যে পুরুষ মানুষ এ কথা কাল ক্লাসে প্রচার করতে হবে।" কথাটা শুনিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে ইন্দু একটু হাসিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া নির্ম্মল বলিল "কি ভাগ্যি হেসেছিস দিদি ? আমি ভাবলুম এক চোখ জল নিয়ে মার কাছে নালিশ করতে গেলেই আমার ইন্দিরার আজ রক্ষা রক্ষা।". তখন বিনয় বলিল, 'আসুন আমি পড়াচ্ছি আপনাকে'। ইন্দু এক পা অগ্রসর হইয়া আবার থামিয়া গেল। তাহা দেখিয়া নির্ম্মল বলিল, "আর না এগিয়ে।" ইন্দু আর এক পদ অগ্রসর হইয়া আবার থামিয়া গেল, তাহা দেখিয়া নির্ম্মল চটিয়া উঠিয়া বলিল, "আয় না পোড়ারমুখী" আবার দাঁড়ালি কেন ? "তুই পড়তে বসলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ছবি খানা আঁকিতে বসি।" ইন্দু হঠাৎ বলিয়া ফেলিল 'বৌ তো অগ্রহায়ণ মাসে আসবে দাদা তবে আর ছবি এঁকে কি হবে ?' বলিয়াই সে লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িল। বিনয় হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিল। নির্ম্মল অপ্রতিভ হইয়া বলিল "তবে রে পোড়ারমুখী এই বিদ্যা হয়েছে তোমার ? আমার ইন্দিরা, আমার বান্ধিতা আমার সব সুখ দুঃখের ধন কি সেই কালামুখী উল্লুকমুখী বৌ ?" এবার কিন্তু বিনয় ও ইন্দু একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল বিনয় বলিল—"পাশাপাশি তুলনা না করলে ঠিক বোঝা যাবে না, সুতরাং বৌ আসা না পর্য্যন্ত তার মীমাংসা হতে পারে না।"

নির্ম্মল হতাশভাবে ছবিখানা রাখিয়া বলিল, "বিনয় তুই এখন ইন্দিকে পড়াবি কি না ? বিনয় বলিল আমি তো প্রস্তুত উনি পড়লেই হয়"। "ইন্দি ! তুই যা বল্‌বি

তাই শুনবো, একটুখানি স্থির হয়ে পড়না ভাই? মুখে বিমল আনন্দের ভাবটা অনেক কষ্টে টেনে এনেছিলুম, তোদের জ্বালায় সব গুলিয়ে গেল"। ইন্দু বইখানি হাতে করিয়া বিনয়ের কাছে আসিল, বিনয় সম্ভ্রমে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল। সে বলিল "আপনি বসুন"। ঘরে মাত্র দুইখানা চেয়ার ছিল, তাহার মধ্যে একখানায় নির্ম্মলেন্দু বসিয়াছিল, সুতরাং ইন্দু বিনয়ের কথামত বসিতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া নির্ম্মল বলিল "ইন্দি ওঘর থেকে আর একখানা চেয়ার নিয়ে আয়"। ইন্দু চেয়ার আনিতে চলিল তাহা দেখিয়া বিনয় বলিয়া উঠিল 'অত বড় ভারি চেয়ার উনি আন্‌তে পারবেন কেন আমি যাচ্ছি।'

পাশের ঘরে অনেকগুলা চেয়ার পড়িয়াছিল, ইন্দু তাহার একখানা তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময়ে বিনয় সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল "উঃ অতবড় ভারি চেয়ার আপনি কি তুলতে পারেন? ছেড়ে দিন হাতে ব্যথা হবে"। ইন্দুর মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, সে সরিয়া দাঁড়াইল, বিনয় চেয়ারখানা তুলিয়া লইয়া আসিল।

স্ত্রীকে চেয়ারে বসাইয়া বিনয় বই খুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "আপনি বইটার দিকে চেয়ে দেখুন, অভিজ্ঞান শকুন্তল কলিদাসের একখান প্রসিদ্ধ নাটক। দুই হাজার বছর পূর্ব্বে আমাদের থিয়েটার ছিল। আপনারা হয়ত মনে করেন যে আমরা ইংরাজী দেখে—নির্ম্মলেন্দু বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল "বিনয় তুই আপনি বলছিস কাকে তুই আমাকে তুমি বলে ডাকিস, কিন্তু ইন্দি যে আমার চাইতে ছ' বৎসরের ছোট তাকে বলছিস আপনি"? বিনয় একটু লজ্জিত হইয়া বলিল "তুমি, বইটার দিকে চেয়ে দেখুন—"নির্ম্মল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল "তুই ইন্দিকে পড়াবি কি? তোর বাঙলা সংশোধন করবার জন্য একজন মাষ্টার প্রয়োজন। তুই একবার বললি তুমি তারপর বলছিস দেখুন"। বিনয় লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বিনয় বলিল "নির্ম্মল তুই এখন আমার কথার ছল ধরিসনে ভাই। তুমি শোন। এই সমস্ত নাটক আমাদের সে কালের থিয়েটারে অভিনয় হোতো। নাটকের মধ্যে দু রকম ভাষা আছে, বড় লোকেরা অর্থাৎ রাজা রাজড়া কিম্বা পদস্থ লোকেরা—"ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল "পদস্থ কাকে বলে?" বিনয় বলিল "যারা বড় চাকরী করেন কিম্বা ভাল কাজ করার জন্য রাজার কাছে সম্মান পেয়েছেন তাদের পদস্থ লোক বলে। নির্ম্মলেন্দু বলিয়া উঠিল, "পড়াচ্ছিস শকুন্তলা এখন সংস্কৃত প্রাকৃত আর অপভ্রংশের তর্ক তুললি কেন?" বিনয় ভ্রুভঙ্গি করিয়া বলিল "তুই ছবি আঁকছিস্ আঁক। 'দেখুন' "আবার দেখুন?" বিনয় এইবার সাবধান হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "দেখ পদস্থ লোকেরা পড়ে বা পড়ে সংস্কৃত বলেন আর সাধারণ লোক প্রাকৃত বলে। এই প্রাকৃত আছে বলেই নাটক গুলো ওত শক্ত ঠেকে। শকুন্তলার মত নাটক আমাদের দেশে খুব কম আছে। প্রথম অঙ্কে বনের মধ্যে রাজা দুষন্ত রথে চড়ে শিকার করতে গেছেন, একটা হরিণ তাড়া কোরেছেন, সেটা কিন্তু মুনিদের আশ্রমের হরিণ। তপস্বীরা এসে রাজাকে হরিণ মারতে বারণ করেছেন, রাজা অমনি ধনুক থেকে বাণ খুলে নিয়েছেন। তারপর শিকার ছেড়ে রাজা আর সারথি আশ্রম দেখতে গেলেন, সেখানে তখন শকুন্তলা; অনসূয়া আর প্রিয়ম্বদা গাছে জল দিচ্ছিলেন। রাজা দূর থেকে শকুন্তলাকে দেখতে পেলেন। সেইখানে সেই বনরাজি নীলা ছিল শান্ত তপোবনের উপান্তে—"নির্ম্মলেন্দু বলিয়া উঠিল ওরে অত বড় বড় কথা ইন্দু বুঝবে কি কোরে?" ছাত্রী কিন্তু অপ্রতিভ না হইয়া বলিল—"ও কথার মানে আমি সব বুঝি দাদা।" নির্ম্মল অগত্যা চুপ করিল।

শকুন্তলার প্রথম অঙ্ক শেষ করিয়া বিনয় যখন উঠিল তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। নির্ম্মলের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "কাল আসবে তো বাবা?" বিনয় লজ্জায় মস্তক নত করিয়া বলিল—"আসবো।"

(ক্রমশঃ)

কচি

[শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়]

এক

নিস্তারিণী বামুনের ঘরের বিধবা ; কলিকাতায় এক বাবুর বাড়ীতে ভাত রাঁধিয়া খায়। পনের বৎসর ধরিয়া সে চাকরী করিতেছে। বয়স প্রায় চল্লিশ। বেঁটে-গোছের, গৌর-বর্ণ, মোটা-সোটা চেহারা। এককালে তাহাকে হয়ত' সুশ্রী বলা চলিত, এখন আর চলে না।

প্রকাণ্ড তে-তলা বাড়ী ; তাহারই উপরের একটা ঘরে রান্না হইত। একদা সন্ধ্যায় সেখানে বসিয়া নিস্তারিণী কাজ করিতেছিল, এমন সময় ভৃত্য বনমালি আসিয়া সংবাদ দিল, বামুন-মা, দেশ থেকে' তোমার বোন্-পো এসেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে, বোনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া, তাহার শ্রাদ্ধশান্তির খরচের নিমিত্ত পাঁচটা টাকা তাহাকে পাঠাইতে হইয়াছে,—আজ আবার কিসের ছুতা লইয়া যে বোন্-পো আসিয়া হাজির হইল, সেই ভাবনায় একটুখানি বিচলিত হইয়া কম্পকণ্ঠে কহিল,—বোন্-পো ? ...কই ?

বনমালি তাহাকে সঙ্গে লইয়াই আসিয়াছিল। বলিল, —এই যে।

নিস্তারিণী মুখ ফিরাইতেই দেখিল, ফটিক চৌকাঠের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নাম জানিত, কিন্তু উভয়ের মধ্যে চেনা-শোনা জীবনে কোনদিনই হয় নাই। নিস্তারিণী দেখিল, চোদ্দ-পনরো বছরের ছেলেটি। দিব্যি ফুটফুটে' সুন্দর চেহারা ;—তবে, পাড়াগাঁয়ে রৌদ্রের উত্তাপে গায়ের রংটা একটু পুড়িয়া গেছে। পরণে, একখানা ছেঁড়া ময়লা কাপড়, গায়ে একটা গেঞ্জি।

বলিল, আয় রে ফটিক, বস্।...তুই কেমন করে' এলি বাছা ?...কখ্খনো ত' আসিস্নি !

ফটিক তাহারই কাছে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। বলিল, না এসে' কি কোর্‌ব ? খাব কি বল ?...দুদিন খেতে পাইনি মাসী, তা কেউ একগণ্ডুষ জলও তায় নি।

—তবে এলি কেমন করে ?...গাড়ী-ভাড়া ?

ফটিক আগ্রহসহকারে বলিতে আরম্ভ করিল, সে-কথা আর বলো না মাসী !...সে-ই যে পাঁচটা টাকা পাঠিয়েছিলে তুমি, সে টাকা তো খরচ হয় নি,—ভট্চাজের কাছে রেখেছিলুম। তারপর ভট্চাজ্ যখন শুন্লেন, আমি দুদিন খেতে পাইনি, তিনি নিজে থেকে টাকা পাঁচটি আমায় ফিরিয়ে দিয়ে বল্লেন, এই নে তোর টাকা। এই দিয়ে তোর মাসীর কাছে চলে' যা, সেখানে খেয়ে পরে' বাঁচ্‌বি। তাই তোমার কাছে চলে' এলুম।

—কল্‌কাতা তো কখনো আসিস্‌নি' ফটিক,—এ বাড়ী টেন্ পেলি কেমন করে ?

—ওরে বাবা, সে কি কষ্ট ! সেই দুপুর থেকে' ঘুরে' ঘুরে' তবে এতক্ষণে এলুম।...একটি জল খাব, বড় তেষ্টা পেয়েছে।

নিস্তারিণী ডাকিল, বনমালি অ বনমালি !

বনমালি সাড়া দিল, কি বোল্‌ছ বামুন মা ?

—ফটিককে একগ্লাস জল আর মিষ্টি দে না বাবা।

বনমালি জল ও মিষ্টি আনিলে, ফটিক এক নিশ্বাসে জলটা চক্-চক্ করিয়া খাইয়া ফেলিয়া বলিল, বাবা ! বাঁচ্‌লুম !...শীগ্‌গির করে' চারটি ভাত দিও মাসী, বড্ডো খিদে পেয়েছে আমার।

—এই যে, চচ্চড়িটা হয়ে যাক্,—তার পর বাবুর কাছে মায়ের কাছে তোকে একবার নিয়ে যাব, তারপর ভাত দিব।

—আচ্ছা, তাই ত-ই।...তুমি বেশ আছ কিন্তু। কল্‌কাতা আচ্ছা সহর, নয় মাসী ?

নিস্তারিণী হাতের-খুন্তিটা উনানের একপাশে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, বেশ আর কোথা বাবা ? এই ভাখ না, এরই মধ্যে যাতে ধরেছে। দুবেলা পনরো-ষোল জনের রান্না, আমি আর পারি না বাবা।...বড্ডো রোগা হয়ে গেছি,—তুই ত' এর আগে আমায় দেখিস্‌নি বাছা !

মাসীর মাংসবহুল বপুখানির দিকে একবার তাকাইয়া ফটিক বলিল, এর চেয়েও মোটা ছিলে নাকি মাসী ? বাবাঃ ! তাহ'লে তো তুমি একটি হাতি ছিলে বল ?

নিস্তারিণী চুপ করিয়া রহিল।

ফটিক বলিল, বেশ হবে মাসী, আমিও তোমার সঙ্গে কাল থেকে রেঁধে' দিব।...আর কিছু না পারি ভাত-ডালটাও তো নামাতে পারবো।

—হ্যাঁ, তাই হবে। বলিয়া, হাতের খুন্তি দিয়া উনানে-চড়ানো তরকারিটা ব্যস্তভাবে নাড়িয়া বলিলেন, এই হয়ে গেল বলে' ! আর দেরী নেই।

...বর্ষাকাল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। ফটিক রান্নাঘরের ইলেকট্রিক্ বাতিটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়াছিল।

নিস্তারিণী ভাবিল, যাহা হউক, ছেলেটা হাতে থাকিলে শেষ-বয়সে অন্ততঃ ভাত রাঁধিয়াও তাহাকে খাওয়াইতে পারিবে।

দুই

হইলও ঠিক তাই। পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির ফলে নিস্তারিণীর শরীর ভাঙিতে দেরী হইল না। বৎসর দুয়েকের মধ্যে বাত এবং অন্যান্য নানাপ্রকার ব্যাধিতে সে যখন এক-প্রকার পঙ্গু হইয়া পড়িল, তখন কটিকও তাহার নিকট শিক্ষানবিশী করিয়া রন্ধনকার্য্যে বেশ সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছে!

একা কটিককেই রান্নার প্রায় সমস্ত কাজ করিতে হয়। জনের-ষোল জন লোকের জন্য দুবেলা রান্না করা এই বালকের পক্ষে একপ্রকার দুঃসাধ্যই ছিল, কিন্তু একটা লোক তাহাকে সময়-সময় জল তুলিয়া, বাঁটনা বাঁটিয়া সাহায্য করিত। সেই বাবুর বাড়ীরই একটা ঝি—কচি। বয়স প্রায় চোদ্দ, গায়ের রং কয়লা, কিন্তু ঠিক সুন্দরী বলা চলে না। সে না-কি তার মায়ের সঙ্গে এ বাড়ীতে আসিয়াছিল, তাহার পর দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাহার মা এইখানেই মারা গিয়াছে। কচির বয়স তখন দশ। তাহার পর আজ চারটা বৎসর সে কোনরকমে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। যাইবার মত যায়গা ছিল না বলিয়াই বোধ করিয়া কেহ তাহাকে এ বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয় নাই।...

বাড়ীতে আরও অনেক ঝি ছিল, কিন্তু কচির সহিত মনের মিল কাহারও হইত না। কচিও তাহাদের পাশ ঘেঁসিত না। সমস্তটা দিন রান্নাঘরের দরজায় বসিয়া বসিয়া কটিকের রান্না দেখিত, এটা-ওটা-সেটা কাজ করিত; খাইবার সময় খাইত এবং ঘুমাইবার সময় ঘুমাইত।

একমাত্র কটিক ছাড়া কেহই তাহার উপর কর্তৃত্ব করিতে ছাড়িত না। যে-কোন সময়ে তাহার সহিত চোখোচোখি হইলেই, কারণে-অকারণে, সকলেই একটা-না-একটা কর্কশ কথা তাহাকে শুনাইয়া দিত। সেও নির্ব্বিবাদে সমস্ত শুনিত,—কাহাকেও কোন কথা বলিবার সাহস হইত না। এই ত' গেল কচির ইতিহাস।

...সেদিন দুপুরে, সকলের আহারাদির পর কটিক বাজার হইতে একটা লাল রঙের ঘুড়ি কিনিয়া আনিয়া তাহার লাটিমের সুতায় বাঁধিয়া, কচিকে বলিল, চল্ কচি, ছাতে এটা উড়াইগে চল্।

কচি বলিল, না, আমি যাব না।

যাবিনে কি রকম? ..চল্, দেখ্‌বি মজা। আজ সব শালার ঘুড়ি কেটে' ফেল্‌ব।

অগত্যা যাইতেই হইল। কটিকের নির্দ্দেশমত ঘুড়িটা তুলিয়া দিয়া, ছাতের এক-কোণে, যেখানে একটু ছায়া পড়িয়াছিল, সেইখানটিতে কচি চুপ করিয়া বসিল।

কটিক ছাতের ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়া ঘুড়ি উড়াইতে ছিল। দেখিল, কচি নীচে নামিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে;—বলিল, এই কচি, পালাচ্ছিস্ যে?...বলিয়া, তাহার একটু কাছে সরিয়া আসিতেই কচি ধীরে-ধীরে বলিল, না, আমায় সন্ধ্যা করে কটিক, এতবড় ধিঙি মেয়ে—

—বা, তুই বুঝি ধিঙি?...তোর বুঝি বিয়ে হয়ে গেছে, নয়?...এই যা! দেখ্‌লি? কল্‌কে' গেল। বলিয়া কটিক উপরের উড়ন্ত আর-একটা ঘুড়ির দিকে তাকাইল।

পড়ন্ত বেলার সূর্য্যের স্নিগ্ধ রশ্মিপাতে আকাশের গায়ে পাশাপাশি দুইটা ঘুড়ি চিক্‌মিক্ করিতেছিল।

—তবে আমিও গুটিয়ে নি, দাঁড়া। রান্নার যোগাড়-যন্তর্ করতে হবে আবার। বলিয়া কটিকও লাটিমের উপর সুতাটা জড়াইতে লাগিল।

কচি নীচে নামিয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বনবাসি উনান্ দুইটা ধরাইয়া দিল। প্রতিদিনের মত কটিক আবার রান্না করিতে বসিল। কচি নীচে হইতে জল তুলিয়া দিয়া, রান্নাঘরের মেঝেয় বসিয়া তরকারি কুটিতে আরম্ভ করিল।

তাতের ডেকচিটা উনান্ হইতে নামাইয়া, ফেন্ গড়াইতে গিয়া কটিক বলিল, দেখেচিস্ কচি, প্রথম প্রথম এই ডেকটা নামাতে কত কষ্ট হতো, আজকাল কেমন কোন কষ্টই হয় না? তুই পারিস্?

—পারি না আবার! আমার ছোঁবার জো নেই, তা নইলে দেখিয়ে দিতুম।...আচ্ছা, এই মলের টপ্‌গুলো ত' ওর চেয়ে কম ভারী নয়, তাও ত' তেতলার নীচে থেকে' জল ধরে নিয়ে আসি।

—হুঁ, তা বটে! তোর ওই তালপাতার সেপাই চেহারা, কিন্তু গায়ে জোর আছে।

কচি বলিল, তা-কর্ত্তে উনোনের আঁচ যেন যে, তুমি ওই তরকারিটা চড়িয়ে দাও না—ফেন্ অমনি গড়াক্।...

—খুব হয়েছে গুরু মশায়, আমাকে আর হাতে ধরে' শেখাতে হবে না। বলিয়া, কটিক উনানের উপর কড়াইটা চড়াইয়া দিল।

হঠাৎ দুয়ুখের জানালার দিকে তাকাইয়া কটিক তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, এই, এই কচি! আয়, আয় দেখ্‌লে আয় শীগ্‌গির—শীগ্‌গির।

কচি সসঙ্কোচে কাছে সরিয়া আসিলে, পাশের বাড়ীর একটা খোলা জানালার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, ভাখ, ভাখ! বলিয়া কিক্ কিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

কচি দেখিল, ঘরের ভিতর আলো জ্বলিতেছে এবং দুই স্বামী-স্ত্রী একটা পালঙ্কের উপর পাশাপাশি শুইয়া কি একটা বই পড়িতেছে।

লজ্জায় কচির কাণ দুইটা রাঙা হইয়া উঠিল। ধ্যেৎ! বলিয়া সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া মুখ টিপিয়া একটু-খানি হাসিল।

...সমস্তদিন পরিশ্রমের পর ফটিক যদি একবার ঘুমাইয়া পড়িত, তাহা হইলেই মুস্কিল। সেদিনও সকাল-সকাল রান্না সেষ করিয়া ফটিক বলিল, কচি, আমি এই বারান্দায় একটু ঘুমিয়ে নি,—এখন ত' কেউ খাবে না। আমায় উঠিয়ে দিস্ যেন।

কচি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না, দোহাই ফটিক, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ঘুমিও না। আবার সেই সেদিনের মত তোমাকে বকে' কিছু বাকী রাখবে না তাহ'লে।

—তা হোক্। আমার ঘুম পেয়েছে, বা রে আমি ঘুমোব না? বলিয়া ফটিক বারান্দার উপর লম্বালম্বি শুইয়া পড়িল।

ঘণ্টাখানেক পরেই, বাবুর এবং গিন্নির খাবারের জন্ত ফটিকের ডাক পড়িল।

সে তখন গভীর নিদ্রামগ্ন!

কচি দো-তলায় নামিয়া আসিয়াছিল। সে জানিত, ফটিকের ঘুম না ভাঙিলে, সেদিনের মত ইতর দাস-দাসী হইতে আরম্ভ করিয়া এ বাড়ীর প্রত্যেক ব্যক্তিটিই ফটিককে নির্ব্বিচারে গালাগালি এবং নির্য্যাতন করিতে কসুর করিবে না। তাই সে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিয়া ভাবিল, তাহাকে উঠাইয়া দিবে; কিন্তু তাহার গায়ে হাত দিয়া নড়াইয়া উঠাইতে কচির লজ্জাবোধ হইতেছিল। সে বলিল, ফটিক, অ ফটিক।

ঘুম ভাঙা সুরে থাকুক, ফটিকের নাসিকাধ্বনি উত্তরো-ত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল।

ভয়ে-ভয়ে চারিদিক চাহিয়া কচি তাহার পায়ের উপর কটাস্ করিয়া সজোরে এক চিম্‌টি কাটিয়া দিল।

উ-উ। বলিয়া, ফটিক পাশ ফিরিল, কিন্তু ঘুম ভাঙিল না।

আরও দু-তিনটা চিম্‌টি কাটিয়াও যখন ফটিকের ঘুম ভাঙাইতে পারিল না, তখন কচির বড় রাগ হইল।

সে তাহার পা দিয়া, ফটিকের পা-দুখানা বেশ করিয়া নাড়াইয়া দিল।

কামিনী কি উপরে উঠিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ কচির এই ব্যাপারটা দেখিয়া ধমকাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, বেশ আক্কেল ত মেয়ের! ও বামুনের ছেলে, আর তুই চাষানি,—ওর পা মাড়ালি কোন্ সাহসে শুনি?...পেন্নাম্ কর্—হারামজাদি, পায়ের ধুলো নে!

লজ্জায় কচির মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। ধীরে-ধীরে প্রণাম করিয়া সরিয়া গেল।

কামিনী কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও যখন ফটিককে উঠাইতে পারিল না, তখনপ্রাণে চীৎকার করিতে করিতে নীচে গিয়া বলিল, বাপ্‌রে বাপ্! যেন কুম্ভকর্ণের ঘুম। না মা, পারলাম না,—এবার আর-কেউ দেখুক।

নিস্তারিণী দোতলার একটা ঘরের কোণে চুপ্‌টি করিয়া পড়িয়াছিল;—কথাটা শুনিয়া আজ আর স্থির থাকিতে পারিল না। বলিল—ধরে' নিয়ে আয় ত' ওকে, কেমন ছেলে আমি একবার দেখে নি। চব্বিশ-ঘণ্টা ঘুম আর ঘুম! একটি গরম জল ঢেলে দে না মা ওর গায়ে, তাহ'লেই ত' সব জ্বালা-যন্ত্রণা চুকে' যায়।...আচ্ছা দেখি, যাই।

নিস্তারিণী ধীরে ধীরে নিজেই উঠিল। উপরে গিয়া ঘুমন্ত ফটিকের চুলে ধরিয়া চক্‌চক্ করিয়া উঠাইয়া দিল, —ম্যা, হারামজাদা, ব'সে'ব'সে খাবার জন্তে ত' তোকে আনিনি বাবা,...একটু ভেবে-চিন্তে দেখতে হয়।...

ঘুমের ঘোরে কি যে হইতেছে, ফটিক কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। ধীরে ধীরে রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া দেওয়াল ধরিয়া চুপ করিয়া, আবার বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিল।

বনমালি বলিল, এই ফটিক, ভাত হাও।

ফটিক নিরুত্তর!

এবার আর নিস্তারিণীর সহ্য হইল না। সে তাড়া-তাড়ি ফটিককে টানিয়া টানিয়া দোতলার কলের নীচে বসাইয়া দিয়া, কলের মুখটা খুলিয়া দিল। ঝর্ ঝর্ করিয়া ফটিকের মাথায় জল পড়িতে লাগিল। শীতের রাত্রি;—তাহার ঘুম ভাঙিতে দেরী হইল না।

কাণ্ড দেখিয়া অন্যান্য সকলে আমোদ উপভোগ করিতেছিল।

গিন্নি নিস্তারিণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—আচ্ছা বোন্-পোটি মা তোমার,—ছেলে ত' নয়, একটি পাকা শয়তান।

নিস্তারিণী ফটিকের একটা কাণে ধরিয়া বলিতেছিল, কের্ যদি এমন কর বাছা, তাহ'লে ঝ্যাংটা মেরে' দূর করে' দিব।...বল্ আর ঘুমোবি নে।...

ফটিক বলিল, না।

ঘটনাস্থলে কচিকে দেখিতে পাওয়া গেল না। সে বোধ হয় কোথাও লুকাইয়াছিল।

তিন

সেদিন এক অলস মধ্যাহ্নে, সেদিন আহারাদির পর সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ফটিকের চোখে ঘুম নাই। সে এঘর-ওঘর করিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া অবশেষে হুড়্ হুড়্ করিয়া হে-তলায় উঠিয়া গেল। কচি তেতলার একটা ঘরের কোণে আঁচল বিছাইয়া শুইয়াছিল। সতর্ক পদবিক্ষেপে ফটিক তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইতেই কচি চোখ খুলিয়া উঠিয়া বসিল। ফটিক তাহার সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া, তাহার মাথাটা কচির নাকের নিকট লইয়া গিয়া বলিল, কচি, খোস্‌বয় তেল্ মাখ্‌বি?...আঘ্ না শুঁকে' আমার মাথাটা।

কচি শুঁকিয়া দেখিল, বেশ একটা সস্তা-কোটা-ফুলের গন্ধ বাহির হইতেছে। বলিল- কোথা পেলে ফটিক? বা এ তো বেশ!

ফটিক তাহার মুখের নিকট হাত নাড়িয়া বলিল—এই চুপ চুপ! কেউ শুন্‌বে এক্ষুনি। তুই নিতে চাস্?

—হাঁ, চাই।

—আচ্ছা, এনে' দিচ্ছি। বলিয়া, ফটিক দোতলায় নামিয়া গেল।

গিন্নির স্নানের ঘরে একটা তেলের শিশি হইতে একটুখানি মাথায় ঢালিয়া লইয়াছিল। এইবার শিশি-শুদ্ধ আনিয়া কচিকে একটু দিবে ভাবিয়া সেখানে যাইতেই দেখিল, একটা কি ঘরজায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার আর যাওয়া হইল না। পুনরায় কচির নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল—এখন চলো না কচি, আজ রাত্রে সব যখন নিস্তব্ধ হবে, তখন তোকে দিব। যত ইচ্ছা তুই নিতে পারিস্।...ইস্! শিশিতে শিশিতে একেবারে ঘর ভর্তি।

—মা ফটিক, চুরি করে' এনে' না। ছিঃ!

—বাঃ! চুরি কোরব কেন? তাল লেগেছে, একটু-খানি ঢেলে' নিব বৈ ত' নয়! এখন তুই এইটাই খানিকটা নে না? বলিয়া হাতটা একবার নিজের মাথায় ঘসিয়া লইয়া পুনরায় কচির চুলের উপর ঘসটাইয়া দিল।

কচি উঠিয়া বলিল—না, আমার চাই না।

ফটিক বলিল—নাঃ, এতে কিন্তু হবে না। আমি এনে দিব। বেশ গন্ধ, নয়? বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ফটিক নীচে নামিয়া গেল।

বনমালি বলিল—ফটিক, তোকে কে ডাকছে ভাখ।

কালো কুচকুচে বেঁটে রতন একটা ছোকরা তাহার অপেক্ষায় ঘরজায় দাঁড়াইয়াছিল। নাম,—রতন। পাশের বাড়ীতে চাকরের কাজ করে। আজ কয়েকদিন মাত্র তাহার সহিত ফটিকের পরিচয় হইয়াছে।

ফটিককে দেখিয়াই রতন চুপিচুপি বলিল, আয়-না ছোঁড়া! তোকে ডাকুব কত? এদিকে মাল যে তৈরী।

ফটিক তাহার সঙ্গে-সঙ্গে পাশের বাড়ীতে গিয়া ঢুকিল। রান্নাঘরটা নীচের তলায়। তাহারই পাশে একটা কয়লা রাখিবার ছোট ঘর। ঘরটা খুব অন্ধকার। সেখানে আরও দুইজন ঠাকুর অপেক্ষা করিতেছিল। রতন ফটিককে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া চুপ করিয়া বসিতেই, একজন বলিয়া উঠিল, লাগাই তাহ'লে! বলিয়া, সে হস্তস্থিত একটি ছোট গাঁজার কলিকা উঁচু করিয়া মুখের নিকট ধরিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি দিয়াশালাই জ্বালিয়া ধরাইয়া দিল।

সর্বশেষে ফটিক টানিল।

রতন বলিল—ধরতেও জানিস্ না রে বোকা, বেশ ভালো করে' টান্।

ফটিক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, আবার কেমন করে' টান্‌ব? এ তো বেশ টান্‌চি। বলিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া কলিকাটি রতনের হাতে দিল।

রতন একটান্ টানিয়া বলিল—তাহ'লে শুন্‌চো হে মহেশ, ফটিককে আজ আমাদের আড্ডায় নিয়ে যেতে হবে, কি বল?

মহেশ বলিল—হ্যাঁ, সকাল-সকাল রান্না সেরে নিও তাহ'লে ফটিক!

ফটিক বলিল—আমার তো সন্ধ্যা বেলাতেই রান্না হয়ে যায়।

কথাটা বলিয়াই তাহার মনে পড়িল, সে আজ রাত্রে কচিকে তেল দিবে বলিয়াছে, সুতরাং আজ তাহার যাওয়া হইবে না। রতন তাহার পাশেই বসিয়াছিল। তাহাকে খোঁচা দিয়া চুপি চুপি বলিল—আজ রাত্রে আমার যাওয়া হবে না রতন, চল্ বরং এখনই চল্।

নেশারঝোঁকে রতন বলিল—তাই চল্।...ওহে মহেশ, ফটিক এখনই যেতে চাইছে—ওকে আমি আড্ডাটা দেখিয়ে নিয়ে আসি তাহ'লে।

মহেশের অনুমতি লইয়া ফটিক ও রতন বাহির হইয়া পড়িল।

কয়েকটা বড় রাস্তা পার হইয়া, একটা গলির ভিতর কতকগুলা খোলার বস্তি। তাহারই মধ্যে একটা ঘরের ঘরজায় গিয়া রতন বলিল—আয় ফটিক, ভিতরে আয়।...

ফটিকের মনে-মনে কেমন যেন ভয় হইতেছিল। তাহার পর, ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেই ছোট খোলার ঘরখানা বেশ পরিপাটি ভাবে সাজানো হইয়াছে। একপাশে একটা বড় তক্তাপোষের উপর পুরু বিছানা পাতা। দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা ছবি ও

তাকের উপর কতকগুলা বোতল সারিবন্দি সাজানো রহিয়াছে। ঘরের কোণে একটা হারমনিয়মও আছে।

রতন ও ফটিক বিছানার উপর চাপিয়া বসিলে, একটা বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে ঘরে ঢুকিয়াই একগাল হাসিয়া বলিল—রতনমণি যে! কি মনে করে?...এটি কে? কই, আগে ত' দেখিনি?

—আমাদেরই দলের লোক কাই, তোমার একটা গান শোন্‌বার জন্যে এসেছে। কই শোনাও দেখি?

রতনের গুপ্ত ইঙ্গিত মত বলিবামাত্র মেয়েটা হারমনিয়ম লইয়া ফটিকের কাছ ঘেঁসিয়া বসিল। বলিল—দাঁড়াও, এসেছ যখন, আগে গোটাকতক গান সেজে নি। তারপর গান হবে। বলিয়া হারমনিয়মটা কোলিয়া রাখিয়া সে গান সাজিতে বসিল।

ফটিক একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে তাকাইয়াছিল। রংটা পরিষ্কার না হইলেও, বয়সের গুণে তাহাকে নেহাৎ কুশ্রী বলা চলে না।

পানের ডিবেটা হাতে লইয়া সে কাছে আসিতেই, রতন বলিল—কুসুম, সেই গানটা গাইতে হবে, সে-ই—

'যাও যাও ফিরে' যাও, মন বাঁধা যেথানে'—

আচ্ছা বেশ। বলিয়া কুসুম হারমনিয়াম ধরিয়া গান আরম্ভ করিল।...

...সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছিল। গান বন্ধ হইলে, ফটিক বলিল, চল্ ভাই রতন, আজ উঠি। আমার আবার কাজ আছে।

সেখান হইতে আসিবার সময় কুসুম নানাপ্রকার ভাবভঙ্গি দেখাইয়া ফটিকের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আবার এসো যেন।

ফটিকের মনে হইতেছিল, তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত চিন্ চিন্ করিতেছে। তাড়াতাড়ি মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাস্তায় আসিতে আসিতে ফটিক বলিল—বেশ আছিস্ ভাই রতন। আমারই শুধু গালমন্দ খেয়ে খেয়ে জনম গেল।

রতন এই কয়দিনের মধ্যেই ফটিকের সমস্ত পরিচয় পাইয়াছিল। বলিল—তুই নেহাৎ আহাম্মক্ কি-না, তাই!...কচিকে একবার বাগিয়ে নিতে চলে' আয়,—ব্যস্! সব ল্যাঠা চুকে যাবে। দিব্যি রাজার হালে বসে বসে খাবি। না-হবে কাজ করতে, না-হবে কিছু।

—সে যদি না আসে?

—আসবে না কি রূপ-আমাদের? বলিস্—কচি, চল্ আমরা এখান থেকে চলে' যাই। বাইরে একটা ভালো চাকরি পেয়েছি। তোকে কিছু করতে হবে না। আমার কাছেই থাকবি।—বুঝলি?

—আচ্ছা, তাই দেখব।

—হ্যাঁ, দেখব নয়। আজই বলিস্। তারপর, তুই তাকে নিয়ে সটান্ এই কুসুমের বাড়ীতে চলে' আয়। দেখবি,—গুরুর মতন খাতির করবে। দেখলি ত' কুসুম কেমন ভাল লোক।...ওকে অমনি করে' মহেশ এনেছিল, সে কোন্ গাঁও ঘুঘুড়ুর তের নদী পার,—সে-ই মেদিনীপুর থেকে। এখন ভাখ্, তোফা রাণীর মতন আছে-আছে,—ফুর্ত্তি করছে।

—ঠিক্ বলেচিস্ রতন!

—কুসুমের বাড়ীটা ঘরে থাকবে ত' তোর?

—তা আর থাকবে না? এদ্দিন্ কলকাতায় রয়েছি কি করতে?...

দ্বিতীয়

রাত্রি তখন প্রায় একটা। সকলেই একে একে ঘুমাইয়া পড়িল। ফটিকের চোখে ঘুম নাই। সে ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া, কচি যে ঘরে শুইয়াছিল, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কামিনী একধারে শুইয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। অন্ধকারের মধ্যে ফটিক' চোরের মত কচির গায়ে হাত দিয়া চুপি চুপি ডাকিল, কচি!

কচি চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল, কোন সাড়া দিল না।

ফটিক আবার তাহাকে নড়াইয়া দিয়া বলিল এই!

কচি বিরক্ত ভাবে তার হাত খানা সরাইয়া দিয়া বলিল যাও!

—আঃ—সেই তেল। মনে নেই?

—না, যাও। বলিয়া কচি গায়ের কাপড়টা বেশ করিয়া জড়াইয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

—আমার কথা শুনবিনে, বেশ। বলিয়া ফটিক আর একবার বলিল, আয় না কচি?

—আঃ, কি জ্বালা! বলিয়া কচি ধীরে ধীরে উঠিয়া তাহার সঙ্গে দোতলায় নামিয়া গেল।

উভয়ে একত্রে অন্ধকার স্নানঘরটায় ঢুকিয়া কোন্‌দিকে যাইবে ইতস্ততঃ করিতেছিল, এমন সময় বাহির হইতে হড়াম্ করিয়া কে যেন দরজা টানিয়া বন্ধ করিয়া দিল। উভয়েই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল! ফটিক তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া দরজাটা টানিয়া দেখিল, বাহিরের ছিট্‌কানিটা কে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

কি যে উপায় হইবে, কেহ কিছু ভাবিয়া পাইল না। খোসবুর লইতে আসিয়া যে এমন সাংঘাতিক বিপদ ঘটিবে, ফটিক তাহা জানিত না। কচি অন্ধকার ঘরের মধ্যে ভয়ে লজ্জায় থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

ফটিক তাহার নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল, নিরুপ

শালী কামিনী টের পেয়ে এই কাণ্ডটা করেছে।...কি বল্ কচি?

কচির মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না।

কটিক বলিল, আচ্ছা, কি হবে ভাই কচি?

কচি কম্পিতকণ্ঠে কহিল, কি হবে!

বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ে অন্ধকার ঘরের মেঝের উপরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অবশেষে কটিক সাহস করিয়া বলিল, হবে আবার কি? বলব, একটু ভালো তেল চুরি করতে এসেছিলুম্। কামিনী এই কাণ্ড করেছে।

কচি ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

কটিক বুঝিতে পারিয়া বলিল, কাঁদছিস কচি? ছিঃ! ভয় কিসের?

কচি কোন কথা না বলিয়া ধপ্ করিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

কটিকের মনে হইল, হাত দিয়া তাহার চোখের জল মুছিয়া দেয়, কিন্তু তাহার গায়ে হাত দিতে গিয়া এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে কটিকের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কটিক একটু দূরে মেঝের উপর শুইয়া পড়িয়া বলিল, বড্ডো ঘুম পেয়েছে আমার, আমি একটু ঘুমিয়ে নি!

কিন্তু ভয়ে ও ভাবনায় কাহারও চোখে ঘুম আসিল না। বহুক্ষণ পরে, অনেক চিন্তার পর, কটিক ধীরে ধীরে উঠিয়া কচির নিকট সরিয়া আসিল। ডাকিল, কচি!

কচি ঘুমায় নাই। বলিল, উঁ।

কটিকের মুখ দিয়া কথা বাহির হইতে ছিল না। কচির ঠাণ্ডা কালো চুলের উপর হাত পড়িতেই কটিকের সমস্ত শরীরটা কাঁটা দিয়ে উঠিল। বুকের ভিতরটা ধপ্ ধপ্ করিতে লাগিল। ধরা ধরা গলায় আবার ডাকিল, কচি!

কচি এবার চুপ করিয়া রহিল।

কটিক তাহার হাত খানা চাপিয়া ধরিতেই, কচি নিজের হাতটা সরাইয়া লইয়া বলিল, ঘুমোও সে, যাও।

...কটিক আবার বলিল, এই!

কচি একটু সরিয়া শুইল। কটিক বলিল, কচি, আমি অন্য জায়গায় একটা কাজ পেয়েছি। চল্ আমরা দুজনেই এখান থেকে পালাই। তোকে কিছু করতে হবে না—বেশ থাকবি।...কেমন, যাবি ত? বলিয়া, কটিক আবার কচির হাত খানা চাপিয়া ধরিল।

কচি এইবার সজোরে কটিকের হাতে একটা ঝাঁকান দিয়া বলিল, যোৎ গায়ে হাত দিওনা বলচি!

—যাবি না? এখানে থেকে তোর কি সুখ?

বিরক্ত ভাবে কচি উত্তর করিল, না, আমি যাব না।

—কচি, তোর হাতে ধরচি, পায়ে পড়ছি—চল্!

—না বলিয়া কচি পাশ ফিরিয়া শুইল।

কটিক তাহাকে আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। পুনরায় একটু দূরে সরিয়া আসিয়া, শুইয়া পড়িল।

এবার সে সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। গিন্নি ও তাহার বাসীর উপর্য্যুপরি দুইটা নাসিকার ঢোটে ঘুম ভাঙ্গিল।...ধীরে ধীরে গত রাত্রির কথাটা স্বপ্নের মত মনে পড়িল।

বি চাকর, প্রভু-ভৃত্য সকলেই সমস্বরে বলিতেছে—বেরো হারামজাদা, বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা বলছি।

কচিকে সে দেখিতে পাইল না। তবে, তাহার ক্রন্দনধ্বনি এবং প্রহারের শব্দ পাশের ঘর হইতে শোনা যাইতেছিল।

কটিককে সকলে মিলিয়া বেশ ভাল করিয়া প্রহার করিবার পর, গিন্নি সিঁড়ির নিকট তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, বেরো আমার ঘর থেকে।

অতি কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কটিক ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

সদর দরজার বাহির হইতে যাইবে, এমন সময় বনমালি আসিয়া তাহার হাত খানা ধরিয়া ফেলিল, যাবি কোথা কটিক? চল্ ডাকছে।

কটিক চোরের মত ধীরে ধীরে আবার গিন্নির কাছে নতমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

গিন্নি বলিল, যা হতভাগা, ভাত রাঁধগে যা। যাবি আবার কোন চুলোয়! ওরে বাপরে বাপ্! এইটুকু ছেলের পেটে এত গুণ!

কটিক ভাত রাঁধিতে গেল বটে, কিন্তু কচিকে আর কর্ম্ম-সহচরী-রূপে পাইল না। জল তোলা, বাটনা বাটা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কার্য্য নিজেকেই করিতে হইল।

সেইদিন হইতে কচি ও কটিকের মধ্যে একটা বিধি নিষেধের গণ্ডি পড়িয়া গেল। কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইবেনা। যদি দেখে, তাহা হইলে উভয়কেই পুলিসের জিম্মায় রাখা হইবে।

একই বাড়ীতে বাস করিয়া এ বিধান মানিয়া চলা বড় কষ্টকর। কোন দিন সিঁড়ির ধারে, কলতলায় বা অন্য কোথায় ও উভয়ের মধ্যে হঠাৎ চোখোচোখি হইয়া গেলে, কচি মাথা হেঁট করিয়া পলাইয়া যায়, কথা বলা দূরে থাকুক্, একটি বারও মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে না।

সুযোগ পাইলেই এ বন্দীশালা হইতে পলায়ন করিবে, এ সঙ্কল্প কটিক দিবারাত্র করিত। কচি যে তাহার সহিত যাইবে না, ইহা তাহার স্থির বিশ্বাস ছিল, তথাপি কি জানি কেন, সে এ স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে ও পারিত না।

হঠাৎ সেদিন একটা অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

বসন্তের শেষ রাত্রি। তখনও কাহারও ঘুম ভাঙে নাই। ফটিককে কে যেন ঘুমের ঘোরে তুলিয়া বসাইয়া দিল। সন্ত্রস্তাগ্রস্ত ফটিক চাহিয়া দেখিল, অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে এক রমণী মূর্ত্তি তাহার মুখের পানে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। জল ভরা চোখে সে যেন কি বলিতে চাহিতেছে, কিন্তু সে বাণী উচ্চারণ করিবার মত সুর খুঁজিয়া পাইতেছে না।

ফটিক চিনিতে পারিল, কহিল, কচি!

পাগলের মত ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কচি বলিল, কথা বলবার অবসর নেই ফটিক,—চল।... সেই যে কোথা যাব বলেছিলে।...

ফটিক যে অবস্থায় ছিল, ঠিক সেই অবস্থায় চলিতে চলিতে বলিল,—আর।

দরজা খুলিয়া, অন্ধকার পথে কিয়দ্দূর চলিয়া থামিয়া ফটিক বলিল, না কচি, তুই ফিরে যা। আমিই এসেছি, সেই ভালো।

—কেন?

—কেন যা বলেছিলুম সব মিছে কথা। আর, যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, সেটা তেমন ভালো জায়গা নয়।

—তা হোক। তুমি চল লক্ষ্মীটি! বলিয়া কচি কম্পিত হস্তে ফটিকের হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া চলিবার ইঙ্গিত করিল।...

দাড়ি গোঁফ

[শ্রী দাড়ি—শ্র কুমার না—দাড়ি]

(১)

দাড়ি হ'তে কত কাঁটা গিরি-চূড়া ধরে!
শিহরে কদম ফুল দাড়িম্-বৌ বিদরে!!

(২)

যাচিলাম চুমা আদরে অধরে গাল দিয়ে
ঠোনা মেরে প্রিয়া উঠিল সরোষে গা'ল দিয়ে!
অনুরাগ চ'টে রক্ত-রাগ ফুটে কেলো-মুখ হ'ল
তেলো-হাঁড়ি,
অভিমানে শেষে সারা গাল-মেলে খোঁচায়ে উঠিল
কালো দাড়ি!!

(৩)

(প্রায়-তোটক ছন্দ)

কা'ল নিশীথ কালে
হয়ে লজ্জায় লাল গালে গাল লাগালে,
গেল খরখর শিহরণ শিহরি' গালে!—
সেই পুলকে, নারী!
প্রতি লোম-কূপে কম্পন রুধিতে নারি'
গালে শাশ্বত দাত শত গজালো দাড়ি!!

(৪)

তব শীতে-কাটা হাতে কা'ল নিশীথ-কালে
মম 'শেভ্'-নাহি-করা গালে ছোঁওয়া বুলালে,
আহা মনে হ'ল যেন টেনে চলে রামদাল
মাঠে ধান-কাটা নাড়া বেয়ে যাব্লার ভাল!

(৫)

গাঁয়া-চেনে একদিন
বুদ্ধি বিচারহীন
বেফাঁস বচন ব'লে ফেলেছিল চণ্ডীরে শিব বুড়ো,
কহিলেন দেবী—"খ্যাবড়া বদনে জেলে দিই তোর নুড়ো!"
অব্যর্থ সে দেবী অভিশাপ চণ্ডী সতীর কোপ,
পুরুষের ঠোঁট বুকশিছে তাই নুড়োকণী মুড়ো গোঁফ!!

(৬)

খেয়ে কার খোঁচা চ'টে উ'ঠে চা'ট মারে মুখ?
শুদ্ধ সে শুদ্ধ!
অধরের সরেতে শুম্ভ নিশুম্ভ
শুদ্ধ সে শুদ্ধ!!

সংগ্রহ

[শ্রীবরেন্দ্রনারায়ণ বসু]

সমুদ্রতলে টেলিগ্রাফ তার

ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে বিমাতারের টেলিগ্রাফে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হইলে অনেকেই বলিয়াছিল এবার সমুদ্রতলবর্তী সতার টেলিগ্রাফের শেষ হইয়া গেল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার কোন ক্ষতি হয় নাই।

প্রথম যখন বিমাতারের টেলিগ্রাফ সতার টেলিগ্রাফের মত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল, তখন সকলেরই ধারণা হইয়াছিল যে আর পঙ্ক, ঘাই, মাই, আলা, পাহাড়, পর্ব্বত, ধরণীভূমি ও সমুদ্রের উপর দিয়া তার লইয়া টানাটানি করিতে হইবে না। এতদিন পরে ঐ সব কষ্টের শেষ হইল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সতার টেলিগ্রাফের কথা উহাতে ঘটে নাই এবং বিমাতারের টেলিগ্রাফ হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকার তুলনায় সমুদ্রতলবর্ত্তী তারের সংখ্যা এখন পাঁচগুণ অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজকাল বিজ্ঞানের উন্নতি যে রকম দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে আশা করা যায় শীঘ্রই এমন কিছু আবিষ্কার হইবে যাহাতে তারের সাহায্যে সংবাদ বিমাতারের সংবাদের সকলদিকেই আদান প্রদান চলিতে পারিবে।

বিমাতারের টেলিগ্রাফ সমস্তই প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করে। সময় সময় অনুকূল বায়ুর অভাবে বা ঝড় বৃষ্টির জন্য বিমাতারের সংবাদ আদান-প্রদান বন্ধ রাখিতে হয়—বা পাঠাইলেও আসল স্থানে পৌঁছায় না। যদিও পৌঁছায় তাহার কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ প্রতিপ্রবাহ যেখানে এই প্রকার অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু সমুদ্রতলবর্ত্তী সতার টেলিগ্রাফের উহাতে কোন ক্ষতির প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সমুদ্র যতই অশান্ত হউক না কেন, জল যত প্রবল বেগে হইলেও তাহার কাজ নির্ব্বিঘ্নে সে করিতে থাকে।

সমুদ্রতলবর্ত্তী সতার টেলিগ্রাফের ব্যাপার বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক উহা সমুদ্রতলে লাগাইতে কত বুদ্ধি কত সহিষ্ণুতা ও কত পরিশ্রমের যে আবশ্যক হয় তাহা আর বলিবার নয়। তাহার পর উহা কোথাও ছিঁড়িয়া গেলে তাহার অনুসন্ধান করিয়া পুনরায় জোড়া লাগান হাজার হাজার মাইলব্যাপী সমুদ্রের মধ্যে যে কতটা বুদ্ধি ও পরিশ্রমের আবশ্যক তাহা না বলিলেও বোঝা আবশ্যক নয়।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ব্রেট পরিবারের দুই ভাই জেকব ও জন্ সর্ব্বপ্রথম সমুদ্রের তলা দিয়া টেলিগ্রাফের তার পাঠাইবার উপায় উদ্ভাবন করে।

ইংলণ্ডের ডোভার ও ফরাসীরাজ্যের কালে বন্দরের ব্যবধান প্রায় ২৫ মাইল। প্রথমে এই দুই বন্দরের মধ্যে সমুদ্রতলে টেলিগ্রাফের তার লাগাইয়া সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ২৫ মাইলের উপর লম্বা প্রায় আধ ইঞ্চি মোটা একটী তামার তার প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর আরও আধ ইঞ্চি পুরু রবার জড়াইয়া জলের মধ্যে ফেলা হয়। যাহাতে কোনরকমে উহা আলিয়া না উঠিতে পারে সেই জন্য ৩০ পাউণ্ড ওজনের সীসা প্রত্যেক ১০০ গজ অন্তর ঐ তারের সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সব কাজ খুব সাবধানের সহিত সম্পন্ন করা হইয়াছিল এবং তাহার ফলে কয়েক ঘণ্টা বেশ সুখ্যাতির সহিত ইংলণ্ডের সংবাদের আদান-প্রদান চলিতে চলিতে হঠাৎ সব বন্ধ হইয়া গেল। কল কব্জা ভাটারী সব পরীক্ষা করিয়া কোন রকম দোষ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এক পক্ষ এই পরিশ্রমের ফল একপ ভাবে সমস্ত বিফল হওয়ায় সকলেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে সমুদ্রতল হইতে সমস্ত তার উঠাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল জাহাজের নঙ্গর খাইয়া আসিয়া স্থানে স্থানে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

লোথাম্পটনে সেই সময়ের একজন খুব ব্যবসায়ী রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ই, ওয়ার, ব্রেনটন সমুদ্রের তল দিয়া তার লইয়া যাওয়ার ভারভার হাত দিলেন। তিনি প্রথম হইতেই জল ও রেলওয়ের কাজ দেখিয়া আসিতেছিলেন, সেই জন্য তার যাহাতে আর কোন রকম ছিঁড়িয়া যাইতে না পারে তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার জন্য প্রায় ২২৫০০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথমে তামার তার ইস্পাতের তারের দড়ির মধ্যে জড়াইয়া তাহার উপর লোহার তার আবার জড়াইয়া সম্পূর্ণ কার্য্যের উপযোগী করিয়াছিলেন। ৩৫ মাইল লম্বা তারের ওজন ৭ টন হইয়াছিল, এবং আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত তার তৈরী হইয়াছে সকলেরই নিকট ইহা আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে।

ইহার কয়েক বৎসর পরে এই রকম উপায়ে সমুদ্রের তল দিয়া তার লইয়া আমেরিকার সহিত সমুদ্রুক্ত করা যায় কি না এই বিষয় আলোচনা চলিতে লাগিল। কিন্তু তারটী বড় সোজা নয়, তখন ঐ প্রকার মজবুত করিয়া প্রস্তুত সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা তার ১০০ মাইলের কিছু উপর পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু আমেরিকা পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে হইলে প্রায় দুই হাজার মাইল লম্বা তারের আবশ্যক তাহার পর আগে যে সমুদ্রে তার ফেলা হইয়াছিল তাহার গভীরতম স্থান ১৮০০ ফিট মাত্র ছিল, কিন্তু আটলাণ্টিক মহাসাগরের গভীরতম স্থান ৩৯০০০০০ ফিট। অত গভীর তার ফেলিতে কতটা তার জাহাজকে বহিতে হইবে তাহা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই বুঝিয়াছিলেন।

যাহা হউক ক্রমে সমস্ত বাধা বিঘ্নের হাত এড়াইয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গ্রেটইষ্টার্ণ কোম্পানী সর্ব্বপ্রথম ব্রিটেন হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া টেলিগ্রাফের তার লইয়া যায়। তাহারাই এখন উক্ত দুই মহাদেশের মধ্যে টেলিগ্রাফে ব্যবসা বাণিজ্যের ও সাধারণ সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার পর ক্রমান্বয়ে ১৭টী টেলিগ্রাফের তার উক্ত দুই মহাদেশ সংযোজিত করিয়াছিল ইহার মধ্যে ১৫টী বৃটিশের নিজের সম্পত্তি। বর্ত্তমানে পৃথিবী এই প্রকার ৩৫০টী তার জলে স্থলে ধারণ করিয়া আছে।

আমেরিকার ভানকুভার ও অষ্ট্রেলিয়ার সিডনিসহরের মধ্যে যে তার সংযোজিত আছে, তাহাই আজকাল পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা। এই তার ফিজি ও নরফক দ্বীপের উপকূল স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। ইহা লম্বায় সাত হাজার তিন শত মাইল, ইহা প্রস্তুত করিতে ব্যয় হইয়াছিল এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাউণ্ড।

বর্ত্তমান সময়ে পঁচিশ হাজার মাইল সমুদ্রতলগামী তার বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই তার বসাইতে প্রায় ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। এবং ইহা বজায় রাখিবার কার্য্যের উপযোগী রাখিতে বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়া থাকে।

এই সকল সমুদ্রতলবর্ত্তী টেলিগ্রাফের তারের মধ্যে তিনটী এখন মৃত অর্থাৎ তাহাতে কাজ চলে না। কিন্তু বাকী যাহা আধুনিক কালে বসান হইয়াছে তাহা একই অমূল্য যে সর্ব্বদাস্থায়ী অবশ্য বলা হইবার কিছু নাই।

নব্য তুরস্ক

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত]

এত অল্পদিনের মধ্যেই যে তুরস্ক আবার নব-বলে বলীয়ান্ হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, তাহা স্বপ্নেও কেহ ভাবেন নাই। বেশীদিনের কথা নহে, চারি বৎসর পূর্ব্বে তুরস্কের অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে দেখিলেই মনে হইত তুরস্কের পুনরুত্থান সুদূরপরাহত! তখন তাহাদের জনশক্তি একেবারে সুপ্ত, সৈন্যবল নিঃস্ব এবং তাহাদের অধিকৃত অধিকাংশ দেশই শত্রুদিগের হস্তগত। তুরস্ক তখন বলহীন, ভগ্ন-প্রাণ। কিন্তু তুরস্কের সেদিন আর নাই, ভাগ্যবিপর্য্যয়ে আজ তাহাদের অবস্থা একেবারে বিভিন্ন প্রকারের।

য়ুরোপের বৈঠকে—একপক্ষে ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং ইটালীর সমবেত মন্ত্রণা-শক্তি এবং অন্যদিকে ছিল শুধু তুরস্কের অস্ত্রবল। যদিও তুরস্ক ইচ্ছা করিলেই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের অযাচিত সাহায্যদান গ্রহণ করিতে পারিত, কিন্তু সে সাহায্যের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন না হওয়ায় তাহারা তাহা লয় নাই। ঘৃণ্যবস্তুর ন্যায় দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল। য়ুরোপের যুক্তমন্ত্রণার ঘাত-প্রতিঘাত তাহারা একাকীই সহ্য করিয়াছে এবং যে সর্ত্ত তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল তাহা তাহারা সম্পূর্ণভাবেই অগ্রাহ্য করিয়াছে। এই অসীম সাহসিকতা অসীম বীর্য্য এবং ধর্ম্মনিষ্ঠাই বোধ করি তাহাদের উন্নতির সোপানের সৃষ্টি করিয়াছে। ছয়শত লক্ষ জার্ম্মানী যে কাজ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে করিতে সাহস পায় নাই, মাত্র আশী লক্ষ তুরস্কবাসী তাহা ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসেই সম্পন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এইখানেই তাহাদের সাহস এইখানেই তাহাদের কর্ম্মদক্ষতা!

চার শতাব্দী পূর্ব্বে শুধু ইউরোপ কেন—সমগ্র জগতের মধ্যেও তুরস্কের সমকক্ষ কোন শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল না। সে তুরস্কের একমাত্র অধিপতি ছিলেন প্রবল-প্রতাপান্বিত 'সোলেমান'। অতবড় বিশাল সাম্রাজ্যের আকস্মিক অধঃপতন জগতকে চমকিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে অধঃপতনের কারণ যে কত সমস্যা ও জটীলতাপূর্ণ তাহা হয়ত অনেকেরই জানা নাই।

তুরস্কসাম্রাজ্যের এই মহা-অবনতির আন্তর্জাতিক কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় কতকগুলি বাধা-বিপত্তিই তাহাদের সাম্রাজ্যকে অবনতির পথে টানিয়া আনিয়াছে। তুর্ক গবর্ণমেণ্টের মূল মন্ত্র ছিল 'যুদ্ধ করা ও যুদ্ধে জয়ী হওয়া।' কিন্তু ক্রমান্বয়ে কয়েকটী বড় বড় যুদ্ধে অংশগ্রহণের আশা যখন ক্রমেই নিরাশায় পরিণত হইতে লাগিল, সাম্রাজ্যের অবস্থা ক্রমে হীন হইতে হীন-তর হইয়া আসিল। নব-বলে বলীয়ান হইবার আশায় তুরস্ক সৈন্য-সংগ্রহে মনোযোগ প্রদান করিল বটে কিন্তু এই সময়ে মুসলমান ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিষয়ক কতকগুলি কুসংস্কার আসিয়া তাহাদের সে চেষ্টা ও উদ্যমকে ব্যর্থ করিয়া দিল। তুরস্ক আর তাহাদের নত মস্তক উন্নত করিতে পারিল না।

একের উত্থানে অন্যের পতন, বিশ্বের এই চিরন্তন ধারা। তুর্ক যখন ধীরে ধীরে অবনতির নিম্ন সোপানে নামিতেছিল ইয়োরোপের মিলিত শক্তি তখনই বল সঞ্চয় করিয়া আগিয়া উঠিতেছিল। প্রথমতঃ অষ্ট্রিয়া ও রুসিয়ার সম্মিলিত মিত্রশক্তি, দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রাজশক্তি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইটালী ও জার্ম্মানী একত্রে মিলিত হইয়া পূর্ব্বদেশীয় কয়েকটী ক্ষুদ্র-খণ্ড জয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সমগ্র ইউরোপ তখন ধনে, জনে ও শক্তিতে সকল বিষয়েই উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে বর্ত্তমান। ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মপ্রচারেও তখন তাঁহারা উন্নতিলাভ করিতেছিল। এখন কোন জাতি ছিল না যে তাহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে পারে।

ইংলণ্ডে যে যন্ত্রনির্ম্মাণাদির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, ক্রমে তাহা সমস্ত ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িল। কালক্রমে তাহা তুরস্কেও আসিয়া পৌঁছিল। বিদেশী দ্রব্য অল্প মূল্যে পাইয়া তুরস্কের শিল্পীগণ বৃথা মেহনৎ ছাড়িয়া দিলেন। দেশের মধ্যে বিলাসিতা ঢুকিল। এইরূপে ধীরে ধীরে

তাহাদের অবনতি হইতে লাগিল। তুরস্কের অজ্ঞাতসারে দেশের মধ্যে সর্ব্বনাশের একটা আগুন ধীরে ধীরে জ্বলিয়া উঠিল—কেহ জানিল না বা কেহ বুঝিলও না।

তুরস্কের এই সন্নিহিত বিপদে, ন্যূনাধিক হইতে বিভিন্ন জাতি আসিয়া নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই গ্রীকেরা তুরস্কের মধ্যে আপনাদের প্রাধান্য বিস্তার করিতেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আর্ম্মেনিয়ানগণ কেহ বা বণিক কেহ বা মহাজন হইয়া তুরস্কে ব্যবসা বাণিজ্য প্রচলন করিল।

এই হীনতা তুরস্ক অস্বীকার করিতে পারে নাই। মুক্তকণ্ঠে তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে তাহার ভাগ্যাকাশে যে কালমেঘের উদয় হইয়াছে তাহা বড়ই ভীতি-প্রদ—এবং আরও বলিয়াছিল যে তাহাদের ঐ সর্ব্বনাশের একমাত্র কারণ—অন্যান্য শক্তির সম্মিলন।

গত ১৯১৪ এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ফ্রান্স, রাশিয়া এবং ইটালী সমস্ত তুরস্ককে স্বেচ্ছামত ভাগাভাগ করিয়া লইয়াছিল। তুরস্কের সহিত যুদ্ধের পর ব্রিটীশ তাহাদের গুপ্ত-মন্ত্রণানুসারে প্রাপ্যের আরও অনেকখানি অধিকার করিয়া বসিল। করাসী প্রাপ্যের অনেক কম অংশ পাইয়াও দুঃখিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে এক বৎসরের মধ্যে তুরস্কের কোন অংশই কাহারও ভোগে লাগিল না। সমগ্র তুরস্কের একমাত্র অধিকারী হইল ব্রিটীশ সাম্রাজ্য। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ককে নিজের বশে আনা।

এই বিজাতীয় শক্তিগণের অংশ গ্রহণের জন্য একটী বৈঠক স্থাপিত হইল।

প্যারিসের প্রথম কাজ ছিল জার্ম্মেণীর সহিত একটা ব্যবস্থা নিরূপণ করা। বৈঠকের সূচনা হইতেই প্রথমে নিকট-প্রাচ্যের বিষয় আলোচিত হইল। কিন্তু তাহাতে যাহা প্রস্তাব হইল তাহা অনেকেরই মনঃপূত হইল না। কয়েকজন আমেরিকান্ প্রতিনিধি স্থির করিলেন যে সমস্ত ব্যাপারটীকে বেশ ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিতে হইবে ও শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিতে হইবে।

অনর্থক বিলম্ব দেখিয়া অনেকে একটা গুরুব রটনা করিলেন যে আমেরিকার মতের অপেক্ষাতেই ব্যাপারটীকে স্থগিত রাখা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কথাটা কিন্তু আদৌ সত্য নহে। কারণ সেভার্সএর সন্ধিপত্র ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের পূর্ব্বে স্বাক্ষরিত হয় নাই। সর্ব্বশেষে সন্ধি স্থাপনার কার্য্য-প্রণালীর ব্যবস্থা করিবার জন্যই অত্যন্ত বিলম্ব হইল, মতামতের জন্য নহে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তুরস্কের প্রতিনিধিগণ প্যারিতে আহূত হইলেন। কিন্তু প্যারিতে গিয়া দেখেন সন্ধিস্থাপনার তখনও ঢের দেরী। অগত্যা তাঁহাদিগের তুরস্কে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতে হইল। সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ স্বয়ং বুলগেরিয়া ও তুরস্কের সন্ধিস্থাপনার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভাবেই প্রত্যাখ্যাত হইল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তুরস্কসন্ধির বিষয় স্থির করিতে আরও বিলম্ব হইয়া গেল—এই ভয়ে—পাছে, আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া আর্ম্মেনিয়ার নিকট হইতে আদেশ গ্রহণ করে। এই বিলম্বের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য আমেরিকার হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা দুইজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে তুরস্কে পাঠাইলেন। এই দুইজন কর্ম্মচারীর নাম—ই কিং ক্রেন ও হার্বার্ড। কিন্তু উভয়েই তুরস্ক-সন্ধি স্থির হইবার ও বুলগেরিয়া সন্ধিস্থাপন হইয়া যাইবার বহুপূর্ব্বেই আমেরিকায় ফিরিয়া আসিলেন।

ইউরোপের মিলিত শক্তি-পুঞ্জ কোন্ অভিসন্ধি অনুসারে আমেরিকাকে তুরস্কের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল বলা যায় না। যাহা হউক ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ও ফ্রান্স একত্রে মিলিত হইয়া কনষ্টান্টিনোপলের উপরে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইটালী এসিয়া মাইনরের অধিকাংশ, ফ্রান্স সিলিসিয়া, এবং ব্রিটেনের রাজশক্তি প্যালেষ্টাইন, মেসোপটেমিয়া এবং আরব দখল করিবার জন্য নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। আমেরিকাও তুরস্কের কয়েকটী অংশ অধিকার করিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রেসিডেণ্টের আদেশ না-পাওয়া পর্য্যন্ত তাহারা কিছুই করিতে পারিল না। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট উইলসন সানন্দে অনুমতি প্রদান করিলেন, অধিকন্তু বলিলেন যে যদি তাঁহার স্বাস্থ্য ঐরূপ আকস্মিক পীড়ায় ভগ্ন না হইত, তাহা হইলে

তিনি নিজে ঐ অংশ গ্রহণের জন্য আমেরিকাকে সাহায্য করিতেন।

তুরস্ক অভ্যুত্থানের প্রথম সূচনা হইল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মে মাসে গ্রীকের স্মার্ণা অধিকার লইয়া। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের চুক্তি-অনুসারে ইটালী স্মার্ণা অধিকার করিতে মনস্থ ছিল, কিন্তু ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের মিলিত শক্তি তাহা সম্পন্ন করিতে দেয় নাই। অনতিবিলম্বে গ্রীস্ দক্ষিণ এসিয়ামাইনর ও স্মার্ণা এই চুক্তি অনুসারে পাইল যে যুদ্ধে আহূত হইলে তাহাদিগকে যোগদান করিতেই হইবে। কিং কনষ্টান্টাইন্ কিন্তু তাহা ফিরাইয়া দিলেন। মিঃ ভেনিজেলাস্ এর স্মার্ণা অধিকারে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল কিনা, ঠিক বলা যায় না, তবে এ কথা সত্য যে প্যারিতে গ্রীকগণ স্মার্ণা ও তাহার নিকটবর্ত্তী দেশগুলিকে লইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। সমুদ্রতীরের উত্তর-দক্ষিণ কূল ধরিয়া বরাবর অগ্রসর হইলে শীঘ্রই তাহারা স্মার্ণায় উপস্থিত হইতে পারিত। স্মার্ণার নিকটবর্ত্তী হইতেই মিঃ লয়েড জর্জ্জ, ক্লিমেন্সো ও উইলসন্ মিঃ ভেনিজেলাসকে স্মার্ণা ও আরও দু'একটী ছোট ছোট দেশ অধিকার করিতে অনুরোধ করিলেন। গ্রীকেরা লুণ্ঠনাদির দ্বারা স্মার্ণা অধিকার করিল এবং অন্যান্য কয়েকটী দেশের উদ্দেশে ছুটিল। তুরস্ক প্রাণপণশক্তিতে তাহাদের বাধা প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। এতেন সহরও খোয়া যাইল। কিন্তু এই স্মার্ণা অবরোধই তুরস্ককে আশা-বিহীন ঔদাস্য হইতে জাগাইয়া তুলিল। শত্রুদের নিকট তাহারা সদ্ব্যবহার আশা করে নাই। অবস্থা বেগতিক বুঝিয়া তাহারা বুঝিল যে যদি কোন-রূপে মুক্তি পাই তাহা হইলে প্রাণপণে চেষ্টা করি স্বদেশ রক্ষা করিতে! নব-বলে বলী হইবার জন্য মুদক্ষ সেনাপতি মুস্তাফা কামালপাশা এ্যাঙ্গোরায় তুরস্কের জাতীয়ত্ব ঘোষণা করিলেন। শীঘ্রই রাজ্য স্থাপিত হইল এবং অবরুদ্ধ সুলতানের নামে সে রাজ্য শাসিত হইতে লাগিল।

এখন সময় সিরিয়ার কার্য্য-কলাপ লইয়া ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে মনান্তর ঘটিল। তথাপি আরও কয়েক মাসের জন্য এই দুইটী শক্তি মিলিত থাকিয়া এসিয়ামাইনরে তুরস্কের বিরুদ্ধে অভিযানে গ্রীস্‌কে সাহায্য করিতে লাগিল। স্মার্ণার ব্যাপার লইয়া ইটালী নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে করিয়া তুরস্কের প্রতি বন্ধুত্ব দেখাইতে লাগিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিল যে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রভূত অস্ত্র ও সৈন্য দিয়া মুস্তাফা কামালপাশাকে সাহায্য করিবে। রুসিয়ার বলশেভিক গবর্ণমেণ্ট এতদিন নিরপেক্ষ হইয়া বসিয়াছিল, এক্ষণে তুরস্কের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল। কিন্তু তাহারা সৈন্য বা অস্ত্র কিছুই দিতে পারিল না। যুদ্ধবিরতির পর হইতেই তুরস্কের নিজস্ব যৎসামান্য সৈন্য ও অস্ত্র মজুত ছিল।

যাহা হউক তুরস্কের সন্ধির কথাবার্ত্তা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তুর্ক প্রতিনিধিগণ কনষ্টানটিনোপলে আবার আহূত হইলেন। কিন্তু কনষ্টানটিনোপল তখনও ব্রিটীশ ও ফরাসীদের অধীনস্থ ছিল বলিয়া উক্ত প্রতিনিধিগণ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলেন। গ্রীসকে পূর্ব্বথ্রেস অধিকার করিতে এবং এসিয়া মাইনরের দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়া প্রতিনিধিবর্গকে তাঁহারা স্বাক্ষর করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে তাহা যথাযথই স্বাক্ষরিত হইল। এ্যাঙ্গোরা গবর্ণমেণ্ট এই সন্ধিকে অগ্রাহ্য করিলেন এবং কনষ্টানটিনোপলও তাহা সমর্থন করিতে পারিল না।

আধুনিক গ্রীকেরা স্বভাবতঃ একটু বেশী রকমের আত্মম্ভরী এবং তাহাদের অসাধ্য কোন কর্ম্মও প্রায় দেখা যায় না। মিঃ ভেনিজেলাসএর বিশ্বাস ছিল যে গ্রীকেরা অন্য কোন শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকেও তুরস্ককে অনায়াসে পরাভূত করিতে পারিবে। শুধু মিঃ ভেনিজেলাস্ নয়, মিঃ লয়েড্ জর্জ্জও তাহা বিশ্বাস করিতেন। মিঃ ভেনিজেলাস্ গ্রীক সৈন্যদিগকে আরও অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। তাহারাও সেই আদেশ পালন করিয়া কিঞ্চিৎ সফলতা লাভ করিল। তাহারা যখন দ্বিতীয় বার অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিল শীত আসিয়া পড়িল। তখন মিঃ ভেনিজেলাস্ অগ্রসরে নিরস্ত হইয়া গ্রীসে একটী বৈঠক স্থাপন করিলেন কিন্তু তাহাতেও বড় সুফল ফলিল না। মিঃ ভেনিজেলাস্ নিজের লোকের দ্বারাই—

অত্যন্ত বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। তাহাকে বিতাড়িত করিয়া রাজা কনষ্টানটাইনকে আনয়ন করা হইল। গ্রীসের প্রতি ফ্রান্সের এতদিন যে সহানুভূতি ছিল, এই নির্ব্বাসিত নৃপতির পুনরাগমনে তাহা শীঘ্রই অন্তর্হিত হইল। ব্রিটীশ ও ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, তথাপি গ্রীসকে সাহায্য করিতে লাগিল। অন্য দিকে ফ্রান্স তুরস্কের সহিত সন্ধি-স্থাপন করিয়া ঐ নির্ব্বাচনের বিষয় ভয়ানক ভাবে আলোচনা করিতে লাগিল।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে রাজা কনষ্টানটাইন তাঁহার সৈন্যদিগকে নূতন ভাবে গঠিত করিয়া ও নূতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া এ্যানাটোলিয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রথমে কয়েক বার জয়লাভ হইল বটে কিন্তু তৃতীয় বার তুরস্ককে পরাজিত ও এ্যাঙ্গোরা অধিকার করিতে গিয়া গ্রীস পরাজিত হইল—এই পরাজয়ে রাজা কনষ্টানটাইন অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। সৈন্যেরা আশা-ভঙ্গ হইল। গ্রীকেরা তখন এসিয়া মাইনর পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল এমন সময়ে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে এই সকল বিষয় আলোচিত হইবার জন্য লণ্ডনে একটী বৈঠক বসিল।

তুরস্ক এই সময়ে প্রতিজ্ঞা করিল যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না স্মার্ণা ও থ্রেস তাহাদের অধিকারে আসিবে, ততক্ষণ তাঁহারা অস্ত্র পরিত্যাগ করিবে না। অধিকন্তু এই সর্ত্তে সন্ধি করিতে হইবে যে তাহারা এখন হইতে রাজ্য সংক্রান্ত সকল বিষয়েই স্বাধীন থাকিবে, তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারও থাকিবে না। এক বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনে কেহই তুরস্ককে এতখানি সর্ত্ত ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হয় নাই। আজও পারিল না, বৈঠক ভাঙ্গিয়া গেল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের বসন্ত ও গ্রীষ্মের সমস্ত সময়টা এ্যানটোলিয়া চুপচাপ রহিল এবং ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। গ্রীস্ একদল সৈন্যকে থ্রেসে পাঠাইয়া দিল।

আগষ্টের শেষে তুরস্কের সৈন্যদল গ্রীসকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। গ্রীক সেনাপতি তুরস্কের হস্তে বন্দী হইলেন। অধিকাংশ সৈন্য প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটী করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র গ্রীকসৈন্য গ্রীসের এক অংশে আনীত হইল। তুরস্ক তাহাদিগের ভিতর হইতে শক্তিশালী সৈন্যদের আটকাইয়া রাখিল। তাহার পর স্মার্ণা সহর জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। তুরস্ক পুনর্ব্বার পাশ্চাত্য এসিয়া মাইনরের সমস্ত খণ্ড ফিরিয়া পাইল। পরে ডার্ডেনেলিস ও বসফরাসের নিকট ইংরাজ সৈন্যের সম্মুখীন হইল।

তুরস্ক ভাবিল তাহারা একটী বড় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। তাহারা কেবল মাত্র একদল আশাভঙ্গ সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাঁহারা আরও ভাবিল যে এই জয়লাভ করার দরুণ ইংরাজ কিম্বা ফ্রান্স নিশ্চয়ই যুদ্ধার্থে সৈন্য পাঠাইতে সাহস করিবে না। অতএব এখন তাহারা বড় বড় শক্তিশালী জাতির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারে কিন্তু অসহায় দুর্ব্বল ভাবে নহে—সমান সমান ভাবে।

মুদানিয়াতে একটী বৈঠক স্থাপন করিয়া তুরস্ক শত্রুপক্ষের প্রতিনিধিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন, এই বৈঠকে তুরস্ক সম্পূর্ণভাবে সফলতা লাভ করিয়াছিল। কারণ চনক ও কনষ্টানটিনোপল যখন সৈন্য রক্ষণের দ্বারা ইংরাজের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইল,গ্রীকেরা পাশ্চাত্য থ্রেস পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইল এবং এইরূপে কনষ্টানটিনোপলও তুরস্কের হাতে আসিয়া পড়িল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ব্রিটীশ যুদ্ধ জাহাজ যেমন কোন জয়েই বসফরাস পর্ব্বতে উঠিতে পারে নাই, সেইরূপ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তাহারা এসিয়া মাইনরের বক্ষস্থ একটী সহরও বিধ্বস্ত করিতে পারিল না।

এই সময়ে সন্ধি বার্ত্তার জন্য লুসেনে আবার একটী বৈঠক বসিল। তুরস্ক তাহার দাবী অনুসারে এত বেশী পাইল যে একটা শেষ চুক্তি না হওয়ার কোন সম্ভাবনাই রহিল না। কিন্তু দুইটী কারণের জন্য বাহ্যিক ভাবে তাহা নিষ্ফল হইল। প্রথমতঃ ইসমেতপাশা ও তুর্ক প্রতিনিধিগণ এ্যাঙ্গোরা গবর্ণমেণ্টের কঠিন আদেশানুসারে তুরস্কের চুক্তিভঙ্গ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করে নাই, দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্স বেলজিয়াম ও ইটালী তুরস্কের রাজশক্তিকে হীন করিয়া ফেলা হইত।

ইউরোপের কোন নূতন শক্তি আসিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলে তুরস্কের বর্ত্তমান অবস্থা অতি সহজেই নিরূপণ

করা যায়। যুদ্ধটী বহুকাল ব্যাপী হইয়া দাঁড়াইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুরস্কের তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। কারণ তাহারা বার বৎসর ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে এখন যুদ্ধ তাহাদের অভ্যাসগত। সৈন্যগণ ও এত মিতব্যয়ী হইয়াছে যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অন্ন ব্যতিরেকেও তাহারা কার্য্য চালাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ একটী যুদ্ধ বাধিলে ইত্যবসরে যে কোন শক্তি আসিয়া এ্যানাটোলিয়া অধিকার করিতে পারে। গ্রীক প্রাচ্য থ্রেস অধিকার করিতে পারিত বটে কিন্তু মূল অংশে বিভক্ত করার দোষেই তাহারা সাফল্য বিবর্জ্জিত হইবে। শক্তি ও প্রচেষ্টার দ্বারা কনষ্টানটিনোপল বিধ্বস্ত ও প্রজ্বলিত হইতে পারিত বটে কিন্তু তাহা সেভাফ্‌এর পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্যই বাঁচিয়া যাইবে। এদিকে এই অবসরে তুরস্ক ও অনায়াসে মেসোপোটেমিয়া ও সিরিয়া জয় করিতে পারিত। মোটের উপর এরূপ কোন যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তুরস্ক কোন ক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হইত না, বরং আরও কয়েকটী স্থান অধিকার করিয়া জগতের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইত।

অন্যদিকে, যুদ্ধের কথা ছাড়িয়া দিলেও অর্থাৎ যুদ্ধ যদি না হইত তাহা হইলেও তুরস্কের উন্নতি, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পরস্পর বিরোধের জন্য আরও অগ্রসর হইত। তাহা হইলে ইংরাজ তুরস্কের স্বপক্ষে এবং ফ্রান্স বিপক্ষে দাঁড়াইত। প্রথম দৃষ্টিতে ব্যাপারটীকে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় বটে কিন্তু আসলে তাহার যথেষ্ট কারণ হইয়া গিয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে ইংরাজ শক্তি গ্রীসকে পরাজিত করিয়া তাহার সমুদ্র পরিত্যাগ করিয়াছিল, লয়েড জর্জ্জের পতনের পর ইংরাজ আর একবার তুরস্কের পক্ষ লইবার চেষ্টা করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে—মাঝে মাঝে তাহাদের মত ও শক্তির যখন পরিবর্ত্তন হইত তাঁহারা বংশানুক্রমেই তুরস্কের বন্ধু হইতেন।

তুরস্ক বোধ হয় তাহার এই স্বাধীনতা সুদৃঢ় করিয়া রাখিবে। কিন্তু রাজ্য ও শিল্প সংক্রান্ত উন্নতিতে তাহার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে? ইহা নিশ্চিত যে তুরস্ক তাহার ঋণ-হইতে আর মুক্ত হইতে পারিবে না। তবে গ্রীস জয় করায় তাহাকে আর অধিক ঋণভার বহন করিতে হয় নাই।

খৃষ্টান অধিবাসিদিগের বিনাশ ও নির্ব্বাসন তুরস্ককে মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে চিন্তিত করিয়া তোলে। বিতাড়িত গ্রীক ও আর্ম্মেনিয়ানগণকে যদি তুরস্কে স্থান না দেওয়া হয় তাহা হইলে তুরস্ককে অত্যন্ত ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হইবে অর্থাৎ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার বণিক, শিল্পী ব্যবসায়ী ইত্যাদি জন সংখ্যা হারাইতে হইবে। অধিকন্তু শিক্ষিত লোকেরও অভাব হইবে। অর্থ পক্ষেও মহা অসুবিধা উপস্থিত হইল। দেশে এমন অর্থ নাই যে রাস্তা, বাটী, শিক্ষা-মন্দিরাদি নির্ম্মিত হয়।

অবশ্য ইহাও হইতে পারে যে সন্ধি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আর্ম্মেনিয়া ও গ্রীকগণকে নিজ নিজ পৈতৃক ভূমিতে অধিকার অনুমতি প্রদান করা হইবে। এবং আরও মনে হয় যে বহুসংখ্যক ইটালিয়ান রেল রাস্তা, বাটী, শিক্ষা মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিবার জন্য তুরস্কে প্রেরিত হইবে। কিন্তু বিজাতীয়দের সাহায্য লইতে তুরস্ক আর সাহস করিল না। তুরস্ক বাহির হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কে দিবে? পাশ্চাত্য ইউরোপের দিবার মত অর্থ কিছুই নাই। আমেরিকার যথেষ্ট অর্থ আছে বটে কিন্তু তুরস্কের উপর একটা কুসংস্কারপূর্ণ ভাব থাকায় তাহারা দিতে চাহিল না। যাহারা যা দিতে চাহিল, পাশ্চাত্য ইউরোপ নানাবিধ চক্রান্ত দ্বারা তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিল।

এইরূপ অবস্থায় তুরস্কের বাহ্যিক যুদ্ধ মোটেই উজ্জ্বল হইতে পারেনা। ভবিষ্যতে যদি তাহারা উন্নতি কামনা করে, তবে তাহাদিগকে অদম্য অধ্যবসায় ও কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, তবে সে দিন আসিবে। যদি তুরস্ক পুনর্ব্বার নব বলে বলীয়ান হইতে চায়, সৈন্য ও রাজ্যকে সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল রাখিতে চায়—তবে তুরস্ককে এখনও দশ বৎসর প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া অধ্যবসায় ও কষ্ট সহ্য করিতে হইবে—তাহার বিশেষ প্রয়োজন।*

* কোরাবের আলবার্টিনো লেবাবের প্রবন্ধ হইতে।

চিঠি

মাননীয়—শ্রীযুক্ত বাসন্তী সম্পাদক মহাশয়

করকমলেষু—

ঠিক যে ভাবে আপনি লেখেন সে ভাবে আমি লিখতে পারিনি অথচ আপনার দরবারে আমার একটা আর্জি পেশ করা দরকার। গরজ বড় বালাই সুতরাং আর্জি খানা পাঠালাম্। ভরসা করি আদালতে পেশ করবেন। যে মামলার বাদী হয়ে আমি উপস্থিত হয়েছি সেমামলাটা কেবল আমার একার নয় আরও দশ জনের আছে কিন্তু তারা আলস্যের জন্যই হোক আর প্রতিবাদী পক্ষের পরামর্শেই হোক আমার সঙ্গে এক সঙ্গে আর্জি পেশ করতে রাজী নন। এখানকার উকিলেরা তুখানক ঘুঘুখোর তাঁরা এক তরফের আর্জি লেখেন আর এক তরফের ঘুষ খেয়ে, সুতরাং যদিও আমি উকীল নই তবুও নিজেই নিজের আর্জি লিখতে বাধ্য হয়েছি।

১। আর্জির মূল কথাটা এই যে আমার ছেলেটা প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে, তার বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে, পাত্র দেখতে এসে একটা বাহাত্তুরে বুড়া—তাকে জিজ্ঞাসা করে বসল টোকিও কোথায়? আমার অকালকুষ্মাণ্ড ছেলে উত্তর দিলে যে টোকিও স্পেন দেশে; কারণ ওকারন্ত অপটো স্পেন দেশে সেখানে পোর্ট মদ জন্মায়। যারা পোর্ট মদ না খায় তারাও জানে স্পেন দেশে ওকারন্ত নগরে পোর্ট মদ জন্মায়। সুতরাং ওকারন্ত টোকিও স্পেন দেশে না হলেও ঐ দেশে অথবা স্পেনের কোন উপনিবেশে হওয়া উচিত। কন্যা পক্ষের সেই বুড়োটা রত্নহীন মুখে একটু মুচকি হেসে চলে গেল।

২। অজুহাৎ—বুড়ার হাসিটা গায়ে বিঁধে রইল, তদবীরে জানা গেল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পণ্ডিত গভীর গবেষণা করে স্থির করেছেন যে ওকারান্ত সমস্ত সহরই স্পেন দেশে হওয়া উচিত, আর যে গুলো নেই সে গুলো শীঘ্র স্পেন দেশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অধ্যাপকের বেতন ১২৫০ টাকা উপরি আয় এবং বাজে আদায় আছে। ছেলের মাষ্টারেরা বলেন যে পরীক্ষার ফি জমা দিলেই ছেলে প্রথম বিভাগে পাশ হয়, বই কিনলে পরীক্ষকেরা তাকে দ্বিতীয় বিভাগে ঠেলে দেয় এবং কেনা বই পড়লে সে ছেলের তৃতীয় বিভাগে ভিন্ন গতি নাই। সুতরাং বই কিনে অথবা কেনা বই পড়িয়ে আমার ছেলেটির আখের নষ্ট করতে তাঁরা প্রস্তুত নন।

৩। অজুহাৎ যে—আমি উপস্থিত পুত্রদায় গ্রস্ত ভুবনেশ্বর সাহার দোকানে আমার অনেক দেনা হওয়ায় পুত্রীকে অকালে অপহার করে ঋণ মুক্ত হব মনে করেছিলুম, কিন্তু অকালকুষ্মাণ্ড ছেলে হাল ফ্যাসানে সিগারেট খাওয়ার পরিবর্ত্তে মদ্য সিতে শেখায়—প্রেমের পদ্য লেখায়—ঘরের আশা ছেড়ে দিয়ে আমাকে পাত্রটিকে কন্যাদায়গ্রস্ত করতে হবে, ইতি বিধায় আমি ভীষণ পুত্রদায়গ্রস্ত। অতএব আদালতের হুজুরে আমার প্রার্থনা এই যে, সাবেক বুড়াগুলা যতদিন না মরে ততদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ধরণের শিক্ষা বন্ধ করা হোক। পাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবার পূর্ব্বেই যে যা যে দেশে তিন পুত্রের মা হয়ে থাকেন—আর যেখানে আমার মত অধমের পুত্রদায় থেকে নিষ্কৃতি নেই, সেখানে পাত্র কন্যার ঠাকুরমা দিদিমার অত্যাচার জর্জ্জরিত দেশে শিক্ষা বন্ধ করার বড়ই দরকার হয়ে পড়েছে।

৪। অজুহাৎ উহার—বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে আর একটা ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে সেটা এই রিষ্ট্রিকমেণ্টের আমলে গরীব কেরাণীর বরদাস্ত করা একেবারেই অসম্ভব। সে অত্যাচারটা গবেষণার ধুয়া। সেকালে অর্থাৎ আশুবাবুর আমলের পূর্ব্বে পাঁচটা পাশ করা উকীল জামাই পাড়া গাঁয়ের মূর্খ লোকের সঙ্গে কথা কইত না, এখন এম-এ বি-এল উকীল হতে গেলে অন্ততঃ আটটা পাশ করতে হয়, কন্যাদায়গ্রস্ত বৈয়াহিকের আশ্রয় না নিলে আটটা পাশের খরচ যোগানই অসম্ভব তার উপর আবার একটা নূতন পাশ বেরিয়েছে সেটা বিনা চিকিৎসার ডাক্তার, এ পাশটা কেবল বই পড়লে হয় না. তার জন্য আবার "গবেষণা।" সাবেক কালে হারাণ গরু খুঁজতে গেলেই গবেষণা হত, আর এখন সকল গরুই হরি ছেঁড়া সুতরাং কারও গরু খুঁজে বার করা যায় না। সুতরাং এই নূতন পাশ কেবল বই পড়লে হয় না। ছাদন দড়ি হাতে করে নিরুদ্দিষ্ট বৎসের গভীর সন্ধানে বেরুতে হয় কেরাণী বাঙ্গালী এতদিন তাও সহ্য করে এসেছিল কিন্তু সম্প্রতি গবেষণার পাশটা আবার অধীর হয়ে উঠেছে, সে যেখানে ইচ্ছা যখন ইচ্ছা গরু খুঁজতে বেরোয়। আশুবাবুর এক ছেলে সকল বিদ্যা ছেড়ে কন্যা বিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেছেন: খবরের কাগজে এই খবরটা পড়ে আমার একটা ভাইপো প্রেম সম্বন্ধে উদ্দাম গবেষণা করতে আরম্ভ করেছে। বড় লোকে যা করে তাই শোভা পায়, কিন্তু গরীব কেরাণীর পক্ষে একে প্রেম, তায় উদ্দাম, তার উপর গবেষণার ভাঁর ও ধার বহন করা একেবারেই অসম্ভব।

অতএব প্রার্থনা এই যে অজুহাৎ-দর্শনে দীনতারক প্রভৃতি পালক হুজুর আদালতের ছুনী গরীবের প্রতি সুবিচার করতে আজ্ঞা হয়। ইতি

বাদী—কমলাকান্ত শর্ম্মা—ইতি দ্বিতীয়।

গ্রন্থ আলোচনা

'ঝড়ের যাত্রী', উপন্যাস :—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত। প্রকাশক রায় এণ্ড রায় চৌধুরী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, দাম আড়াই টাকা। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন 'জাতিভেদের কাঁটা-জঙ্গলে ভারতের মূর্চ্ছিত আত্মা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠেছে—এই 'মহামানবের সাগর-তীরে' উদারতার অনাহত ভেরী না বাজালে সে মূর্চ্ছা আর ভাঙবে না। ভারতের বর্ত্তমান অধঃপতনের প্রধান কারণ—জাতিভেদ। এই জাতিভেদ-সমস্যার উপরেই 'ঝড়ের যাত্রী'র কাঠামো খাড়া করানো হয়েছে।' ঝড়ের যাত্রী উপন্যাসখানি সমস্যা-মূলক। বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মের বাহুল্যে ভারতে আজ সমগ্র ভারতীয় জাতীয়তার কোন নিদর্শন নাই। ভেদে ভারতীয় শক্তি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। জাতি ও ধর্ম্মের প্রাধান্য রক্ষা করিতে গিয়া ভারত মনুষ্যত্বের সম্মান দিতে ভুলিয়া যাইতেছে। ইহাতে অন্যের উত্থান আর নিজের পতন হইয়াছে। দেশের পক্ষে ইহা অমঙ্গলকর—বর্ণধর্ম্ম একদিনে হয়তো ভালর জন্যই সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু আজ তাহা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তাই ভারত চিরকাল ঘরোয়া ঝগড়া লইয়াই মাতে—বাহিরের আক্রমণে বাধা দিয়া নিজ সংহতি শক্তির বল কোন দিন দেখাইতে পারে নাই। গ্রন্থের নায়ক ললিত বলিতেছেন—জাতীয়তার ভিত্তি হচ্ছে স্বজাতির প্রতি মমতায়। একে যদি অন্যকে ছোট নজরে দেখে তবে সে মমতা আসবে কোত্থেকে?...হিন্দু মাত্রই এক জাতি, দেশ ভেদ থাকুক, ভাষা ভেদ থাকুক—উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে—যেখানে যত হিন্দু আছে সকলেই এক জাতির লোক,—কে শূদ্র, কে বৈশ্য, কে ক্ষত্রিয়, কে ব্রাহ্মণ, সে বিচার একেবারে ভুলতে হবে—পূর্ব্বের বর পশ্চিম থেকে বধূ আনবে, উত্তরের জল দক্ষিণে অচল হবে না, সকলেই সমান শিক্ষা দীক্ষার অধিকারী হবে—এই হোল গিয়ে জাতীয়তা সৃষ্টির গোড়ার কথা। এই সমস্ত ব্যাপার করিতে হইলে আমাদের বর্ত্তমানের জীবনধারা, সংস্কার একেবারে বদলাইয়া দিতে হইতে পারে—কিন্তু তাহা না হইলে এক জাতীয়তাই বা সম্ভব কি করিয়া? আর জগতে এদের প্রাধান্য চলিয়া গিয়াছে—সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে আজ শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। তবে যদি জাতি জাগে, তবে যদি দেশ জাগে। ভেদের জন্ম মানুষের মনের দুর্ব্বলতায়, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতায়। ঐ ভেদ আমেরিকায় নাই, ইওরোপে নাই, খৃষ্টানের মধ্যে, বৌদ্ধের মধ্যে, মুসলমানের মধ্যেও নাই; কেবল এই ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দুর দেশে এই তুচ্ছ ভেদ থাকিবে কেন? এ ভেদ নিয়ে ভারত কি পৃথিবীর আর সব দেশকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছে? না, তা পারে-নি,—বরং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, জাতির বৃহত্তর অংশকে অস্পৃশ্য করে ফেলে পিছনে ঠেলে রেখে তার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে শক্তিহীন হিন্দুজাতি ক্রমেই জীবন্মৃত হয়েই পড়ছে।.....ভেদের দ্বারা যে অধিকাংশ ভারতবাসীকে আমরা আমাদের যাত্রাপথ থেকে নির্ব্বাসিত করে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলুম, সাম্যের দ্বারা আবার আমরা তাদের সাহায্য পাব, অনাহত একতায় আবার আমরা বলবান হয়ে উঠব—তখন আমাদের এই জাতীয় বিজয় যাত্রায় বাধা দেবে, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি থাকবে না। ত্যাগে ক্ষয়, গ্রহণে পুষ্টি; এই আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হোক।' গ্রন্থকার সমস্যার দিকের সমাধান এইভাবে করিয়াছেন। সমস্যার মধ্য দিয়া প্রাণের খেলায় উপন্যাসখানির উপন্যাসত্বও বেশ ফুটিয়াছে। তবে একেবারে উচ্চ বর্ণের সঙ্গে নিম্ন বর্ণের বিবাহ দেওয়াতে অনেকের চোখেই ইহা বাধিতে পারে—কিন্তু গ্রন্থে গ্রন্থকার জাতিভেদ ও প্রচলিত উচ্চ নীচ সংস্কারকে বর্জ্জন করিয়া মনুষ্যত্বকেই জীবনে উচ্চ স্থান দিয়াছেন। কে ব্রাহ্মণ, কে শূদ্র তাহা বিচার না করিয়া কে কেমন মানুষ ইহা বিচার করিলেই গোল মিটিবে। গ্রন্থের ললিত, মাধবী ও ছোট ছোট চরিত্রগুলিও বেশ ফুটিয়াছে। সমস্যা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও উপন্যাস ম্লান হয় নাই। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ভাল—বাঁধাই মনোরম—কিন্তু দাম আড়াই টাকা—খুব বেশীই মনে হয়।

গ্রীষ্মের দিনে

স্নানের আরাম পাইতে, শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল রাখিতে, আমাদের আইডিয়াল্ গ্রীসলেস্ এবং মেসিনে প্রস্তুত :—চন্দন, ফুলেলফুল বাসন্তী ও জারগেট নামক বাবহার করুন।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানী

৩৪।১এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন ২৯২৬

"আমাদের লক্ষ্য স্বাধীনতা। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য আমাদিগকে করাক্রমে হইতে হইবে। এবং কি মুসলমানগণ হইবার আমি স্বাধীনতা দাবী করিব। স্বাধীনতা মহান্ আদর্শ এবং ইহার জন্য সংগ্রাম অপরিহার্য্য। হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধের মূলে বিদ্য বাদের আসিয়াছে; এই বাদ-বাধির প্রতিকার—বিদ্যের দূর করা।"

– মৌলানা মহম্মদ আলী

বাঙ্গালী-হিন্দু আজ বাঁচিতে চাহে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই উৎকণ্ঠা জাগিয়াছে। ধর্ম্ম যাহা এতদিন আমরা বিনাপত্তিতে বাহ্য পালন করিয়া আসিতেছি, যে সমস্ত বিধি-নিষেধ, আচার বিচার মানিয়া চলিতেছি,—তাহা যদি ধর্ম্ম হয়, তবে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না কেন? যাহা জাতিকে রক্ষা করিতে পারে না, তাহা কি ধর্ম্ম? যদি আমরা বলিয়াই যাই, তাহা হইলে হয়ুমদম চণ্ডীর মূর্ত্তির ব্যবস্থা, মহামান্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ দিলেও, অবলম্বন করিয়া লাভ কি? আচারের নামে অত্যাচার চলিতেছে, কিন্তু অবশ্যোচিত ব্যক্তিচারকে বাধা দিবার, শাস্তি দিবার ক্ষমতা যে সমাজের নেই হইতেছে না।

অকর্ম্মণ্যতা ও অক্ষমতাকে নিষ্ঠা বলিয়া প্রচার করিবার পাপ্য ও বাপ্পাবাজী আজকালের বাঙ্গালার ধরা পড়িয়া গিয়াছে।—তুমি ব্রাহ্মণোত্তমই হও, আর চণ্ডালাধমই হও, রক্তমাংসের, সুখে, দুঃখে আত্মসম্পর্ক করিয়া আর পরিত্রাণ পাইবে না।—

শুধু হরতাল করিয়াই এ অপমানের প্রতিশোধ হইবে না। যদি আমরা স্বরাজলাভ করিতে না পারি, জাতি হিসাবে বলশালী হইতে না পারি, তবে আমাদিগকে বাহিরের লোকে গ্রাহ্য করিবে কেন? কুকুরের কথায় কি কেহ কাণ দেয়? অতএব সর্ব্বাগ্রে স্বরাজলাভের জন্য আমাদিগকে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। স্বরাজপ্রাপ্ত, স্বাধীন জাতিকে অপমান করিবার সাহস কেহ বা পীত কোন জাতিরই হইবে না।

বরোদার মহারাজের হইতে প্রতিবৎসর কেবল শিকার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। গত অক্টোবর মুবারীর রিপোর্টে দেখা যায়, বরোদার শতকরা ৯৯জন লোক নিরক্ষর। আর এই রাজ্যমধ্যে প্রায় ১২ কোটি টাকা খাজনা আদায় করিয়া মাত্র ১২,৭০,০০০৲ টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন। একজন স্বেচ্ছাচারী দেশীয় নরপতির ভুলনায়, ব্রিটিশ-তন্ত্র-পরিচালিত ভারতের ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাকল্পে কিরূপ অগ্রসর প্রশংসাতঃ তাহা সকলই মনে হয়। 'আনন্দবাজার'

আসানী রবিবার শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এরূপ জানা গিয়াছে। বর্ত্তমানে তিনি রঙ্গপুর জেলে আছেন।

বরোদা হইতে আগত হিন্দু মহাসভার যাত্রীদল প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীপাদ শাস্ত্রী বড় হাস্যরসিক লোক। তিনি সভায় বক্তৃতা দিবার সময় তাঁহার রঙ্গরসিকতায় সভার লোকদিগকে খুব হাসাইয়াছিলেন। "অসহযোগ" প্রস্তাবে বক্তৃতা দিবার সময় তিনি কয়েকটী মজার কথা বলিয়াছিলেন। আমরা নীচে তাহার দুইটী বিবৃত দিলাম :—

বাঙ্গালী ও কাবুলী :—অসহযোগের অভাবে বাঙ্গালী কিরূপ দুর্ব্বল ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন যে, তিনি একবার একটা কাজে ঢাকায় গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে পত্নিত মদন শাস্ত্রী ছিলেন। ঢাকা হইতে ফিরিবার দিন রেলে খুব ভীড় হইয়াছিল। গাড়ীর মধ্যে একজন বিশালদেহ কাবুলী প্রকাণ্ড একটা বোচকা লইয়া অর্দ্ধেক বেঞ্চি জুড়িয়া বসিয়াছিল; গাড়ীর মধ্যে বহু বাঙ্গালী এধারে ওধারে ঠাসাঠাসি করিতেছিল, কিন্তু কাবুলীকে কেহ কিছু বলিতে সাহস পাইতেছিল না। ইহা তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য বোধ হওয়ায় তিনি গাড়ীতে উঠিয়া এক টান মারিয়া কাবুলীর বোচ্‌কাটা টানিয়া নামাইয়া ফেলিলেন এবং নিজে সেখানে বসিয়া পড়িলেন। কাবুলী দেখিল যে, সে এবার শক্তের হাতে পড়িয়াছে। সে কিছুক্ষণ ছটফট করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল। পরে সারা হইলে তিনি হাত যোড় করিয়া বলিলেন যে, তিনি বাঙ্গালীদের নিন্দা করিবার জন্য এই কথা বলিতেছেন না, শুধু শারীরিক বলের অভাবে বাঙ্গালীরা কিরূপ ভীরু হইয়া পড়িয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিতেছেন। যদি তাঁহার কোনও অপরাধ হইয়া থাকে তবে বাঙ্গালীরা যেন তাঁহাকে ক্ষমা করেন। গল্প শুনিয়া সভাস্থ লোক হাসিয়া খুন হইতে লাগিল, শুধু বাঙ্গালীরা মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

লর্ড উইলিংডন ও কোলাপুরের রাজকন্যা :—বোম্বাইএর ভূতপূর্ব্ব লাট লর্ড উইলিংডন একবার কোলাপুরে গিয়াছিলেন। সেখানে লাট সাহেব ও কোলাপুরের রাজকুমারীর (যিনি 'আঁচা সাহেব নামে' অভিহিত) চড়িবার জন্য দুইটী ঘোড়া আনা হয়। লাটসাহেবকে যে ঘোড়াটী দেওয়া হইল, সে ঘোড়াটী দুষ্ট ছিল। লাট সাহেব উঠিতে যাইতেই ঘোড়াটী অত্যন্ত লাফালাফি আরম্ভ করিল। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও ঘোড়ার উপরিতে পারিলেন না। তখন লাটসাহেব বলিলেন, "রাজকুমারীর ঘোড়াটী আমাকে দাও।" রাজকুমারী তখন লাট সাহেবকে আপনার ঘোড়াটী দিয়া নিজে সেই দুষ্ট ঘোড়াটীর অত্রেরণে চড়িয়া বসিলেন। ইহা দেখিয়া লর্ড উইলিংডন অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "মহারাষ্ট্রীয় মেয়েরা যে ঘোড়ার পেটে থাকিতেই ঘোড়ায় চড়িতে শিখে।" 'আনন্দবাজার'

কলিকাতার কেন্দু—কলিকাতার অধিবাসীর গড় করা ৩০ জন কেন্দু-ফলে তুষ্টিতেছে। মশার-কামড় এই জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইতেছে বলিয়া অনেক অনুমান করিতেছেন।

কলিকাতার চিড়িয়াখানায় সম্প্রতি আফ্রিকা হইতে অনেক প্রকার জন্তু আসিয়াছে। তন্মধ্যে দুইটী লোমশ উষ্ট্র বড়, একটা 'ডাসমেনিয়ার ডেভিল, দুইটী কাল রাজহংস বিশেষভাবে আমাদের উল্লেখযোগ্য।

বাসন্তী—

সশঙ্খচক্রঃ সকিরীটকুণ্ডলঃ
সপীতবস্ত্রঃ সরসীরুহেক্ষণম্।

—গোবিন্দভবনের গৌরবে

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

২য় বর্ষ] ২২শে ভাদ্র শনিবার ১৩৩০, ইং ৮ই সেপ্টেম্বর। [১০ম সংখ্যা

বাঙ্গালীর বীরত্ব

বাহিরে—

ঘরে—

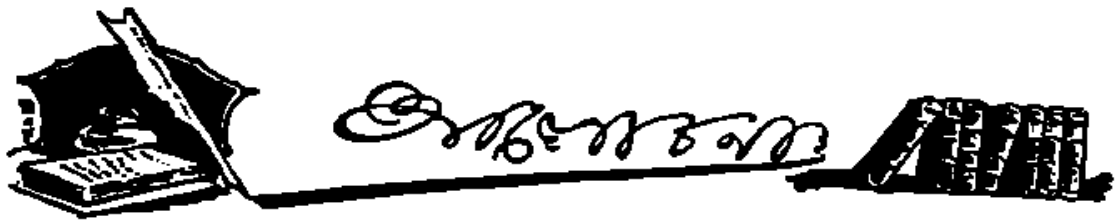

বোম্বে ক্রণিকেল পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগ হইতে বাংলার জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশনের সভ্যদের নিকট একখানি পত্র আসিয়াছে। পত্রখানি এই—Several journalist friends have expressed a desire to join a central organisation, if one is formed, to protect the economic and other interests of those who make their living by journalism. ইহার বিশদার্থ হইতেছে এই যে, দেশে এখন সংবাদ পত্র লেখকদের আর্থিক ও অন্যান্য অবস্থা ভাল না—সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই অর্থে তাঁহাদের রক্ষা করিতে হইবে। এই ব্যাপার লইয়া বাংলায় ইতিপূর্ব্বে আলোচনা কিছু কিছু হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যকরী ব্যবস্থা কিছু হয় নাই। কারণ যার যখন যাহার ঘাড়ে পড়ে তখন তাহারই যায়—অপর সকলে তখন দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখে এই স্বভাবের জন্যই আজ ভারতীয় সংবাদপত্র লেখকদের দুরবস্থা বিশেষ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় অবস্থা যদি উন্নত হয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের সাহিত্যিক ও সংবাদ পত্র লেখকদের অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতে চাহি। অর্থ থাকিলে এখন এ দেশে সাহিত্যিক, সম্পাদক সবই হওয়া যায়। অর্থবলে লেখককে হাতে পাইয়া তাহার উপর যথেষ্ট দুর্ব্যবহারও করা যায়। প্রকাশক বা সংবাদপত্র ব্যবসায়ীর অর্থ আছে। বহি যাহারা লেখেন বা সংবাদ পত্রের সেবা যাহারা করেন তাহাদের অর্থ নাই। এই অর্থের গর্ব্বে অর্থশালী প্রকাশক বা ব্যবসায়ী যাহাদের মাথার ঘামে পুঁজক ও পত্র ব্যবসায় চালাইতেছেন তাঁহাদের উপর যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহার প্রতিরোধের ব্যবস্থা যদি না হয় তবে দেশের লেখকদের অবস্থা ক্রমশঃ আরও শোচনীয় হইবে। বাংলায় সম্প্রতি অতি অল্প দিন মধ্যে সংবাদপত্র লেখক ও গ্রন্থ লেখকের সঙ্গে উভয় ব্যবসায়ীর যে কতকগুলি অত্যন্ত অপ্রীতিকর ঘা-তা ব্যাপার হইল ইহাতে সব স্থানেই মস্তিষ্ক-জীবিরা অর্থশালীর উপহাসের পাত্র হইয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রতিকার এই অভাবের দেশে অর্থ ভিন্ন হইতে পারে না। অভাবের কাছে শিক্ষিত বিবেচক লোকের মান মর্য্যাদাও কত ম্লান করিতে হয় বাধ্য হইয়া তাহা উপরোক্ত সকল ঘটনাতেই সু-প্রকাশ। বিনা পয়সায় গ্রন্থি-পশিলন Authors Union কিম্বা সংবাদ পত্র সঙ্ঘের প্রস্তাব পাশে কোন ফল হইবে না। কারণ মাস্তিষ্কজীবিরাও পেট চালাইবার দায়েই এই সব হীন অপমান ম্লান মুখে সহিতেছেন। অথচ দেশের অর্থশালী মস্তিষ্কজীবি কিম্বা মস্তিষ্কজীবিদের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন অর্থশালী লোকেরাও এই অপমানে ঘোটেই সাড়া দিতেছেন না। উপায় নাই। তাই যতদিন অবস্থার পরিবর্ত্তন না হয় ততদিন দুঃস্থ সাহিত্যিকদের এ অপমানে মা-সওয়া করিয়াই থাকিতে হইবে—যদি কোনদিন উপায় হয় এই ভরসায়।

দেশীয় সামন্ত রাজ্য পাতিয়ালা হইতে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রবেশ নিষেধ আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে। শোনা যাইতেছে অমৃতবাজার নাভার মহারাজের গদি-চ্যুতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন তাই তাহার ভাগ্যে পুরস্কার মিলিল প্রবেশ নিষেধ। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসকেও কাশ্মীর মহারাজ নিজ রাজ্যে প্রবেশ নিষেধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। আরও অনেক দেশীয় নেতাকে এই ভাবে অনেক সময়ে দেশীয় রাজ্যে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এগুলি কি রাজাদের স্বেচ্ছাকৃত আজ্ঞা—না পর ইচ্ছায় চালিত আজ্ঞা। এ বিষয়ে বৃটিশ

ভারত তবু সেদি অনেক ভাল। ভারতীয় সামন্ত রাজাদের কার কতটুকু মূল্য আছে তাহা জানিবার বাকী কাহারও নাই। ঠেকা সময়ে এই দেশীয় সংবাদ পত্র গুলিই তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দাঁড়ায়, দেশীয় বিচক্ষণ লোকেরাই তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিলাতে আন্দোলন—আবেদন করিতে যান অথচ তাহাদের প্রতি ইহারা কি সুন্দর ভাবই প্রকাশ করেন।

• •

ভারতীয় জেলে কয়েদীদের উপর অত্যাচারের অনেক কাহিনী নিত্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। শুনিতেছি জেলে মৌলানা সৌকত আলির মত লোককেও প্রায় উলঙ্গ করিয়া বিড়ি আছে কিনা তাহারই সন্ধান লওয়া হয়। জেলের এই আইন এবং ইহাই পালন করিতে হইবে,—উপায় নাই। তাঁহাদেরও গদ্য পিষিতে হয়—ইহাই নিয়ম! সালেমের অসহযোগী ডাক্তার রাজলু নাইডু অসুস্থ শরীরেও তাই গদ্য পিষিতেছেন—নিয়ম অবশ্যই প্রতিপাল্য!

মৌলানা মহম্মদ আলি জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াই বারবেদা জেলের চাবি খুলিতেছেন। বারবেদা জেলে নিখিল ভারতের মুক্তি মন্ত্রের গুরু মহাত্মা এখনও কারাদণ্ডিত অবস্থায় রহিয়াছেন। আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের একজনের আসনে যেন আবার উৎসাহের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যতদিন আলি ভ্রাতৃদ্বয় মহাত্মার সঙ্গে ছিলেন ততদিন তিনি হিন্দু মুসলমানের মিলন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন। মৌলানা মহম্মদ আলির কারাদণ্ডের পরেই মহাত্মা গাত্রাবরণ বস্ত্র প্রভৃতি বর্জ্জন করিয়া কৌপীনসম্বল হন। আজ সব সংশয়তীত, অগণতন্ত্রের মধ্যে এস ভারতে একজন সর্ব্বাদী মুক্ত নেতা। মোহমুক্ত ভারতীয়দের আবার স্বপথে চালিত কর।

• •

এশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি জাপানের উপর প্রকৃতির ধ্বংস লীলার তাণ্ডব নৃত্য বহিয়া গিয়াছে। জাপানের রাজধানী টোকিও, ইয়াকোহামা নাগাসিকি ওসাকা প্রভৃতি বড় বড় সহর বন্দর ও গ্রাম প্রভৃতি প্রকৃতি বিপর্য্যয়ে একেবারে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, অগ্নিলীলা যুগপৎ এই তিনটী বিভিন্ন প্রকৃতির রুদ্র লীলার বাহন হইয়া জাপানের লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ, অর্থ, সমৃদ্ধ সব হরণ করিয়াছে। এশিয়ার শ্রেষ্ঠ শক্তি জগতের দ্বিতীয় ইংলণ্ডের এই শোচনীয় পরিণামে আমরা মুগ্ধ—মানুষের শক্তির সীমা কত সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ তাই বুঝিতেছি। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান—পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অনুকারী জাপান কিছুতেই প্রকৃতির হাত এড়াইতে পারিল না। এই ধ্বংসলীলা হইতে নিজেকে ফিরাইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় লইতে জাপানের হয়তো শতাব্দী লাগিতে পারে। তবে জাপান স্বাধীন—তাই ইতিমধ্যেই তাহার সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

এলবেনিয়া ব্যাপার লইয়া ইটালি এবং গ্রীসের মধ্যে যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল তাহা লইয়া এখন প্রকাণ্ড যুদ্ধের সম্ভাবনা ঘটিয়া উঠিয়াছে। ইটালি গ্রীসের নিকট হইতে যে কয়েকটি ক্ষতিপূরণের সর্ত্ত দাবী করিয়াছে গ্রীস তাহা দিতে অথবা নিজের কোন দোষ বা ত্রুটি স্বীকার করিতে নারাজ। গ্রীসের মত যে এই ব্যাপার ইয়োরোপের লীগ অব নেশন কর্ত্তৃক মীমাংসিত হয়। ইটালীর প্রধান মন্ত্রী সাইনর মুসোলিনির মতে লীগ অব নেশনের এ বিষয়ে হাত নাই। এই ভাবে ইটালী গ্রীসের কর্ফু ও আরো কয়েকটি দ্বীপ অধিকার করিয়া লইয়াছে। ক্রমে এই ব্যাপার আরও অনেক দূর গড়াইবে তাহা ইতিমধ্যেই বেশ বুঝা যাইতেছে। একদিকে যেমন ইংলণ্ড তাহার পরম প্রিয় লীগ অব নেশনের প্রতি ইটালীর এই উপেক্ষার জন্য অত্যন্ত রুষ্ট অপর দিকে ফ্রান্স ইটালীর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। এ দিকে বল্কানের খবরে দেখা যায় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল্কান দেশ গুলিও সমর সজ্জায় সজ্জিত হইতেছে। লীগ অব নেশন প্রভৃতি বহাড়ম্বরের পর আবার কি আমরা এক মহা যুদ্ধের সূচনায় উপস্থিত হইয়াছি! ঘটনা যেরূপ দ্রুত

অগ্রসর হইতেছে তাহাতে সমর পিপাসুদের তৃপ্তি শীঘ্রই ঘটিতে পারে।

দিল্লীতে শীঘ্রই কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসিবে। কংগ্রেসের দুই দলই দলবল সহ ইহাতে উপস্থিত হইবেন। মৌলানা মহম্মদ আলি জেল মুক্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া বলিয়াছেন যে বিশেষ অধিবেশনে ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর প্রত্যেক সভ্য দেশের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিবেন। এই মর্ম্মে তিনি এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন। কাউন্সিলের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে, সকল দলই এই প্রস্তাবের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া ইহাতে একমত হইবেন সন্দেহ নাই। মূলে যদি এই প্রস্তাবের প্রাধান্য থাকে তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুচ্ছ মতবাদ ও মতভেদ সহজেই দূর হইতে পারিবে। এই প্রস্তাবের কষ্টি পাথরে পরখ করিলেই দেশের রাজনীতিক এবং ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রাণ বস্তুর পরিচয় পাইব।

• • • •

রামপুরহাটের তারের খবরে প্রকাশ দেশমান্য শ্রীযুক্ত দিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আজ কারামুক্ত হইবেন। কারামুক্তির পর সর্ব্বপ্রথমেই তিনি স্বীয় জন্মতীর্থ রামপুরহাটে পদার্পণ করিবেন। সুস্থ দেহে আবার বাংলার এ মহা ঘোর সঙ্কটের দিনে তাঁহার লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অগ্রে দাঁড়াইয়া তাহাদের আশা অনুপ্রাণিত করিয়া তুলুন। দীর্ঘ দুই বৎসরের অদর্শনে স্বদেশ যে তাঁহার আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছে। এসো সৌম্য শান্ত স্বরাজ-মন্ত্রের ঋষিবর, এসো সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ—বাংলা আজ তোমার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শুনিবার আশায় উদ্গ্রীব হইয়া রহিয়াছে—তুমি আসিয়া আবার আত্মবল ভরসে নিমজ্জমান স্বরাজ তরণীর হাল ধরিয়া দাঁড়াও—স্বরাজের বিজয় নিশান আবার বাঙ্গালায় উড্ডীন কর!

বিরাগে

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত]

তুমিই প্রথম জ্বালিয়েছিলে
হৃদয়ে মোর আলো,
তোমার হাতের পরশ লভে'
জীবন আমার টুটুল সবে
তাই বলে কি হে প্রিয় মোর,
বাঁধব তোমায় ভালো?
পথ-চলা কোন্ সুদূর-বনে,
বাদল-ভরা সাঁঝে,
মুক্ত-বনের ঘুম-বিতানে
ঘুমুব তোমার,—বাজ্‌ল কাণে
তাই বলে কি হে প্রিয়তম
ঘুমুব তোমায় মাঝে?
চুকিয়ে দিছি তোমার সাথে
সকল লেনা-দেনা,
আজ আমি গো একলা-পথিক
নেই যে গো পথ-চেনা॥

রণচেরী

ইতালী আর গ্রীসের মধ্যে আবার সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। ইতালী ইতিমধ্যেই গ্রীসের অধিকৃত 'করফু' নামক স্থানটি দখল করিয়া বসিয়াছেন। বিশ্বের ক্ষতিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বহু শোণিত ক্ষমাট বাঁধিয়া ধরিত্রীর বুকে বিষম বেদনা সঞ্চার করিয়াছে। বহু রক্তপাত না হইলে এ ব্যথা জুড়াইবে কি?

শান্তিসঙ্ঘ (Leage of Nations)—

শান্তিসঙ্ঘ গড়িয়া সমগ্র জগতের সমরহুঙ্কার শেষ করিয়া ফেলিবেন—তাই সমরাবসানে মহাসঙ্ঘের চক্কারবে কাণে তালা ধরাইয়া দিয়াছিল। সম্প্রতি কর্ত্তারা ইতালী ও গ্রীসকে সমর-দ্বন্দ্বে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য বলিয়াছিলেন। গ্রীস মধ্যস্থতায় রাজি আছেন, তুর্কীর তীব্র জ্বলের জ্বলের বেদনা এখনো ও জুড়ায় নাই। কিন্তু ইতালী কর্ত্তাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বিদায় করিয়াছেন।

ফরাসীর ফাল্গুনজ্বালা—

গ্রীস আর ইতালীর দ্বন্দ্বে ফরাসী কথাটি কহিতেছেন না। কহিলেই ত মুস্কিল, ঝড়ের কীর্ত্তিটা ধরা পড়িয়া যাইতে পারে। আর এই দ্বন্দ্বে হয় ত ইতালীর কাছে ফরাসী ঋণ সংক্রান্ত ব্যাপারেও যৎকিঞ্চিৎ চোরা গোপ্তা সহায়তার প্রত্যাশা করেন। কত কেরামত জানরে বাপ্পা—কত কেরামত জান!

প্রবেশ নিষেধ—

পাতিয়ালা মহারাজ নাকি স্ব-রাজ্যে পত্রিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। কারণটা কিন্তু বুঝা যাইতেছে না। কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতাটা দেখাইয়া দিবার জন্যই বুঝি পত্রিকা অতি ভক্ত পাতিয়ালাপতির বিষ নজরে পড়িয়া থাকিবেন। স্বাধীন নরপতিগণের স্বাধীনতার মৌজ দেখিয়া হাসিও পায়—কাঁদিতেও ইচ্ছা করে।

ক্ষমার আপকাটি

বিহার আইন মজলিসে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে কারামুক্তি দিয়া আগামী নির্ব্বাচন ব্যাপারটা সকলের পক্ষে সুবিধাজনক করিবার জন্য এক প্রস্তাব উঠিয়াছিল। প্রস্তাবে সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছিল যে, কারারুদ্ধ নেতৃবর্গকে ক্ষমা করিয়া তাঁহাদের মজলিসে যোগাদেবী করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হউক। প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু সভাপ্রধান মিঃ ম্যাকফারসন এই প্রসঙ্গে ক্ষমার পাত্রাপাত্র ভেদটা বেশ ভাল করিয়া মজলিসী মহাশয়দের বুঝাইয়া দিয়াছেন। ম্যাকফারসন সাহেবের মতে আমলাতন্ত্র-বিরোধী জীবমাত্রেই ক্ষমার অযোগ্য। কেবল মাপ পাইতে পারেন তাঁরা, যাঁরা 'দেহিপদপল্লব-মুদারম্' বলিয়া আমলাতন্ত্র হাই তুলিলে তুড়ি দিবেন এবং হাঁচি দিলে 'জীব' বলিবেন। বলিহারী!

সাদা ইংরাজ ও সাদা ফরাসী—

ফরাসী সরকার এক পরওয়ানা জারি করিয়া ফরাসী দেশের সকল জাতীয় প্রবাসীদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা ফরাসীজাতির অতিথি, কাজেই সম্মানের পাত্র। তাই বলিয়া তাঁহারা বর্ণবিদ্বেষ হেতু জাতিবিশেষের প্রতি আহার বিহার সম্পর্কে কোনপ্রকার অবজ্ঞার ভাব দেখাইলে ফরাসী সরকার তাহা ক্ষমাই বিবেচনা করিবেন না। উত্তম কথা। সমান সুলভ্য ইংরাজ কিন্তু কেনিয়াতে কালার জন্য নিম্নভূমিতে গণ্ডি আঁকিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা হইতে চন্দননগরের ভাড়া কত?

আর্কিমেদের উদ্ধারশাসন—

মার্কিন যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট মিঃ উইলসন বিগত মহাযুদ্ধাবসানে খুব এক চোট বক্তৃতার তোড় বহাইয়া বলিয়াছিলেন যে, ছোট ছোট দেশগুলিকে 'আত্ম-নিয়ন্ত্রণের' সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। সেই মার্কিনই

ফিলিপাইন দ্বীপনিবাসীর সামান্য অধিকারগুলিও একে একে কাড়িয়া লইয়া বদান্যতার নমুনা দেখাইতেছেন। "বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।"

নাগপুর সত্যাগ্রহাপরাধী—

মধ্যপ্রদেশ সরকার স্বরাজপতাকা সম্পর্কে কারাদণ্ডিত বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সাধু।

সাহারাণপুরের লাঞ্ছনা—

সাহারাণপুরে বিগত মহরম পর্ব্ব উপলক্ষে যে বিষম হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে তাহার বিস্তারিত খবরে প্রকাশ সহরে কোনও দেবমন্দির সংলগ্ন একটি বিপুল গাছ আছে, সেই বৃক্ষ কাটিয়া না ফেলিলে সেই রাস্তায় বৃহৎ 'তাজা' (তাজিয়া?) লইয়া যাওয়া যায় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে ছোট তাজিয়া তৈরী হইত তাই বিপুল গাছে আটকাইত না। কিন্তু এবার প্রকাণ্ড তাজিয়া তৈরী করিয়াই এই হাঙ্গামার সূচনা করা হয়। ফলে, সহস্র সহস্র হিন্দুর দোকান পাট, মুসলমানগণ লুট করিয়া নিয়াছে এবং সরকারী কৌজের গুলি খাইয়া চারিজন মুসলমান হত এবং অনেকে আহত হইয়াছে। সহরের কোনও মুসলমানের উপর জুলুম হয় নাই বলিয়া প্রকাশ। এই সুযোগে মোয়া কাগজ ওয়ালারা 'ননকোর' উপর বেশ এক চোট গাহিয়া লইতেছেন। বলি—ভাইরে! মহাত্মার মত পুরুষ প্রধানকে আজ বন্দি করিয়া না রাখিলে হয়ত এই ব্যাপারটা ঘটিতে পারিত না। হরি বল মোপলা আর চৌরীচেরার ব্যাপার মহাত্মার কারাদণ্ডের পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল—উত্তরে অনেক কথাই বলা যায়। যখন উস্‌কাইয়া দিবার লোকের অভাব নাই—তখন ভেড়ার মত হিন্দু মুসলমান নিজে নিজে এমনি করিয়াই গিঁ তাজিয়া মরিবে।

রাজরোষ

রাজ বিদ্রোহাপরাধে জমিদার পত্রের অন্ধ সম্পাদক ২ বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। বিচারক সাহানুভূতি দেখাইয়া রায়ে লিখিয়াছেন যে, এই অন্ধের প্রতি দীর্ঘ কারাদণ্ডাদেশ দিতে তাঁহার প্রাণে দুঃখ হইতেছে। অপর একজনের লেখা পড়াইয়া শুনিয়া এই অন্ধ সম্পাদক ছাপার অযোগ্য দিয়াছিলেন। লেখক ধরা পড়ে নাই—তাই অন্ধকেই সংক্ষেপ দুটি বৎসর সরকারের আতিথ্যে আপ্যায়িত হইয়া আসিতে হইবে। গান্ধী বলেন 'বড় কারাগার হইতে নাকি তিনি ছোট কারাগারে নীত হইয়াছেন!'

মিনার্ভা থিয়েটার—

স্থানীয় মিনার্ভা থিয়েটারের সহস্র সহস্র পৃষ্ঠপোষক-বর্গ শুনিয়া সুখী হইবেন যে মিনার্ভার নূতন রঙ্গালয়ের নির্ম্মান কার্য্য পূর্ণ উদ্যমে আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ইংরাজী বৎসরের প্রারম্ভেই মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষ আবার নূতন উদ্যমে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, আধুনিকতম প্রণালী-সঙ্গত, নব ভবনে অভিনয় আরম্ভ করিবেন। আজ প্রায় বৎসরেক ঘুরিয়া আসিল মিনার্ভার সুযোগ্য স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয় ভগবান রঙ্গার কোপে পড়িয়া অদম্য অধ্যবসায় বলে আর্থিক যথেষ্ট অনিষ্ট স্বীকার করিয়াও তাঁহার প্রতিষ্ঠানটি বজায় রাখিয়াছেন। সুখের বিষয়, তাঁহার পরিশ্রমের সাফল্যপ্রাপ্তির শুভদিনের আর বিলম্ব নাই। সকল দুর্ঘটনার অন্তরালেই একটা শুভচিহ্ন লুক্কায়িত থাকে। তাই বুঝি দীর্ঘ রঙ্গালয়ের ভস্মরাশি হইতে আজি বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ রঙ্গমঞ্চ গড়িয়া উঠিতেছে।

দেশ বিদেশ

এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটীর জন্য মিয়াদের মিউনিসিপাল বোর্ড ও কমিশনার মেম্বরগণকে অভিনন্দিত করিয়া মানপত্র পাঠ করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট।

বরোদার মৃত যুবরাজ গুরুসিং রাওয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া "পেরী" মহাশয়ের সম্পন্ন হইয়াছে। মহারাজ গাইকোয়ার বরোদার জন্য সমস্তদিন শ্মশানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল মহারাণা গাইকোয়াই যাত্রা দিয়াছেন। পরে জানা গিয়াছে যে সে সংবাদ ভুল। তুল মৃত্যু সংবাদ আয়ুবৃদ্ধির পরিচায়ক। মহারাণা দীর্ঘায়ু হইয়া প্রজারঞ্জন করুন।

বাঙ্গালীর মৌরুস মোকদ্দমাদের ফুটবল ক্লাব অন্যদের বোম্বাই সহরে ফ্রেঞ্চার কাপ প্রতিযোগীতায় তাহাদের চতুর্থ খেলায় তাহারা লাইট ইন্‌ফ্যান্ট্রি র সঙ্গে হারিয়া গিয়াছে। মাঠের ভাল খেলিয়া গোলের কাছে আসিয়াই গোলোছাড়া বরাবর পাইয়া যায়—এটাই মোকদ্দমাদের অভিসম্পাত।

জাপানে প্রকৃতির প্রকোপে লক্ষ লক্ষ লোক মারা পড়িয়াছে। আর কত লোক যে গৃহহারা হইয়া পথে দাঁড়াইয়াছে তাহার ইয়ত্তা হয় না।

দুইটী দ্বীপ ভূমিকম্পের বলে অতল জলধির তলে তলাইয়া গিয়াছে। ইয়োকোহোমা সহর আগুনে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। আগুনের তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া কত লোকে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।

জাপানের দুর্দ্দিনায় সভ্যজগৎ বিশেষ প্রাণ হারাইয়াছে।

দুঃখের বিষয় ইতিমধ্যেই এই দুর্দ্দিনে জাপানের সাহায্যকল্পে মার্কিন, ইংলণ্ড, চীন, ভারত প্রভৃতি সকল দেশেই অর্থ সংগ্রহের কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

ভয়ঙ্কর সভ্যতাদ্রোহিদিগকে বিলাট ইংলণ্ডের নাবিক ব্যবস্থাপকের অধিবেশনে সাধারণভাবে অভিসম্পাত করিতেছে।

জাপানের "মার্ক" যাহা ইতিপূর্ব্বে আমাদের প্রায় এক টাকারই সমান ছিল—এখন তাহার দর যে কত নামিয়া গিয়াছে তাহাতে অধিক হইতে হয়। পনেরটী টাকায় আজ ৭,০০,০০,০০০ কোটী মার্ক পাওয়া যায়।

ম্যাঞ্চেষ্টারের সোইয়াষ্টার মুদের মোকদ্দমার প্রাপ্যের ডিক্রীর আসামী বরেন্দ্রকুমার ঘোষের আপিল হাইকোর্টের পাঁচ জন বিচারক (Full Bench) শুনিতেছেন। জীবনমৃত্যু সমস্যার সংযোজকত্বে বাদল ইন্সিওরেন্স আসামী আপিলপুরে দিন কাটাইতেছে।

প্রসিদ্ধ চিত্রকর কে-ডি সেন জাল নোট তৈয়ারী করায় অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছে এ সংবাদ পাঠকগণ জানেন। তাহাকে প্রথম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং জামীনের জন্য তাহার পক্ষের উকীল দরখাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু জামীন গ্রাহ্য হয় নাই। তাহার বিরুদ্ধে ১০০ শত টাকার সম্পূর্ণ জাল নোট পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী—মাদ্রাজের ২৭শ সেপ্টেম্বরের ঝড়ের প্রকাণ্ড তাণ্ডবে মৃতকল্প হইয়া শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়কে চিকিৎসা করিতেছেন তাঁহার জন্য ভয়ের কোন কারণ নাই। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যহানি হইয়াছে। ডাক্তারেরা তাঁহাকে একবৎসর বিশ্রামের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে বলিয়াছেন।

মিঃ হ্রফোর্ড একদল লোক লইয়া উত্তর মেরুতে ইংরাজের পার্শ্ব অধুনা রাখিবার জন্য এবং নূতন দ্বীপ আবিষ্কার করিতে গিয়াছিলেন। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে একজন এস্কিমো রমণী ছাড়া তাহার দলের সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তিনি নিজের মরা খাইয়াছেন।

ডেমুক্রাটিক নমিনেশন—কলিন ক্লিভের এই-এর উইলোমিন নামে এক সাহেব বাঙ্গালা ক্লিভে এক অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে নালিশ করিয়াছে যে তাহার অনুমোদন ভিন্ন, সে কেবল তাহার স্ত্রীকে ফুসলাইয়া লইয়া গিয়াছে। মামলা মুলতুবী আছে।

যে ষ্টকোতে ইংরেজগণ মাথা খুঁড়িয়া মরিয়া হইয়া একটী নূতন গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছিল। এতদিন পর্য্যন্ত আমেরিকা এই গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করা হয় নাই। সম্প্রতিকালের সংবাদে প্রকাশ যে আমেরিকা নূতন গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

আবার মৌরীপত্তন অভিযান—জেনারেল-ক্রসের নেতৃত্বে মৌরীপত্তন যুদ্ধে আরোহণ করিবার জন্য আর একদল যুদ্ধী আসামী জানুয়ারী মাসে রওনা হইবে। যাহাদের হাতে যুদ্ধ করার ভার তাহাদের নিজেদের উপরই দেওয়া হইয়াছে। ইনি এবার যথেষ্ট রবি টৈন্য করিবেন। অতি গরমীদের মধ্যে কাপ্তেন সোয়াইডেনও আছেন।

লুধিয়ানার ১৩ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, লুধিয়ানার কয়েকজন শিখ পল্লীবাসী গবর্ণরের নিকট এই মর্ম্মে দরখাস্ত করিয়াছেন যে, ডেপুটি কমিশনার মিঃ ষ্টিউর্ট ও এডিস্যাণ্ট কমিশনার মিঃ হার্ডিং আসন্ন শুক্র ও শনিবার শিখ মেওরদের উপর গুরু হইয়া গুরুদ্বারের মধ্যে গ্রন্থ সাহেবের সম্মুখে চেয়ারে বুট সমেত উপবেশন করিয়া শিখ ধর্ম্মকে অবমাননা করিয়াছেন এবং একটা সাধুনীর ধর্ম্মনাশকে বাধা দিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগকে ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তার করিতে অনুমতি দেওয়া হউক।

মোটর গাড়ীর গতি বন্ধ, করিবার নূতন আবিষ্কার।—"টিকাগো ট্রেবিউনের" বার্লিন সংবাদদাতা মিঃ উইট জানাইয়াছেন যে, তাঁহার মোটর গাড়ী একটি খোড়াসজ্জা করিয়া বার্লিন পরিত্যাগ করে। ঐ যানে মোটর, ঘণ্টাধ্বনী হইতে ১ শত মাইলে উপস্থিত হইলে হঠাৎ সমস্ত মোটর থামিয়া যায়। প্রত্যেক মোটরের চালক কহিল যে তাহাদের মোটরের কল খারাপ হইয়াছে। যেখানে যে মোটর ছিল সেইখানে তাহা দাঁড়াইয়া থাকে। কিসের জন্য মোটর থামিল তাহা জানিয়া সকলেই একেবারে বিস্মিত হইল। একখানা দুইখানা নয় ২০ খানার অধিক মোটর গাড়ী। দুর্ঘটনায়ের কত চেষ্টা করিল, মোটর কিন্তু কিছুতেই এক ইঞ্চ অগ্রসর হইল না। তার পর বার্লিন হইতে বিজ্ঞানবিদ্ আসিয়া তাঁহারা বলেন যে বিদ্যুতাঘাতের দ্বারা প্রত্যেক মোটরের চলচ্ছক্তি নষ্ট করা হইয়াছে। এ একটি নূতন আবিষ্কার। এই পরীক্ষার প্রয়োগে, টেলেফুনে তার ও এমন কি সমরোপযোগী প্রভৃতির উপায় পরীক্ষা করা হইবে। যদি প্রত্যেক পরীক্ষা কৃতকার্য্য হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে এক মিনিটে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হইবে।

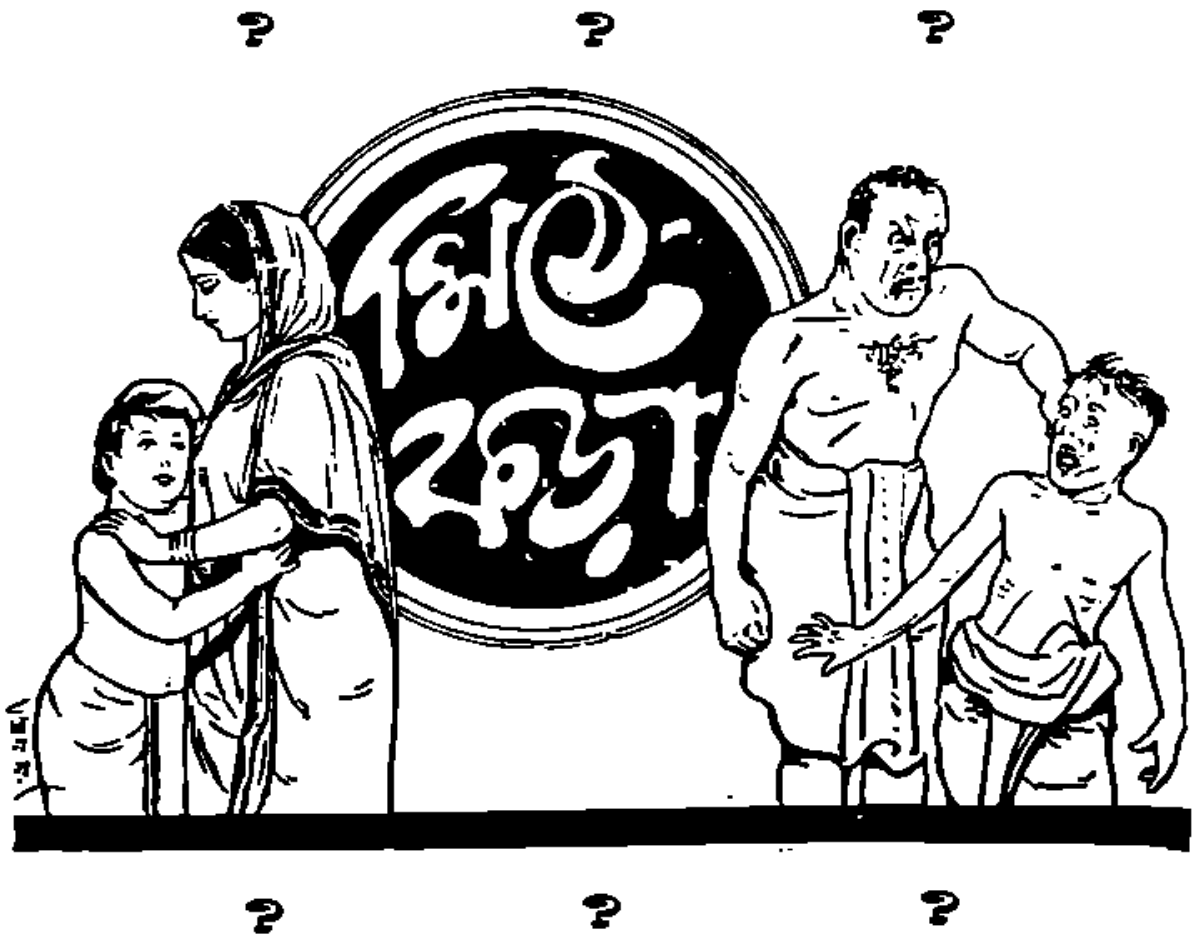

প্রদর্শনী বর্জন

কেনিয়ার ব্যাপারে ইংরেজ সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থাটা কর্তারা আমাদের চক্ষে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। ফলে, যতবড় সুবীন সুবোধ বয়েঞ্চখা-দিগকেও বিলাতে গলাবাজির বেলায় হার মানিয়া নিজ নিজ মুখে আর এক পোঁচ বেশি কালি মাখাইয়া —গলাবাজি থাইয়া গৃহে ফিরিতে হইয়াছে।

কিন্তু গৃহে ফিরিয়াই তাহারা কঠিন পণ করিয়া বসিয়াছেন, "সাদা বরন কালা হেরিবে না আর।" দুর্জয় মানভরে তাঁহারা সকলে একবাক্যে প্রচার করিয়াছেন যে, আর ইংরাজের কোনও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানেই ভারতবর্ষ যোগদান করিবে না। এতদিন যাহারা দিবানিদ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেন যে ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই একটা অংশ এবং কালা পাথার প্রভেদটা মর্টেজ মাকালের জোরে অচিরেই লোপ পাইতে বাধ্য —সেই আশার বুক বাঁধিয়া যাহারা ইংরাজ মন্ত্রীসভার আবদার জানাইয়া বাঘি মারিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, তাহারাই কিন্তু আজ ভারতের প্রকৃত অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অতি দুঃখে মানের কান্না কুড়িয়া দিয়াছেন।

সাম্রাজ্যে প্রদর্শনী একটি চাল, যাহার নিগূঢ় উদ্দেশ্যটা একটা পদ্দিজার ঘোমটার আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সেই প্রদর্শনীর পূর্ব প্রচেষ্টা স্বরূপে ভারতের প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারও এক একটি ক্ষুদ্র সংস্করণের প্রদর্শনী খুলিতেছেন। আগামী শীতের মরসুমে বাঙ্গালায় প্রদর্শনী খোলা হইবে। বহুবিধ আমোদপ্রমোদের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

কলিকাতার ইডেন উদ্যানে প্রদর্শনী বসিবে। টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ হইবে—বিবিরা হাত ধরাধরি করিয়া গৌরাঙ্গের গলা জড়াইয়া নাচিবেন। কেলনার খোলা তাঁটি খুলিয়া সুরা সরবরাহ করিবেন। আশমানে দিনে তারা ফুটিবে, রাতে সহস্র সূর্য্যালোক জমাট বাঁধিয়া আমোদের আসর গুলজার করিয়া তুলিবে। ব্যবস্থাপক মজলিসের কর্তারাও যথারীতি খানিকটা গলাবাজি করিয়া—অনারেবল প্রভু-দিগের গালাগাল খাইয়া অবশেষে শান্তভাবে গৌরীসেনের তাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন। কাজেই বছর খানেক ধরিয়া যত যত জনকয়েক দুহাজারী চারহাজারী মিলিয়া প্রদর্শনী-রূপ বিরাট লোকরঞ্জন ব্যাপারের আয়োজনে লাগিয়া গিয়াছেন।

ইতিমধ্যে কেনিয়ার ব্যাপারে তাচ্ছীল্য ও উপেক্ষার ব্যথায় অধীর হইয়া কয়েকটি অতিভক্ত সুবোধ ছেলেই বিদ্রোহ করিয়া বসিলেন। ভারতীয় সংবাদপত্র-সঙ্ঘও মন্তব্য পাশ করিলেন যে, তাঁহারা একযোগে প্রদর্শনীর সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিবেন।

মাদ্রাজের নিউইণ্ডিয়া পত্রের সুযোগ্যা সম্পাদিকা শ্রীযুতী আনিবসন্ত সেদিন তাঁহার কাগজসহ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহূতা হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, কর্তৃপক্ষ তাঁহার সহিত দেনা পাওনার আলোচনা করিয়া প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন দিবেন। উত্তরে সেই শ্বেতাঙ্গ মহিলা যে জবাব দিয়াছেন নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

"দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে সাম্রাজ্যপ্রদর্শনীর ভারতীয় বিভাগের কর্তাদিগের নিকট আমার কাগজ পাঠান অসম্ভব। কেনিয়ার ব্যাপারে ইংরাজ সাম্রাজ্যে ভারতবাসীকে অতি হেয় নিকৃষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে। যে পর্যন্ত এই অন্যায়ের প্রতীকার করা না হয়, সে পর্যন্ত আমি প্রদর্শনীর কোনও কার্য্যে যোগ দান করিতে আদৌ ইচ্ছা করি না।"

কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, এত বড় একটা বর্জন ব্যাপার সম্পূর্ণ সফল করিতে হইলে বিরাট আন্দোলন এবং সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার প্রয়োজন। তথাপি এযাবৎ তাহার জন্য আর বড় একটা উচ্চবাচ্য শুনিতে পাইতেছি না। কলিকাতায় প্রদর্শনীতে দোকান বিতরণ কার্য্য বর্তমান সেপ্টেম্বর মাসের ৩০শে তারিখের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে। ইতিমধ্যে বিপুল উদ্যমে তাহার জন্য ক্যানভাসিংও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালার নেতারা আপাততঃ শ্রীভাণ্ডার মহাব্রতায়

নিজ নিজ ব্যক্তিগত মতামত এবং অধিকারগুলি গড়িয়া পিটিয়া লইতেছেন। মহাত্মার চরকা, খদ্দর, অস্পৃশ্যতা পরিহার, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব স্থাপন প্রভৃতি স্বপ্নগুলি তাঁহার গোঁড়া শিষ্যেরা আপাততঃ ধামাচাপা রাখিয়াছেন। স্বরাজ পাইয়া আমাদিগের স্বায়ত্ত শাসন যন্ত্রটা কেমন করিয়া সরগরমে চালাইতে হইবে ইতিমধ্যেই বাঙ্গালার কয়েকজন করিয়া তাহার মহলা দিয়া লইতেছেন। পঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশের হিন্দু মুসলমানেরা লাঠালাঠি দিয়া, কোমর বাঁধিয়া নিরস্ত্রীকরণ নীতির তালিম দিতেছে; তাহাতে কর্ত্তাদের মাথা ঘামাইবারই অবসর হইতেছে না। অথচ, 'যাহাদিগের সঙ্গে একপাতে আহার করিয়াছি' তাহারা জনকয়েক আইন মজলিসে ঢুকিলেই যে অষ্টাদশ পর্ব্ব অশুদ্ধ হইয়া যাইবে সেই ভাবনায় গলার বহর পরিমাপ করিতে কি লাঠির কসরৎ দেখাইতে কেহই কসুর করিতেছেন না।

কেনিয়া ব্যাপারে দেশের সার্ব্বজনীন অসন্তোষ প্রকাশের জন্য কংগ্রেসের আদেশে ভারতব্যাপী হরতাল হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে সর্ব্বসাধারণের মনের অবস্থাও বেশ বুঝা গিয়াছে। কিন্তু সেই ফাঁকা আওয়াজে বড় কাহারও আতে ঘা লাগে নাই। পক্ষান্তরে এই ব্যাপারটি, যাহা বিগত আড়াই বৎসর ধরিয়া কত মাথা ঘামাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ চকিয়া তুলিয়াছেন—সেই অনুষ্ঠানটি সত্য সত্যই বর্জ্জন করিতে পারিলে কর্ত্তাদের বুদ্ধিশক্তি ফিরিয়া আসিতেও পারে।

আমরা ইতিমধ্যেই বাঙ্গালার ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য উপলব্ধি করিয়াছি। তাঁহারা প্রায় রাখিবেন কি কুল রাখিবেন, কেহই সে কথাটা তাঁহাদের বলিয়া দেন নাই। অথচ, একথা বুঝিতে বেশী একটা ভাবিতে হয় না যে—ব্যবসায়ীদের এখন স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন যে এই প্রদর্শনী সম্পর্কে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি—নেতৃবর্গ তাঁহাদিগের কাছে কি প্রত্যাশা করেন। দোকানদার, শিল্পী, কারিকর প্রত্যেকেই ভাবিতেছে, যে যখন নেতৃবর্গ কিছুই বলিতেছেন না তখন সকলেই প্রদর্শনীতে যে প্রদান করিবে; তাহা হইলে 'আমি একা পড়িয়া থাকি কেন?' এই ভাবিয়া যদি সকলে প্রদর্শনীতে যোগদান করে তাহা হইলে কেনিয়া সম্পর্কে কর্ত্তাদের সকল বক্তৃতাই ব্যর্থ বাচালতায় পরিণত হইয়া যাইবে। এমন কি কেহ কেহও যদি এই প্রদর্শনীতে যোগদান করে তাহা হইলেও কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য সফল হইবে। অথচ, যাহারা যোগদান না করিবে কেবল তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যে প্রকার ক্যানভাসিং চলিয়াছে, তাহাতে উপকথার 'উকিলের মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই কাছারি ভাঙ্গিয়া যাওয়ার' মত যদি কর্ত্তাদের আদেশজারি হইবার পূর্ব্বেই সকলে ষ্টলের টাকা জমা দিয়া বসে, তখন আর সহস্র গলাবাজিতেও কোন ফল হইবে না, এ কথাটাই আমরা কর্ত্তাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি।

দেশের সকল দলের নেতৃবৃন্দেরই অবিলম্বে স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাদের নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কে আগে পথ দেখাইবে সেই কথা ভাবিয়া সকলের নীরব থাকিলে চলিবে না। অসহযোগীদিগের আত্মকলহ দেখিয়া আনন্দে বগলবাজাইলেও চলিবে না। আর ফলাফলে সন্দিহান হইয়া বিদ্যের মত "ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ" ইত্যাদি মহাজনবাণী মনে মনে আবৃত্তি করিলেও দেশবাসীর কাছে কর্ত্তাদের দায়িত্ব শেষ হইবে না।

কেনিয়ার ব্যাপার লইয়া কৌশল করিয়া ভারতবাসী হরতাল করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেই সকল কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায় নাই। বরং একথা জোর করিয়াই বলা চলে যে, বন্ধ দুয়ারের পশ্চাতে বসিয়া মনের ক্ষোভে গস্ গস্ করিলে কাহারও অঙ্গে তাত লাগিবার সম্ভাবনা নাই। আগামী প্রদর্শনী বর্জ্জনের কথাটা যখন বেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে, সেই সুযোগে এই ব্যাপারে বর্ত্তমান আন্দোলন আংশিক সাফল্যলাভ করিলেও তোমাদিগের মুরদ প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তখন সহস্র চেষ্টায়ও আর কাহারও মুখ চাপিয়া রাখিতে পারিবে না।

কোনও কোনও ব্যবসায়ী বলিতেছেন—"আমরা ত বিলাতে যাইতেছি না—কিন্তু দেশের মধ্যে এমন একটা সুযোগ ছাড়িয়া দিব কেন?" এ কথার যে কোনও অর্থ নাই—তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এমন করিয়াই আজ প্রবঞ্চিত জাতি এক একটা বিষয় ভুল করিয়া বসে।

বিলাতি প্রদর্শনীর পূর্ব্বানুষ্ঠানে কর্তৃপক্ষের হাতে সাফল্য তুলিয়া দিলে তাহাতেই প্রমাণ হইয়া যাইবে যে দেশের লোকমত নেতৃবর্গের মতের পরিপন্থী এবং সরকার বাহাদুরেরই ইচ্ছার পরিপোষক। কারণ, এই প্রাদেশিক প্রদর্শনীগুলি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রদর্শনীর অঙ্গীভূত অনুষ্ঠান তাহা কর্তৃপক্ষ আগাগোড়াই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন।

কাজেই যাহাতে আমলাতন্ত্রের মনোরথ সম্পূর্ণ বিফল হয়, এবং ভবিষ্যতে কেনিয়া সমস্যার রচয়িতাবর্গকে বলা যাইতে পারে যে "ঘরের মধ্যে পাড়িয়ার অধম করিয়া রাখিয়াছ, তাহাই ভাল। কিন্তু তোমাদের বহিঃস্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য আর আমাদের সঙ্ সাজাইতে চাহিও না।"

ঘরে আমরা ছুঁইলেও তোমাদের জাত যায়, অথচ বাহিরে তোমরা প্রচার করিবে, আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমান হিস্যাদার ছাড়া আর কিছুই নই। এই অপমান, এই পরিহাস আমরা ইচ্ছা করিয়া বরণ করিয়া লইব কেন? দেহের শোণিতপাত করিয়া আমরা দক্ষিণ আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে উপনিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছি—এখন সেখানে সামান্য প্রজার অধিকার হইতেও আমরা বঞ্চিত। কৃষ্ণাঙ্গ বলিয়া আমরা গৌরাঙ্গের মহল্লায় পা দিলেও আইনের ফাঁদে পড়িব। এবং সে কথাটা বিশ্বময় ঘোষণা করিয়া প্রাচীন সভ্যতার সূতিকাগৃহ ভারতবর্ষকে লোকসমাজে হেয় করিতে তোমরা এতটুকু লজ্জা বা কুণ্ঠাও বোধ কর না। এমন জঘন্য অবস্থাটা আরও ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বিশ্বশক্তি-সঙ্ঘে সঙ্ঘের মত আমরা তোমাদের সঙ্গে একাসনে বসিতে পারি না! 'লিভরি' পরিয়া লাট সাহেবের আরদালী যখন 'হাওয়া গাড়ীতে' লাটসাহেবের সঙ্গে সমান আসনে বসিয়া বেড়ায়—তখনও কি তাহার বক্ষজ্বালা ঘুচিয়া যায়?

আমাদিগের কি আছে, যাহা লইয়া আমরা বিশ্বের বাজারে দাঁড়াইতে পারি? বিলাতি রক্ষণ-নীতির জোরে আমাদের সকল শিল্প সম্পদ লোপ পাইয়াছে। আজ অনুন্নত কলার খনি—ভারতের বাজারে আফ্রিকার কলা সম্ভাদরে বিক্রয় হইতেছে। রক্ষণ নীতিসূচক আইন আইন পাশ করিয়া তাহা বন্ধ করা ত দূরের কথা, তোমরা বরং এদেশে রেলের ভাড়া বাড়াইয়া আফ্রিকার মহাজন দিগেরই সহায়তা করিতেছ। টাটার সুবৃহৎ লৌহ কারখানা, রেশম, পশম, গালিচা, চামড়া কোন কিছুকেইত তোমরা রক্ষণনীতির সহায়তায় বিদেশীয়ের প্রতিযোগীতা-মুখে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইতে দিতেছ না? তাহা হইলে ভারতের হীন শিল্পসম্ভার বিলাতের লোককে দেখাইবার জন্য এতটা আগ্রহ কেন তোমাদের? আবার কি রক্ষণনীতির সাহায্যে ভারতের অবশিষ্ট সামান্য ঐশ্বর্য্যটুকুও লোপ করিতে চাহ? তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে ভারতে আগে রক্ষণনীতি অবলম্বন কর; ধন, শস্য, ফল, ফুল পূর্ণ ভারতকে আগে

দ্রষ্টব্য

বাসন্তী শনিবারে বাহির হয় বলিয়া মফস্বলের ডাক সোমবারের আগে পাঠান হয় না। ফলে মফস্বলের গ্রাহকবর্গের বাসন্তী পাইতে বিলম্ব হয়। তাই এখন হইতে বাসন্তী নিয়মিত রূপে প্রতি শুক্রবারে বাহির হইবে।

পরিচালক
বাসন্তী

বিশ্বের শিল্পভাণ্ডার করিয়া গড়িয়া তোল, তাহার পর সেই শিল্পসম্পদ লইয়া গিয়া বিশ্বের দুয়ারে দাঁড়াও। নহিলে বৃথা এই বুভুক্ষু, মারী-প্লাবন-মথিত অর্দ্ধনগ্ন দেশের দৈন্যের কঙ্কাল জগতের সম্মুখে ধরিয়া দিয়া মুমূর্ষু ভারতের আসন্ন মৃত্যুর ব্যথা আর বাড়াইয়া তুলিও না। এতটুকু—শুধু—এতটুকু অনুগ্রহ আমাদের কর। আমাদেরই মর্ম্মান্তিক স্নেহের শোণিত ধারা দিয়া উপার্জ্জিত অন্নমুষ্টির অংশে তোমাদের আমরা আজ্ঞাদাস রাখিয়াছি—বিনিময়ে অনুকম্পা না কর—উপহাস করিও না।

আর দেশবাসী শিল্পী ব্যবসায়ীবৃন্দ! এখনও এই জরাজীর্ণ দেশকে মুষ্টিমেয় তোমরা কয়জনে বাঁচাইয়া রাখিয়াছ। কিন্তু তথাপি বড় দীন, বড় অসহায়, বড়ই অক্ষম তোমরা। বড়র সঙ্গে পাঁটছড়া বাঁধিতে গিয়া অথবা নাকাল হইও না। আপাত মধুর আশার কুহকে নিজের স্বার্থ ভুলিয়া যাইও না। অসহযোগের মন্ত্রগুরু মহাত্মা গান্ধী আজ কারাগারে। তাঁহার মহান শিক্ষা ভুলিয়া যাইও না। সাম্রাজ্যপ্রদর্শনীর কলুষিত স্পর্শে তোমাদিগের সর্ব্বস্ব হারাইয়া আবার একেবারে কাঙ্গাল হইও না। অথবা এই মহাব্যয় সঙ্কুল—সহস্র দরিদ্র নারায়ণের কষ্টার্জ্জিত অর্থের ব্যর্থ বিলাসমকে আত্মহত্যা করিও না! কেনিয়ার দগ্ধ পদদলিত ভারতবাসীর লাঞ্ছনার ব্যথা অযথা বিগুণ করিয়া বাড়াইয়া দিও না। যে এখনও তাঁহাদের মাতৃভূমি ভারতের, তথা তোমাদেরই মুখ চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

প্রেমালাপ

[শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু]

প্রথম তোমায় দেখেছিলুম
পশ্চিমের ঐ জান্‌লা দিয়ে—
সাজাচ্ছিলে বাক্স, কিম্বা
ঝাড়ছ ছিলে আন্‌লা নিয়ে।
দ্বিতীয় দিন ছাতে উঠে,
দেখলুম নীচে কিছু খুঁটে;
তৃতীয় দিন, চেটে পুটে
খাচ্ছিলে ভাত আন্‌লা দিয়ে।
চতুর্থ দিন, চেঁচাচ্ছিলে
কিসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে!

তারপরে সেই দুর্ঘটনা!—
তুমিই আমার গিন্নী হ'লে।
যেমন ছিলে শান্তশিষ্ট
তেমনি জবে গিন্নী হ'লে!
এখন তোমার চোখ-রাঙানি
উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিখানি,
দেখে কেবল ভাবি আমি
কোথায় ছিল আহ্লাদী এ?

রবীন্দ্র-সদনে

[শ্রীমৃণালকান্তি বসু]

১৯শে আগষ্ট রবিবার সকালে রবীন্দ্রনাথের কলকাতার বাড়ীতে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই এবং বর্ত্তমানে দেশের লোকের মনে যে সব প্রশ্ন প্রবল হয়ে উঠেছে সেগুলি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জেনে আসি।

কবি বল্লেন কিছুদিন রোগে ভুগিয়া তাঁর স্বাস্থ্য অনেকটা ভেঙ্গে পড়েছে। আমিও দেখলাম তিনি অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন কিন্তু দেহটা যদিও শুকিয়েছে মনটা কিন্তু এতটুকুও সজীবতা হারায়নি।

কিছুদিন অবধি তাঁর রাজনৈতিক মত সাধারণের নিকট তিনি প্রকাশ করেন নি, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থা তিনি বিশেষ মন দিয়ে বিচার করছেন্ এবং সমস্যার সমাধান কল্পে গভীর চিন্তা নিয়োগ করছেন্। আজকার দিনের কতগুলি গুরুতর সমস্যা সম্বন্ধে তিনি পরম আগ্রহ-ভরে আলোচনা করলেন এবং সেই আলোচনা প্রসঙ্গে যে ভাব তিনি প্রকাশ করলেন, তা তাঁর অন্তরের আবেগে ভরপুর।

সেদিন তাঁর কাছে যা আমি শুনে এসেছি, তা সাধারণে প্রকাশ করবার অনুমতি আমি তাঁর কাছে চাইনি, তবুও নিজের দায়িত্বে আমি তা প্রকাশ করছি, কেননা আমি বিশ্বাস করি যে কবির কথা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। তিনি যে শুধু সূক্ষ্ম বিচারে পারদর্শী তাই-ই নয়—দলাদলির বাইরে নিভৃতে থেকে তিনি দেশের অবস্থা যেমন স্থিরভাবে দেখতে পাচ্ছেন—দলাদলির মধ্যে যাঁরা মত্ত হয়েছেন তারা তা পাচ্ছেন না।

কংগ্রেসের দলাদলি

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির ঘটনাসূত্রে প্রথমেই তিনি কংগ্রেসের দলাদলির কথা সুরু করলেন। তিনি বল্লেন, দলাদলির জন্য বা দলাদলির ফলে যে ক্ষয় উপস্থিত হয়েছে তার জন্য তিনি কিছুমাত্র দুঃখিত নন। দলের উদ্ভব জীবনেরই লক্ষণ। লোকে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক একটিমাত্র প্রোগ্রাম নিয়েই যে সবাইকে কাজ করতে হবে এমন কথায় তাঁর মন সায় দেয় না! তিনি নিজে চির-দিনই মতের ও কাজের স্বাধীনতার বাণী শুনিয়েছেন তার জন্য সংগ্রাম করে এসেছেন আর আজও এ সম্বন্ধে তাঁর মতের পরিবর্ত্তন হয় নি।

দুই বা ততোধিক দলের সত্যিকার কাজ করবার যথেষ্ট বায়গা এদেশে রয়েছে। তিনি যে জিনিষের ঘোর প্রতিবাদ করলেন, তা হচ্ছে মতানৈক্য উপস্থিত হলেই দল বিশেষের উপর উদ্দেশ্য আরোপ। যে মুহূর্ত্তেই কারু সঙ্গে মতের অমিল দেখা যাবে সেই মুহূর্ত্তেই প্রমাণ করতে হবে যে প্রতিপক্ষ লোক অতি খারাপ আর অজানা কোন স্বার্থ সিদ্ধির মতলবেই সে ওই বিশেষ মত পোষণ করছে! এমন মনোভাব, কবি বিশেষ জোর দিয়েই বল্লেন, তিনি নিন্দার্হ বলেই মনে করেন। অপরের মনোভাব বুঝতে না পারা দুর্ব্বল মনেরই লক্ষণ। রাজনৈতিক ব্যাপারে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ অন্য প্রদেশের চেয়ে বাংলারই বেশী করে প্রকাশ পেয়েছে বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন।

কাউন্‌সিল্ প্রবেশ

কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে তাঁর মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন যে,তিনি ব্যক্তির মতের ও কাজের স্বাধীনতার পক্ষপাতী। কাউন্সিলে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কোন দল যদি প্রবল হয়ে থাকে, তা'হলে তাদের কাউন্সিলে যেতে দেওয়াই ঠিক এবং সেখানে গিয়ে তাঁরা যা করতে পারেন তাই করতে দেওয়াই উচিৎ।

তিনি নিজে মনে করেন, কাঁউন্সিলে ঢুকে তা ভেঙে দেবার চেষ্টার চেয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান গড়ে তোলবার চেষ্টা করা ভালো। কেননা নিজেদের এই সব অনুষ্ঠান গড়ে উঠলে দেশের লোকের সাহায্যের অভাবে সরকারী অনুষ্ঠানগুলি আপনা থেকে ধ্বংস হবে। কিন্তু কাউন্সিল ভাঙবার চেষ্টার চেয়েও পল্লীর পুণর্গঠন অনেক বেশী প্রয়োজনীয়।

গড়ার কাজ

রবীন্দ্র নাথ বল্লেন, আমাদের গোড়া থেকেই সবটা গড়ে তুল্‌তে হবে। আমাদের নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খাড়া করতে হবে, আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা আমাদের নিজেদেরই করতে হবে, গাঁয়ে গাঁয়ে আমাদের নিজেদেরই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। দেশে যে সব সরকারী অনুষ্ঠান রয়েছে, তাতে করে দেশের লোকের উপর সরকারী প্রভুত্বই বেশী করে স্থাপিত হচ্ছে, দেশের জনসাধারণের মনের ভাব এমন করেই তৈরী করা হচ্ছে যাতে তারা বলতে পারে আমাদেরই মঙ্গল কামনায় সরকার এত সব কাজ করছেন। সাধারণের অগোচরে কিন্তু সুনিশ্চিত ভাবে লোকের মনের উপর সরকারের এই যে প্রভাব বিস্তারিত হচ্ছে, এ দূর করে আমাদেরই প্রভাব বিস্তার করতে হবে।

কি করে আমরা তা করতে পারি? তা করবার প্রকৃষ্ট উপায়ই হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তাদের কর্মকুশলতা দিয়ে সরকারী অনুষ্ঠানগুলিকে এমন অ-কেজো করে ফেলতে হবে, যাতে করে সরকার সেগুলি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

তিনি মোটেও চাননা যে আমাদের সমস্ত উদ্যম এই করা হোক সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করবারই উদ্দেশ্যে, আর সেই জন্য বরাবরই তিনি নিজেদের অনুষ্ঠান গড়ার আগেই সরকারী শিক্ষালয় বা অপর অনুষ্ঠান বয়কটের বিরোধী।

কবি তারপর বল্লেন যে তিনি নবীন কংগ্রেস কর্মীদের গাঁয়ে গাঁয়ে কংগ্রেসের সভ্য সংগ্রহের কাজ করতে দেখেছেন—সত্যিকার স্থায়ী ভাবের গঠন কার্য্য তাঁরা খুবই কম করেছেন। গত কয়েক বছর যাবত যে কাজ হয়েছে তা একেবারেই ভাসা ভাসা—তাই এই আন্দোলনও একেবারেই ভাসা-ভাসা রকমের হয়ে গেছে।

হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা

কবি তারপর বল্লেন, আজ দেশের সর্ব্বত্রই সব চেয়ে প্রবল ভাবে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান মিলন সমস্যা। তাঁর মনে হয় যে আজো পর্য্যন্ত নেতারা কার্য্যোপযোগী কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে কেবল বিলাস-স্বপ্নই থেকে যাবে। কারু কারু মনে হিন্দু মুসলমানের মিলনের এমন একটা অস্পষ্ট ভাব রয়েছে, যাতেকরে তাঁরা বলতে পারেন যে, বিদেশী প্রভুত্ব লোপ পেলেই মিলন সম্ভবপর হবে। কবির তেমন বিশ্বাস নেই। তিনি বল্লেন, ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্প্রদায় ডেমোক্র্যাটিক মুসলমান কেন ধর্ম সম্পর্কীয় আভিজাত্য গর্ব্বিত শতধা-বিচ্ছিন্ন হিন্দুর সঙ্গে এক আসন গ্রহণ করবে? মুসলমান শক্তিমান এবং নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। তারা জানে হিন্দু দুর্ব্বল।

মানব স্বভাব আজ যেমন রয়েছে, তাতে করে কবি বিশ্বাস করেন না যে, অবস্থার দাবী, নয় মনের উদারতা দিয়েই মুসলমান আজ হিন্দুর সঙ্গে তার সম্বন্ধ নির্ণয় করে নেবে!

কবি বল্লেন যে মোপ্লা বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই তিনি মালাবার অঞ্চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি যেখে এসেছেন চল্লিশ লাখ হিন্দু এক লাখ মুসলমানের ভয়ে মারাত্মক রকমে অভিভূত। হিন্দু আজ এত দুর্ব্বল,

এমনি অসহায়ভাবে মুসলমানের দয়ার উপর সে বেঁচে আছে!

"আমি বিশ্বাস করতে পারিনা" কবি বলেন যে "শতাব্দীর ইংরেজের জবর শাসনের অধীনে থেকে যা সম্ভবপর হয়েছে, ইংরেজের শাসন অপসৃত হবার সঙ্গেই তা আর সম্ভবপর হবে না।"

হিন্দু মুসলমানের মিলন অসম্ভব-প্রায় করে তুলেছে আর একটি যে প্রধান ব্যাপার, তা হচ্ছে এই যে, মুসলমানের ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ দেশাত্মবোধ নেই। মোসলেম জগৎ গঠিত হয়েছিল ধর্মের সৌভ্রাত্র অবলম্বনে আর এই ধর্মের বন্ধনই দুনিয়ার এক প্রান্তের মুসলমানের সঙ্গে অপর প্রান্তের মুসলমানের মিলন সুদৃঢ় করে তুলেছে।

"আমি অনেক মুসলমান নেতাকে স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করেছি," কবি বলেন "যে, আফগান বা অপর কোন মুসলমান শক্তি যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তা'হলে হিন্দুদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সে আক্রমণ প্রতিহত করতে তারা প্রস্তুত কি না। জবাব তাঁরা যা দিয়েছেন তাতে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। আমি বলছি, মহম্মদ আলির মত লোকেও বলেছেন যে কোন অবস্থায়ই কোন মুসলমান, যে দেশেই তার জন্ম হোক না কেন, অন্য কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে কখনো দাঁড়াবে না।"

আদোরায় আজ বিরাটাকার মোসলেম-শক্তি প্রবল হয়ে উঠেছে। নিখিল-মোসলেম ভাবকে এই অভ্যুদয় অনেকটা শক্তি জুগিয়েছে। এর জন্য আমরা হিন্দুরা ততক্ষণই আনন্দ প্রকাশ করিতে পারি যতক্ষণ দুই সম্প্রদায়ের সাহচর্যে আমাদের বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধান হয়।

সমস্যার-সমাধান

এ সমস্যার সমাধান হবে না কেবলমাত্র হিন্দুর খিলাফৎ আন্দোলনের সমর্থনে। অ-মিলের প্রধান একটা পরম্পরা বর্তমান। বাইরের প্রলেপে কিছুই হবে না; আর এতদিন পর্য্যন্ত কেবল আমরা তাই-ই করে আসছি।

"এই সমস্যা" কবি বলেন "মানব মনকে এমন করেই গুলিয়ে দেয় যে সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে হতাশ হয়ে হাত পা ছেড়ে দেবার ভাবই প্রবল হয়ে ওঠে।"

কবি তারপর একটু হেসে বলেন—"আমার অনেক সময় মনে হয় এ সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র তা হলেই সম্ভবপর হয়, যদি সব হিন্দু মুসলমান হয়ে যায় অথবা সব মুসলমান হিন্দু হয়ে ওঠে।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে তিনি বলেন—"একমাত্র অর্থনৈতিক ব্যাপার আশ্রয় করে একটা সত্যিকার স্থায়ী মিলন সম্ভবপর করে তোলা যায় অন্য কোন ভাবে যা যায় না। এইখানে আমাদের স্বার্থ এক, আমরা একে অন্যের সাহায্য পাই।

সুখা মুসলমানকেও কাতর করে, প্রতিবেশী হিন্দুকেও রেহাই দেয় না। সুবিধারণ দু'সম্প্রদায়ই সমানে উপভোগ করে। এই সুবিধাবৃত্তির জন্যই আমরা এক সঙ্গে কাজ করতে পারি। হিন্দু আর মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় পল্লীতে পল্লীতে যে অর্থনৈতিক অনুষ্ঠানগুলি গড়ে উঠে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই কল্যাণ সাধন করবে, সেগুলিই ক্রমশঃ দুই সম্প্রদায়ের ভিতরকার ব্যবধান কমিয়ে দেবে এবং মিলনের বেদী গড়ে তুলবে। আর কোন মতে সম্ভবপর হবে না।

পল্লী সংগঠন ব্যাপারে এই ভাবে পরস্পরের প্রতি সাহানুভূতি জাগিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হবে।

হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় রবীন্দ্র নাথ বলেন কেবল মাত্র রাজনীতিক আন্দোলনের চেয়ে এ আন্দোলন তিনি অধিক প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। হিন্দু যদি বাঁচতে চায়, যদি মানব সমাজে অবমানিত অবস্থায় চিরদিন পড়ে থাকতে না চায়, তা হলে তাকে সঙ্ঘবদ্ধ হতেই হবে।

"কিন্তু হিন্দুদের এই সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা কি মুসলমানরা সন্দেহের চোখে দেখবে না আর তার ফলে হিন্দু মুসলমানের অমিলের আর একটা কারণ কি বৃদ্ধি পাবে না?"—এ প্রশ্নের জবাবে কবি বলেন—"হ্যাঁ, তা হবে বৈ কি? কিন্তু সে বিপদের আশঙ্কা আমাদের মেনে নিতেই হবে। মুসলমানের যে স্বাধীনতায় আমরা বাধা

দেবনি সে স্বাধীনতা আমাদেরও প্রাপ্য। তারা নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে, তারা ইচ্ছামত হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করতে পারে আর তারা তা করেছে এবং এখনো করছে—আমরা তো কখনো বাধা দিতে যাইনি। আমরা যখন দিয়েছি, তখন তারাই বা সে স্বাধীনতা কেন আমাদেও দেবে না? আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে চাইলে তারা কেন তাতে বাধা দেবে?"

কবি তারপর মালবানা রাজপুতদের শুদ্ধিব্যাপার সম্বন্ধে বলেন—তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না, মুসলমান যে স্বাধীনতার দাবী নিজে করছে, ঠিক সেই স্বাধীনতা অপরকে দিতে নারাজ কেন?

"কিন্তু"—কবি তারপর বলেন—"হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করা বড় কঠিন—যে সব বাধাবিপত্তি আছে তা অতিক্রম করা বড়ই শক্ত। সামাজিক ভেদ-নীতি হিন্দুকে মৃত্যুর মুখেই ঠেলে দিচ্ছে।"

কবি তারপর বলেন "আমি আমার জমিদারীতে দেখেছি হিন্দু প্রজা কোনরূপ সংস্কারই বরদাস্ত করে নিতে পারে না কিন্তু আমার মুসলমান প্রজারা সহজেই সকল সংস্কার আয়ত্ত করে নিতে পারে। ফলে মুসলমান সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, আর হিন্দুর অস্তিত্বই লোপ পাচ্ছে।"

কবি তারপর হিন্দুদের সামাজিক কতকগুলি ব্যবস্থার দোষ দেখিয়ে বলেন যে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি না হবার আরো কারণ হচ্ছে ওই সব সামাজিক ব্যবস্থা।

প্রায় দুই ঘণ্টা আলাপ করবার পর আমি কবির নিকট বিদায় গ্রহণ করি। বিদায় দেবার সময় কবি আমায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করতে বলেন আর বলেন যে দেশের নেতাদের সবখানি মন দিয়ে আজ এই সমস্যা সমাধানের উপায় স্থির করাই দরকার।

—বিজলী

কাঁদিও না—আর কাঁদিও না

[শ্রীপ্রভাস দত্ত বি-এ]

ত্যাগ করেছি হাসিখুসী অনেকদিন গো অনেকদিন,
বুকের মাঝে জ্বলছে আগুন; জ্বলছে যে গো নিশিদিন,
(আমি) কেঁদে কেঁদে হলেম সারা, কান্না যে মোর সাধনা,
কাঁদছি আমি, তার উপরে ওগো আমায় কাঁদিও না।

গর্ব্ব করার নাইত কিছুই, নাই যে গো ধন মান,
অহঙ্কারের চূড়ার পরে নয়ত আমার স্থান,
ধূলার পরে লুটিয়ে আছি, তাতেই আমার সান্ত্বনা।
উঁচু হবার লোভ দেখিয়ে, আমায় ওগো কাঁদিও না।

বিস্মরণে প্রীতির দাবী করছো না আর করবো না,
সবাই মোরে থাকুক ভাল, বলবো না আর বলবো না,
থাকবো আমি নিয়েই আপন ধরম, করম, সাধনা,
ভালবাসার আশায় রেখে, আমায় কেবল কাঁদিও না।

(আমি) দুখের মাঝে আছি ভাল, নাইক দুখের কামনা,
আমি আপন ধনে ধনী যে গো, আরতো কিছুই পাবনা।
কাঙ্গাল মনের মর্ম্ম ভেদি' উঠে করুণ প্রার্থনা—
(যেন) আশা দিয়ে নিরাশ করে, আমায় আমায় কাঁদিও না

মায়ের আদেশ

[শ্রীসুধা দেবী]

সমস্ত ডাক্তার একে একে দেখে গিয়েছে কিন্তু কিছুই ফল হ'ল না। সবাই জবাব দিয়ে আমাকে মৃত্যুর পরওয়ানা দিয়ে গেছে। মরণ আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে আছে নববধূর মত—শুধু বাকি আছে তার সকলহারা সুধাময় অধর আমারই এই প্রতারক ঘৃণিত অধরে রেখে তার আলিঙ্গন। ব্যস! তাহলেই আমার সব শেষ। আর দীর্ঘ বছর পলে পলে পুড়ে মরার শেষ হবে সেই দিন যে দিন মরণই আমার বরেণ্য হবে। আমার অনেক দিনের পথ চেয়ে বসে থাকা প্রিয়ার সাথে মিলন হবে সেই দিন, যেদিন শুভক্ষণে আমার জীবন-স্পন্দন শেষ হবে। কিন্তু কবে তা কি কেউ জানে? কেউ না গো কেউ না। শান্তি কি অমনি সহজে মেলে। মরণে আমার শান্তি। নারীর চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েছি এই শ্যামল ধরণী শ্রাবণের ধারার মত করিয়ে। তার বুকভরা আশা, বুক-ভরা ভালবাসা আমি যে সবই করে দিয়েছি ব্যর্থ। তখন ত বুঝিনি যে আমারই জন্যে একজনের জীবন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে!

নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে তাই আজ আমার এই মরণা পন্ন দেহটাকে নিয়ে এলুম ফিরে পুরীতে—এইটেই যে আমার মহাতীর্থ। ভাবলুম আর নয়। কেন মিছামিছি আর দেরী করে পলে পলে পুড়ে মরি। যদি মরণই হয় তবে এইখানেই ভাল। আজ ছিল বাসন্তী পূর্ণিমার কি তিথি একটা। আকাশে চাঁদের আলোয় আর নীচে প্রান্ত ক্লান্ত সাগরের কল-গীতিতে ভরে উঠেছিল প্রকৃতি আজ আজ। আর মাঝে মাঝে দূরে দূরে অনেক দূর তমাল বন থেকে কোকিলের মধুর সুর ধীর বাতাসে ক্ষীণ হয়ে ভেসে আসছিল। এই সমস্ত রাতকে তুলেছিল বড় মধুর বড় করুণ করে।...ছাদে কৌচের উপর আমার মরণ পন্ন দেহখানি সেইখানে রেখে পড়েছিলুম চুপটী করে, আর পাশে বসে আমার দশ বছরের হিন্দুস্থানী চাকর মহুয়া আমার চুলের মধ্যে তার কচি কচি আঙুল দিচ্ছিল বুলিয়ে, আর তারই সঙ্গে জ্যোৎস্না ধোয়া তারার ভরা আকাশের পানে চেয়ে এক দুই করে তারা গুণছিল। আবার মধ্যে মধ্যে গোণাতারা হারিয়ে ফেলে গোড়া থেকেই সুরু করছিল গুণতে। এতে কিন্তু তার বিরক্তি ছিল না বরং গোণার আগ্রহ যাচ্ছিল বেড়ে! শিশুর না পেলেই পাবার আগ্রহ যায় বেড়ে বড্ড বেশী। মহুয়া ছিল আমার শিশুর মত সরল আর নারীর মত কোমল।

এখানে আসবার কিছুদিন আগে দেশে থেকে মহুয়ার বাপ চিঠি দিয়েছিল আমাকে যেন তার মহুয়াকে আমি ছুটী দিই। তার বিয়ের সব ঠিক হয়েছে। আজ সকালে তার দেশ থেকে লোক এল নিতে। যাবার সময় সে কেঁদে বলে বাবু তোমাকে ছেড়ে আমি যেতে পারব না। আর সাদীও এখন আমি করবো না। তুমি সেরে উঠো তবে যাবো। তাকে কত বোঝালুম কিন্তু কিছুই হলো না, সে শুধু বলে, বাবু তোমাকে কে দেখবে বলত যদি আমি চলে যাই। আমি বললুম কেন তুই ছাড়া কি আমার দেখবার আর কেউ নেই? এই এত চাকর রয়েছে। আমার কথা শুনে মহুয়ার মুখখান ম্লান হয়ে গেল। তারপর সে আর কোন কথা না বলেই উঠে গেল। তার যাবার ভাবই যেন আমাদের জানিয়ে গেল সে কিছুতেই যাবে না। তাই মহুয়ার যাওয়া হয়নি।

হায়রে দরিদ্র শিশু! তোর ঐ কচি বুকে কে এত স্নেহ ভরে দিয়েছিল। ওরে অবোধ তুই কি ভেবেছিস তোর ঐ স্নেহের বাহুর ডোরে আমায় বেঁধে রাখতে পারবি আর বেশী দিন। তা হবে নারে তা হবে না। মরণ যে দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে সে কি তোর ঐ বাহুর বাঁধাকে ভয় করবে? সব ছিঁড়ে দেবে যে মহুয়া সব ছিঁড়ে যাবে।

মহুয়া হঠাৎ থেমে গিয়ে বল্লে বাবু আকাশে কত তারা আছে। আমি বল্লুম ওরে অনেক মহুয়া ; গোণা ত যায় না। আচ্ছা বাবু মানুষ মরে গিয়ে নাকি সব তারা হয়? বলেই বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে রইলো। তাত আমি না কে তোকে বল্লে। মহুয়া একটু হেসে বল্লে তুমি জান না বাবু লক্ষী আমাকে বলেছিল যে মানুষ মরে সব তারা হয়ে থাকে। তার কথা চাপা দিয়ে আমি বল্লুম আচ্ছা মহুয়া তুই তোর বউকে দেখেছিস্। সে হেঁসে বল্লে হ্যাঁ বাবু তারই নাম ত লক্ষী। আচ্ছা মহুয়া তোর সঙ্গে যদি না তার বিয়ে হয়? এই যে তুই গেলি না। যদি আর কারও সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায় তা হলে কি হবে। আমার কথা শুনে সে চম্‌কে উঠলো। তারপর বল্লে না বাবু তা হবে না সে আমায় খুব ভালবাসে। আগে সে আমায় কত খাবার দিত আমি তাকে দিতুম। তারপর সে একটু হেসে যেন জোর করে বল্লে আর জান বাবু সে যায় সেই যে সেগে যখন আসি না তখন আমার জন্যে খুব কেঁদেছিল। কিছুতেই আসতে দেবে না। শুধু তোমার জন্যেই...বলেই সে আকাশের পানে চেয়ে রইল তার নিমেষ হারা দৃষ্টি দিয়ে। কিছু বাদে মহুয়া হঠাৎ বল্লে বাবু আমার যদি কোথায় তাকে আনবেন তাকে ত আমি দেখিনি কখন আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করে থাকে।

মহুয়া আজ হঠাৎ আমার অনেক দিনের কত আঘাত কত বিক্ষত করে দিল! সমস্ত বুক আমার হয়ে উঠলো রক্তে রাঙ্গা। তাকে বল্লুম সে ত নেই মহুয়া এখানে। কোথায় বাবু বলে মহুয়া চেয়ে রইল আমার দিকে। আমি বল্লুম মহুয়া সে ঘরে গেছে রে ঘরে গেছে। মহুয়ার চোখে বয়ে জল ঝরে পড়লো আমারই মুখে।

আজ যমুনার কথায় অনেক দিনের একটা হারাণ স্মৃতি আমার বুকের মধ্যে জেগে উঠলো। রেণু ছিল আমার খেলার সাথী। তাদের বাড়ী ছিল ঠিক আমাদেরই পাশে। অনেক দিন ছেলে বেলা থেকে আমরা দুজনে বেড়ে উঠলুম এক সাথে—ঠিক টবের পোতা গাছের মত। দু' জনকে রোজই দেখা চাই সকাল সন্ধ্যে তা না হলে চলতো না। রোজ সাঁঝের সময় আমরা এসে জুটতুম আমাদের বকুল তলায় দুজনের হাজা প্রাণের হাজা কথা কত যে বলে যেতুম তার ঠিক থাকতো না। বকুলের গন্ধও বোধ হয় মিশে যেতো। এমনি ভাবে কতদিন গেছে তার ঠিক নেই। তারপর একদিন বর্ষার জলে ধোয়া দুই ফুলের মত রেণু আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো। তখন সবে মাত্র পড়েছে আমার চোখে রঙীণ আলো। এমনি অবস্থায় দিন যাচ্ছিল আমাদের দুজনের ঠিক আগেরই মত—যেন পাহাড় থেকে বয়ে যাচ্ছে একটা বন্ধকবিহীনা নদী।

সেবার ঠিক এমনি সময়ে আমরা পুরীতে এসেছিলুম। সঙ্গে রেণুরাও ছিল। সে দিনটা ছিল ঠিক এমনি ধারা চাঁদের আলোয় ভরা আকাশ। মা আর খুড়িমা দুজনেই গিয়েছিল ঠাকুর দর্শন করতে। সন্ধ্যে বেলা ছাদে রেণু আর আমি গল্প করছিলুম। পাশে রজনী গন্ধ ঢলে ঢলে ফুটে ছিল। গন্ধ সন্ধ্যেপ্রকৃতি উঠছিল ভরে। হঠাৎ রেণু একটা ফুল তুলে নিয়ে বল্লে আচ্ছা মুক্তিদা' চাঁদ আর ফুল এর ভিতরে কাকে তোমার ভাল লাগে বলত? আমার কিন্তু ফুলটাই বেশী ভাল লাগে। বলে সে ফুলটা আমার কাছে এগিয়ে দিল। আমি হেসে বল্লুম আমারও ঐ ভাবে তার চাইতে আর এক জনকে আরও বেশী বলেই রেণুর মুখের পানে চেয়ে রইলুম। রেণু বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে বল্লে কি মুক্তিদা? আমি বল্লুম না তা আমি বলতে পারি না। তুমি সুকল্পকে বলে দাও আর কি? রেণু আমার হাতটা ধরে বল্লে সত্যি বলছি মুক্তিদা কাউকে বলবো না এই তোমার গা ছুয়ে বলছি। তারপর আমি ধীরে ধীরে কাঁপা হাতে তার মুখখানি চাঁদের আলোয় তুলে তার সেই সুন্দর সুন্নী মুখখানিকে রাঙ্গা করে দিয়ে বললুম এই তোমায়। নিজেকে আমার কাছে থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে গেল কিন্তু তার চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। সে নীরবে আমারই বুকে মাথা রেখে পড়ে রইলো। তারপর হঠাৎ বলে উঠল যাও তুমি ভারি দুষ্টু, আমি আঠাইবাকে বলে দেব বলেই সে চলে গেল।

এরপর হঠাৎ একদিন শুনলুম রেণুর সঙ্গে আমার বিয়ে। এমনি করে দুজনের মান অভিমানের মধ্যে দিয়ে কত সুখেই না দিন যাচ্ছিল কেটে। তারপর হঠাৎ একদিন

একখণ্ড কালবৈশাখীর কাল মেঘ আমাদের এই মিলন রাতে চাঁদকে দিল ঢেকে। সামান্য একটা পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে তাদের সঙ্গে মায়ের ঝগড়া হয়ে গেল। আমি তখন ভাবিনি এই সামান্য বিবাদ আমাদের দুজনের মেলবার পথে বাধা দিয়ে দাঁড়াবে। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে তাতে আমারই কি আর রেণুরই বা কি? দুদিনের বিবাদ দুদিনেই মিটে যাবে। তাই আমি নিত্যিকার মত সে দিনও তার কাছে গিয়েছিলুম। সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকার বকুল গাছের পাতায় পাতায় নেমে পড়েছে। রেণুর হাতটা আমার নিজের হাতে নিয়ে গল্প করছিলুম তারপর এমন সময় মা এসে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লে মুক্তি তুমি বড় হয়েছ আর রেণুও বড় হয়েছে। এখন আর অমন করে বেড়িও না দুজনে। লোকে দেখলে কি ভাববে বলত? তাঁর মুখে আমি প্রথম এই কথা শুনলুম। আমি চুপ করে থাকতে তিনি বল্লেন আর দেখ রেণুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না। মায়ের কথা শুনে আমার বুক কেঁপে উঠলো। সারা দেহ ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো। ধীরে ধীরে চলে এলুম।

প্রথমে ভেবেছিলুম এ বিবাদ মিটে যাবে দুদিনেই, কিন্তু ফলে তা হলো না। মায়ের স্বভাব ছিল বড় রোখা। শেষে রেণুর সাথে আমার দেখা হওয়া ভার হয়ে উঠলো। এক একদিন রেণু আসতো আমাদের বাগানে দেখা করতে কিন্তু আমাদের সময় হ'ত না। মায়ের তীব্র দৃষ্টি থেকে নিস্তার পাবার জো ছিল না।

এমনি করে কিছু দিন যাবার পর আমার কলেজ গেল খুলে। আসার আগের দিন রাতে একলাটী বসে আছি। বাগানে ঘাটের ধারে অতীতের স্মৃতি বুকে জড়িয়ে। এমন সময় রেণু এসে আমার চোখ দুটো পিছন থেকে টিপে ধরলো, তারপর ধীরে ধীরে আমার পাশে বসলো। আজ অনেক দিন বাদে রেণুকে একলাটী এমনি ভাবে পেয়েছি কিন্তু পেয়েও আমার প্রাণে পুলক জাগলো না। শুধু মায়ের কথা মনে হতেই প্রাণটা শিউরে উঠলো। একটীও কথা আমার মুখে এলো না। রেণু হঠাৎ কেঁদে নিজের হাতে মুখ ঢেকে বল্লে মুক্তিদা সত্যিই কি তুমি আমায় চাও না। আমার এমন সর্ব্বনাশ কেন করলে বলত? ফিরে যাবার ত আমার আর উপায় নেই। আমি শুধু তার হাতটী নিজের হাতে নিয়ে বল্লুম কি করবো বল রেণু, "মায়ের আদেশ।" রেণু কোন কথা না বলেই আমার পায়ের তলায় তার মাথাটী একবার নীচু করে আস্তে "আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

তারপর অনেকদিন বাড়ী যায়নি। রেণুকে ভুলে যেতে আমার এখানে থাকা কিছু ভোলা হ'ল না। হঠাৎ মায়ের চিঠি পেলুম। বাবার অসুখ শীঘ্রি বাড়ী যেতে। বাড়ী এসে শুনলুম বাবার অসুখ মিথ্যে আমার বিয়ের আয়োজন হয়েছে।

ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে মিলনবাঁশীর সুরে বাতাস ভরে উঠেছে। নিদ্রাজড়িত চোখে তখনও শুয়েছিলুম। এমন সময় কে যেন চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি দেখি রেণুর বাবা রেণুর প্রাণহীন দেহ জল থেকে তুলে পাড়ে এনে রেখেছে। তার হাতে একটা হলুদে রংএর জোর বাঁধা রয়েছে। আমি আর কোন কথা না বলে মাতালের মত টলতে টলতে নিজের ঘরে এসে বসে পড়লুম! কাণে এসে বাজলো মা যেন কাকে বলছে বাবা কি মস্তি পেয়ে। আমি ভেবেছিলুম বুঝি বা মুক্তির আমার বিয়ের সময় কিছু বা করে বসে। গিয়েছে ভালই হয়েছে। সেই দিনই আমি বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছি। আর ফিরিনি। কতদিন গিয়েছে কেটে শুধু রেণুর কথা ভাবতে ভাবতে। এ জনমে ত আর তার আশা মিটাতে পারিনি।

মরণ আজ আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ তাই ভাবি এমনি রাতে রেণুকে একদিন এইখানে বুকে নিয়েছিলুম জানিনা কবে আবার তার কাছে যাবো। আবার তাকে তেমনি করে বুকে রাখব।

সংযমের প্রয়োজন

[শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু]

অবস্থার অতিরিক্ত সন্তান আজ বাঙলার অধিকাংশ ঘরে জন্ম গ্রহণ করছে। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ আবার থাকছেও না, অকালে মারা পড়ছে; মাঝে থেকে কয়দিনের জন্যে এসে বাপ মার দুঃখ দুর্দশার বোঝা আরো অসহ্য ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। এই জন্যে দেশে একটু সংযমের প্রয়োজন হয়েছে! কিন্তু যাদের ধারণা, এ রকম সংযমে বাঙলার লোকসংখ্যা হ্রাস পাবে এবং বাঙালী জাতটা লোপ পাবার যোগাড় হবে, তাঁদের কোন কথা না বলে, একজন বিশেষজ্ঞের বক্তব্য শোনাতে চাই।

ইনি হচ্ছেন হ্যাভলক্ এলিস্, এঁর বই অনেকেই পড়ে থাকবেন। ইনি কি বলছেন, দেখা যাক :—

মহাযুদ্ধের ক'বছর আগে থেকেই দুনিয়ার সমস্ত দেশে একটা গোলমাল উঠেছে—'সংযম মানে জাতির আত্মহত্যা!' আমেরিকার থিয়োডোর রুজ্‌ভেল্টের বক্তৃতায় যেমন চাকল্য ছড়িয়ে পড়েছিল, ইয়োরোপে ততটা না হলেও, সংযমের বিপক্ষে আপত্তি কিছু কম হয়নি! তারপর, যুদ্ধ বাধবার পর চীৎকারের মাত্রা যদিও আরো বেড়ে উঠেছিল, কিন্তু তার মূল্য বেশী ছিলনা। কারণ, যাদেরই কিঞ্চিৎ দায়িত্বজ্ঞান ছিল, তারাই ইতিমধ্যে বুঝেছিল যে, যে সময়ে দেশে ধাবারের সংস্থান সুবিধাজনক নয়, সে সময়ে লোকসংখ্যা বাড়ানোর সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়াই বাতুলতার লক্ষণ।

এখন এসব কথা অনায়াসে যদিও আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি, তবু করবনা। জাতি লোপ পাবার সম্বন্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, তাতে যুক্তির কোন ছিদ্র নেই বটে। লোকে কেবল নিজে নিজে আন্দাজ ক'রে নিয়েছে যে, কোন জাতের লোকেরা সংযম অবলম্বন করলে, সেই জাতের মানুষ যেমনি গণতিতে কমে যাবে, সেই অনুপাতে সৈন্যসংখ্যা হ্রাস পেয়ে আর পাঁচটা জাতের চেয়েও ক্রমে সেটা দুর্বল হ'য়ে পড়বে। তারপর পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যেতেও তার বেশী দেরী হবে না। বাস্তবিক নিজের খেয়ালে কোন জাত যদি বিশেষ একটা যাঁরা সময়ের মধ্যে ধ্বংস হবার আয়োজন করে, তাহ'লে সেটা ভাবনার বৃথা বই কি! 'জাতের আত্মহত্যা' বলতে এই ত বোঝায়। এখন এই বিষয়টা নিয়ে ভাল ক'রে আলোচনা করা হোক্!

যাঁরা এই অভিযোগটা তুলেছেন, তাঁরা হয়ত এর মানেটা কি দাঁড়াতে পারে, তাও ভেবে দেখেননি। এর একমাত্র অর্থ এই হয় যে, 'সন্তানের জন্ম দেশে আরো হ'ক্ এই আমরা চাই।' ওঁরা ত চান, কিন্তু ঐ চাওয়ার মধ্যে কি আছে? আছে—প্রসূতির যন্ত্রণা আর অস্বাস্থ্য, সংসারে অভাব ও বিশৃঙ্খলা, ছেলেদের জীবনে অযত্ন; আর আছে, অতিরিক্ত লোকসংখ্যা বাড়ার দরুণ যুদ্ধ বিগ্রহের স্থায়ী আশঙ্কা। এ ছাড়া, আরো জন্ম মানে হচ্ছে আরো মৃত্যু! এর প্রমাণ দেখানোর দরকার নেই। সকলেই দেখতে পাচ্ছে, একদিকে জন্ম যেমন খুব বেড়ে চলেছে, আর একদিকে মৃত্যুহারও সেই অনুপাতে চ'ড়ে উঠেছে। এ ব্যাপারটাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

জিনিসটাকে ভালো ক'রে বুঝতে হ'লে শুধু বাজে লোকের কথায় কাণ দিলে ত' চলবেনা। আর কেবল জন্ম সংখ্যা কিম্বা মৃত্যু সংখ্যা দেখেও জাতটা কমছে কি বাড়ছে, তাও বোঝা যাবে না। লাভ, লোকসান দুই বিচার করতে হবে, তারপর দুটোকে পাশাপাশি রাখলে তবে না বুঝতে পারব ফলটা কি দাঁড়াচ্ছে! মোটামুটি হিসাবে একটা ধারণা করতে হ'লে জন্মসংখ্যা থেকে মৃত্যু সংখ্যা বাদ দিতে হবে, তারপর যেটা দাঁড়াবে, তার নাম দেওয়া যাবে, জীবিত সংখ্যা। জীবিত সংখ্যা জন্ম সংখ্যা কম বেশী হলে কিছু এসে যায় না। কম বেশী হ'লেই বোঝা যাবে, জাতটা কমলো কি বাড়ল। এ রকম গণনায় দেখা যায়, যে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতের লোকসংখ্যাই বেড়ে চলেছে। এমন কি, যে ফরাসী জাতির লোপ পাবার

সম্বন্ধে বেশী গোলমাল উঠেছে, তারাও এ হিসাবে প্রতি বছরেই বেড়েছে বই কমেনি!

পুরোণ জগতের অবস্থা ত' এই; এখন নতুন জগৎ, অর্থাৎ ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যাণ্ডএর অবস্থাটা দেখা যাক্।

ক্যানাডার ২৫০ অটোয়ার সবচেয়ে বেশী লোক জন্মায়, আবার শিশু মৃত্যুর সংখ্যা সেখানে অন্য সহরের চেয়ে তিন-গুণ বেশী। ক্যানাডার সংক্রম সম্বন্ধে লোকের ধারণা ঠিক নেই। এ সম্বন্ধে ভালো রকম শিক্ষা দিলে কেমন সুফল হয়, ইল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা সেটা বেশ বুঝতে পারি। সেখানকার গভর্ণমেণ্ট ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক লোককে এসব বিষয় পরিষ্কার করে জানিয়ে দেয়। তার ফলে, চল্লিশ বছর ধরে জন্মসংখ্যা সেখানে বরাবর কমে আসছে' এবং মৃত্যু সংখ্যাও আশ্চর্য্য কমে গেছে। আবার, জীবিত-সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার দরুণ দেশের লোকসংখ্যা যেমন বেড়ে চলেছে, সাধারণের স্বাস্থ্য ও দেহের গঠনের উন্নতি ও তেমনি যথেষ্ট হয়েছে।

কিন্তু এ বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যাণ্ড এর মতন ভালো অবস্থা পৃথিবীর আর কোন দেশের নেই!

এই দুটো দেশে, অনাবশ্যক জন্ম সংখ্যা কমে আসার সঙ্গে অসম্ভব রকম সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতি হয়েছে। আগে অষ্ট্রেলিয়ার যেখানে শতকরা ৪ জন লোকের ছেলে হ'ত, এখন সেখানে সংখ্যাটা ২৬ এ এসে দাঁড়িয়েছে। নিউজিল্যাণ্ডেও তাই। কিন্তু বেশী লোক যখন জন্মাত, তখন জন্ম সংখ্যার সঙ্গে জীবিত-সংখ্যার যত তফাৎ ছিল, এখন তেমন নেই; অর্থাৎ এখন আগের চেয়ে লোক বেশী বাঁচছে। এখন মৃত্যুসংখ্যা নিউজিল্যাণ্ডে শতকরা ৯, আর অষ্ট্রেলিয়ায় শতকরা—১০; এত কম মৃত্যুহার দুনিয়ার আর কোথাও নেই। যে দেশে অতি প্রসবের প্রতিষেধক পথে ঘাটে বিক্রী হয়, সে দেশেই কি না লোকসংখ্যা ভীষণ ভাবে বেড়ে চলেছে! সুতরাং সংযমে 'জাতির আত্মহত্যা' হওয়া কতটা সম্ভব সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ রইল না।

সত্য ও মিথ্যা

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

সত্য যখন ভীষণ আঘাত পায়
তখন তারে খুঁজে পাওয়া দায়
কোন খানেতে অন্ধকারে লুকিয়ে সে যে থাকে।
যতক্ষণ সে সজাগ থাকে,　　নিজের প্রভাই চক্ষে আসে,
দশটা দিশি কলসে তোলে আলো,
থাকে না কেউ কোথাও জেগে ভালো।
এক নিমেষে কালোর নাশে হায়,
দূর করে দেয় হতাশ নিরাশায়।
মিথ্যা সেথা পায় না যেতে,　　লুকিয়ে থাকে কোন ভীতে,
সত্য আলো তীব্র লাগে—তাই,
বলে ডেকে—"আলোক নাই চাই।"

সত্য যখন ব্যথায় ভেঙ্গে পড়ে,
সবাই এসে ব'লে তারে যায়ে,
মিথ্যা তখন দেয় গো উঁকি থেকে অন্ধকারে।
ধীরে ধীরে বাহির সে হয়　　মনে তাহার সন্দেহ না রয়,
ভাবে মনে এই তো সময় তার,
রাজ্য পেতে আসে ছুটে সহিত অন্ধকার।
হায় সে ক'দিন? মিথ্যে কি রে টেঁকে,
সত্য তারে দেখেই উঠে রুখে,
হৃত শক্তি আসে ফিরে,　　মিথ্যার জাল যায় যে ছিঁড়ে,
অন্ধকার সে পলায় কোথা ছুটে,
সত্য আলো প্রকাশ হ'য়ে উঠে।

সঞ্চয়

[শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়]

এক কাঁটার ঘড়ি—

ঘড়ির এতদিন দুটি কাঁটা ছিল, একটি ছোট আর একটি বড়। এখন এমন এক রকমের ঘড়ি বাজারে উঠেছে—তার একটি মাত্র কাঁটা আছে। এই একটি কাঁটা দিয়েই ঠিক সময় বলে দেওয়া যাবে। বারটা, একটা, দুইটা, প্রভৃতি যে সমস্ত ঘণ্টার চিহ্ন আছে তার যে কোনও দুটি অঙ্কের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে এগারটি সমান অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। এই ঘর গুলিতে ছয় থেকে ৫৫ অবধি সংখ্যা পাঁচএর ক্রমিক অঙ্কে লেখা আছে। এই অঙ্ক থেকেই মিনিট ধরতে পারা যাবে। এ রকম ঘড়ির সুবিধা এই যে দুটি কাঁটা এক হয়ে গেলে ঘড়ি দেখবার যে অসুবিধাটুকু ঘটত, এবার হতে তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে।

• •

সদ্যজাত শিশুর দন্ত—

ফ্রান্সের একজন ডাক্তার, সম্প্রতি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পত্রিকায় লিখেছেন,—তিনি একবার যমজ শিশু প্রসব করানর সময়, দেখেন যে একটি ছেলের সমস্ত দাঁতই উঠেছে আর অপরটি জন্মাবার বার দিন পরেই একটি দাঁত উঠেছিল।

চিকিৎসকেরাও বলেন, এ রকম ঘটনা খুব অল্পই ঘটতে দেখা যায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে মাত্র ৫০।৬০টি এ রকম ঘটনা, ইতিপর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে।

ইউরোপে একটা সংস্কার ছিল, যে, দাঁত নিয়ে যে শিশু জন্ম গ্রহণ করে, তার অদৃষ্ট খুব সুপ্রসন্ন হয়। রাজা তৃতীয় রিচার্ড, চতুর্দ্দশ লুই, দার্শনিক পণ্ডিত বাইরণ সুকবি বায়রণ,—এঁরা সকলেই সদন্ত জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

• •

সৌন্দর্য্যের খাতিরে—

সৌন্দর্য্যের খাতিরে আমেরিকা আফ্রিকা অসভ্য আদিম নিবাসীরা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কত বিকৃত করে উল্কী পরে। কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে, সুসভ্য জাতিরাও সৌন্দর্য্যের খাতিরে, অনেক রকম দুঃসহ যন্ত্রণাও অবলীলা ক্রমে সহ্য করতে শিখেছেন। ঔষধ লাগান এক রকম ছুচ দিয়ে তাঁরা গালে ছিদ্র তৈয়ার করে, কৃত্রিম গালের 'টোল' সৃষ্টি করছেন।

এমন অনেক মেয়ে আছেন, যাঁরা তাঁদের নাক ভেঙে চুরে, নূতন ভাবে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চান্। অনেকে আবার সুন্দর চুল তুলে ফেলে, ইচ্ছামত উঁচু বা নীচু করে নিয়েছেন। সুন্দর সাজবার জন্য এঁরা কি না করতে পারেন!

অনেক অভিনেত্রী আবার অভিনয়টি সুন্দর করবার ইচ্ছায়, কৃত্রিম উপায়ে উপরের ঠোঁট এমন ভাবে উল্টা করিয়ে নেছেন, যাতে তাঁদের মুখে বিষাদের ছবি বেশ সুন্দরভাবে ফুটে উঠতে পারে। এই সব চেহারায় কৃত্রিম ভাব ফুটিয়ে তোলবার জন্য নিপুণ লোক নিযুক্ত থাকে।

অনেক সৌখীন মেয়ে, কস্মেটিক্ সুসজ্জি করাবার জন্য জিদ্ ধরেছেন। একজন তাঁর ঠোঁটে লাগাবার জন্য এমন ভাবে প্রস্তুত করিয়েছেন, যে তাতে সুসজ্জি কদলীর আস্বাদ পাওয়া যাবে। যে রকম ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে তাতে আর কেউ যেঁদি বুঁচি থাকবে বলে মনে হয় না। ইচ্ছামত খাঁদা নাকে 'টিকল' বা 'তিলফুল জিনি নাসা' হ'য়ে পড়বে, হাসিলেরা গাল টোল্ খাবে, মন্দ কি? আমাদের দেশের সুন্দরীরা কি বলেন?

• • •

আর্থার কীট (Arthur Keith) নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বলেন, যে, কোনও এক বিশেষ প্রণালী অবলম্বনের ফলে, পনের পুরুষের মধ্যেই সমস্ত নর-নারীর লেজ গজিয়ে যেতে পারে। অনাবশ্যক বোধে আর তিনি তার পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে চান না, এই —রক্ষা না হ'লে!—

যাক্ তার শেষের কথায় বাঁচা গেল, যে মানুষ যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন লেষের ভয় নেই। ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতি ওটাকে Retrenchmentএর পর্য্যায় ভুক্ত ক'রে ফেলেছে।

নতুন রেকর্ড—

গ্রামোফোন যাঁদের বাড়ী আছে, বা যাঁরা গ্রামোফোন শুনেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন একখানা রেকর্ডের মত বড় একটা গান কত অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রামোফোনে শেষ হয়ে যায়। সাধারণতঃ পাঁচ মিনিটের বেশী কোনও রেকর্ডেই লাগে না। এতে গান যেন তাড়াতাড়িতে নষ্ট হ'ল বলে মনে হয়। সম্প্রতি এক রকম রেকর্ড বাহির হয়েছে, যে প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে সে রেকর্ড ঘুরতে থাকবে। এই নূতন আবিষ্কারে গ্রামোফোন যে আরও জনপ্রিয় হ'য়ে উঠবে, তাতে আর কারও সন্দেহ নেই।

গত কয়েক বৎসর ধরে দেখা যাচ্ছে, যে আমেরিকার লোকেরা দিন দিন খুব মোটা হ'য়ে উঠেছে। আমেরিকার সহরে, মোটা আর বেঁটে লোকের ছড়াছড়ি। ইংলণ্ডে কিন্তু মোটা লোকের সংখ্যা খুব কমে গেছে। যে সমস্ত কার্টুন বা ব্যঙ্গ চিত্র প্রকাশ করা হয় তাতে ধন মূলকে মোটা আর সামচাচাকে রোগা দেখান হয়। এখন সে প্রথাটা উল্টে দেবার কথা হচ্ছে।

টেলিফোনের নূতনত্ব—

টেলিফোনে এখন দূরের লোকের সঙ্গেও কথা কওয়া যায়। এখানে বসে আসানসোলের লোকের সঙ্গেও অক্লেশে কথাবার্ত্তা চলতে পারে। কিন্তু তাতে যার সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে, তাকে দেখা যায় না। সম্প্রতি এড্ওয়ার্ড বেলিন্ নামে একজন ফরাসী আবিষ্কারক এমন যন্ত্র প্রস্তুত করেছেন, যাতে টেলিফোনে, কথা বলবার সময় যে ব্যক্তির সঙ্গে কথা কওয়া হচ্ছে, তার চেহারাও চোখের সামনে ফুটে উঠবে।

বেলিন সাহেব যে কয়টি পরীক্ষা করেছেন, তার সব গুলিতেই কৃতকার্য্য হয়েছেন।

এর পূর্ব্বে M. A. Law নামে একজন ইংরেজ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই রকম টেলিফোন ব্যবহার করতে অনেক খরচ পড়েছিল। বেলিন সাহেব যা আবিষ্কার করেছেন, তাতে অসম্ভব বেশী খরচা পড়ে না আর অন্য সব অসুবিধাও দূর করা হয়েছে।

যৌবন আনা ডাক্তারী—

যযাতির বার্দ্ধক্য ত্যাগ করে পুনর্যৌবন লাভ করার কথা পুরাণে পাওয়া যায়। সম্প্রতি ডাক্তারেরা Glands এর পরিবর্ত্তন করে বৃদ্ধের শরীর নবযৌবন ফিরিয়ে এনেছেন। সেদিন কলিকাতা সহরেও এই রকম ব্যাপার ঘটেছে। Engene Steinach নামে একজন অষ্ট্রীয়ার ডাক্তার, এই রকম জরাগ্রস্তকে যৌবনও যেমন দিতে পারেন, যুবাকে সেই রকম ইচ্ছাক্রমে জরাগ্রস্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

ফ্রান্সের এক বৈজ্ঞানিক সভায় তিনি এই নূতন উদ্ভাবনীর কথা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর কথামত একটি কুড়ি বৎসরের যুবতী নিজের শরীরে সত্যাসত্য নির্ণয়ে বদ্ধ পরিকর হল। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তার কাল চুল বুড়ীর চুলের মত হয়ে উঠল, গালের নিটোল ভাব মিলিয়ে গেল তাকে দেখতে হল ঠিক যেন সত্তর বছরের এক বুড়ী। এ রকম খেয়ালী আমাদের দেশে কেউ আছেন কি?

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানীর
মেসিনে প্রস্তুত
চন্দন, রয়েলবকুল, ব্লাক ও ভেলভেট সাবাবান
ব্যবহার করুণ। টেলিফোন, ২৪৯৬

প্রিন্সিপল্

(Principle)

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়]

কর্ত্তাটি ছোটবেলা হইতেই ইংরাজ-ভক্ত। ভক্তের লক্ষণগুলিও তাঁর সকল কার্য্যেই তাই ফুটিয়া বাহির হইত। মোটা কয়েক বাঁধা বাঁধা ইংরাজী নীতিকথাও সদাই তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকিত, যদিও তার অর্থ বা ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও একটা স্পষ্টধারণা তাঁহার ছিল না। ইংরাজি কেতাব পড়িয়া, ইংরাজের চাকুরী করিয়া, ইংরাজি হোটেলে আহার করিয়া, ইংরাজী ছাট, ইংরাজী কোট পাটলুনে বরবপু ভূষিত করিয়া গাউন পরা বহু বান্ধবদের সঙ্গে ইডেন উদ্যানে অপেরা বায়স্কোপে বেড়াইয়া কর্ত্তার কাল অঙ্গের তলায় ঠিক গৌরাঙ্গের মানসমূর্ত্তিটিই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

সংস্কারের দোষে বক্ষটি কিন্তু সেই শিবপূজাপরায়ণা, সিন্দূরসীমন্তিনী, তাম্বূল-রাগ-স্ফুরিতাধরা সেই সেকেলে মানুষটিই রহিয়া গিয়াছেন। কর্ত্তার আজন্ম চেষ্টার ফলেও কিন্তু একালের মতন নভেল পড়া, মূর্চ্ছা যাওয়া, ফিটনচড়া, বারহাতি শাড়ীপরাটি হইয়া উঠিতে পারেন নাই।

কি জানি কি খেয়ালে আজ কর্ত্তার কোলের নন্দন 'হাবুলবাবু' কর্ত্তার টেবিল হইতে রবার ষ্ট্যাম্পের কালির শিশিটা খুলিয়া সকলটুকু কালি পিতার অতি আদরের "পশী" নামক সাড়ম্বর-বন্ধনের রোমশ রাঙ্গা বরবপুতে মাখাইয়া দিল।

কর্ত্তা আফিস হইতে আসিয়া বৈঠকখানায় পা দিতেই "পশী" লেজুড় নাড়িয়া সানন্দে ভিক্ষার মত আদর কর্ত্তার কোলে উঠিয়া বসিল। মৃদু সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতে করিতে কর্ত্তা "পশীর" শ্রীমুখকমল স্বীয় গণ্ডাবরণ-প্রদেশে স্থাপন করিয়া সোল্লাস-পাদবিক্ষেপে উপরে আসিলেন। কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া অদূরস্থিত টেবিলের উপর মুকুরখণ্ডে নিজের মূর্ত্তিখানা দেখিয়াই কর্ত্তা বিষম চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবিশেষ বিরক্তির সঙ্গেই তিনি পশীকেও ছুড়িয়া বারান্দায় ফেলিয়া দিলেন। কাতর "কেউ কেউ" ধ্বনি সহকারে পশী কোনও মতে নিরাপদ বিরালয়ে চলিয়া গেল।

কর্ত্তার হাত মুখ জামা পাটলুন কালিতে এমন সুন্দর ভাবে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে যাহা দেখিয়া তাহার ক্রোধ স্বতঃই সীমা ছাড়াইয়া গেল। অমনি উচ্চকণ্ঠে গৃহিণীকে আহ্বান করিয়া কর্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন—

"পশীর গায়ে কে কালি মাখালে?"

গৃহিণী বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন যে, খুব সম্ভবতঃ হাবুলবাবুই একাজ করিয়া থাকিবেন—যদিও তাকে করিয়া কর্ত্তাকে এমন অদ্ভুত একটি সঙ্ সাজাইবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। অমনি বজ্রনির্ঘোষে হাবুলের ডাক পড়িল।

নিরীহ ভাল মানুষটির মত হাবুল আসিয়া দাঁড়াইলেন। কর্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন,—

"হারে পাজি একি করেছিস্ বলত?"

"তোমার গায়ে ত আমি কালি মাখাইনি বাবা—পশীর ড'লটা একটু—"

"পাজি ছেলের ন্যাকামো শোন! কেন? পশীর গায়েই বা রঙ্ মাখিয়েছিলি কেন?" বলিয়া কর্ত্তা রোষকষায়িত নয়নদ্বয় হাবুলবাবুর মুখের উপর স্থাপন করিলেন।

"ওর-রঙটা আমার খুব পছন্দ হয় না তাই।"

নির্ভীক হাবুলের জবাবটা তাহার মুখ হইতে বেশ স্পষ্ট বাহির হইয়া আসিল।

কর্ত্তা মুখ বিকৃত করিয়া আবার রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন —"কেন পছন্দ হয় না?"

নির্ভয়ে হাবুল এবার মাথা উঁচু করিয়া বলিল—"On principle."

"ভবের বেয়াদব" বলিয়া কর্ত্তা চটি হস্তে তাড়া করিয়া ছেলেকে 'আদব' শিক্ষা দিবার জন্য দৌড়াইলেন। অমনি পশ্চাৎ হইতে গৃহিণী কর্ত্তার হাতখানা ধরিয়া বাধা দিয়া বলিলেন,—

"ছি! এ বলছে On principle [illegible] এতেও তোমার রাগ পড়ল না? ছি!"

কর্ত্তা অবাক!

ব্যতিক্রম

(উপন্যাস)

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এখনকার ন্যায় তখনও অনেক পল্লীবাসী ছাত্র কলিকাতায় পড়িতে আসিত—বিনয় তাহাদিগের মধ্যেই একজন। তবে সাধারণ ছাত্রের ন্যায় তাহার পিতার আর্থিক অবস্থা নিতান্ত হীন ছিল না। বিনয় তাহার একমাত্র পুত্র বলিয়া, স্নেহেও তিনি তাহাকে কোন কষ্ট অনুভব করিতে দিতেন না। কলেজে বিনয়ের সহিত নির্ম্মলেন্দুর আলাপ হইয়াছিল। বিনয়ের অসামান্য প্রতিভায় তাহার অনেক সতীর্থ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই বিনয়কে হিংসা করিত কেবল নির্ম্মলেন্দুর মনে কোন হিংসার ভাব ছিল না, সেই জন্য বিনয়ও নির্ম্মলেন্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। দুই তিন মাসের মধ্যেই দুই জনের বন্ধুত্ব এত প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল যে, অন্য ছাত্রেরা তাহাদিগকে পরিহাস করিত।

বিনয় যেদিন ইন্দুলেখাকে অভিজ্ঞান শকুন্তলার প্রথম অঙ্ক পড়াইয়া আসে, তাহার পর হইতে তাহাকে প্রতিদিন যাইয়া নির্ম্মলদের বাটী যাইতে হইত। নির্ম্মল প্রতিভাবান ছাত্র নহে, কিন্তু তাহার ভগ্নী ইন্দু ঠিক তাহার বিপরীত। ইন্দু বুদ্ধিমতী, তাহার স্মৃতি-শক্তি অত্যন্ত প্রখরা এবং তাহার শিখিবার আগ্রহ ছিল। এমন ছাত্রী পাইয়া অধ্যাপকের উৎসাহও বাড়িয়া গিয়াছিল। দুই মাসের মধ্যে অভিজ্ঞান শকুন্তলা শেষ করিয়া সে সাগ্রহে প্রস্তাব করিল যে ইন্দু মালবিকাগ্নি পড়িতে আরম্ভ করুক। ইন্দুলেখার পিতা ও মাতা সাগ্রহে সম্মতি দিলে বিনয় পড়াইতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ পূজার ছুটী আসিয়া একটা অঘটন ঘটাইয়া দিল। নির্ম্মলেন্দু স্থির করিয়াছিল যে সে ছুটীর সময় বেড়াইতে যাইবে এবং সঙ্গে বিনয়কে লইয়া যাইবে। বিনয় যখন পিতার অনুমতি চাহিয়া পত্র লিখিল, তখন তাহার উত্তর আসিল যে বিনয় তিন মাস বাড়ীছাড়া, অতএব পূজার সময়ে তাহাকে বাড়ীতে আসিতেই হইবে। তাহার বন্ধু যদি বেড়াইতে চাহে, তাহা হইলে বিনয় যেন সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে।

অনেক ধস্তাধস্তি করিয়া নির্ম্মলেন্দু যখন বিনয়কে পশ্চিমে লইয়া যাইতে পারিল না, তখন সে নিজেই উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ ছাড়িয়া দিয়া বিনয়দের বাড়ী যাইতে প্রস্তুত হইল। কলেজের ছুটী হইলে দুই বন্ধু চলিয়া গেল। বলিয়া রাখা উচিত যে, নির্ম্মলেন্দুর পিতা ধনী, তাহার উপরে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি জাতিতেও ব্রাহ্মণ কিন্তু পীরালী সম্প্রদায়ভুক্ত। নির্ম্মলেন্দু তাঁহার একমাত্র পুত্র এবং ইন্দু তাঁহার একমাত্র কন্যা। নির্ম্মল যে বিনয়ের সহিত গেল তাহাতে তাহার আপত্তি ছিল না বটে, কিন্তু পুত্র যতদিন ফেরে নাই ততদিন তাঁহার মন বড়ই উদ্বিগ্ন ছিল। তাহার কারণ বিনয়দের বাড়ী পল্লীগ্রামে, সেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যে একেবারে ছিল না তাহা বলিতে পারা যায় না, অথচ ডাক্তার বৈদ্যের নিতান্ত অভাব।

বিনয়ের পরামর্শ মত নির্ম্মল একজন চাকর পর্য্যন্তও সঙ্গে লইল না। বিনয় তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে তাহারা কলিকাতায় যেভাবে দিনপাত করে সেভাবে দিন কাটাইলে পল্লীগ্রামের লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। নির্ম্মল অগত্যা বিনয়ের কথামতই জুতা, কাপড়, জামা, বাছিয়া লইয়া একাই চলিল। পূর্ব্ব-বঙ্গের রেল লাইনের কোন ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল দূরে ইচ্ছামতী নদীর অদূরে একটী ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামে বিনয়দের বাড়ী, সকালবেলা কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া বেলা একটার সময় তাহারা ষ্টেশনে পৌঁছিল। বিনয়ের পিতা তাহাদের জন্য দুইখানি

পালকী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; নির্ম্মলেন্দু ষ্টেশনে নামিয়া পালকীর সাজসজ্জা দেখিতে বসিয়া গেল। সে কলিকাতায় পালকী দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু এত বড় ও এত ভাল পালকী দেখে নাই। পালকীর ভিতরে গদী আঁটা, চারিদিকে কাচের ও বার্নিশ। নির্ম্মলেন্দু পালকীতে চড়িবার পূর্ব্বে ছবি আঁকিতে যাইতেছিল। কিন্তু বিনয়ের নিকট প্রহার খাইয়া নিরস্ত হইল।

ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম্যপথ বহিয়া নির্ম্মল যখন বিনয়দের বাড়ী উপস্থিত হইল তখন দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। একটু বিশ্রাম করিয়া দুই বন্ধুতে স্নান করিতে চলিল। সদর বাড়ী, পূজার বাড়ী ছাড়াইয়া খিড়কীর পুষ্করিণী দেখিয়া বিনয় মুগ্ধ হইয়া গেল। সে বৎসর বাংলাদেশে বেশ বৃষ্টি হইয়াছিল; সুতরাং দীঘিতে ও পুষ্করিণীতে জলের অভাব ছিল না। বিনয়দের খিড়কীর পুষ্করিণী একটা প্রকাণ্ড দীঘি বলিলেও চলে। আশ্বিনে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য পুষ্করিণী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহার চারি-কূল শ্যামল দূর্ব্বাদলে আচ্ছন্ন। কূলের উপরে আম্র, পনস নারিকেল বৃক্ষের ঘন সন্নিবেশ—ছবিখানি দেখিয়া নির্ম্মল মুগ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু বিনয় তাহার পিঠে কীল মারিয়া বলিল—"ওরে বাঁদর, এ রকম শোভা গ্রামে পায় পায় দেখতে পাবি। এখন শিগ্‌গীর স্নান করে নে, আমরা না খেলে মা মুখে জল দেবেন না।" নির্ম্মল আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন?" বিনয় বলিল—"মার বহুভাস।" পথ চলিয়া নির্ম্মলের ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, সুতরাং সে আহার করিয়া বিনয়ের মাতাকে পরিতুষ্ট করিল। বিকাল বেলা বিনয় তাহাকে লইয়া বাহির হইল; এবং সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া আসিয়া সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরিল। নির্ম্মল বাড়ী আসিয়াই তাহার পিতাকে এক-খানা সুদীর্ঘ পত্র লিখিল, তাহাতে তাহার ছবি আঁকিবার সরঞ্জাম চাহিয়া পাঠাইল।

সকালবেলা নহবতের বাজনার শব্দে নির্ম্মলেন্দুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে কখনই ভোরে উঠিতে পারিত না, সুতরাং বিরক্ত হইয়াই বিছানায় পড়িয়া দেখিল যে বিনয় ঘরের ভিতরে ব্যায়াম করিতেছে। নির্ম্মল শুনিতে পাইল যে চারিদিকেই কোলাহল, বাড়ীর সমস্ত লোক আসিয়াছে, গ্রামের অর্দ্ধেক লোক বিনয়দের বাড়ী আসিয়াছে। বিছানায় পড়িয়া থাকা ভাল দেখায় না বলিয়া নির্ম্মলেন্দু উঠিল; এবং প্রাতঃকৃত্য সারিয়া বিনয়ের জামেল দুইটা কাড়িয়া লইল। তখন দুই বন্ধুতে বাহির হইল। বিনয়ের পিতা বিনয়কে বলিলেন বিনয়—তুই আর তোর বন্ধু তাঁড়ার ঘরের সম্মুখে বোস্, আজ তাঁড়ারে কেউ লোক নেই তোরা দুজনে সারাদিন সেখানে বসে থাক।" নির্ম্মল সম্মত হইল বটে কিন্তু মনে মনে রাগিল। কারণ, সে স্থির করিয়াছিল যে প্রভাত-সূর্য্যের আলোক যখন দীঘিকার কালো জলের উপর আসিয়া পড়িবে তখন সে তাহার একখানি ছবি তুলিয়া লইবে। পূজা-বাড়ীর—ভাণ্ডারে এত কাজ যে তাহার মনের দুঃখের কথা ভাবিবার আর অবসর হইল না। চার পাঁচখানি গাড়ীতে দুই হাজার নারিকেল আসিয়া উপস্থিত হইল, নির্ম্মল তাহা একাই গুণিয়া তুলিল। তোলা শেষ হইলে সে নির্ম্মলকে জিজ্ঞাসা করিল—"এত নারকোল্ কি হবে রে?" বিনয় বলিল—"সন্দেশ হবে।" "নারকোলের সন্দেশ ত্যাম যেট্! পাড়াগাঁয়ে সব ব্রাহ্মণে ছানার সন্দেশ খায় না? এত নারকোলের দাম কত?' "দাম কি রে, এ-সব আমাদের বাগানের নারকোল।" নির্ম্মল মনে মনে স্থির করিল যে যাইবার পূর্ব্বে সে নারিকেলের বাগান দেখিয়া যাইবে। এই সময় পাঁচ ছয় গাড়ী ভরিয়া বিলাতী কুমড়া আসায় তাহার অন্য চিন্তা করিবার অবসর রহিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মা আনন্দময়ী বিদ্যুতের মত আসিলেন আর বিদ্যুতের মত চলিয়া গেলেন। বঙ্গবাসী তিনদিন হাসিল, চতুর্থ দিনে কাঁদিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাতৃমূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া বাঙ্গালী হাসিমুখে নূতন বৎসর আরম্ভ করিল। এ কয়দিন পরিশ্রম করিয়া নির্ম্মল বড় নাম কিনিল, এমন কি বিনয়ও তাহার সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতে পারিল না। পূজা শেষ হইল, গোলমাল চুকিয়া গেল, নির্ম্মল তখন নিবিষ্টমনে চিত্র বিদ্যায় মনঃসংযোগ করিল।

গ্রামের নীচে একটী ছোট নদী ছিল, এককালে

তাহাতে জল আসিত কিন্তু দুই দিকের মুখ বন্ধ হইয়া যাওয়াতে তাহা এখন শীর্ণকায়া, প্রায় জলহীনা। সে বৎসর আশ্বিন মাসে অতিরিক্ত বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া শীর্ণকায়া নদী ভরিয়া উঠিয়াছিল। সকালে বিকালে একখানি ছোট নৌকা লইয়া দুই বন্ধু বাহির হইত, নির্ম্মল ছবি আঁকিত আর নদীতীরে গাছের ছায়ায় নৌকা বাঁধিয়া বিনয় পড়িত। পাঠ্যপুস্তক আমিলে নির্ম্মল তাহা জলে ফেলিয়া দিত বলিয়া বিনয় ইংরাজী ও সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ পড়িত।

একদিন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, নির্ম্মল একমনে ছবি আঁকিতেছে। সে দিন তাহারা যেখানে নৌকা বাঁধিয়াছে সেখানে একটা বড় বাঁশের ঝাড় ফেলিয়া পড়িয়া তাহাদিগকে লোক চক্ষুর অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছিল। তখন সূর্য্য প্রায় অস্ত গিয়াছেন, নিকটের ঘাটে গ্রাম্য বধূরা জল প্রক্ষালন করিয়া গৃহে ফিরিতেছে। এই সময় একটী ছোট মেয়ে তীরে দাঁড়াইয়া বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিল—"কাদের নৌকো?" বিনয় বই হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল—"আমাদের নৌকো।" মেয়েটী বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল—"আমাদের পার করে দাও না?" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে একটা শুষ্কতার পদার্থ আসিয়া বিনয়ের কোলে পড়িল, সে মাথা তুলিয়া দেখিল, পদার্থটা নির্ম্মলের চটিজুতা। বিনয় আরও দেখিল যে নির্ম্মল ছবি আঁকা ছাড়িয়া হাঁ করিয়া তীরের দিকে চাহিয়া আছে। তীরের দিকে চাহিয়া বিনয় দেখিল যে পটের পুতুলের মত সুন্দরী চারি পাঁচ বৎসরের একটী মেয়ে আর এক অসামান্যা সুন্দরীর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত দেখিয়া লইয়া বিনয় মৃদুস্বরে নির্ম্মলকে বলিল—"ওরে বাঁদর", গাঁয়ের মেয়ে অমন করে চেয়ে থাকিস্ নে! নির্ম্মল গাহিয়া উঠিল,—"সখি রে আঁখি মোর ফিরিতে না চায়।" বিনয় প্রত্যুত্তরে চটিজুতাটা ফিরিয়া দিল। ছোট মেয়েটী কিন্তু ছাড়িবার পাত্রী নহে। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আমাদের পার করে দাও না গা, বেলা যে পড়ে এলো!" তখন নির্ম্মলের চমক ভাঙ্গিল, সে তাড়াতাড়ি ছবি নামাইয়া নৌকা খুলিল। বিনয় নৌকা ঠেলিয়া তীরে লাগাইল ও ছোট মেয়েটীকে তুলিয়া লইল। তাহার সঙ্গিনী নৌকায় উঠিতে গিয়া ঈষৎ টলিল, তাহাকে পড়িতে দেখিয়াও বিনয় সাহসে ভর করিয়া ধরিতে পারিল না কিন্তু নির্ম্মলেন্দু ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাহাকে উঠাইয়া নিজের বায়গায় কম্বলের উপর বসাইয়া দিল। তরুণী লজ্জায় জড়সড় হইল এবং তাহার সহিত বিনয়ও সঙ্কুচিত হইল। নির্ম্মল কিন্তু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নৌকা যখন নদীর মাঝখানে তখন নির্ম্মল ছোট মেয়েটীকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা কোনখানে যাবে?" মেয়েটী বলিল—"ঘণ্টিতলার ঘাটে।" নির্ম্মল বিনয়ের দিকে চাহিল, বিনয় মাথা নাড়িল, তখন দুই বন্ধুতে নৌকা বাহিয়া চলিল; স্রোত বলে নৌকা দুই মিনিটের মধ্যে কূলে আসিয়া লাগিল। তীরে একখানা বড় কাঠ পড়িয়াছিল বিনয় এমনভাবে তাহার পাশে নৌকা লাগাইল যে নামিতে কাহারও কষ্ট হইল না। তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, আরোহীরা নামিলে নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল—"চল এদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।" বিনয় হাসিয়া বলিল—"ধেৎ, লোকে বোলবে কি? এটা কি বিলেত পেয়েছিস্? ও চক্রবর্ত্তীদের মেয়ে, কুলীনের বলে বিয়ে হয় নাই, সন্ধ্যাবেলায় সঙ্গে গেলে লোকে এত এত কথা তুলবে যে মেয়েটার বিয়ে হওয়া দায় হবে।" নির্ম্মল ক্ষিই-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"ওর নাম কি ভাই?" অন্যমনস্ক হইয়া বিনয় বলিল—"মোহিনী না মুরলী, ছেলে বেলায় নেড়ী বোলে ডাকতো। অন্ধকার ঘন হইয়া আসিল তখনও নির্ম্মল নদীতীরে সেই কাষ্ঠখণ্ডের উপরে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহা দেখিয়া বিনয় বলিল—"ওরে নৌকায় ওঠ, রাত্রি হয়ে গেল, মা যে ভাববে?" চমক ভাঙ্গিয়া নির্ম্মল নৌকায় উঠিল,—নৌকা যখন বিনয়দের ঘাটে আসিয়া লাগিল, তখন লোকজন আলো লইয়া চারিদিকে তাহাদিগকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

সেই সময় হইতে নির্ম্মলেন্দু কেমনতর হইয়া গেল, আহার করিতে বসিয়া সে খাইতে পারিল না, তাহা দেখিয়া বিনয়ের মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"শরীর ভাল আছে তো বাবা?" নির্ম্মল অন্যমনস্ক হইয়া বলিল—

"হুঁ।" বিনয় হাসিয়া উঠিল। পাতের সূচি পাতে ফেলিয়া রাখিয়া নির্মল যখন উঠিয়া গেল তখন বিনয় বাহিরে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁরে নির্মল তোর হোলো কি? সেইটা কি প্রেমে পড়লি?" নির্মল চটিয়া উঠিয়া বলিল—"তুই গাধা দারাদিন বই পড়িস তুই প্রেমের বুঝিস্ কি?" বিনয় আর একটু হাসিল, তখন অধ্যয়ননিরতা ইন্দুর মুখখানি তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল, বিনয়ের মুখে সে হাসিটী আঁকিয়া রহিল। তাহা দেখিয়া নির্মল আরো চটিয়া বলিল—"হাসছিস্ তুই হাসবেক্ষণ? জানিস্ কত ধ্যান কত সাধনার পরে উর্ব্বশীর চির বাঞ্ছিত মূর্ত্তি নয়ন পথে আসে? মল্লিনাথের টীকা পড়লে কি প্রেম বোঝা যায় রে গাধা?" বিনয় কথা কহিল না। সে উঠিয়া গিয়া একটা দেরাজ খুলিয়া রেশমের রুমালে বাঁধা কতকগুলা চাপেলী ফুল বাহির করিল, আর সেগুলাকে দেখিয়া আবার বাঁধিয়া রাখিল। হঠাৎ নির্মল আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাকে দেখিয়া বিনয় তাড়াতাড়ি রুমালটা লুকাইতে গেল, কিন্তু নির্মল তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। রুমাল বাহির করিয়া নির্মল দেখিল যে কতকগুলা শুষ্ক ফুল। রুমালের কোণে কি নাম লেখা ছিল, সে অন্ধকারে তাহা দেখিতে পাইল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুরের ফুল বুঝি?" বিনয় লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া বলিল—"হাঁ ঠাকুরের ফুল।" নির্মল ফুল ছাড়িয়া দিল তখন বিনয় রুমাল লুকাইয়া বাঁচিল। নির্মল বলিল—"বিনয় তোকে একটা অনুরোধ কোরছি ভাই, রাখবি?" বিনয় হাসিমুখে বলিল—"বেড়ীতে আর একবার যেখাতে হবে তো?" একবার ছেড়ে দশবার দেখাবো, কিন্তু নির্মল ভুলে যা। যা হবার নয় তা ভেবে ফল কি? সে কুলীনের মেয়ে তার বাপ ফুল কোরবে বলে বসে আছে, সে ফুল তো তোমার গলায় পড়বে না ভাই? কেন মিছে মনকে কষ্ট দিচ্ছো?" নির্মল বলিল—"আমি দিব্যি করে বলছি কেবল চোখের দেখা দেখতে যাবো, সে স্বর্গের পারিজাত তাতে লোভ করে ফল কি? আর একবার দেখতে যাবো ছুবার দরকার নেই।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেদিন সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বে দুই বন্ধু নৌকা লইয়া বাহির হইল, বক্সীতলার ঘাটে, যেখানে লোকে স্নান করিতে আসে তাহার অদূরে বিনয় একটা আমগাছের আড়ালে নৌকা বাঁধিল। নির্মল একটা নূতন ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিল, সে ছবিটা শীর্ণকায়া স্রোতস্বিনীর, প্রথম প্রভাতের তরুণ আলোকে ঘুরে তার বিটপি রাজিমণ্ডিত ঘাটের। অল্প অল্প করিয়া ছবিখানি ফুটিল, বেলা বাড়িয়া উঠিল। বিনয় আজ পড়ে নাই, তাহার মনে কেবল এক কথারই উদয় হইতেছিল। গাছের পাতার ঘন আবরণ ভেদ করিয়া রৌদ্র যখন তাহার অঙ্গে আসিয়া লাগিল তখন চমকিয়া উঠিয়া বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—"ওরে বেলা হয়ে গেল যে, দেখতে যাবিনি?" নির্মল এক মনে ছবি আঁকিতেছিল, সে মুখ না তুলিয়াই বলিল—"এখনও সময় হয় নি, কাল যতটা দেখেছি সেটা এখনও ফুরোয় নি, সেটা যতক্ষণ না ফুরবে ততক্ষণ দেখবার দরকার হবে না।" "মেয়েছুয়ের মেয়ে তো তোর জন্যে ঘাটে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে না, আমি নৌকো খুলে দিই।"

"তবে যে।"

বিনয় নৌকা বাঁধিয়া ঘাটের সম্মুখে আসিল, দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ ঘাটে স্নান করিতেছিল, কেহ তাহাদের দেখিয়াও দেখিল না। স্থির জলে মৃদু বাতাস আসিয়া নৌকাখানাকে একপাশে লাগাইয়া দিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে জলের ঘড়া লইয়া দুই তিনটী সমবয়সীর সহিত মেয়েটী আসিল। জলে ঘড়া ভাসাইয়া দিয়া তাহারা আকণ্ঠ অবগাহন করিয়া বসিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে বিনয় মুখ তুলিয়া বলিল—"তবে যাই।" নির্মল উত্তর দিল না, বিনয় দেখিল যে নির্মল একখান নূতন ছবি আঁকিতেছে। বেলা বাড়িল স্নান করিয়া অনেকেই চলিয়া গেল, মেয়েগুলিও চলিয়া গেল, তখন বিনয় আবার বলিল—"এইবার চল যাই?" নির্মল বলিল—"চল।" নৌকা ফিরাইয়া বিনয় বাড়ীর ঘাটে আসিল।

স্নান ও আহারের মধ্যে সে যতটুকু সময় পাইল, নির্মল কেবল ছবি আঁকিল কিন্তু দুইখানা ছবির এক-খানাও শেষ হইল না। বিনয় দেখিল প্রথম ছবিখানায় বক্সীতলার ঘাটে ছায়ার মধ্যে অস্পষ্ট রমণীমূর্ত্তি ফুটিয়া

উঠিতেছে। আর দ্বিতীয় ছবিখানা জলের, স্থির কালো জলে অসংখ্য লহরীমালা তার মধ্যে একটা মড়া ভাসিতেছে। ছবি দেখিয়া বিনয় বলিল—"নির্ম্মল, চল কোলকাতায় ফিরে যাই!" নির্ম্মল বলিল—"যাবই তো, তাড়াতাড়ি কেন ছুটী ফুরুক?" "চল না এখনই যাই।" "না ছবি দুখানা শেষ হয় নি।" বিনয় চুপ করিয়া রহিল।

বিকালবেলাই নির্ম্মল ধরিয়া বসিল, যে সে হাঁটিয়া বেড়াইতে যাইবে। অগত্যা বিনয় তাহার সহিত বাহির হইল. আঁকাবাঁকা গ্রাম্য-পথে খানিকটা ঘুরিয়া বিনয় বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এখানে ঘুরে কি হবে?" নির্ম্মল বলিল—"গ্রামটা ভাল করে দেখা হয় নাই, চল দেখা যাক্।" বিনয় হাসিয়া বলিল—"দেখবার মধ্যে কেবল চক্রবর্ত্তীদের বাড়ী তো?" নির্ম্মলও সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া ফেলিল। তখন দুই বন্ধু গ্রাম্য-পথে উদ্দেশ্য-হীন ভ্রমণ ছাড়িয়া চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীর দিকে চলিল। চক্রবর্ত্তীদের বাড়ী গ্রামের এক প্রান্তে, তাহার পরেই শস্যক্ষেত্র যতদূর দেখা যায় মাঠে আধপাকা ধান, মাঝে মাঝে একটা আমের গাছ। সদানন্দ চক্রবর্ত্তী সম্পন্ন গৃহস্থ তাহার বাড়ীটী তিন মহল, প্রথম মহলে চণ্ডীমণ্ডপ আর গোশালা তাহার পিছনে অন্দর মহল এবং পরে দুইটী শিবমন্দির চণ্ডীমণ্ডপ ও গোশালা দুইখানি খড়ের ঘর, উঠানে একটা বড় সুপারি গাছ। বিনয় ও নির্ম্মল যখন সদরের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন মোহিনী গোয়াল ঘর হইতে একটা গরু বাহির করিয়া সুপারি গাছে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল। দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া নির্ম্মল দাঁড়াইয়া গেল। মোহিনী সুন্দরী—যৌবনের প্রথম বিকাশে সে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছিল, সে তখন মাথার কাপড় ফেলিয়া কোমরে আঁচল জড়াইয়া গরুটাকে সুপারি গাছের কাছে আনিবার চেষ্টা করিতেছিল, আর গরুটাও লাফাইয়া দড়ি ছিঁড়িয়া বন্ধন মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছিল। নির্ম্মলকে দেখিয়া মোহিনী চিনিল, সে একহাতে মাথার কাপড় টানিয়া দিবার চেষ্টা করিল, সেই অবসরে গরুটা তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া ধানের ক্ষেতের দিকে লইয়া গেল। বিপদে পড়িয়া মোহিনী বিনয়কে বলিল—"বিনয় দাদা ঘড়িগাছটা একবার ধর না?"

নির্ম্মল ছুটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু বিনয় চোখ রাঙাইয়া নিষেধ করিল এবং নিজে গিয়া দড়িগাছটা ধরিল। মোহিনী মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, গরু বাঁধিয়া বিনয় দেখিল যে, বহু চেষ্টা করিয়া নির্ম্মল দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না; বিনয়ের ভয়ানক হাসি আসিল। সে অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মেজো জেঠামশায় কোথায় রে?" মোহিনী তখন নির্ম্মলকে দেখিতেছিল, সে বিনয়ের কথার উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ও কে বিনয় দাদা?" বিনয় হাসিয়া উঠিল, তাহাকে হাসিতে দেখিয়া মোহিনী একটু লজ্জিতা হইল; নির্ম্মল দূর হইতে চোখ রাঙাইল। বিনয় মনে করিয়াছিল যে নূতন মানুষ দেখিয়া মোহিনী মাথায় কাপড় দিয়া পলাইবে, কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে তখন আবার জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁরে মেজো জেঠামশায় কোথায় বলি না?" মোহিনী নিতান্ত অপরাধীর মত বলিল—"বাবা বাড়ীর ভিতর বিনয় দাদা! আপনারা চণ্ডীমণ্ডপে বসুন।" সে চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া একখান মাদুর পাতিয়া দিল এবং নির্ম্মলের দিকে আর একবার চাহিয়া অন্দরে চলিয়া গেল। মাদুরের যেখানটা সে ধরিয়াছিল, নির্ম্মল আগে গিয়া সেইখানটায় বসিয়া পড়িল, বিনয় তাহা দেখিয়া খুব একচোট হাসিল।

সদানন্দ চক্রবর্ত্তী আসিলে, বিনয় ও নির্ম্মল তাহার সহিত দুই চারিটী কথা কহিয়া বিদায় লইল, চক্রবর্ত্তী তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। দুই বন্ধু উৎফুল্লহৃদয়ে বাড়ী ফিরিল।

বাড়ীর দুয়ারে বিনয়ের পিতা দাঁড়াইয়াছিলেন, দুই বন্ধু ফিরিতেই তিনি তাহাদিগকে একখানা তার দেখাইলেন। তারে লেখা ছিল, "ইন্দু অত্যন্ত পীড়িতা, শীঘ্র চলে এস, বিনয়কে আনিও।" নির্ম্মল তার পড়িয়া বলিল—"আমি তবে আজই যাই? বাবা বিনয়কে নিয়ে যেতে বোলেছেন নিয়ে যাব কি?" বিনয়ের পিতা বলিলেন—"তিনি বোলেছেন যখন তখন বিনয় যাবে বৈ-কি?" অবসাদহৃদয়ে সদানন্দ চক্রবর্ত্তীর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া নির্ম্মল সেই রাত্রিতেই বিনয়ের সহিত কলিকাতায় চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থালোচনা

বাসন্তিকা—বার্ষিক পত্র, প্রথম সংখ্যা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—জগন্নাথ হল হইতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা। এই পত্রখানি সম্পাদন করিয়াছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যাপক, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত। সম্পাদক ভূমিকায় লিখিয়াছেন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের সাহিত্যসভার সভাপতিত্ব করিতে গিয়া দেখিতে পাইলাম যে এখানকার ছাত্রদের মধ্যে বেশ ভাল লিখিবার শক্তি আছে। সাহিত্য সভায় কতকগুলি প্রবন্ধ পড়া হইয়াছিল, সেইগুলি কেন্দ্র করিয়া হলের সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকদের দুই তিনটি রচনা যোগ করিয়া দিয়া 'বাসন্তিকা' সাহিত্যের আসরে উপস্থিত করিতেছি। এই পত্রখানিতে যে সকল অধ্যাপকেরা লিখিয়াছেন তাঁহারা বাংলা সাহিত্যে বিশেষ পরিচিত, আর ছাত্র যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহারাও অপরিচিত নহেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বাঙ্গালা-সাহিত্যে' স্বল্প পরিসরে ইংরেজী আমলের বাংলা সাহিত্যের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে অনেক জানিবার ও শিখিবার বিষয় আছে। নানা তথ্য পূর্ণ এই মনোজ্ঞ প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি। বাংলা সাহিত্যের ভাবধারা ও ক্রম বিকাশের মধ্যে বাঙ্গালী সাহিত্যে কি পাইয়াছে ও কি হারাইয়াছে তাহা বেশ দেখানো হইয়াছে। কিন্তু অল্প কথায় এত বড় একটা জিনিসের পরিচয় খুব কৌশলের সঙ্গে দেওয়া হইলেও দু' একটি স্থান দুর্বোধ হইয়া পড়িয়াছে—যথা, 'গিরিশ ঘোষ নাটক লিখে ও অভিনয় করে খ্যাতনামা হয়ে গেছেন। সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা তার উপর এক বিষয়ে বিশেষ চটা ; তিনি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের বিশেষ নিষেধ সত্ত্বেও নাটকে শাস্তরসের অবতারণা করেছেন। শাস্তরস যে কি করে নাটকে প্রযোজ্য হতে পারে তা' এখন আমার ধারণার অতীত।' শাস্তরসের একটু ব্যঞ্জনা ও বিশ্লেষণ ও তাতে গিরিশচন্দ্রের নাটকের কি অপহানি হইয়াছে তাহা লেখকের একটু দেখানো উচিত ছিল। এই অরিৎ মন্তব্যটি পড়িয়া আমাদের যেমন খটকা লাগিয়াছে—অনেকেরই তেমন লাগিয়াছে। বিশেষ পণ্ডিতজনেরাও ইহার তাৎপর্য্য বুঝাইতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনের বড় গল্প 'একা' বাংলার গল্প সাহিত্যের সম্পদরূপে পরিগণিত হইবে। মানুষের মনোবৃত্তি অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতের এমন সুন্দর বিশ্লেষণ হইয়াছে গল্পটিতে। প্রাণের ভালবাসা, আনন্দ, উল্লাস, সংসারের আবর্তে, ঘটনাচক্রে কি ভাবে নানা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া, রামলোচন, ক্ষীরোদা ও প্রতিমার চরিত্রের মধ্য দিয়া তাহা সুন্দর ফুটিয়াছে। 'পল্লী-সমস্যা' একটা গ্রাম ধরিয়া কি ভাবে পল্লীর সংস্কার হইতে পারে কত বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া এই সংস্কার কার্য্য চলিতে পারে লেখক প্রত্যক্ষ কর্মী ভাবে নিপুণতার সঙ্গে তাহা দেখাইয়াছেন। 'মহারাষ্ট্রে সামাজিক প্রচেষ্টা' 'বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতা' প্রবন্ধগুলিও সুন্দর। শ্রীশক্তিপ্রসন্ন, উমাপ্রসন্ন প্রভৃতির কবিতা ও অন্যান্য গল্প প্রবন্ধ কবিতাগুলিও উল্লেখ যোগ্য। গ্রন্থে দু' খানি রঙীন চিত্র ও কার্টুন আছে। আশা করি আগামী বর্ষে ঢাকার ছাত্র শিক্ষকগণের মিলিত চেষ্টায় এই বার্ষিক পত্রখানি আরও সুন্দর ও মনোজ্ঞ হইবে।

বৈষম্য

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত]

বৈশাখের তীব্র তেজে
তপ্ত ধরাতল
সুশীতল বরষার
ধারা বরষণে

যৌবনের উষ্ণ রক্ত
হয় সুশীতল
বার্দ্ধক্যের মৃদু মধু
ধারা পরশনে।

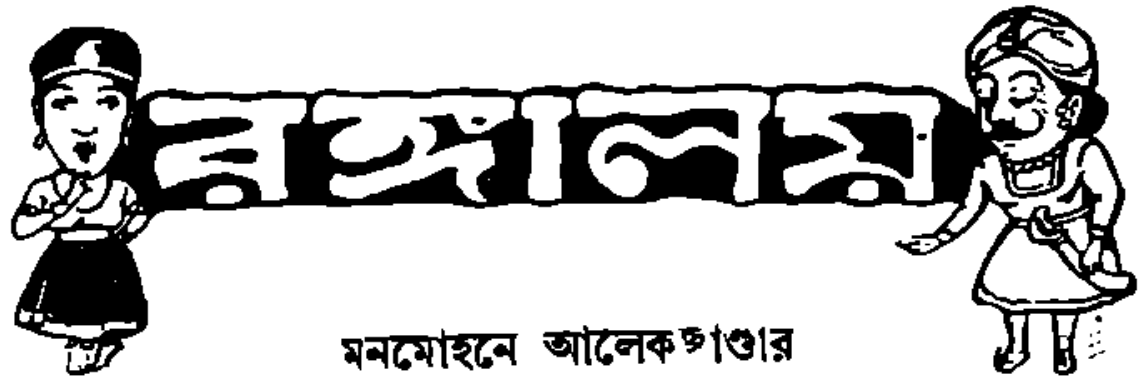

মনমোহনে আলেকজাণ্ডার

'মোগল-পাঠান' 'চিন্ধুবীর' প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আলেকজাণ্ডার' নাটকের তৃতীয় অভিনয় হইয়া গিয়াছে। ভুবন বিজয়ী মহাবীরের সমগ্র কীর্ত্তি-গাঁথা-মুখরিত জীবনী অবলম্বনে নাটক লিখিতে গিয়া গ্রন্থকারকে স্বভাবতঃ অনেক বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং একথা বলা চলে যে যাঁহার জীবনের এক একটি ক্ষুদ্র ঘটনাও এক একখানা উত্তম নাটকের যাবতীয় উপাদান যোগাইতে সক্ষম, সেই মহাদ্ভুত আলেকজাণ্ডারের সমগ্র জীবন একখানা ক্ষুদ্র নাটকে সীমাবদ্ধ করিতে গিয়া সুরেনবাবু ইহাপেক্ষা অধিক সাফল্যের আশা করিতে পারেন না। বাস্তবিক সেদার দিক দিয়া দেখিতে গেলে মোটের উপর নাটক খানার প্রশংসা করিতে হয়।

একটি অনন্ত সেণ্টিমেণ্টের ধারা এই নাটকে বহমান। বীরসিংহ, মীরা, আলেকজাণ্ডার এবং পুরুর চরিত্রে লেখক যে কয়েকটি আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সুমহান আদর্শ রক্ষার জন্য, এবং প্রজারঞ্জনের জন্য তিনি এ কয়টি চরিত্রের সাহায্যে যে কয়েকটি আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষই একদিন জগতের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিল। ক্লিয়োপেট্রার ক্ষুদ্র চরিত্র-আলেখ্যে এমন সুন্দর একটি মাতৃত্বের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে যাহা মাতৃমন্ত্রমুগ্ধ ভারতবাসীর প্রাণের মধ্যে অনন্ত ভাবের উৎস প্রবাহিত করিয়া দেয়। পুরু এবং তক্ষশীলার চরিত্র সাহায্যে নাট্যকার অভিসপ্ত ভারতের অধঃপতনের মূল কারণটি অতি নিপুণ ভাবেই দর্শকের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন।

স্থানে স্থানে কয়েকটি অসংবদ্ধ,অস্বাভাবিক এবং অসম্ভব ঘটনার অবতারণা করিয়া লেখক নাটক খানার গৌরবের অনেকটা হানি করিয়াছেন একথা স্বীকার এবং সত্যের খাতিরে আমরা বলিতে বাধ্য। একটা তথাকথিত নাটকীয় 'শিহরণ' জাগাইয়া তুলিবার জন্য নাট্যকার যেখানে সেখানে যাহার তাহার আত্মপ্রকাশ, কথায় কথায় হত্যা আত্মহত্যা, পাত্রা-পাত্রে ক্ষমা বিতরণ—এই প্রকার অনেকগুলি বাহুল্যতা দ্বারা নাটকীয় ভাবের সৌন্দর্য্যের পরিপন্থী তথাকথিত 'লোক-রঞ্জন' প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই জানেন, বাঙ্গালার দর্শকগণ আর এই সকল 'ফাঁকা আওয়াজে' মুগ্ধ হয় না। তাহারা চাহে সত্য শিল্পকলা—তাহারা চাহে ভাবের স্নিগ্ধ চিত্তোন্মাদ কাব্য কল্পনা। একথা না বুঝিলে সত্যই বাঙ্গালীর বুদ্ধিকে পরিহাস করা হয়।

কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও আমরা বলিতে বাধ্য যে, গ্রন্থকারের ভাষায় এমন একটা সুতীব্র অথচ ললিত উদ্দীপনা জাগাইয়া তোলে, যাহার বাঙ্গালায় আজ খুবই প্রয়োজন। নাটক খানার মূলীভূত নিগূঢ় ভাবটি প্রত্যেক বাঙ্গালীর ভাবিবার, বুঝিবার—চিরকাল স্মরণ রাখিবার বিষয়।

অভিনয় সম্পর্কে কথা বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। অথচ, দুই চারিটি কথা বলাও সঙ্গত। আমাদের রঙ্গালয়ে একটা কুপ্রথা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, যাহার সংশোধন না হইলে রঙ্গালয়ের সম্ভ্রম বজায় থাকিতেই পারে না। প্রত্যেক অভিনেতা এবং অভি-নেত্রীর এক একটা বৈশিষ্ট্য থাকাই স্বাভাবিক। সেই বিশিষ্টতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর বেতনের পরিমাণেই অভিনয়াংশ বিতরণ করিয়া থাকেন। বৃদ্ধ অভিনেতাকে

যুবরাজ সাজান—হাস্যরস-রসিক নাটকে তরুণ নায়ক সাজাইয়া অতি গম্ভীর অংশে হাস্য রসের সৃজন—নব-বস্তু-হীনা অভিনেত্রীকে নায়িকা সাজাইয়া তরুণ অভিনেতার সহিত প্রেমাভিনয় করান—আমাদের বুদ্ধালয়ের মজ্জাগত দোষ। আলেকজাণ্ডারেও তাহাই দেখিয়াছি। অমুকের নামে টিকিট বিক্রয় হয়—তাই তাহাকেই বিশপতি রবীন নায়কের অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।

এই প্রকারে অংশ বিতরণের দোষে অ্যালেক্জাণ্ডারের ভূমিকা একটু বেমানান হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এই অংশে নট-চূড়ামণি ধনীবাবু তাহার খ্যাতি সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। নাট্যকার ইচ্ছা করিলে অংশটি অভিনেতার পক্ষে অধিকতর উপযোগী করিয়া লিখিতে পারিতেন এবং তাহা হইলে অশোভন বয়সের দোষও মার্জ্জনীয় বলিয়াই বিবেচিত হইত।

পোষাক এবং মূল্যবলীর কোনও বিশেষত্ব দেখিলাম না। খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর ঘটনাভিনয়ে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতানুমোদিত দৃশ্য ও পরিচ্ছদ চাক্ষুষের ব্যাপার হইলেও ইহা দর্শকগণ নির্ব্বিবাদে পরিপাক করিয়া আসিতেছেন। তারপর, কোনও হিন্দু নরপতিকে পূজাবাড়াতে উকীল উত্তরিয় বস্ত্রালঙ্কার ভূষিত করিয়া, পর মুহূর্ত্তে আবার তাহাকেই মুসলমান-শোভন আজান পায়জামা পরান হইয়াছে—এই যে দৃশ্য পোষাকের অসঙ্গতি, ইহার পরিবর্ত্তন হইবে কবে? মুসলমানের পূর্ব্বে এই পুণ্য ভূমিতে আজান পায় জামার ব্যবহার ছিল না এই সাধারণ কথাটা রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ মহলের অজ্ঞাত নহে।

নাট্যকার রাজস্থানের গৌর্য্য কাহিনীর একটি অত্যুজ্জ্বল পৃষ্ঠা পারস্যের ইতিহাসে জুড়িয়া দিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের "জল গ্রহণ করব না আর চিতোর রাণার পণ—মুঁদির কেল্লা মাটির পরে থাকবে যতক্ষণ" কবিতাটির মূলীভূত আখ্যান অবলম্বনে পারস্যে একটি "লোমহর্ষণ" ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন। ইহা ধান নহে, দুর্ব্বাঘাস। নিজের ঘরের লক্ষ্মীকে পরের অঙ্কে সঁপিয়া দিতে পারা যায় না।

বীর সিংহের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের সুযোগ্য দৌহিত্র দুর্গা বাবুর অভিনয় আমাদিগের বড়ই মধুর লাগিয়াছে। একটু আড়ষ্ট ভাব নাই, একটু অস্বাভাবিকতা নাই—সহজ সরল সুন্দর ভাবে এমন চিত্তগ্রাহী অভিনয় ধনী বাবুর অনুকরণ দুর্গাবাবুর পক্ষেই সম্ভব। অহীন্দ্রবাবু বেসাসের ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। তরুণীলার অভিনয় উত্তম হইয়াছে, কিন্তু চেহারা এবং পরিচ্ছদের দোষে অভিনেতার সকল পরিশ্রমই ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

গান অনেক শুনিলাম, কিন্তু তাহার মধ্যে সঙ্গীত বলিয়া পদার্থ খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছিল—আশ্চর্য্যময়ী ও রাণীর মুখে দুটি তিনটিতে। নৃত্য সম্পর্কে বড় একটা বেশী কিছু বলাই চলে না—কেননা, সুপ্রসিদ্ধ 'নৃত্যবীর' কড়িবাবু শুনিয়াছি এখনকার নৃত্যশিক্ষক। তথাপি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—ভারতবর্ষে কি নৃত্যকলার এমনই অভাব পড়িয়াছে যে, কড়িবাবু কবেই প্রাতীচ্যে পা বাড়াইয়া দিয়া বাঙ্গালার এক অপূর্ব্ব তাণ্ডবতা আনয়ন করিতেছেন? আমরা অন্ততঃ হিন্দুস্থানী নর্ত্তকীর কাছে এক আধটি খাঁটি স্বদেশী নাচের প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। আচ্ছা, এই জীবটিকে আনা হইয়াছিল কেন?

পুরুর অভিনয়ের ব্যর্থতা দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া যায়। এই কি আর্য্য নরপতি প্রাতস্মরণীয় পুরুর প্রধান পুরুর চিত্র! ধরাসুদ্ধ অলিম্পিয়া চিলো ক্লিয়োপেট্রা প্রভৃতি কয়টি চরিত্রের অভিনয় ভাল হইয়াছে। অবশিষ্ট চরিত্র গুলির মধ্যে একটা "সুর" সর্ব্বদা তালিয়া থাকিয়া অন্য সকল সৌষম্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এই সুরটা কি সত্যই অপরিহার্য্য? জনৈক কর্তৃপক্ষ বলিলেন "সুর ব্রহ্ম-সনাতন, এ ছাড়ব ত মায়ার মঞ্চে বাঁচব কি নিয়ে!"

যাহা হউক এই অংশপতিত জাতির পক্ষে জাগরণের প্রয়োজনীয়তা যদি সত্য হয়—তাহা হইলে আলেক-জাণ্ডারের অভিনয় দেখিয়া অনেক নিদ্রিতের ঘুম ভাঙ্গিতে পারে, এবথা নিসঙ্কোচে বলা যায়। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের প্রভেদ ঘুচ—সত্যের সঙ্গে কৃত্রিম সভ্যতার সংঘর্ষ—ত্যাগের সঙ্গে ভোগের বৈষম্য বুঝাইবার জন্য এদেশে এপ্রকার নাটকের প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে হয়।

বাসন্তী—

বসন্তের সাথী

মেসার্স

শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং-র

সৌজন্যে

সংখ্যা - ১১৮

সম্পাদকীয়

প্রাচ্যের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী স্বাধীন জাপানের উপর দিয়া প্রকৃতির যে ধ্বংসলীলা স্রোত বহিয়া গিয়াছে এ সংবাদে জগতের সকল দেশের স্বাধীন অ-স্বাধীন সকল জাতিই অল্পাধিক পরিমাণে শিহরিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির আকস্মিক নির্ম্মম আঘাত কত প্রচণ্ড বাধাহীন হইতে পারে ধ্বংসলীলার এই বৈচিত্র্যে তাহা বেশ বোঝা যায়। দু'দিন পূর্ব্বেও যে জাপান সাগর জলের মধ্যে অকস্মাৎ নূতন দ্বীপের উদ্ভব দেখিয়া রাজ্য-সীমা বৃদ্ধি হইল ভাবিয়া প্রকৃতির অনুগ্রহে উল্লসিত হইয়াছিল; আজ আবার তাহারাই প্রকৃতির নিগ্রহে কত পার্থিব সম্পদ হারাইল। জাপানের এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে তাহার শত্রুপক্ষ সুখী হইবে, মিত্র পক্ষ ব্যথিত হইবে। কিন্তু শত্রু মিত্রের মধ্যে কে যে কাহার শত্রু আর কে যে কাহার আন্তরিক মিত্র তাহাও সহজে কাহারও বুঝিবার উপায় নাই। জাপানের বড় বড় নগর প্রায় সবগুলিই একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তাহার সাগরজয়ী শত্রু ভীতিকারী রণতরী সমূহ বিধ্বস্ত, শত সহস্র লক্ষ লোক মৃত, গৃহ সম্পদহারা। কত শত কোটি অর্থ, কত বহু চেষ্টা ও শ্রম, সঙ্ঘবদ্ধ জাতির সম্মিলিত কত শক্তি যে জাপানের পূর্ব্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিতে আবশ্যক হইবে তাহা বাস্তবিকই দেখিবার জিনিস।

• • • •

জাপানের এই ধ্বংস মুখ হইতে বাঁচিবার চেষ্টা ও ও পুনর্গঠন প্রচেষ্টার মধ্যে অনেকে তাহাদের বুদ্ধি, কলা কৌশল দেখিবে—তাহাদের রাজশক্তি, দেশশক্তি ও সঙ্ঘ-শক্তি কত সুদৃঢ় তাহা পরীক্ষা করিবে,—কিন্তু ভারতীয়দের বিশেষ করিয়া তাহাদের প্রতিবাসী এই প্রাচ্য স্বাধীন জাতির ধ্বংসলীলার মধ্যে অনেক দেখিবার ও শিখিবার বিষয় রহিয়াছে। স্বাধীন জাপান প্রকৃতির এই আকস্মিক প্রচণ্ড ধ্বংসলীলাকে বাধা দিতে পারে নাই—কারণ এ বাধা দেওয়া এখনও জগতের মানব শক্তির সাধ্যের অতীত। কিন্তু যে সমস্ত প্রাকৃতিক লীলা-খেলা অন্যান্য অ-স্বাধীন মানব জাতির উপর প্রতিদিন নানা উপদ্রব করিয়া যায়—যথা অজন্মা, চিরদুষ্কাল, দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, পীড়া, অনশন—দুর্ভাগ্য জাতি ও সমাজের এই যে চিরসাথী সংক্রামক অভিশাপগুলি—এ গুলিকে জাপান বা জাপানের মত সঙ্ঘবদ্ধ দেশশক্তি সম্পন্ন জাতি চির-দিনই বাধা দিয়া আসিয়াছে। এই সমস্ত আধিভৌতিক উপদ্রবগুলি ইহাদের বিধ্বস্ত করিতে পারে না, ব্যবস্থার গুণে ইহারা দেশ হইতে তাহা এক রকম দূর করিয়া দিয়াছে। তারপর বন্যা বা জলহীন অবস্থায় আমরা যেমন হাহাকার করিয়া মরি—ব্যাধি-পীড়া অনশন অর্দ্ধাশনে আমাদের অপমৃত্যু যেমন অতি সহজ ও স্বাভা-বিক—ইহাদের দেশে তেমন নহে। আমাদের দেশে বন্যা বা ভীষণ বন্যা হইলে লোক জনের যেমন আর গতি থাকে না—সাহায্যের জন্য যেমন তাহারা কার যা কার মা করিয়া আকাশপানে চাহিয়া মরে ইহাদের অবস্থা অত সহজে তেমন হয় না।

• • • •

ধ্বংসের মুখে প্রবল ভূমিকম্প প্রজ্বলিত টোকিও সহরের রাজসভাগৃহে কাউন্ট ইয়াশাশোটা ও অন্যান্য রাজ-নীতিকগণ নূতন কাউন্সিল গঠনের যে সভা করিয়াছিলেন সে সভার কার্য্য তাঁহারা সভাগৃহের ছাদ পড়িয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত করেন নাই। সামুরাইয়ের বীরত্ব জাপানীরা ধ্বংসের মধ্যে দাঁড়াইয়াও যথেষ্ট দেখাইয়াছে। এত বড় একটা ধ্বংসলীলা হইয়া যাইতে না যাইতেই জাপান সকল দিকে সকল বিষয়ে আবার সু ও স্বাভাবিক ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। গৃহহারা—অন্নহীনদের থাকিবার খাইবার যথা সম্ভব ব্যবস্থা হইতেছে। দস্যু তস্করদের লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি যাহা এমন অবস্থায় স্বতই জাগিয়া উঠে তাহা প্রশমনের সুব্যবস্থা হইয়াছে—যাহাতে হাত নাই তাহা হইয়া গিয়াছে কিন্তু

মানবশক্তিতে এখন যাহা করিতে পারে তাহার কোনটিতেই জাপান চেষ্টার ত্রুটি করিতেছে না। এমন বিপদে বাহির হইতেও সাহায্য সহানুভূতি আসিতেছে বটে—কিন্তু ভিতরের শৃঙ্খলা দেশের রাজশক্তি ও জনশক্তির সমবেত চেষ্টাই হইতেছে এমন অবস্থা হইতে মুক্তি পাওয়ার প্রধান কথা। স্বাধীন দেশ এত বড় একটা বিপদও কিভাবে কাটাইয়া উঠে তাহাই দেখিবার জিনিস।

• • • •

জাপানে যে সমস্ত ভারতীয় ছিল এই বিপদে তাহাদের কতজন রক্ষা পাইয়াছে তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই। অন্যান্য 'দেশীয়েরা' নিজ নিজ দেশীয়দের অবস্থা কিরূপ তাহার সংবাদ অনেকেই পাইয়াছে—ভারতীয়দের সংবাদ, অল্প অল্প আসিতেছে। তবে বাঙ্গালী কাহারও সংবাদ আজ পর্য্যন্তও পাওয়া যায় নাই।

• • • •

ভারতবর্ষে জাপানের মত প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা এ পর্য্যন্তও না হইলেও প্রতিদিন রোগে, অনাহারে, দারিদ্র্যে এ দেশে যত লোক মরিতেছে বা মরণের মুখে দাঁড়াইয়া আছে ষোটের উপর খতাইয়া দেখিতে গেলে এমন ধ্বংসলীলা বরাবরই আমাদের উপর চলিয়া আসিতেছে। তবে ইহা অন্তঃসলিলা, ধাক্ করিয়া আকস্মিক প্রচণ্ডভাবে আসিতেছে না—ধীরে ধীরে সমগ্র দেশকে মরণের মুখে টানিতেছে, তাই আমরা ইহার উগ্রতা ও প্রচণ্ডতা তেমনভাবে বুঝিতে পারি না। তাই মনে হয় ভগবান—সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যাহাদের দিয়াছ তাহাদের উপর এ প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা কেন—যাহাদের লইয়া জীবন্ত মরণ খেলা খেলিতেছে তাহাদেরই একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেল না কেন?

• • •

এবার বাংলা দেশের এক দিকে হইয়াছে বিপুল বন্যা—আর একদিকে ষোটেই জল নাই। পশ্চিমে বেজায় বন্যায় সব ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে—আর পুবে বর্ষার আভাসও নাই। এক-দিকের শস্যরাশি অতল-জলে ডুবিয়া পচিয়াছে, আর এক দিকের ধান, পাট, জলাভাবে শুকাইয়া গিয়াছে। বন্যার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাভাব, মড়ক প্রভৃতি আসিবে, আবার যে দেশে বর্ষার জল নাই সে দেশেও খাদ্যাভাব ও নানা ব্যাধি পীড়ার প্রকোপ খুবই দেখা দিবে। ইতিমধ্যেই দেশে ধান, চাল, খাদ্য দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া গিয়াছে, নানাস্থান হইতে ম্যালেরিয়া মহামারী ও নূতন নূতন ব্যাধির সংবাদ আসিতেছে। অবস্থা দেখিয়া বোঝা যাইতেছে দেশের অবস্থা এবার আরও ভীষণ বিচিত্র হইবে।

• • • •

ঘরে ঘরে অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব এ তো আছেই। তার উপরে দেশে টাকা পয়সার অভাবও দিনে দিনেই বাড়িয়া চলিয়াছে। লোকে অর্থের মুখ আর এখন বড় একটা দেখিতে পায় না। কি ভাবে দেশে অর্থাগম হইবে, কি ভাবে দেশের লোক দু'বেলা দু'মুঠো খাইয়া বাঁচিবে—দেশের এই জীবন মরণ সমস্যা আজ বড় দুর্ভীষ্ম ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের দায় ও জ্বালা দিনের দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। দেশের লোকে এ অবস্থায় কি করিবে—পরিত্রাণের উপায় কি?

• • • •

দেশের লোকের মনে কোনদিক দিয়া কিছুতেই আর কোন আশা উৎসাহ জাগাইতে পারিতেছে না। অভাবের তাড়নায় মানুষের সকল আশা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। যে দিকে চাহিতেছে দেশের লোক সেই দিকেই দেখিতেছে রুদ্ধ দুয়ার—আশাভঙ্গে বার বার প্রতিহত নিরাশ হইয়া ফিরিতেছে। জীবন এখন আনন্দের উৎস না হইয়া ভীতি ও নিরানন্দের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশ জীবনের উপর কত পাপ ও পুঞ্জীভূত জ্বালার জঞ্জাল যে জড় হইয়া দেশের আজ এই অবস্থা ঘটাইয়াছে তাহা কে বলিবে।

• • • •

দিল্লী সহরে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইবে। এই বিশেষ অধিবেশনেও যদি তৃণমাত্র কাউন্সিল প্রবেশ লইয়াই বাদ প্রতিবাদ চলে ও ইহার উপরেই কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের সার্থকতা নিহিত থাকে তবে এমন অধিবেশন দেশবাসী সাধারণের পক্ষে আদৌ সার্থক

হইবে না। এই সামান্য ব্যাপারে নানা জটিলতার আরোপ করিয়া অনর্থক কিনিসটার এমন একটা গুরু রূপ দেওয়া হইয়াছে যে ইহার বচ্‌কচিতে সারা দেশ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। কাউন্সিলে দেশ-হিতকামীগণ গিয়া যদি দেশের শাসন প্রথার নূতন রূপ দিতে পারেন—যো হুকুম গাহিবার পরিবর্তে যদি দেশীয় মনুষ্যত্বের স্বরূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারেন তবে তাহাতে দোষের কি থাকিতে পারে। দেশ কার্য্যে যোগ্যতার প্রমাণ দেশহিতকামীগণ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় নানা দিক দিয়াই দিতে পারেন। কিন্তু সমগ্র কংগ্রেসটীকেই শুধু কাউন্সিল-মুখী করিতে চাহিলে চলিবে কেন? কাউন্সিলটাই এখন দেশের পক্ষে একটা বড় কথা নহে, কাউন্সিলের বাহিরেও দেশের কার্য্য করিবার যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে। কাউন্সিল বয়কট করা যখন সম্ভব হয় নাই তখন সেখানেও যোগ্য লোক যাওয়া প্রয়োজন।

• • •

কারামুক্ত নেতারা একে একে কারাগারের বাহিরে আসিতেছেন—দেশের লোকে আশান্বিত হইতেছে, কারা-মুক্ত নেতাদের মুখ হইতে তাহারা আশার বাণী শুনিবে একটা কর্ম্মপদ্ধতি পাইবে—এই আশা করিয়া তাহারা আছে। কখনও আশা পাইতেছে, কখনো নিরাশ হইতেছে—আশা নিরাশার মধ্য দিয়া দেশবাসী মুক্ত নেতাদের অভিনন্দন করিতেছে।

• • •

মৌলানা মহম্মদ আলি, ডাঃ কিচলু, শেঠ যমুনালাল বাজাজ ইঁহারা সকলেই বলিতেছেন মহাত্মাকে যেমন করিয়াই হউক মুক্ত করিতে হইবে। ভারতের দেহের ভিতরে ভারতের মুক্তিমন্ত্রের গুরু যত, ইঁহার মুক্তির উপরে ভারতের মুক্তি-সাধনা নির্ভর করিতেছে। মহাত্মা মুক্ত হইবেন এমন একটা গুজবও ইতিমধ্যে রটিয়াছে—কেহ বলিতেছেন আমলাতন্ত্র কৌন্সিল নিরাপদ রাখিবার জন্য মহাত্মাকে মুক্তি দিবেন—একথা আমাদের বিশ্বাস হয় না। কারণ আমলাতন্ত্র কৌন্সিলের মূল্য কতখানি—ও মহাত্মার কর্ম্মের প্রভাব কতখানি তাহা দেশবাসীর অপেক্ষাও অনেক ভালভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। সমগ্র দেশের মিলিত আকাঙ্ক্ষার ফলে যদি মহাত্মার মুক্তি সাধিত হয়, তবেই মহাত্মার মুক্তি সার্থক, নতুবা দেশের পাপের ভার তো তিনি হাসিমুখেই বরণ করিয়া লইয়াছেন, আত্মাহুতি দিয়াছেন। পথ কি—কোন পথ মুক্তির ইহা লইয়া আজ অনেক কথাই হইতেছে—মহাত্মার পথও ছিল শক্তি সাধনারই পথ, বিরাট শক্তিকে আত্ম-শক্তিতে প্রতিহত করিবারই পথ। জনমতের জাগরণে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত লাহনার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিতেছিল—আর আজ কোন পথে ভারতের মুক্তি সাধনা চলিবে কে জানে?

• • • •

আগামী কল্য কংগ্রেসের অধিবেশন। মৌলানা মহম্মদ আলি, কিচলু, চিত্তরঞ্জন, মতিলাল, আজাদ, শ্রীমতী সরোজিনী প্রভৃতির দিকে সমগ্র দেশ চাহিয়া আছে। ভুল মতবাদে আজ দেশময় যে ভেদ ও কর্ম্ম শিথিলতা আসিয়াছে তাহা হইতে দেশ পরিত্রাণ চাহিতেছে। আশাহীন দেশ আজ জীবনে আশা চাহিতেছে। দেশ নেতাগণ দেশবাসীর কামনা সফল করুন!

• • • •

আমাদের দেশের শিল্প বাণিজ্য মৃতপ্রায়। কি করিয়া দেশের শিল্প বাণিজ্যের এ অবস্থা হইল তাহার ইতিহাসও বিচিত্র। কিন্তু আজ বিদেশী শিল্প ও পণ্যদ্রব্য যাহা আমাদের দেশে জাঁকিয়া বসিয়া আমাদের দেশের অর্থ, সম্পদ শ্রী শোষণ করিয়া লইতেছে তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায়ও যেন আমাদের নাই। আমরা বিদেশীদের পণ্য কিনিয়া তাহাদের পেটের খাবার ও বিলাসিতার উপকরণের যোগাড় করিয়া দিয়া নিজেরা অনশনে থাকি আর পরিবর্ত্তে তাহারা আমাদের নিত্য অপমান, সহস্র লাঞ্ছনা করে। মানুষের মত ব্যবহার আমাদের উপর করে না। এমনি অবস্থা যখন আমাদের প্রাণে বড় বাজে তখন আমরা বিদেশী দ্রব্যজাত বয়কট করার কথা তুলি। জগতের সকল আত্মসম্মানী দেশের লোকেরাই বিদেশী পণ্য বিষবৎ বর্জ্জন করে শুধু পারি না আমরাই। বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিব, নিজেরা বাঁচিবার উপায় করিব তাহার মধ্যেও আমরা নানা বাই-ইজ্‌ম ধার্য্য করিয়া লই—উচিত অনুচিত বিচার করি। কিন্তু ইহা

কি আমাদের মহানুভবতা না মানুষ বলিয়া পরিচিত হওয়ার অযোগ্যতা! জোর করিয়া যদি আমরা শুধু পরদেশী পণ্য বর্জ্জন করিতে পারিতাম—তবে আমাদের লাঞ্ছনার গ্লানিভারের অনেক উপশম হইত। বিদেশীদের আমাদের খাইয়া আমাদের উপরেই এই যে ভাণ্ডা খুরাণোর প্রবৃত্তি তাহাও অনেকটা লাঘবে আসিত। কিন্তু এইভাবে বিদেশী পণ্য বয়কট করিতে গেলে আধুনিক সভ্যতার উজ্জ্বল মোহ ছাড়িয়া আবার যে আমাদের তাঁতী ও কুমার সাজা ভিন্ন গতি নাই। কারণ এই যে ভারতের যাহা সভ্যতা ইহার মধ্যে তাহার নিজস্ব তো কিছুই নাই। সবই যে ধার করা, তাহাতীয়ের বয়কট অর্থ হইবে তাহার মধ্যকার বাহ্য সভ্যতার বয়কট, ধার-করা বাবুয়ানীর বয়কট,—আর এই বয়কটে যদি সে নিজস্ব দীনতার দিকে চাহিয়া নিজ অবস্থা বুঝিয়া তাহার প্রতিকার সাধন করিতে পারে।

• • • •

আমাদের দেশে মেয়ে পুরুষের অবাধ মেলা মেশা নাই। ইহার ভাল ফলও যেমন দেখানো যায় মন্দ ফলও তেমনি দেখানো যায়। দেশে যাহারা মেয়েদের স্বাধীনতা করিবার পক্ষপাতী তাহারাও মেয়েদের পর্দ্দা একেবারে তুলিতে নারাজ। শুনিলাম এই সহরে মেয়েদের একটি বিদ্যালয় হইয়াছে, তাহাতে প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় ধরণের শিক্ষাই দেওয়া হইবে। দিনে আসন পিঁড়িতে ভারতীয় ধরণে আহারের ব্যবস্থা, সন্ধ্যায় টেবিল চেয়ারে ডিনার—নৃত্যাদির ব্যবস্থা। দিনে ভারতীয়, রাত্রে পাশ্চাত্য ভাব। ইহার ভাল মন্দ বিচার করিতে যাইতেছি না—কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে পুরুষদের মেলা-মেশার একটা ব্যবস্থা হওয়া দেশে প্রয়োজন। শিক্ষিত পুরুষ ও নারী ইহারাও মিলিতে মিলিতে পারিবে না, ভাব বিনিময় করিতে পারিবে না—চিরকাল বাঙ্গালীর জীবন এমন Chivalry, gallantry বিহীন হইয়া থাকিবে এই বা কেমন কথা! জীবনে নূতনত্ব বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন।

• • • •

নেশন পত্রিকাখানি দেশীয় সামন্ত রাজাদের সম্বন্ধে নিত্য অনেক নূতন খবর প্রকাশ করিতেছেন। সম্প্রতি বালোয়ারের মহারাণা সম্বন্ধে নেশন একটি বিচিত্র খবর বাহির করিয়াছেন। এই সামন্তরাজ মহারাণা নিজ রাজ্য ছাড়িয়া নাকি বিলাতেই বরাবর বসবাস করিতেছেন; আর তাঁহার রাজ্য শাসন করিতেছেন ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান কর্ম্মচারী। নেশন অনেক বড় বড় হাম-বড়া সামন্ত রাজাদের ঘরের কথা বাহির করিতেছেন অথচ এ পর্য্যন্তও সামন্তরাজ রক্ষা আইন ইহার উপর প্রয়োগ হইতেছে না এই আশ্চর্য্য!

• • • •

গত সোমবার সন্দেশ সম্পাদক সুধর্ম্মা সুকুমার রায়ের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও চিত্র ব্যবসায়ী ৺উপেন্দ্রকিশোর রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। নিজেও সুলেখক ছিলেন, ইঁহার মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত।

ব্যথার ব্যথি

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

ক্ষুব্ধ পবন গুমরিয়া মরে
স্তব্ধ বেদন বহিয়া,
গগনের বুকে কালো হ'ল মেঘ
দহন-জ্বালায় দহিয়া।
শাঙনের ধারা আকুল কাঁদিয়া,
শুষ্ক হ'তে পাতা পড়িছে ঝরিয়া,
অসীম সিন্ধু মরে গরজিয়া—
ধরণীর ব্যথা হেরিয়া;
ম্লান ছবি তার রাখিয়াছে সবে
আপন মর্ম্মে আঁকিয়া।

পত্রের স্বল্পে ফাঁসী আটকা

যাক বাঁচা গেল। গর্ভ লীগ নেতৃত্বে যে অনুসন্ধান সমিতি, ভারতীয় জন মাজিষ্টর সচিব অমাত্য ডাক্তার পুলিস প্রভৃতি মহা পরোপকারী চাকুরিয়াদিগের হীন অবস্থার তদন্ত করিবার জন্য গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা কবির মানস-স্বর্গ ভারতবর্ষের বহু যাবতীয় দর্শনযোগ্যস্থান গুলি না দেখিয়া, কেবল দিল্লি হইতেই ফিরিয়া যাইবেন না। সে কি হয়? ভারতের অতিথি তাঁহারা। ভারতের মৃত গরীমার অবশিষ্ট যা কিছু আছে তাহা তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাইবেন বৈ কি। অস্ত্রতাও ত একটা আছে। তাতে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হইবে। তা হউকই বা। তেত্রিশ কোটীর পিঠে তা একগাছি তৃণের সমান। তবে উপকথার 'উটের পিঠের শেষ তৃণের' কথা যদি কেহ বলে, তাহারা নিতান্তই নির্ব্বোধ। অন্ত তাগ —কিবা রাত্রি কিবা দিন!

বিবাহ-বন্ধন

মার্কিন যুক্তরাজ্যে প্রতি মিনিটে ষাট হাজার করিয়া বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। ইংলণ্ডের অবস্থাও অনেকটা সেই প্রকার। প্রকৃত প্রস্তাবে কাগজপত্রে সহিকরা একরার-নামায় বিবাহ বন্ধন যে সকল দেশে প্রচলিত আছে, প্রায় সেই সকল দেশেরই বন্ধনটা "যত্র আটুনি ফস্কা গেরো"তে দাঁড়ায়। অথচ, হিন্দুর বিবাহ বন্ধনের কোনও দলিল দস্তা-বেজ থাকে না। ব্রাহ্মণ, নারায়ণ আর অগ্নি সাক্ষী করিয়া দুইটী অজানা মানুষ জীবনব্যাপী মহা বাঁধনে বদ্ধ হয়—সেই বাঁধন আর কিছু ছিন্ন হয় না। পক্ষান্তরে বহুকাল পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, ভাল করিয়া নিজ নিজ মন ও রুচির কষ্টি পাথরে পরস্পরকে যাচাই করিয়া পরিণত বয়সে যে বিবাহ হয়, তাহার অবস্থা দুধ-পানের মত প্রতি মিনিটে ষাট সহস্রধা। এদের সত্যতারই অনুকরণ করি আমরা। ধন্য দুই!

খ্রীশেষ চেক্সে বকশিস দড়

ইতিপূর্ব্বে কটকের পুলিস একবার আদেশ জারি করিয়াছিল যে রাত্রি ৯টার পরে শোভা যাত্রার সঙ্গে কেহ গান গাহিতে পারিবেনা—পাছে খেতাঙ্গ রাজ কর্ম্মচারীদের নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। আহা পদ্‌ক্, টেনিস, পলো প্রভৃতি কার্য্যে সারাদিনব্যাপী পরিশ্রমের পর বেচারিরা সাঁঝের ঝোঁকে একটু ঘুমাইতেও পাইবে না? যাহা হউক, এ আদেশ পরে প্রত্যাহার করা হইয়াছিল। সম্প্রতি আবার অতিভক্ত শান্তিশৃঙ্খলার মূর্ত্ত্য দেবতারা মহরম পর্ব্ব উপলক্ষে রাত্রি দশটার পর তাজিয়ার সঙ্গে সঙ্গীত নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারি করিয়াছিলেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কিন্তু সেই সময়টা আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন।

ভালের দর টাকায় তিন পোয়া

কলিকাতার বুকে জল মিশ্রিত দুগ্ধ বিক্রয় হয়, তাহাতে কোন আইনেই বাঁধে না। ব্যাপারটা তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে ইহাতে কত প্রকারের অনিষ্ট হয়। প্রথমতঃ সহরতলীর পচা,নানা ব্যাধির বীজাণুদূষিত জল আমাদিগকে দুগ্ধ বলিয়া কিনিয়া খাইতে হয়। ফলে, কলিকাতার 'শিশু মৃত্যুর' সংখ্যাও এতটা বাড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ টাকায় চারি সের হিসাবে যে দুগ্ধ বিক্রয় হয়, তাহা Hydrometre দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাতে দশ আনা জল বাকি ছয় আনা দুধ। এই হিসাবে এক টাকায় মাত্র দেড় সের দুধ আমরা কিনিয়া খাই। এই প্রকার টাকার পাঁচে তিন সের, তিন সের ইত্যাদি হরেক রকম দরে দুগ্ধ বিক্রয় হয় এবং হিসাব করিয়া দেখিলে মিশ্রিত দুগ্ধে টাকাপ্রতি কখনও দুই সেরের বেশী দুধ কেহ পায় না। অথচ খাঁটি দুধ কিনিলে টাকায় আড়াই সের পাওয়া যায়। যাহাদের জল মিশ্রিত দুধ ব্যতীত হজম হয় না, তাহারা ত পরিষ্কার কলের জল বাড়ীতেই মিলাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু বেশী পাওয়ার মোহে কেহই এই সহজ কথাটা বুঝে না। নিরক্ষর গয়লারা প্রতিদিন এমন করিয়া আমাদিগকে চক্ষের উপরই ঠকাইয়া যায় এবং মনে মনে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে। সুসভ্য কলিকাতার আদর্শ মিউনিসিপাল

শাসনের উপযুক্ত সার্টিফিকেট বটে। আমরাই নাকি পৃথিবীর মধ্যে একটা বুদ্ধিমান জাতি। হেক্ আত্ম-প্রবঞ্চনা।

মৃতের মর্য্যাদা

মহারাণা গেইকোয়ারের বিধবা মৃত্যুসংবাদ রটনার সঙ্গে সঙ্গেই বিলাত এবং ভারতের শ্বেতাঙ্গ কাগজ-ওয়ালাদের মধ্যে জিঘাংসার আনন্দস্রোত বহিয়া গিয়াছিল। অনেক পুরাণো কাসন্দি ঘাটিয়া প্রভুরা "বিপ্লববাদীর আশ্রয়" মহারাণার মৃত্যু সংবাদ পল্লব করিয়াছিলেন। বিগত মিসি ধরবাঁরের কাহিনী তুলিয়াও বিলাতের বড় বড় কাগজ ওয়ালারা মৃতের প্রতি শ্লাঘনোচিত সম্মান প্রদর্শনের নমুনা দেখাইতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। মহারাণা জীবদ্দশায়ই তাঁহার প্রতি ইংলণ্ডের জনসাধারণের মনের ভাবটা জানিতে পারিলেন—ইহাও এক প্রকারের লাভ। পক্ষান্তরে শ্বেতাঙ্গ পত্রগুলির বিরক্তিই মহারাণার রাজকীয় গুণের অত্যুচ্চ প্রশংসার নিদর্শন। কারণ, কেহই একসঙ্গে ভগবান এবং শয়তান উভয়ের সন্তুষ্টিবিধান করিতে পারে না। মহারাণা স্বীয় রাজ্যে প্রকৃতিপুঞ্জের চক্ষে মূর্ত্ত্য ভগবানতুল্য। প্রজাবর্গও তাঁহার কাছে সন্তানাধিক স্নেহের পাত্র। কাজেই তাঁহাকে ভারতের শোণিতপুষ্ট বিদেশীয়ের অপ্রীতিভাজন হইতেই হইবে।

সাম্রাজ্য দিবস

সালেম মিউনিসিপালিটির সভাপতি এক আদেশপত্র জারি করিয়া সাম্রাজ্য দিবস উপলক্ষে তাঁহার অধীনস্থ স্কুল আফিস প্রভৃতি বন্ধ রাখিবার প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন। শুভ সংবাদ। পরাধীন ভারতবর্ষ রাজাদেশে অজস্র শোণিতপাত করিয়া মহাযুদ্ধে রাজার হাতে বিজয়শ্রী বহন করিয়া আনিয়া দিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে জালিওয়ানাবাগ, চাঁদপুর, মুলতানের শান্তি শৃঙ্খলার প্রেতলীলা নিবারিত হয় নাই। শিখগণ ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে জার্ম্মাণীর বুক তরবারির আঘাত বুক পাতিয়া লইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে অমৃতসরের সহস্র নিরস্ত্র আকালীর নগ্ন বুকের উপর গ্রেডস্মৃতা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় নাই—আফ্রিকা, কানাডাতে কৃষ্ণাঙ্গের নির্য্যাতন প্রশমিত হয় নাই। সেই ভারতের আবার বিজয়ে আনন্দ বা পরাজয়ে দুঃখ কি? মস্তক থাকিলে ত' শিরঃপীড়া সম্ভব হয়।

টাইমস্‌এর হিতোপদেশ

মুম্বাইনগরের 'টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া' আসন্ন নির্ব্বাচন সমস্যার অবতারণা করিয়া ভূতপূর্ব্ব মজলিসী মহাশয়দিগকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের আর বিশ্রামের অবসর নাই। এবার তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে নির্ব্বাচনকারীদিগকে উত্তমরূপে গড়িয়া পিটিয়া লওয়া। তাঁহারা নির্ব্বাচনপার্থী হইবে অতীতের রহিয়াসহিত ঘোসনাযের জোরে কিন্তু স্বরাজ্যদল নির্ব্বাচন প্রার্থনা করিতেছেন গায়ের জোরে। এই বৈষম্যটুকু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিলেই নাকি কেল্লা ফতে হইয়া যাইবে। পুরাতনরা যাইতেছেন গঠন করিতে আর স্বরাজ্যদল, যাইতেছেন ধ্বংস করিতে—এটুকু বুঝাইয়া বলিতে পারিলেই নাকি দেশের আবালবৃদ্ধ সকলে পুরাতনের গলায় বিজয় মাল্য পরাইয়া দিতে পথ পাইবে না। বলিহারি! যেন বিগত দুই বৎসরব্যাপী মজলিসী কীর্ত্তি কলাপ সকলই দেশের লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। এদেশের শাস্ত্রকাররা কাণা চক্ষু বেদনা সহ্য করার অপেক্ষা বরং চক্ষুহীন হইয়া থাকাই শ্রেয়ঃ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। লবণ শুল্ক বৃদ্ধি, ডাকমাশুল বৃদ্ধি, আদালত খরচ বৃদ্ধি, আবকারি নির্য্যাতন, মূলী পীড়ন, দেশ-নায়ক বৃন্দকে জেলে পুরিয়া চোর ডাকাতের অধম অত্যাচার—এ সকলের প্রতিকারে যে মজলিসীগণ ক'ড়ে আঙুলটি পর্য্যন্ত তুলিতে পারেন নাই—তাঁহাদের মজলিস থাকার চেয়ে বরং ভাঙ্গিয়া ফেলাই শ্রেয়ঃ—একথা ভারতবর্ষ বুঝিতে পারে! তাঁরা নিজতলা আর কাঁসারিপট্টির দুই ঘাটই চিনে—তবু বলিয়া রহিয়াছে, তাই কথা বলে না।

হিন্দু মুসলমান

এদেশে গবর্ণমেণ্ট পাকা ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া হিন্দুস্থানের অনেক মুসলমানই বিলাফত সমস্যার সমাধান হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ মুসলমান নেতৃবৃন্দ এ প্রসঙ্গে বহুস্থলে তাঁহাদের স্পষ্ট মত প্রচার করিয়াছেন। মুসলমান বলিকার শক্তি

সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এখনও এজোরা সরকারকে, তথা সমগ্র জগতের মুসলমানজাতিকে আরও বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। একথা কোনও খাঁটি মুসলমানেরই ভুলিয়া যাওয়া সঙ্গত নহে। বিলাফত ব্যাপারে হিন্দুরা যেভাবে মুসলমান নেতৃবর্গের পাশে দাঁড়াইয়া সহায়তা করিয়াছে, ভবিষ্যতেও সেই প্রকার সহায়তা করিবে; এবং একথা বলিলে অন্যায় হয় না যে, সেই প্রকার সহায়তা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় বা অযাচিত বলিয়া বিবেচনা করিলে হিন্দুদিগের প্রতি সুবিচার করা হইবে না। এমন অবস্থায়—শুদ্ধি আন্দোলন, হিন্দুদিগের স্বাস্থ্যানুশীলন, সংহতিবদ্ধ সংস্কার চেষ্টা প্রভৃতি ব্যাপারে বিদ্বেষের ছায়া দেখিয়া মিথ্যা আতঙ্কে প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষী মুসলমান মাত্রেরই হিন্দুর সংস্কারগত নিষ্ঠার হানিজনক কোনও কার্য্য করা ন্যায়ানুমোদিত নহে। একটুকু ভাবিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সকল ধর্মাবলম্বীরই অপরকে নিজ নিজ ধর্মে দীক্ষিত করিবার স্বাধীনতা আছে। এতদিন হিন্দুগণ ইচ্ছায় সেই অধিকার ব্যবহার করে নাই। তাই বলিয়া কোন কালেও যে তাহারা তথাকথিত বিধর্মীকে স্বীয় ধর্মে গ্রহণ করিতে পারিবে না এমন কথা কোনও সচ্চিন্তক মুসলমানই ভাবিতে পারেন না। সুলক্ষ্য—যখন হিন্দুস্থান হিন্দু মুসলমান উভয়েরই মাতৃভূমি এবং এই হিন্দুস্থানের জল-ফল-শস্য-বাতাস-পুষ্ট দেহ যখন হিন্দু মুসলমান উভয়কেই অবশেষে এই হিন্দুস্থানের মাটীতেই মিশাইয়া দিয়া যাইতে হইবে, তখন অযথা কল্পিত শত্রুহাতের সৃষ্টি করিয়া নিজের ঘরে দুই ভাই মারা-মারি কাটা-কাটি করিতে থাকিলে শুধু শত্রুকেই হাসান হইবে, একথা হিন্দু মুসলমান দুইয়েরই বুঝা উচিত। ভারতবাসী বলিতে যখন হিন্দু মুসলমান কেহই বাদ পড়ে না, তখন এই স্বরাজসাধনার দিনে আবার গৃহ-বিবাদের সৃষ্টি করা কেন? আমরা এ বিষয়ে দিল্লীতে সমবেত হিন্দু মুসলমান নেতৃবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। এ সমস্যার সমাধান যতদিন না হইবে, ততদিন কোনও ভারতবাসীর অন্য কোনও রাজনীতি-আলোচনা করিবার অবসর থাকিতেই পারে না। উভয় সম্প্রদায় যেদিন পরস্পরের ধর্মসংস্কারের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া একত্র স্বরাজ সাধনায় বদ্ধ পরিকর হইয়া দাঁড়াইবে—তখন সেই মহান সাধনার পথ হইতে নিমেষে সকল বাধা দূর হইয়া যাইবে। আর যতদিন হিন্দু মুসলমান এমন করিয়া গৃহ বিবাদে পরস্পর পরস্পরের মাথায় লাঠি ঝাপাইয়া থাকিবে—ততদিন স্বরাজের কথা বলাই একটা তীব্র পরিহাস মাত্র। *

অসময়ে

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী]

(১)

আমি যখন তোমায় চাহি নাথ!
　　তুমি তখন আমায় চাহ নাকো;
আমি যখন ব্যস্ত নানা কাজে,
　　তুমি তখন হেসে হেসে ডাকো!
কেমন ক'রে এসব ফেলে দিয়ে,
থাকবো আমি তোমার কাছে গিয়ে?
কেমন ক'রে হবে আমার যাওয়া?
　　দাঁড়াও, ওগো একটুখানি থাকো;
তোমার কাজেই ব্যস্ত আমি প্রভু!
　　অসময়ে বড়ই তুমি ডাকো!

(২)

তোমার গেহ হয়নি যে গো গড়া,
　　হয়নি রচা কুসুম দিয়ে বেদী;
ঘুচীয়ে মোর থাকবে কোথা নাথ!
　　হেথায় তুমি এসেই পড় যদি?
হয়নি যে গো আসনখানি পাতা,
তোমার তরে ফুলের মালা গাঁথা,
হয়নি যে গো পূজার আয়োজন,
　　তাইতো ব'সে ভাবছি নিরবধি;
তোমার কাজেই ব্যস্ত আমি নাথ!
　　হেথায় তুমি এসেই পড় যদি।

(৩)

এসব আমার সেরে যেতে নাথ!
　　একটুখানি দেরী-ই যদি হয়,
তুমি যেন রাগ ক'রোনা ওগো!
　　পথের পানে আঁখি যেন রয়।
আমায় যেন যেওনাকো ভুলে,
যখনই যাই কোলেই নিও তুলে,
হেসেই যেন আমার পানে চেয়ো,
　　মুখ ফিরিয়ে দেখিও না ভয়;
তোমার কাজেই ব্যস্ত আমি প্রভু!
　　পথের পানে আঁখি যেন রয়।

দেশ-বিদেশ

জাপানে মহাযুদ্ধ

বিলাতে লর্ড বেভারের উদ্যোগে যে মহাযুদ্ধ ভাণ্ডার গঠিত হইয়াছে, ইতিমধ্যে তাহাতে ৮০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১২ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে ব্রিটিশ সম্রাট নিজে দিয়াছেন ৫০০০৲ টাকা।

রুটারের বিশ্বস্ত খবরে প্রকাশ ইতালী এবং গ্রীসের মধ্যে মনোমালিন্য প্রায় মিটিয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষ শীঘ্রই রাজদূত সম্মিলিত সীমান্তের সর্ত্তগুলি নিরোধার্য্য করিয়া লইবে। শুভ সংবাদ।

ব্রিস্টলের মেয়র নেতৃবর্গ কর্পোরেশন যাবত খাস মৌজ ক্রীত হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এবং ব্যবস্থাপক সভা প্রবেশ এ দুইটি গুরুতর ব্যাপারের মীমাংসার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। মালয়াজী, বঙ্গলাল মহাশয় আদি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন।

"লোকমান্য" পত্রিকার পূজায় প্রতিনিধি জানাইয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধীকে ৩৯ দিনের জন্যই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে বলিয়া গুজব রটিয়াছে।

"বেঙ্গলী" পত্রে শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছিল যে, তিনি নাকি সুরেন্দ্রনাথের সাহায্যে একটি ৫ হাজার টাকার চেক পাঠাইয়াছেন। তাই বাবু সুরেন্দ্রনাথের কাছে একখানা চিঠি লিখে এই বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাহার উত্তরে সার সুরেন্দ্রনাথ জানাইয়াছেন—"আমি কোন দিন কোন টাকা শ্যাম বাবুকে দেই নাই। অথবা কোন ইউরোপীয়ানকে চেক পাঠাইতে অনুরোধ করি নাই।"

তাঁতারালের রাজকুমারের গাড়িখানা মেরামত হইয়াই যেন রহিল। কোথায় মরিয়াছে কি খাঁকিয়া আছে, সেই প্রশ্নটা কেমন করিয়া কে যে করিবে বুঝা যায় না। মার্কিনি মহলে মাকি গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই ব্যাপারের তদন্ত করিতেছেন, সাক্ষ্য সাবুদ গ্রহণ করিতেছেন। তাঁতারালের মহারাণীকে দেখিতেছি, খুন করিয়াও কেহ দিতে পারিতেছেন না, আবার গ্রহণও করিতে পারিতেছেন না। হাইকোর্টে মামলার ব্যাপার আপীল উঠিয়াছে—দেখা যাক্ কি হয়। যমরাজ

গত সপ্তাহে চাকার এক মহার ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। সেখানকার ইউনিভার্সিটির কর্ত্তৃপক্ষ টাকার বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করায় সমস্যার চাকরেরা মাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কয়েকজন কমিশনারও এই প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধী। এই সম্পর্কে সেদিন ইউনিভার্সিটির এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভা বসিবার পূর্ব্বে দলে দলে কলেজের আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। অবশেষে ভিতরে জায়গা না হওয়ায় সভা বন্ধ হয়।

গত ৩রা তারিখে মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ৪৫ জন বাসিন্দা হইয়াছে। বরিশালের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ২-জন আসামীর মধ্যে একজনকে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং বাকী ১৭ জনের তিন হইতে নয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বাংলার শেষ স্বাধীন নরপতি বিক্রমপুরের ভূলুয়া কেদারনাথের অনুপমানে যে মন্দিরের অভ্যন্তরে চূড়া পড়িয়া গিয়াছে, যে শিবমন্দির এত দূর বলিয়া কত লক্ষ বাঙ্গালীর প্রাণে সেই স্বাধীন যুগের গর্ব্বমণ্ডিত চিত্র জাগাইয়া তুলিত, গত সোমবার সেটা ভাঙ্গার সময় সেই রাজবাড়ীর "মা" পদ্মার গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। পদ্মার এদিকের নাম কীর্ত্তিনাশা। রাজকবির অমূল্য কীর্ত্তিরাশী উদরে করিয়া কালস্রোতা পদ্মা এইবার পাইয়াছিল। আজ বিক্রমপুরবাসিদের সেই কীর্ত্তিমুক্ত উদরে করিয়া সর্ব্বনাশী পদ্মা "কীর্ত্তিনাশা" নামের পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিল।

পৃথিবীতে সমস্ত মোটরের সংখ্যা কত জানেন? ১৫,০০০,০০০। ইহার মধ্যে একা আমেরিকার মোটরের সংখ্যাই হইতেছে ১২,০০০,০০০।

বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, ভারতের বিভিন্ন স্থানের বন্যার সাহায্যের জন্য বোম্বাইয়ের এংলোইণ্ডিয়ানদের একটি সভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী সাইকু প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করেন। সভায় ১১ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। আরো টাকা তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। বাঙ্গালা এবিষয়ে কি করিল?

ব্রহ্মে হীরকখচিত বুদ্ধমূর্ত্তি

সেরোবোতে ঐতিহাসিক আবিষ্কার

ব্রহ্মের সেরোবোতে একটী মূল্যবান ঐতিহাসিক আবিষ্কার হইয়াছে। একটী পুরাতন প্যাগোডা ভাঙ্গা হইতেছিল, এমন সময় তাহার মধ্যে অনেকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে একটী হীরক-খচিত এবং আর অনেকগুলি স্বর্ণ, রৌপ্য, অথবা বিভিন্ন ধাতু নির্ম্মিত। লোকের বিশ্বাস যে, একজন প্রাচীন বৌদ্ধরাজ কর্ত্তৃক এই মূর্ত্তিগুলি স্থাপিত হইয়াছিল।

গত সোমবার প্রত্যুষে বাঙ্গলার বায়ুকি খুব খানিকটা বাঘ ঝাড়া দিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গলার সর্ব্বত্র ১০ সেকেণ্ড হইতে ১ মিনিট পর্য্যন্ত ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছিল। সুখের বিষয়, কোথাও বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় নাই। কেবল মালদহে কয়েকের ইমারতের ভূমিকম্পের ফলে আংশিক ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাতে কিছু পরিমাণ টাকা অপচয় হইয়াছে। ভূমিকম্প কলের স্থানে স্থানে ভাসিয়া গিয়াছে।

বর্ষীয়ান ব্রাহ্মসমাজ কবিবর রবীন্দ্রনাথের ঈশানের জন্য পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় মহাশয়ের উপর ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। সম্প্রতি পণ্ডিতজী পদ্মাবতী মন্দির পক্ষে রায় দিয়াছেন। তদ্বিরোধি অপর পক্ষ এ বিচার মান্য করিবেন না। বিলাতে কবীন্দ্রবাবু সমিতির বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষে আবার এ বিষয় উত্থাপন করা হইবে।

সাহায্যের সংবাদে প্রকাশ, রেশ শাহর নাম মাদ্রাজের বন্যার সাহায্যার্থে দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

লণ্ড-ভণ্ড

[শ্রীস্নেহশীলা (বসু) চৌধুরী]

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঘটনাটি পুরাতন।

বালিগঞ্জের ইংরেজটোলার একটা সুবৃহৎ গৃহের অলিন্দে একটি যুবক পদচারণা করিতেছিলেন। যুবকের বয়স অনুমান পঞ্চবিংশ বর্ষ, তাঁহার পরিধানে ঢিলা পায়জামা, তদুপরি একটি ঢলঢলে কোট, পায়ে একজোড়া জাপানী ঘাসের চটি—চোখে চশমা! যুবক সুশ্রী, সুপুরুষ বলা চলে। যুবকের নাম, বিকাশচন্দ্র চৌধুরী, ইনি সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ সি চৌধুরীর একমাত্র পুত্র।

সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই। রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। যুবক অন্ধালোকে হাতেবাঁধা ঘড়িটি দেখিয়া আবার পদচারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যায় যে তিনি অত্যন্ত অন্যমনস্ক। মুহুর্মুহু পথের দিকে চাহিতেছিলেন।

ইহার কারণও ছিল। মিঃ চৌধুরী লাট ভবনে গিয়াছেন, ফিরিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেছে—পিতা কেন এখনো ফিরিলেন না বিকাশ তাহাই ভাবিতেছিল। বিকাশ জানিত, আর সেদিন নাই, যেদিন মিঃ চৌধুরীর ইঙ্গিতে বঙ্গদেশটাই উঠিত, বসিত। আর সেদিন নাই যেদিন বাঙ্গালার নর-নারী সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে তাঁহারই মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। আর সেদিন নাই বাঙ্গালার শিক্ষিত অশিক্ষিত আবালবৃদ্ধ বণিতা তাঁহারই পদনিম্নে বসিয়া দীক্ষা-গ্রহণ করিত। সেদিন গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক গিয়াছে। সে ভক্তি নাই, সে শ্রদ্ধা নাই, সে মন্ত্রের যাদু নাই। অকৃতজ্ঞ বাঙ্গালী আজ মিঃ চৌধুরীর দিকে ফিরিয়াও চাহে না; যদি বা নাই, সে সৃষ্টি হইতে যাহা নির্গত হয় তাহা শ্রদ্ধা বা সম্মান নয়—অথচ একদিন ছিল যখন মিঃ চৌধুরীকে রক্ষা করিতে বাঙ্গালী কামানের মুখে বুক পাতিয়া দিত। যাক—সে কথা। মিঃ চৌধুরী ক'দিনই বলিতেছেন, একদল ছোকরা তাঁহার শত্রুতা করিতেছে। শয়তানের বল তাঁহাকে সর্ব্বথা অনুসরণ করিতে ছাড়ে না—এই জন্যই বিকাশ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। খুব দেরী হইলেও ঘণ্টার বেশী হইবার কথা নয়, সাতটা বাজিয়া গেল—এখনও দেখা নাই—বিকাশ ঘরের মধ্যে আসিয়া টেলিফোনের কল তুলিয়া লইল। কিন্তু কাহাকে টেলিফোন করিবে?—বিকাশ কলটা ফেলিয়া সেখানে বসিয়াই ভাবিতে লাগিল।

পার্শ্বের দ্বার খুলিয়া সুমতি স্বামীর পাশটিতে দাঁড়াইয়া বলিল—এখানে বসে! কি করছ?

বিকাশ সুমতির প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—বাবা কেন এলেন না তাই ভাবছি।

সুমতি বলিল—এতে ভাববার কি আছে? কোথায় গিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন—

বিকাশ ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন—না।

একমুহূর্ত্ত পরে পুনশ্চ কহিল—বাবা ক'দিন বলছিলেন, একদল লোক তাঁর শত্রুতা করবার চেষ্টা পাচ্ছে—তারা তাঁকে অনুসরণ করেও বেড়ায়। সেই জন্যই আমার ভাবনা। কোন বিপদ টিপদ হ'ল না-কি? কিছু বুঝতে পারছি নে।

সুমতি বলিল—তার আর আশ্চর্য্য কি বল? চটাতে ত কাউকে কসুর করেন নি।

বিকাশ রোষদীপ্ত-নেত্রে চাহিয়া উঠিল, সুমতি আর একটি কথাও বলিল না। আস্তে আস্তে যে দরজা খুলিয়া আসিয়াছিল সেই দরজা খুলিয়াই বাহির হইয়া গেল।

ঠিক এই সময়েই মটরের শব্দ শ্রুত হইল। বিকাশ অলিন্দে আসিয়া দেখিল, কে একজন নামিল বটে, কিন্তু পিতা নন্। আগন্তুকের আপাদমস্তক শালাবৃত। বিকাশ সিঁড়ির সম্মুখে আসিয়া ভৃত্যের সংবাদ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। একমিনিট পরেই মিঃ চৌধুরী শাল খুলিয়া উপরে আসিতেই বিকাশ বলিয়া উঠিল—তুমি!

মিঃ চৌধুরী অত্যন্ত গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন হ্যাঁ। ঘরে চল, কথা আছে।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—কতদূর সাবধান হ'য়ে আসতে হ'য়েছে দেখেছ ত! এই থেকেই বুঝতে পারবে যে বিপদ কি রকম ঘনিয়ে এসেছিল। গভর্ণমেণ্ট প্লেসের মোড়ে এসেই আমি বুঝতে পারি একদল লোক আমাকে অনুসরণ করছে, সশস্ত্র, আমাকে মোটরে দেখে তারাও একখানা মোটরে চড়ে পিছু পিছু আসতে লাগল—তখন আমি বাধ্য হয়ে এলগিন রোডে বোস্ সাহেবের বাড়ীতে ঢুকে পড়ি। এতক্ষণ সেখানেই ছিলুম, শেষে তাঁরই কারে, আপাদমস্তক ঢেকে তবে পালিয়ে এসেছি। আমাদের গাড়ী তখানেই পড়ে আছে, কাল সকালে আনতে বলে এসেছি

আপনি তাদের সশস্ত্র দেখেছিলেন?

দেখেছিলাম। অস্ত্রটা দেখতে পাই নি, সেটা কাপড়ে মুড়ে একটা ছোকরা হাতে করে' বসেছিল, তলবারের মতই বোধ হ'ল।

বিকাশ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। বলিল—তাদের গাড়ীর নম্বরটা আপনি দেখেছিলেন কি?

মিঃ চৌধুরী বলিলেন—দেখেছি, কিন্তু সে সব কথা মনেও ঠাঁই দিও না, বিকাশ। তাদের ধরিয়ে দেওয়া হয়ত শক্ত নয়, কিন্তু তারা ত একদলই নয়, অনেক দল অমনি আছে। একদল ধরিয়ে দিলেই শত্রু শেষ হবে না, বরং বৃদ্ধি পাবে।

বিকাশ তরুণ যুবক; শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবাহিত—তদুপরি অর্থবান প্রতিপত্তিশালী পিতার পুত্র। বলিল—আপনি কি বলছেন বাবা? এই সব আমাদের সহ্য করে থাকতে হ'বে। প্রশ্রয় পেলে যে কোনদিন বাড়ী চড়াও হয়ে ঢুকবে। তখন—তখন কি করবেন? একে ত যে ব্যবসায় আমাদের বাড়ী, সময় মত না পুলিসের সাহায্য মিলবে, না কিছু...

মিঃ চৌধুরী বলিলেন—সে কথা ঠিক। সেই জন্যই আমি মনে করছি যে এখন কিছুদিন কলকাতায় থাকতে হ'বে। খবর পেয়েছি এস্প্ল্যানেডের মোড়ে একটা ভাল বাড়ী খালি আছে, কালই সেটা ঠিক করে আসব...

শেষে আমাদেরই বাড়ী ছেড়ে পালাতে হ'বে? তারাই বা কি মনে করবে, বাবা?

সে কথাও আমি না ভেবেছি তা নয় বিকাশ। তাদের মনে করার জন্যে আমি ভাবিনে—কিন্তু গভর্ণমেণ্টের লোকে কাণাকাণি করতে পারে। তাই ঠিক করেছি একটা সাহেব কণ্ট্রাক্টারকে বাড়ীটা সারাবার কনট্রাক্ট দিয়ে দিই, সে কাজ আরম্ভ করবার আগেই আমরা চলে যাই। কি-বল?

এ যুক্তির বিরুদ্ধে কোন তর্কই বিকাশের মনে আসিল না। অধিকন্তু পিতার পাকা-মাথার বুদ্ধিতে সে সন্তুষ্টই হইল।

মিঃ চৌধুরী বলিলেন—আমার মা কোথায়? তাঁকে যে দেখছি নে...

বিকাশ বাহির হইয়া গেল এবং দুই মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে সুমতি।

সুমতি শ্বশুর মহাশয়ের নিকট আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন—হাতে ও কি বই মা?

গীতা, বাবা!

গীতা! তুমি গীতা পড়? ইংরেজী?

না-বাবা! এটা সংস্কৃত গীতা, তলায় বাংলা অনুবাদ দেওয়া আছে।

মিঃ চৌধুরী বলিলেন—গীতা কি এই বয়সে তুমি বুঝতে পারবে মা? আমার ত তা মনে হয় না। ও-সব বই হ'ল বেশী বয়সের লোকের জন্য। অল্পবুদ্ধি লোকে ওর মর্ম সব ঠিক বুঝতে পারে না বিকৃত করে ফেলে। এখন তোমাদের পড়বার জিনিষ ও নয়...

সুমতি নতমুখে স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল—কেন বাবা? আমি ও বেশ বুঝতে পারি। খুব ছেলেবেলায় আমি আর কনক মা'র কাছে বসে গীতা পড়তাম, মা আমাদের বুঝিয়ে দিতেন।

কনক সুমতির একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সুমতির চেয়ে বছর চারেকের ছোট।

মিঃ চৌধুরী বলিলেন—না, না, ও গীতা টীতা নয়। ও সব পড়ে কোন কাজ হয় না। তার চেয়ে আমি বলি কি তুমি দিন কতক ভাল করে ইংরেজীটার চর্চ্চা কর। আমার তখন তোমার দ্বারা অনেক কাজ হ'তে পারবে।

সুমতি কোন কথা কহিল না।

মিঃ চৌধুরী বলিলেন—মা, দিন কতকের জন্য এখান থেকে আমাদের যেতে হবে। এস্প্ল্যানাতে একটা বাড়ী নিচ্ছি সেখানেই থাকা যাবে।

সুমতি বিস্মিতস্বরে কহিল—কেন বাবা, এ বাড়ী?

এটা মেরামত আর রং হবে।

এই যে সেদিন হ'ল বাবা! আবার...

ক্ষতি কি মা! বাড়ী-ঘর-দোর মজবুত রাখতে গেলে মাঝে মাঝে মেরামত করা দরকার আর এবারকার রংটা কারুরই পছন্দ নয়, ওটা বদলে ফেলতেই হ'বে।

সুমতি বলিল—না, বাবা, লোকের অপছন্দ হয়েছে বলেই আবার কতকগুলো টাকা খরচ করবার কোন দরকারই আমি দেখি নে। এ রং আমরাই পছন্দ করে দিয়েছি—বাবা, বদলাবার দরকার নেই।

মিঃ চৌধুরী একবারমাত্র ঝিকাশের দিকে চাহিয়া, বলিলেন—মা, এর অন্য কারণও আছে।

সুমতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

মিঃ চৌধুরী বলিলেন, যা এ বাড়ীতে থাকা আমার পক্ষে বড়ই বিপদজনক হ'য়েছে। তারা আমাকে হত্যা করবার জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হত্যা করবার জন্য! না বাবা, আপনি মিথ্যা খবর পেয়েছেন।

মিথ্যা নয় মা, আমি স্বচক্ষে তাদের হাতে অস্ত্র দেখেছি।

আপনি দেখেছেন বাবা!...কিন্তু এ যে আমি বিশ্বাস করতে পারিনে। তারা ত হিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত নয়...

কে বল্লে নয়? ও সব ভুল শুনেছ মা, ভুল শুনেছ। কতকগুলো বাজে বাংলা কাগজ পড়ে তোমার ভুল ধারণা হয়ে গেছে।

সুমতি একমুহূর্ত্ত কি ভাবিল, তারপর বলিল—না বাবা, ধারণা আমার ভুল নয়। তারা হিংসা করবে না, করতে পারে না—আমি জানি।

আমি যে নিজে দেখেছি মা।

আপনি অস্ত্র দেখেছেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ অস্ত্র বৈ-কি। তবে—তবে—

তবে কি বাবা?

কাপড় ঢাকা কি একটা ছিল বটে...

দেখেন নি। না বাবা, সে অস্ত্র নয়, আর কিছু। তাদের জন্য করবার কিছু নেই বাবা? তার জন্যে আমরা কখনই বাড়ী ছেড়ে যাব না।—বলিয়া সে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

পিতা পুত্র কেহই একটি কথা বলিতে পারিলেন না।

সুমতি এ বাড়ীর গৃহিণী, সুমতি গৃহবাসীদের একমাত্র অভিভাবক। মিঃ চৌধুরী—বিপত্নীক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কয়দিনই সুমতি মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে গিয়াছে। যেখানে তাহার প্রবেশাধিকার ছিল না, সে সমস্ত স্থলেই সে পার্শ্বে মোটরে অপেক্ষা করিয়াছে এবং এই কয়দিনেই সে তাবে ও ভাষায় মিঃ চৌধুরীকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে তাঁহার আশঙ্কা সর্ব্বৈব মিথ্যা। এই যে নিরুপদ্রব প্রতিরোধের প্রবল বন্যা সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া চলিয়াছে তাহার তলে আর যাহাই থাক্ হিংসা নাই। এবং মন্ত্রের দ্রোতা যিনি—হিংসা তাঁহার ধর্ম্ম নয়। অবশ্য এ সকল আলোচনা সে করিত না। আর করিবেই বা কাহার সঙ্গে। পতনের কথা—থাক্ গুরুনিন্দা না-হয় না-ই করিলাম, স্বামী—তিনিও পিতার পুত্র। সেখানেও কোন আশা ছিল না।

আজও সুমতি মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে চৌরঙ্গী দিয়া ফিরিতেছিল। আরমি-নেভির বাড়ীর সামনে আসিতেই মিঃ চৌধুরী আতঙ্ক-বিহ্বল-স্বরে বলিয়া উঠিলেন—ঐ—ঐ...

তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সুমতি দেখিল, একখানা ট্যাক্সি গাড়ী উর্দ্ধশ্বাসে চলিয়া যাইতেছে—দুটা তিনটা মনুষ্যমূর্ত্তিও দেখা গেল।

মিঃ চৌধুরী সাফারকে গাড়ী থামাইতে আজ্ঞা দিতেছিলেন, সুমতি বলিল থামিয়ে কি হবে বাবা? অনর্থক দেরী হবে, তার চেয়ে চলুন—

কিন্তু...

কিন্তু ভয় নেই বাবা, আমি বলছি। আপনার কোন বিপদ হ'বে না, অন্ততঃ আমি থাকতে নয়।

গাড়ী ছুটিতে ছুটিতে একটা গ্যাসল্যাম্পের সম্মুখে আসিতেই মিঃ চৌধুরী সুমতির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে সম্পূর্ণ নির্ভয়চিত্তেই সামনের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। গাড়ী কম্পাউণ্ড পার হইয়া বারান্দার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল—সুমতি অগ্রে নামিয়া মিঃ চৌধুরীর হাত ধরিয়া নামাইয়া লইয়া বলিল—এখানকার আলোটা কেন জ্বাললে না? দাঁড়ান বাবা, আমি আলোটা জেলে দিয়ে আসি, অন্ধকারে আপনি যেতে পারবেন না।

সুমতি দুইটা সিঁড়ি উঠিয়াছে, অকস্মাৎ মিঃ চৌধুরী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। সুমতি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিতেই দেখিল, সে একটা লোক তখনও তাঁহার কাঁধের উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া আছে। চীৎকার শব্দের সঙ্গেই ভৃত্যেরা আলো জ্বালিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, সাকারও আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সকলেই আততায়ীকে ধরিবে কি না ইহাই ভাবিতেছিল, সে কিন্তু সেই অবসরে নড়িলও না, চড়িলও না, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিঃ চৌধুরী হাঁকিলেন, বেঁধে ফেল্ বেঁধে ফেল্। বউমা তুমি টেলিফোন করে দাও। পুলিস এসে শুদ্ধ ডাকাতটাকে নিয়ে যাক্।

সুমতি বৈদ্যুতীক্ আলোকসম্পাতে আততায়ীকে এক-দৃষ্টে দেখিতেছিল, বন্ধনোদ্যত ভৃত্যগণকে হস্তেঙ্গিতে নিরস্ত করিয়া সুমতি বলিল—আপনি উপরে চলুন বাবা। তারপর যা করবার করা যাবে। বলিয়া সে 'ডাকাতটার' উদ্দেশে কহিল—আপনি আসুন?

'ডাকাত' বোধ করি বিস্মিত হইয়াছিল, এক মুহূর্ত্তে সুমতির মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া, পুনরায় নতমুখে কহিল—চলুন।

মিঃ চৌধুরী একবার ডাকাতটার, একবার সুমতির মুখের পানে চাহিয়া ক্রমাগত দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। সুমতি তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল—আসুন বাবা।

ডাকাতটাও সঙ্গে সঙ্গে উপরে আসিল। তাহার অজ্ঞাতসারে তখনও অস্ত্রটা ছিল। সুমতি একখানা চেয়ার দেখাইয়া বলিল—বসুন।

মিঃ চৌধুরী বলিলেন—তাহলে টেলিফোনটা আমিই করে দিই।

না বাবা—টেলিফোন করতে হবে না।

ডাকাতটা চেয়ারে বসিতেই রায় বাহাদুর জ্বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু কোন কথা বলিবার আগেই সুমতি তাহাকে জিজ্ঞাসিল—আপনারা একাজ কতদিন আরম্ভ করেছেন?

ডাকাত নির্ভয়ে উত্তর দিল – কি কাজ?

সুমতি বলিল—এই যা করতে আজ এসেছিলেন।

কি করতে এসেছি?

আপনার হাতে ওটা কি?

ডাকাতটা একখানা প্রকাণ্ড কাঁচি বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল, বলিল—একটু খানি আমোদ করতে এসেছিলুম, কোন ক্ষতি হ'ত না।

মিঃ চৌধুরী গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন আমোদ! রাস্কেল, আমোদ তোর বার করছি। আমোদ...

সুমতি বাধা দিয়া বলিল—কাঁচি দিয়ে কি করতেন?

ডাকাত চৌধুরীর আবক্ষ-বিলম্বিত দাড়ীর পানে লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—একদিকটা কেটে দিতুম। আর কিছু না।

মিঃ চৌধুরী লাফাইয়া কি একটা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সুমতি ডাকাতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল তাতে লাভ?

ডাকাত বলিল—কোন পক্ষেরই লাভও ছিল না, ক্ষতিও না। কিন্তু না, আর কোন কথাই আপনি জিজ্ঞাসা করবেন না, কেননা আমি উত্তর দেব না।

মিঃ চৌধুরি বলিলেন—তোকে আমি পুলিসে দেব, ঘানি টানাব, দ্বীপান্তরে পাঠাব। এই জমাদার এযাদার

সুমতি বলিল—না বাবা, ওঁকে ছেড়ে দিন।

ছেড়ে দেব? কি বলছ সুমতি? না না...

ডাকাত বলিল—আমি ছাড়া চাইনে। আমাকে পুলিসেই দিন।

সুমতি বলিল—না, আপনি যান্—আমি বলছি আপনি যান্।

তুমি এ সবের কি বোঝ, বউমা? ওকে ছাড়া কখনই হতে পারে না। পুলিসে দিয়ে তবে ছাড়ছি বাবা...

না, না, ওসবে তুমি কথা কয়ো না। এই শয়তানদের প্রশ্রয় দিলে...

সুমতি আরক্ত মুখে কহিল—শয়তান ওরা নয় বাবা। ...বাবা, অন্যায় করেছেন, তারই জন্য পথে বার হ'তে পারেন না, তার ওপর আর নিরপরাধকে পুলিসে দিয়ে ফেলেতারী বাড়াবেন না। যান্—আপনি, আমি বলছি আপনার কাঁচি নিয়ে যান্।

ডাকাত বলিল না। ওতে আর আমার দরকার নাই—বলিয়া ডাকাত ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান করিল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শিল্প মঞ্জুরী

[শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়]

প্রথম পর্য্যায়

(৫)

আমাদের বক্তব্য ঃ—এই সমস্ত চিত্র বুঝিবার জন্য ও কাটিং শিখিবার জন্য ব্যায়ামিতির চিত্রের মত চিত্র আঁকিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা সকলেরই উচিত।

ফ্রক্ ঃ—(আর এক রকম ফ্রক দেওয়া গেল আরও বহু রকম ফ্রক হয়)

ফ্রকের মাপ ঃ—

লম্বা—২৬″ ছাতি—২২″ পুট—১০″ গলা—৯″

ফ্রক কাটিবার নিয়ম ঃ—প্রথমতঃ লম্বা মাপে কাপড়ের লম্বা দিক ডবল ভাঁজ করিয়া এড়ো দিকে ডবল ভাঁজ করিতে হইবে। এইটী মনে থাকে যেন এই ফ্রক এক টুকরা কাপড়ে কাটা হইবে। এই ফ্রকের সেলাই ও সব রকম ফ্রক হইতে সহজ। ক, খ লম্বা—২৬″+১½=২৭½″ ক, ঘ ছাতির ¼—½=৫″ ইঞ্চি ঘ, ঙ পুটহাতার মাপ ১০″+½=১০½″ ইঞ্চি। ঘ, ছ ছাতির ½ অংশ+২″ অর্থাৎ ছাতি ½ অংশ ৫½″+২″=৭½″ ইঞ্চি স্থানে চিহ্নিত করিয়া গ, চ, ছ ও চ ½″ ইঞ্চি বরাবর ভিতর দিক চিত্রানুযায়ী সংযোগ করিয়া তারপর খ লাইন হইতে ঘ বিন্দু ১″ইঞ্চি উপরে বাঁকাভাবে ধরিয়া ছ, ঘ চিত্রানুযায়ী দাগিতে হইবে। ক, ঝ গলার মাপের ¼ অংশ অর্থাৎ ৩″ইঞ্চি ক, ট ১″ ইঞ্চি নীচে ট, ঝ সংযোগ করিয়া (দাগিয়া) দাগ দেওয়া হইয়া গেলে ট, ঝ চিহ্নিত রাগে কাটিয়া গ, চ, ছ, ঘ ও ঙ রাগে কাটিয়া লইয়া যে দিকে সামনা রাখা হইবে, সেদিকে ট, ১ চিহ্ন ১½″ইঞ্চি নীচে চিহ্ন করিয়া ঝ, ১ চিত্রানুযায়ী বাঁকাভাবে সংযোগ করিয়া লইয়া ঝ, ১ রাগে কাটিয়া লইলে ফ্রক কাটা শেষ হইল। এখন ফ্রকের কাটা অংশ খুলিয়া ফেলিলে ২০নং চিত্রের মত দেখাইবে।

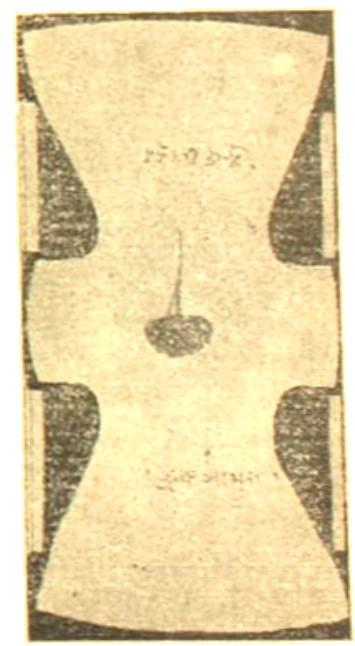

ফ্রক্ সেলাই ঃ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি ফ্রকের পেছন দিকে বোতাম ঘর বসাইতে হয়। এখন পেছন দিকের কাপড়কে মাঝামাঝিতে ৫″ইঞ্চি নীচে কাটিয়া লইতে হইবে ও পূর্ব্বে ফ্রকের মত বোতাম পটী ও কাজপটী তৈয়ার করিয়া নিয়া পুটহাতা মাপ হইতে যে ½″ইঞ্চি কাপড় বেশী রাখা হইয়াছে তাকে উল্টাইয়া তার উপর ইন্‌সেসন বসাইয়া রেখা সেলাই দিয়া হাতে যেরূপ ইন্‌সেসন দেওয়া হইল তদনুরূপ ইন্‌সেসন দিয়া গলা সেলাই

করিয়া দুই পাশ জুড়িয়া বরাবর সেলাই দিতে হইবে। জোড়ার কাজ শেষ হইয়া গেলে নীচের ১½″ ইঞ্চি কাপড় যে বেশী রাখা হইয়াছিল তাকে ভিতর দিক বরাবর সেলাই দিলে কুর্ত সেলাই হইল।

এখন কোমরের নিকট ইন্‌সেদনের একটী বেল্ট (belt) বসাইবার জন্য দুই পাশে দুইটী এক্সেরাপ (Strap) বসাইয়া বেল্ট পরাইয়া লইলে কুর্ত সেলাই হইল।

বোতাম পটী ও কাজঘর ২১নং চিত্রে দেখান হইল। এখন বোতাম পটীতে তিনটী বোতাম ঘর করিয়া কাজঘরের সমস্থানে তিনটী ঝিনুকের বোতাম বসাইয়া লইলে কুর্ত সম্পূর্ণ হইল।

দ্বিতীয় পর্য্যায়

সায়াঃ—বয়স্কা মেয়েরা সায়া বা পেটিকোট কাপড়ের ভিতর পরিবার জন্য ব্যবহার করে। ইহার মাপ লইতে হইলে কোমর হইতে যতদূর লম্বা মাপ লইতে হইবে।

সায়ার মাপঃ—

লম্বা—৩৪″ কোমর—২৮″

সায়া কাটিবার নিয়মঃ—কোমর হইতে লম্বা মাপ যতদূর লওয়া হইয়াছে সে মাপে লম্বা দিক বরাবর ভাঁজ করিয়া এড়ো দিকে কোমরের মাপের ¼ অংশ+২″ ইঞ্চি=১৬″ ইঞ্চি থাকে ভাঁজ করিতে হইবে। ভাঁজ করা হইয়া গেলে ক, খ লম্বা মাপ ৩৪″ ক, গ কোমরের মাপের ¼ অংশ+৩″ অর্থাৎ কোমরের ¼ অংশ ৭″+৩″=১১″ ইঞ্চি। খ, ঘ কোমরের মাপের ¼ অংশ ১৪″+২″=১৬″ ঘ, ঘ লাইন হইতে ১″ ইঞ্চি উপরে চিত্রানুযায়ী সংযোগ করিয়া গ, ঘ দাগ করিতে হইবে। এখন ক, গ, ঘ ও ঘ দাগে কাটিয়া লইলে সায়া কাটা হইল। পাশে যে কাপড়ের টুকরা আছে তাহা হইতে কোমরের বেল্ট (Belt) কাটিয়া বাহির করিতে হইবে। বেল্ট কাটিবার সময় মেপিতে হইবে, কোমরের কিতা পরাইবার জন্য কত বড় চওড়া হইলে ঠিক সায়ার সঙ্গে মানাইবে। ৪″ কোমরের মাপ ২৮″+৪″=৩২″ ইঞ্চি লম্বা একখানি বেল্টের টুকরা কাটিয়া লইলে সায়া কাটা শেষ হইল। সায়া অনেক টুকরা কাপড়ে হয়—আমি এখানে দুই টুকরা কাপড়ে সায়া কাটা দে খাইলাম।

সায়া সেলাই ঃ—প্রথমতঃ সায়ার দুই টুকরা করা কাপড়কে এক পাশ জুড়িয়া তার উপর চওড়া বা চিকন লেস অথবা কাপড়কে কুঁচি দিয়া ঘেরের উপর ইন্‌সেসন দিয়া সেলাই করিয়া লইয়া অপর পাশ জুড়িতে হইবে। ঘেরা কাজ হইয়া গেলে কোমরের জন্য যে ৩৬″ ইঞ্চি লম্বা এক টুকরা কাপড় কাটা হইয়াছে—তার দুই দিকের মুখ ½″ পরিমাণ ভাঁজ দিয়া সেলাই করিয়া এই বেল্টের মাপে কোমরের দিককার কাপড়কে নয় কুঁচি দিয়া বেল্টকে তখন ভাঁজে কোমরের সঙ্গে বসেয়া দিয়া জুড়িয়া লইতে হইবে। সেলাই হইয়া গেলে দেখিবে মাঝখানে ফিতা পরাইবার জন্য এক ছিদ্র হইয়াছে—তার মধ্যে একখানি চওড়া ফিতা পরাইয়া দিবার উদ্দেশ্য কোমরে বাঁধিবার কাজ চলিবে। এখন সায়াকে লম্বা মাপ নিয়া দেখিলে দেখিবে ৩৬″ ইঞ্চি লম্বা মাপ হইতে অনেক লম্বা হইয়াছে। এখন ইন্‌সেসনের দুই ইঞ্চি উপরে—½″ ইঞ্চি পরিমান করেকটী সরু পটী দিয়া ৩৬″ ইঞ্চি মাপে রাখিলে সায়া সেলাই সম্পূর্ণ হইল।

এরপর সেমিজ থাকিবে।

আনন্দ

(Wagner)

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

আনন্দ,—যেন হোমশিখাখানি
মন-ভূমি করে ঝলমলা।
রশ্মি তাহার জীবনেতে পড়ি'
নিমেষে ফুলায় সকল জ্বালা।

নারীর মন

(Sir Samuel Tuke)

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

অবোধ ভাবে কিরা'বে তা'রে
বলে না হয় ছলে,—
নারীর মনের গতি,—সে যে
স্রোতের মতো চলে।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানীর

মেসিনে প্রস্তুত

চন্দন, রয়েলবকুল, মাস্ক ও ভেলভেট সাবান

ব্যবহার করুণ। টেলিফোন, ২৪৯৬

সংগ্রহ

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত]

খনিতে বে-তারঃ—

বেতার এতদিন পরে আবার খনিতেও দেখা দিয়েছে। অবশ্য এই নতুন আবিষ্কারটী বেশ সুশৃঙ্খলার সঙ্গে চলতে পারে কিনা দেখবার জন্যে একটা পরীক্ষাও করা হয়েছিল। লারখামের ডাইকহেড কয়লার খনিতেই পরীক্ষাটী সর্ব্বপ্রথম করা হোল। প্রথমে খনির তিনশত তিরিশ ফিট্ নীচু থেকে পনেরো মাইল দূরের গ্লাসগো ষ্টেশনের কথাগুলো বেশ স্পষ্টভাবে শোনা গেল বটে, কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল যে ইলেক্‌ট্রিকের দোষে শব্দটি আরও ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই 'দোষ' সারতেও বেশী দেরী হয়নি—শীঘ্রই সফলতায় পরিণত হয়েছিল। এবার বেতার আবার কা'কে ধরে—দেখা যাক্!

অদ্ভুত চোরঃ—

লণ্ডনের একটী রাজপথে সম্প্রতি একটী লোক প্রত্যেক লোককেই আলিঙ্গন করে বেড়াচ্ছিল। পথিকেরা তার ব্যাপার দেখে অনুমান কোরলে যে, নিশ্চয়ই বায়স্কোপের কিছু তোলা হচ্ছে, কিন্তু লোকটী ঐ রকম কোরতে কোরতে যখন অদৃশ্য হয়ে গেল সকলে পকেটে হাত দিয়ে দেখেন পকেটস্থ সকল জিনিষই অদৃশ্য হয়ে গেছে! চোরটীকে বাহাদুর বলতে হবে!

চলনের ভাষাঃ—

মুখ দেখে মেয়েদের স্বভাব যতটা জানা যায় না, চলন দেখে তা সম্পূর্ণ জানা যায়। যারা জোরে জোরে পা ফেলে চলে তারা আত্মম্ভরী হবেই। যারা দ্রুত চলে অথচ চলতে শব্দ হয় না তারা ব্যস্ত এবং সাধারণতঃ খুব ভাল গৃহকর্ত্রী। এদের ঠকান খুব কঠিন। যারা ধীরে ও জড়িয়ে জড়িয়ে চলে তাদের স্বভাবখানা বেশ নম্র ও স্বামীর পক্ষপাতিনী। স্বামীর অধীনে থাকাই তাদের বাঞ্ছনীয়। পায়ের পাতা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চলে শুধু তারা—যারা সর্ব্বদা প্রায়ই আত্ম-বিহ্বল ও অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। অবিবাহিতা মেয়েদের মধ্যেই এ রোগটী একটু বেশী দেখা যায়, নয় কি? যারা খুব বড় বড় আর জোরে পা ফেলে চলে, সেই সব মেয়েদের স্বভাবটা খুব গর্ব্বিত ও রুক্ষ। আর যারা বেশ ধীরে ধীরে অথচ ছোট ছোট পা ফেলে চলে তারা সাধারণতঃ শান্ত আর লাজুক হয়। বিশ্বাস না হয় নিজেদের চলনের দিকে একটু লক্ষ্য রাখলেই সব জানা যায়।

বে-তারের আষ্টাঘাতঃ—

নটোতনের একটী যুবক ছাত্র বে-তার সংযোগে তার লেখাপড়া চালিয়ে নেয়। প্রায় বিশ মাইল দূরে ছাত্রটীর শিক্ষক বাস করেন। রোজই বেতার সাহায্যে পরস্পর নিজেদের কাজ চালিয়ে নেন। ব্যাপার মন্দ নয়। আশা করা যায় কিছুদিন পরে ইস্কুল কলেজের যাওয়াটাও বেতারের সাহায্যে চলে যাবে।

খুচরা খবরঃ—

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম টাইপরাইটার যন্ত্র প্রস্তুত করা হয়।

• • • •

সুয়েজখাল খনন কোরতে পূর্ণ তেরোটী বৎসর অতিবাহিত হয়েছিল।

• • • •

ইংলণ্ডে রেলওয়ের এক মাইলের ভেতর প্রায় সাতাশটী সুরঙ্গ আছে।

• • • •

ইয়োর্কশায়ারের Ruby castle এ একটী অত্যন্ত পুরাতন ডুমুর গাছ পাওয়া গেছে। গাছটী এখনও ফল দিচ্ছে। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ইটালী থেকে গাছটীকে আনা হয়েছিল।

• • • •

লণ্ডনের 'সেভয়' হোটেলে একটী যন্ত্র আনা হয়েছে—যন্ত্রটীর সাহায্যে একঘণ্টায় দুইশত প্লেট এবং আড়াইশত আলো একসঙ্গে পরিষ্কার করা যায়। বাঙ্গালীর মহৌষধ, সন্দেহ নাই।

ত্রিমন্ত্র

বাগবাজারের হরিহর তর্করত্ন সেদিন পাপুরিয়াঘাটার কাছে কোনও ত্রিতল বাটীতে সরস্বতী পূজা করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন; সঙ্গে তিনটি মুটিয়ার মাথায় সাজ্জাদন, সোপকরণ ভূরিভোজ্যভার। তরুণ অধ্যাপকের প্রাণটিও তখন বিপুল আত্মপ্রসাদে ভরপুর। তিন পুত্রের উপর ক্ষুদ্রতর তিনটি পূজার ভার দিয়া নিজে ছোট ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর যজমানের বাড়ী আসিয়াছিলেন। এ কয়টি পূজার উপলক্ষে অবাধে অনতিবৃহৎ পরিবারের কয়েক মাসের গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যায়।

কাজেই অগাধ বিত্তবৃদ্ধির সুপরিস্ফুট প্রমাণভার মুটিয়ার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া তর্করত্নের প্রাণ আনন্দে ভরিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। আনন্দ-বিহ্বল অধ্যাপক মুটিয়ার সহিত বিত্তনয়োয়রের কাছে উপস্থিত হইয়া দেখিল, বিরাট জন-তরঙ্গ ছাপাইয়া সঘন জয়োল্লাস ধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রাণে আনন্দ থাকিলে আমোদ প্রমোদের তৃষ্ণাও স্বতঃই প্রবলভাব ধারণ করিয়া থাকে। তাই ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুত্রের সহিত মুটিয়াত্রয়কে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া নিজে বিশাল জনতার গর্ভে মিশিয়া গেলেন।

বিরাট ব্যাপার। সেই দিন ভারতবরেণ্য বহু প্রখ্যাত নেতৃবর্গ কলিকাতায় অসহযোগমন্ত্র প্রচার করিতে আসিয়াছেন।

মহাত্মার ওজস্বিনী বক্তৃতায় অপার্থিব শক্তিপ্রভাবে বিশাল জনসঙ্ঘের মধ্যে ক্ষণে নিস্তব্ধতা—পরক্ষণেই আবার গগনবিদারী উল্লাস কোলাহলের সৃষ্টি হইতেছে। উপস্থিত জনসঙ্ঘের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ভারতের দাসত্বমোচনের অমোঘমন্ত্র ত্রিমন্ত্রসাধনা।—চরকা, একতা এবং হুঁৎমার্গ পরিহার।

নেতৃবৃন্দের বক্তৃতাস্পষ্ট ভাবের আধিক্যে বিরাট জনসমুদ্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা স্থির প্রতিজ্ঞার গাম্ভীর্য্য ফুটিয়া উঠিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত সমবেত বিংশ-সহস্র ভারতবাসী একমুহূর্ত্তে মহাত্মার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ভগবানের নামে শপথ করিল যে তাহারা প্রাণপাত করিয়াও মহাত্মার ত্রিমন্ত্র সাধনা করিবে। বলা বাহুল্য তর্করত্নও তাঁহাদের মধ্যে একজন।

সন্ধ্যার পর সভা ভাঙ্গিয়া গেল। তর্করত্ন বুকের তলায় নবশক্তির পূর্ণতা লইয়া আবার গৃহাভিমুখী হইল। সরস্বতী পূজা, সত্যনারায়ণ এবং কার্ত্তিকের পূজার সময় হুঁৎমার্গ পরিহার করাই তর্করত্ন ঠাকুরের কুলপ্রথা। কিন্তু তাহাতে অনেকে অনেক কথা বলে। তাই তর্করত্নকে লোকসমাজে একটু সঙ্কোচের সহিত মাথা নিচু করিতে হইত। কিন্তু আজ দেশপূজ্য নেতৃবৃন্দের মুখে হুঁৎমার্গ পরিহারের আদেশ সোল্লাসে শিরোধার্য্য করিয়া তর্করত্নের আর লজ্জার কোনও কারণ রহিল না।

পথে যাইতে রাজবল্লভপাড়ার একটি বাড়ীর সম্মুখে তর্করত্নকে দাঁড়াইতে হইল। একটি আট বছরের ফুট ফুটে ছেলে তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল—"ভটচাজ মশায় যা আপনাকে ডাকছেন।"

বালকটিকে তর্করত্ন চিনিতে পারিলেন না। তবু তাহার শুভ্র মুখে একটা সরল আগ্রহের স্পষ্ট ছায়া দেখিয়া তিনি আর আপত্তি করিতেও পারিলেন না।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তর্করত্ন দেখিলেন পূজার দালানে পূজোপচার আগলাইয়া এক দিব্যমূর্ত্তি প্রৌঢ়া মালা হাতে বসিয়া রহিয়াছেন। তর্করত্নকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন,—

"আমি বড় বিপন্ন। সারাদিন ভটচাজ মশায়ের

জন্ত বসে রয়েছি—এত রাত হ'লো তিনি এলেন না। ব্রাহ্মণের বৃত্তি নষ্ট করতে মন সরে না, তাই সারাদিন তাঁর আশায় বসেছিলাম। যখন তাঁর আসার সময় উৎরে গেলো, তখন অবধি আর কাহকে পাওয়াই যাচ্ছিল না। আপনি আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার না করলে, একটা পুরাণো ঘরের ক্রিয়া কর্ম্মলোপ হতে বসেছে।"

বিনা বাক্যব্যয়ে তর্করত্ন ভৃত্যের দেওয়া জলে পা ধুইয়া পূজায় বসিয়া গেলেন। অমনি শুভ কুসুমের মত স্নানমুখ ছেলেমেয়েগুলির মুখে আবার হাসির আভা ফুটিয়া উঠিল। কাঁসর, ঘণ্টা, শাঁখ বাজাইয়া আবার তাহারা আনন্দে মাতিয়া উঠিল।

যথাকালে পূজা শেষ করিয়া ঠাকুর ভোজ্য বস্তু, নৈবেদ্যাদি বাঁধিয়া লইলেন। কাঞ্চন-মূল্য যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা আঁচলের খুঁটে বাঁধিতে বাঁধিতে তর্করত্ন গৃহযাত্রার উদ্যোগ করিতেই গৃহকর্ত্রী বিনীতভাবে বলিলেন,—

"সে কি ভটচাজ মশায়, গৃহস্থের বাড়ী পূজা ক'রে অভুক্ত অবস্থায় কি যেতে হয়?"

তর্করত্নের অবশ্যই অভুক্ত অবস্থায় গৃহে ফিরিবার কোন আগ্রহ ছিল না। সমস্ত দিনের উপবাসের ফলে তাঁহার বুকের তলায় ইতিমধ্যেই পিত্তনাশক পদার্থটী ঈষৎ উদ্রতা আশ্রয় করিয়াছিল। দুই চারি কথায় রাজি হইয়া তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। মেজেতে কার্পেটের আসনের সম্মুখে খানকয়েক লুচি সমেত খাবার দেওয়া ছিল। তর্করত্নও উত্তম ভোজ্য, লুচি কয়খানা নিঃশেষ করিতে তাঁহার বেশি বিলম্ব হইল না। অমনি গৃহকর্ত্রী আর একখানা লুচি আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। কিন্তু তখন তর্করত্ন হাত উঠাইয়া বসিয়াছেন—তাঁহার গম্ভীর মুখ গাঢ় বিষণ্ণতার আঁধারে ভরিয়া গিয়াছে।

বিস্মিতা কর্ত্রী বলিলেন,—"কি হ'ল ভটচাজ মশায়, হাত তুলে বসে রইলেন যে?"

সক্রোধে তর্করত্ন রক্ত রক্ত চক্ষের জল ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—"আপনি কায়স্থ, আপনার ছোঁয়া লুচি আমি খাব?"

বহু সাধ্যসাধনায়ও কোনও ফল হইল না। হরিহর অটলভাবে বসিয়া রহিলেন।

অগত্যা কর্ত্রী ঠাকুরাণী নিজের হাতে তর্করত্নের সম্মুখ হইতে ভোজনপাত্র উঠাইয়া লইয়া, গোবর জলে স্থানটি মুক্ত করিয়া দিলেন। তাহার পর আবার একথালা মিষ্টান্ন ও ক্ষীর রাবড়ী দই ইত্যাদি তর্করত্নের সম্মুখে রাখিয়া আহত অভিমানের ব্যথা বুকে চাপিয়া শঙ্কিত-চিত্তে তিনি বারান্দায় বসিয়া পড়িলেন। গলদশ্রুলোচন তর্করত্ন হাতমুখ ধুইয়া আকস্মিক আঘাতপাত হেতু ক্ষোভের আতিশয্যে মিষ্টান্নগুলি নিঃশেষ করিয়া উঠিলেন। "হায় হায় শত জন্ম তপস্যার ফলে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মলাভ হয়, অবশেষে আজ শুভ শ্রীপঞ্চমীর দিনে শূদ্রের হাতে সেই অমূল্য রত্ন আতিটি বিক্রয় করিয়া বসিলাম!'

সকল বেদনা বুকে চাপিয়া রাখিয়া কর্ত্রী সন্তানতুল্য তরুণ দ্বিজবরের পদে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণ-মূলে যৎকিঞ্চিৎ ভোজনদক্ষিণা রাখিয়া বলিলেন,—

"বাজারের সাত জেতের ছোঁয়া আটা চালের গুঁড়ায় তৈরী খাবার খেয়ে জাত যায়না, আর শুদ্ধাচারী কায়েতের মেয়ের হাতে ঘৃতপক্ক লুচি খেলেই অমনি জাত ছুটে যায়। এমন নূনকো পলকা জাতি বিচারের তাৎপর্য্য কি ঠাকুর?"

তর্করত্ন এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দেওয়ার আবশ্যকতা দেখিলেন না। অথচ, উত্তর দিবার মত কিছু আছে কিনা তাহাও তিনি ভাবিয়া দেখিলেন না। কায়েত বাড়ীর লুচির কড়ায় ঘৃতপক্ক মুখে বহু পুণ্যার্জ্জিত জাতটিকে রাখিয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন।

নষ্ট জাত্যাভিমানের ভাবনায় অস্থির হইয়া পথ চলিতে চলিতে তর্করত্ন আবার জামকোয়ারে বিরাট জনতার মুখে "গান্ধী মহারাজের" জয়োল্লাসধ্বনী শুনিয়া দাঁড়াইলেন। অমনি সেই বিরাট পুরুষের জিম্মা সাধনার আবেশ তর্করত্নের মনে পড়িয়া গেল।

কিন্তু সেই নিষ্ঠাবতী কায়স্থকন্যা, যিনি নিজের হাতে তৈরী শুদ্ধাচারের নৈবেদ্য দেবতাজ্ঞানে এই অর্ব্বাচীন ব্রাহ্মণের সম্মুখে স্থাপন করিয়া মর্ম্মের গোপন বেদনায় দুই ফোঁটা অশ্রু মোচন করিয়াছিলেন—তাঁহার কথা তর্করত্নের আর মনে পড়িল না।

রাহুগ্রাস মুক্ত—জিতেন্দ্রলাল

আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে।

ভারতবরেণ্য, রাহুগ্রাসমুক্ত বাঙ্গালার পূর্ণচন্দ্র জিতেন্দ্রলাল দীর্ঘ দুই বৎসর কারাযন্ত্রণা ভোগের পর বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার আবার তাঁহার লক্ষ দেশবাসীর অগ্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এস, পণ্ডিতাগ্রণী, অসাধারণ আত্মত্যাগী বীর! বাঙ্গালা আজ গৃহবিবাদে বিক্ষুব্ধ। ভারত আজ আবার ব্রাহ্মণত্বের কলঙ্ক-কৌটা পরিয়া জগতের উপহাস-কটাক্ষ বরেণ্য করিয়া লইতেছে। এসো ঋষিবর—এই মহা শ্মশানের তপ্ত ভস্মরাশি হইতে তোমার আশিস-করস্পর্শে আবার স্নিগ্ধ কান্ত সৌম্য সুন্দর একদল সত্য শুদ্ধ ব্রতধারী তরুণ কর্মী অক্ষৌহিণী গড়িয়া তোল। এসো ভেদাভেদ বৈষম্যের অতীত, সার্বভৌম স্বরাজ-মন্ত্রের মহাসাধক—হিন্দু, মুসলমান, জৈন, পার্শি, শিখ, বৌদ্ধ—সমবেত ভারতবাসীর অগ্রে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে স্বরাজের সমুচ্চ স্বাধীন শিখরে লইয়া চল—এ জড় জাতির নিথর দেহে আবার বিরাট কর্মস্পৃহা জাগাইয়া তোল।

পরলোকগত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে।

বিংশ শতাব্দীর প্রত্যূষে বাঙ্গালায় এক নবজাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল। তাহারই ফলে বঙ্গমাতার ক্রোড় হইতে ঋলিত হইয়া যে কয়েকটি রত্ন কালের গর্ভে বিলীন হইয়া যায়, যতীন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই অন্যতম। বিদেশীরেরা চিরকাল বাঙ্গালীকে এক নির্বীর্য জাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। সেই সকল কাহিনী পড়িয়া পড়িয়া আমরাও নিজেকে নিতান্ত কাপুরুষ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছি। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঙ্গালী যুবকগণ নিজ নিজ জীবনের বিনিময়ে যে দুর্জয় সেনের সম্মুখে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিদেশীগণের ভুল ভাঙ্গিয়াছে বটে—তবু তাঁহাদের দেশবাসীর ভ্রম ভাঙ্গে নাই। বালেশ্বরের ঘন বনানীর অন্ধকারে সঙ্গীনযুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে ১৯১৫ সালের ১৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে যতীন্দ্রনাথ অসংখ্য আততায়ীর আক্রমণকে উপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ভীরুর মত আত্মসমর্পণ না করিয়া এই বাঙ্গালী যুবক সম্মুখযুদ্ধে বীরশয্যা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন! স্বদেশ, স্বজাতির হীন কলঙ্ক ঘুচাইবার ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষাবশে এই বাঙ্গালী যুবকই আত্মহত্যার প্রেরণায় হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

রবীন্দ্র-সদনে

(২য় দফা)

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

[শ্রীমৃণালকান্তি বসু]

গত ১৪ই ভাদ্র শুক্রবার বিকাল বেলায় হঠাৎ আর একবার রবিবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিলাম। বিকালে কিকিৎ জলযোগ করছি এমন সময় স্কটিশচার্চ্চ কলেজের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সেন এসে বল্লেন, চলুন একবার রবিবাবুর বাড়ীতে যাওয়া যাক্। তিনি দুই এক দিনের মধ্যেই বোলপুর চলে যাবেন, আবার কবে আসবেন ঠিক নেই, একবার যোগাযোগ করে আসা যাক্। একটু ইতস্তত: করতে লাগলাম। আগের বার অরুণ বাবু, আমি যাব সে খবরটা রবিবাবুকে দিয়ে রেখেছিলেন। যাঁরা কাজের লোক খবরাখবর না দিয়ে হঠাৎ তাঁদের উপর চড়াও করাটা আমি বরাবরই অপছন্দ করি। কিন্তু অরুণবাবু নাছোড়বান্দা। তিনি ভরসা দিলেন,যে আমি গেলে রবিবাবু অসন্তুষ্ট হবেন না, যদি হন তার জন্য তিনি দায়ী থাকবেন। কাজেই বেরিয়ে পড়লাম।

রবিবাবুর সঙ্গে দেখা হল। কুশল প্রশ্নে জানলাম তিনি ভালই আছেন। বিলাত ওঁর পত্রবারে Interview যা বেরিয়েছিল তার কথা তুল্লেন। বল্লেন, যে হাঁ ঠিকই হয়েছে। তবে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা সম্বন্ধে আর দুএকটা কথা বলে' তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার করতে চান। তিনি বল্লেন যে "হিন্দু মহাসভার পণ্ডিত মালব্যজী মুসলমান গুণ্ডাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য হিন্দুদের শারীরিক শক্তি অর্জ্জন করা আবশ্যক বলেছেন।" আমি তাতে আপত্তি করে বল্লাম যে মালব্যজী ঠিক ও কথা বলেন নি। তিনি বলেছেন যে হিন্দু হউক,মুসলমান হউক, আততায়ীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার শক্তি মানুষ মাত্রেরই থাকা উচিত, এবং হিন্দুদেরও থাকা উচিত। তবে একথা ঠিক, পঞ্জাবে ও যুক্তপ্রদেশে বিভিন্নস্থানে, অত্যাচার হিন্দুদের উপরই হয়েছে, এবং হিন্দুরা তার প্রতিরোধ কর্ত্তে পারেনি। এই সব ক্ষেত্রে মুসলমানরাই অত্যাচার করেছে, একথাটা মালব্যজীর মনে প্রথিত থাকা অসম্ভব নয়। এবং হিন্দু মহাসভা যে সব উদ্দেশ্যে আবাহন তার অন্যতম হচ্ছে হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ কর্ত্তে উদ্বুদ্ধ করা ও শারীরিক শক্তি ও সাহস অর্জ্জনে তাদের প্রবৃত্ত করা। এই হিসেবে হিন্দু মহাসভায় হিন্দুদিগের শারীরিক শক্তি অর্জ্জনের কথা পণ্ডিত মালব্য ও অন্যান্য বক্তারা যা বলেছিলেন তাতে মুসলমানদের কারো কারো মনে এটা উদয় হওয়া বিচিত্র নয় যে হিন্দু-মহাসভা-আন্দোলন মুসলমান বিদ্বেষে দূষিত।

গায়ের জোর

রবিবাবু বল্লেন যে গায়ের জোর, সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, সকলেরই থাকা উচিত এবং তা অর্জ্জন করবার চেষ্টা মানুষ মাত্রেরই করা উচিত। শুধু মুসলমানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেন, সর্ব্বপ্রকার আততায়ীর বিরুদ্ধে লড়তে পারার শক্তি মানব মাত্রেরই থাকা আবশ্যক। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই। শুধু গায়ের বল থাকলে বা তা অর্জ্জনের চেষ্টা করলেই সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া যায় না, অর্থাৎ organisation গড়ে ওঠেনা।

পঞ্জাবে বা যুক্ত প্রদেশে হিন্দুর গায়ের শক্তি মুসলমানের চেয়ে কম নয়, ওরাও ছাড়ুটাড়ু খায়। কিন্তু

হিন্দুই পড়ে যায় যায়, তার কারণ হিন্দুদের সংহতি নেই। মুসলমান মুসলমানের ডাকে সাড়া দেয়, হিন্দু দেয় না। মুসলমানের এই orgainsing Spirit কোথা থেকে এসেছে? তার ধর্মই তাকে organise করেছে। মুসলমানের ধর্ম সাম্যবাদমূলক। মুসলমানে মুসলমানে যে সহানুভূতি, তার Sanction বা বনিয়াদ মুসলমান ধর্ম। হিন্দুর ধর্ম অর্থাৎ বর্তমানে যাকে আমরা হিন্দুধর্ম বলে বুঝি তা organisationএর পরিপন্থী। সাম্যবাদের উপর এ প্রতিষ্ঠিত নয়। সেদিন এক বন্ধু সীমান্ত প্রদেশের এক গল্প বলেছিলেন। আফ্রিদীরা প্রায়ই সীমান্তের ব্রিটিশ প্রজাদের উপর চড়াও হোয়ে মেয়ে পুরুষ ধরে নিয়ে যায়। একবার একটি হিন্দুর মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। যে বন্ধু এই গল্প বলেছিলেন তাঁর বাসা এই ঘটনাস্থলের অতি নিকটে ছিল। তিনি দেখলেন যে, হিন্দু প্রতিবেশী কেউ মেয়েটিকে রক্ষা করবার জন্য অগ্রসর হ'ল না। তাতে তিনি একজন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কি রকম? আপনারা যে দুই শব্দটী করলেন না। তাতে ব্রাহ্মণ জবাব দিলেন, "উঃ! ত বেনিয়াকা লেড়কী!"

কবি বল্লেন এই ত হিন্দুর Mentality, মুসলমান কিন্তু কখনও এ রকম জবাব দেবে না।

অস্পৃশ্যতা দোষ—

হিন্দুর অস্পৃশ্যতা বা untouchability শুধু দৈহিক বা physical নয়, তার চেয়ে প্রবল হচ্ছে moral untouchability, বাংলা দেশে physical untouchability হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ নেই কিন্তু moral untouchability খুবই আছে। জাতে উচ্চ নীচ ভেদ-ভেদ সব বর্ণের মধ্যেই আছে।

গান্ধীজী ও মালবীয়জীর ভুল এই হয়েছে যে, তাঁরা মনে করেন—উচ্চ বর্ণের নিম্ন বর্ণ সম্বন্ধে untouchability অর্থাৎ physical untouchability বা দৈহিক অস্পৃশ্যতা দূর করলেই অস্পৃশ্যতা দোষ দূর হবে। অর্থাৎ ডাল পালা কিছু ছাঁট কাট করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ বা organised হতে পারবে।" কবি বল্লেন "আমি তা মনে করি নে। হিন্দুদের দুর্বলতার কারণ আরও Fundamental বা মূলগত। হিন্দুসমাজ মানুষের সঙ্গে মানুষের জন্মগত ভেদ করে রেখেছে যার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ দেওয়া যায় না। জগতে কোনো জাত উন্নতি করতে পারেনি যারা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝে নিজেদের ধর্মগত বা অন্যান্যগত আচার ব্যবহার না পরিবর্তন কর্ত্তে পেরেছে। কবে মনুসংহিতায় সমুদ্র-যাত্রা নিষেধ করে গিয়েছে আর যতই অবস্থার পরিবর্তন হউক না কেন তাই আঁকড়ে ধরে বসে থাকতে হবে। এ বিশ্বাস না বদলালে আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। অবশ্য সব জাতেরই কতকগুলি সংস্কার আছে এবং সংস্কারগত আচার ব্যবহার আছে যার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ দেখান যায় না। কিন্তু উন্নতিশীল জাতি মাত্রেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল সংস্কার ও আচার ব্যবহার উন্নতির পরিপন্থী তা ত্যাগ করতে পেরেছে। জগতে আমরা অর্থাৎ কেবল হিন্দুরাই তা ত্যাগ কর্ত্তে পারি নি। তাই আমরা মানুষে মানুষে জন্মগত বা অনৈসর্গিক প্রভেদ যা হয়, তা কোনো কালে কোনও উপযুক্ত কারণে বা নিকারণে করা হয়েছিল। তা এখনও বজায় রাখতে চাই। বস্তুতঃ ভগবান মানুষে মানুষে এমন কোন ভেদ করে দেন নি। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সত্য সম্বন্ধ তার ব্যতিক্রম কোরে কখনও সত্যিকার মিলন গড়ে উঠতে পারে না।

হিন্দু মহাসভা—

কবি বল্লেন যে "হিন্দু মহাসভা যদি হিন্দু সমাজের কীট স্বরূপ Physical ও Moral untouchability দূর কর্ত্তে পাল্লেন তা হলে, মুসলমানরা চটে গেলেও, কাজের মত একটা কাজ হোতো। কিন্তু ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল এই যে হিন্দু মহাসভা তার কিছু কর্ত্তে পাল্লেন না। হিন্দু যেখানেই ছিল, সেইখানেই থাকলো এক পাও অগ্রসর হোলো না। অথচ, মুসলমানদের চটিয়ে দেওয়া হোলো। এখন যেখানে এক কুস্তির আখড়া হবে—মুসলমান আঙুল নির্দ্দেশ করে বলবে, ঐ দেখ হিন্দুরা আমাদের মারবার জন্য গায় জোর কচ্ছে।

হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ কর্ত্তে হলে তাদের মুসলমানদের সঙ্গে পাল্লাপাল্লি করে গায়ে জোর কর্ত্তে হবে এমন কোনো কথা নেই। ঘরে সলদ দূর কর্ত্তে পারে অর্থাৎ হিন্দুদের মধ্যে যে অস্পৃশ্যতা Physical ও moral দোষ আছে তা নিরাকরণ কর্ত্তে পাল্লে হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠবে। শুধু মাংসপেশী ফোলাবার চেষ্টা করে কিছু হবে না। মুসলমান ও হিন্দুদের দেখা-দেখি গায়ের জোর আরও বৃদ্ধি করবার চেষ্টা কর্ত্তে পারে। এ রকম চেষ্টা ও Counter চেষ্টা কেবল এক vicious circleএ ঘুরতে থাকবে। তাতে ফল হবে কি?" কবি আবার বল্লেন যে "শারীরিক শক্তি মানুষ মাত্রেরই অর্জ্জন করা দরকার সেত চিরন্তন সত্য, কিন্তু আমাদের সমাজদেহের যে ব্যাধি তার কারণ নির্দ্দেশ করে তাই উৎপাটন করার চেষ্টাই হচ্ছে গোড়ার কথা।"

দেশে গঠনমূলক কাজ সম্বন্ধে কবির সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল, বারান্তরে তা প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইল।

—বিজলী

প্রলয় বন্যা

[শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস]

মাঝে মাঝে নদী নালার অতি বর্ষণে বা জোয়ারে জল বাড়িয়া পথ ঘাট ভাসাইয়া দেয় তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। আর আজ কাল প্রতিদিনই পত্রের কাগজে এখানে সেখানে ভীষণ বন্যার খবর দেখিতে পাওয়া যায়, তার কারণও দেখিয়া থাকেন। অতি-বর্ষায় কলিকাতা সহরের রাস্তাতেও সময়ে সময়ে বান ডাকে। কিন্তু আজ যে বন্যার ব্যাপার লিখিতেছি—তাহা নদী নালা বা বর্ষা সম্ভূত নহে। ইহা সাগর মহাসাগরের তাণ্ডব নৃত্য। ইহার ফল অতি ভয়ানক। তাই ইহার নাম দিলাম প্রলয় বন্যা।

সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে প্রলয় বন্যার সম্বন্ধ খুবই কম। সাধারণতঃ সমুদ্রের তলদেশ হঠাৎ বসিয়া যাওয়া, প্রচণ্ড ঘূর্ণি বায়ু (Cyclone. Hurricane) ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির অভ্যুদয় ইত্যাদি যে সমস্ত কারণে জলভাগ অত্যধিক আলোড়িত হয় তাহাতেই প্রলয় বন্যার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

যদি উপরোক্ত কোন কারণে কোথায় ও একবার ঐ প্রকার বন্যার উৎপত্তি হয় তাহা হইলে তাহার বিভীষিকার ফল বহুদূর দূরান্তের হতভাগ্য অধিবাসীরাও ভোগ করিতে বাধ্য হয়। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে সমুদ্রের তলদেশ বসিয়া গিয়া ঐ প্রকার এক প্রলয় বন্যার সৃষ্টি হইয়া বহুদূর উহা প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের উপর গড়াইতে থাকে এবং ইহার প্রচণ্ড প্রতাপ সুদূর জাপান, অষ্ট্রেলিয়া আলাস্কা কামাস্-কাটকা, অরিগন ও ক্যালিফোর্ণিয়া পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়াছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী অনেক দ্বীপ এই প্রলয় বন্যার করাল গ্রাসে পতিত হইয়া জন মানবহীন শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল।

প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ুতে যে প্রলয় বন্যার সৃষ্টি হয় তাহার সংখ্যাই অধিক। তবে তাহারও ক্ষমতা কম নহে। ১৮৭৬ সালে আষাঢ়ের এই গঙ্গার উপকূলে যে প্রলয় বন্যার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার মোটামুটি একটা হিসাবে দেখা যায় যে তাহাতে এক লক্ষেরও অধিক লোকের প্রাণনাশ এবং ঐ অনুপাতে বাড়ী ঘর ও চাষ আবাদের ধ্বংস হইয়াছিল। বন্যার শেষে গাছের উপর লবণাক্ত জলের দাগ দেখিয়া স্থির হয় যে ঐ বন্যার স্রোত ৪৫ ফিট (৩০) হাত উচ্চ হইয়া ধাবিত হইয়াছিল।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দে সমুদ্র তলের ভূমিকম্পের জন্য চিলি উপকূলে ঐ প্রকার প্রলয় বন্যার সৃষ্টি হয়, এবং ঐ ভীষণ প্লাবন হাজার হাজার দ্বীপ বাসীর ধন-প্রাণ বাড়ী-ঘর অতল জলে ডুবাইয়া, ২৪ ঘন্টার মধ্যে সুদূর জাপানের হেকোডেট বন্দরে আসিয়া পড়ে। হেকোডেট বন্দর ও চিলির দূরত্ব ৭৬০০ মাইল। ইহাতে দেখা যায় ঐ সর্ব্বগ্রাসী জলস্রোত ঘন্টায় ৩০০ মাইল (মিনিটে ৫ মাইল বেগে ধাবিত হইয়াছিল। ঐ স্রোতের বেগে যে কেবল সমুদ্রের বাতী-ঘর Light House গুলিই উপাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল তাহা নহে; বন্দরের মুখে সমুদ্রের স্রোতবেগ প্রতিরোধের জন্য যে সকল দেয়াল গাঁথা ছিল এবং তাহা রক্ষার জন্য আরও যে সমস্ত মজবুত অবরোধ করা হইয়াছিল তাহা সমস্তই স্থানচ্যুত ও চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয়। হেকোডেট বন্দরের ৭০ টন ওজনের একটী গ্রেনাইট পাথরের বেদী ১৪০০ হাত দূরে সহরের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল।

১৮৯১ খৃঃ অব্দে আর একটী ৭০ ফিট (প্রায় ৪৮ হাত) উচ্চ জলস্রোত নিপন দ্বীপের অধিকাংশ স্থানকে শ্মশানে পরিণত করিয়া দেয়। বন্যার পর দেখা যায় যে উক্ত দ্বীপের ৮৫০০০ হাজার গৃহের মধ্যে মাত্র ১০০০ গৃহ বর্ত্তমান আছে। রেলের পুল এবং রাস্তা ঘাট একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। বহুসংখ্যক গ্রাম, ভাঙ্গা বাড়ীর কাট কাটরায় ও সমুদ্রের বালিতে এমন ভাবে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল যে তাহা আর চিনিবার উপায় ছিল না। ঐ বন্যা আরম্ভ হইবার প্রথমে সমুদ্রের জল প্রায় আধ মাইল নীচে নামিয়া যায়। পরক্ষণেই ঐ জলরাশি পুনরায় অপরিসীম বেগে কূলের দিকে ফিরিয়া আসিতে থাকে

এবং উহাতে প্রায় সমস্ত দ্বীপটীই ডুবিয়া যায়। ইহাতে ১০,০০০ হাজার লোকের প্রাণ নষ্ট ও প্রায় তিন লক্ষ লোককে ঘর বাড়ী হারাইতে হইয়াছিল।

এই রকম বন্যার প্রাসে পড়িয়া বহু জাহাজকে তাহার নাবিকদিগের সঙ্গে অতল জলে তলাইয়া যাইতে হইয়াছে। আবার অনেক স্থলে ইহাও দেখা গিয়াছে যে কোন কোন জাহাজকে স্থানচ্যুত করিয়া বহু মাইল দূরে লোকালয়ের মধ্যে বসাইয়া রাখা হইয়াছে অথচ জাহাজের কিছুই নষ্ট হয় নাই। ১৬৯২ খৃঃ অব্দে ইংরাজের যুদ্ধ জাহাজ "সোয়ান" Swan মেরামতের জন্য ডকে ছিল। একদিন ঐ প্রকার প্রলয় বন্যা আসিয়া অতবড় যুদ্ধ জাহাজকে শত শত অট্টালিকা ও গাছ পালার উপর দিয়া লইয়া গিয়া বহুদূরে একটী বালগুদামের ছাদের উপরে বসাইয়া দেয়। ইহাতে কতির মধ্যে বালগুদামের পুরাতন ছাদটি কেবল পড়িয়া গিয়াছিল।

১৭৪৬ সালের ২৮ এ অক্টোবর কালাওর Callaor অধিবাসীরা দেখিতে পায় বহুদূরে সমুদ্রের উপর একটা খুব উঁচু দেয়ালের মত জলস্রোত জমির দিকে বেগে ছুটিয়া আসিতেছে, যতদূর দৃষ্টি যায় উহা তাহার ও অধিক বিস্তৃত। হতভাগ্য অধিবাসীরা চারিদিকে এই সংবাদ দিবার পূর্ব্বেই সর্ব্বগ্রাসী বন্যা তাহাদের উপর আসিয়া পড়ে। বন্দরে তখন ২৩ খানা জাহাজ ছিল, তাহার মধ্যে ১৯ খানা জাহাজ নাবিক সমেত তৎক্ষণাৎ ঐ স্রোতের মধ্যে ডুবিয়া যায়। একখানা ইংরাজের যুদ্ধ জাহাজ ও অপর তিনখানা সাধারণ জাহাজ স্রোতের উপর ভাসিয়া সমুদ্র তীর হইতে বহুদূরে এক উচ্চ ভূমির উপর আটকাইয়া রক্ষা পাইয়াছিল।

যে সময় ঐ ঘটনা হয় তখন কালাওর অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৪০০০ হাজার তাহার মধ্যে মাত্র ২০০ জন লোক কোনও প্রকারে রক্ষা পাইয়াছিল। জল নামিয়া যাওয়ার পর দেখা গেল ভেরাক্রুজ দুর্গের (Vera Cruz) সামান্য অংশ ছাড়া সমস্ত সহরটাই সমুদ্রের বালি ও পাথর চাপা পড়িয়া গিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন সমুদ্রতলবর্ত্তি ভূমিকম্পই এই অতি প্লাবনের কারণ। ইহাতে লিমা, কেজালী ও আরও অনেকগুলি বন্দর ধ্বংশ হইয়াছিল ও সর্ব্বসমেত প্রায় ৪০,০০০ লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছিল।

১৯০৪ সালে 'এডেনলার' নামে একখানা জাহাজ সমুদ্রে প্রলয় বন্যার মুখে পড়িয়া মেক্সিকো উপসাগরের চাওলার chandelour দ্বীপে সমুদ্র হইতে অনেক দূরে একমাঠের উপর আসিয়া আটকাইয়া যায়। উহা আবার সমুদ্রে ভাসাইবার জন্য সেই মাঠ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত খাল কাটাইয়া জল আনিবার ব্যবস্থা হইতেছিল। ১৯১৬ সালের ১১ই জুলাই আবার এক প্রলয় বন্যা আসিয়া জাহাজটীকে মাঠ পার করিয়া তাহার পূর্ব্বস্থান সমুদ্রে আনিয়া দিয়া যায়:

১৮৮৩ খৃঃ অব্দে জাভা ও সুমাত্রার মধ্যে সুনদা প্রণালীতে যে প্রলয় বন্যার উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা বড়ই ভীষণ ও সর্ব্বগ্রাসী। অনেকে অনুমান করেন উহা জল-তাগের ১৫০ কি ২০০ হাত নীচে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গমের ফল। প্রথমতঃ প্রণালীর মাঝখানের জল হঠাৎ অনেক নীচে নামিয়া পড়ে, পর মুহূর্ত্তে তীরবেগে দুই পাশ হইতে জল ছুটিয়া আসিয়া এক ভীষণ সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি ধারণ করে। প্রণালীর ধারে ধারে যে সকল গ্রামও নগর ছিল তাহার সবই,এবং সেই সকল বন্দরে যে সকল জাহাজ ছিল তাহাও ঐ সঙ্গে ধ্বংশ হইয়া যায়।

প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা এই প্রকারেই শেষ হইয়া যায় নাই। হঠাৎ প্রণালীর জলরাশি নীচে নামিয়া যাওয়ায় দূরবর্ত্তী সমুদ্রের জলস্রোত ঐ স্থানকে পূর্ণ করিতে বেগে ছুটিয়া আসিতে থাকে, তাহার ফলে ঐ প্রণালীর মধ্যস্থিত ক্রেকাটোয়া দ্বীপটী একবারে জলে হইয়া যায়।

প্রথম স্রোতের সঙ্গে দ্বিতীয় স্রোত মিশিবার পর তাহার উচ্চতা প্রায় ২০ ফিট (৬০ হাত) হইয়াছিল। ১০০ শত মাইলের মধ্যে যে সমস্ত বাতী ঘর (Light House) ছিল তাহার সবগুলিই চূর্ণ হইয়া যায়। এই ঘটনায় প্রায় ৩৬,৩০০ লোকের জীবন নাশ হইয়াছিল।

ইহা গেল প্রায় সবই বিদেশের কথা আমাদের দেশের বঙ্গোপসাগরের প্রলয় বন্যার ২।১টী ঘটনা পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

ব্যতিক্রম

(উপন্যাস)

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ]

অষ্টপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

ইন্দুর বিছানার একপাশে বিনয় ও আর এক পাশে নির্ম্মলকে বসাইয়া নির্ম্মলের মা উঠিয়া গেলেন। নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁলা পোড়ারমুখী! রোগ হয়েছে মুখ বুজে পড়ে থাকবি, তা না কেবল বিড় বিড় করে বোকছিস্ কেন? মাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিস্?" ইন্দুর চোখ দুটী জলে ভরিয়া আসিল, তাহা দেখিয়া বিনয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"আহা রোগা মানুষ বকছিস কেন? দেখ দেখি চোখ দুটো জলে ভরে গেছে।" চোখের জল মুছিয়া ইন্দু বিনয়কে বলিল—"জানেন আমি স্বপ্ন দেখতুম যে দিন রাত্রিই পড়ছি। পড়া বই নতুন বই কত বই-ই যে ঘরের ঘোরে পড়েছি তা মনে নেই। কেবল মনে হোতো আপনি আমার পাশে বসে আছেন। বিনয় একটু লজ্জিত হইল, নির্ম্মল চটিয়া বলিল—"তোর অসুখ করেছিল তার জন্য আমাকে তার করা কেন? আমি কি ডাক্তার?" অপ্রস্তুত ইন্দু বলিল—"আমি কি তার করেছি দাদা?" সদানন্দ চক্রবর্ত্তীর প্রত্যাখ্যাত নিমন্ত্রণ স্মরণ করিয়া বিনয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। নির্ম্মল একটু লজ্জিত হইল, তাহা দেখিয়া ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছিল?" নির্ম্মল বিনয়কে চোখ টিপিল, নিষেধ না মানিয়া বিনয় বলিল—"তারটা একটু অসময়ে পৌঁছাতে তোমার দাদার বড়ই অসুবিধে হয়েছিল।" কাছের গোড়ায় একটা শুখনা ফুলের তোড়া পড়িয়াছিল। নির্ম্মল তাহা বিনয়ের গায়ে ছুড়িয়া মারিল, তোড়াটা ছিঁড়িয়া বিনয়ের ও ইন্দুর মুখে ছড়াইয়া পড়িল। ইন্দু খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, আর জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছিল বলুন না?"

বিনয় বলিল—"সে বড় মজার কথা"—নির্ম্মল বিনয়ের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই উঠিয়া গেল। বিনয় তখন নিশ্চিন্তমনে মোহিনীর আবির্ভাবের কথা ইন্দুকে শুনাইল। সে দিন বিকালে ডাক্তার আসিয়া রোগিণীকে এতই প্রফুল্ল দেখিলেন যে, তিনি ইন্দুর পিতামাতাকে খুব আশ্বস্ত করিয়া দিলেন।

তখনও কলেজ খোলে নাই, সুতরাং ছাত্রাবাসগুলা বন্ধ ছিল। বিনয় আসিয়া প্রথম দিন নির্ম্মলদের বাড়ী উঠিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলা সে অক্রূর যাইতে চাহিল, কিন্তু একদিনের মধ্যেই ইন্দুর পরিবর্ত্তন দেখিয়া নির্ম্মলের পিতা তাহাকে কিছুতেই যাইতে দিলেন না। প্রবল আনন্দের বেগ অনেক কষ্টে দমন করিয়া বিনয় দেখাইল যেন সে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই থাকিয়া গেল। সেই দিন হইতে ইন্দুর অবস্থা দিন দিন ভাল হইতে লাগিল। সমস্ত দিন বিনয় ইন্দুর বিছানার পাশে বসিয়া থাকিত, কখনও গল্প করিত, কখনও বা পড়িত, কেবল ইন্দুকে বেশী কথা কহিতে দিত না। মায়ের হুকুমে নির্ম্মল মাঝে মাঝে সেখানে আসিত বটে কিন্তু বিনয় ও ইন্দুর বাক্যবাণে সে তিষ্ঠিতে পারিত না।

এক সপ্তাহের মধ্যে ইন্দু রোগশয্যা ত্যাগ করিল। নির্ম্মলদের বাড়ীর অদূরে একটা ছোট পুষ্করিণী ছিল, নির্ম্মলের পিতা তাহার চারিপাশে ফুলের গাছ বসাইয়া একটী সুন্দর বাগান তৈরি করিয়াছিলেন। সেই পুষ্করিণীর এক কোণে একটা অনেক দিনের মালতীলতা ছিল। লতাটা বাড়িয়া অনেকটা স্থান ছায়াতে শীতল করিয়া রাখিত। তাহার নীচে শ্বেত পাথর দিয়া নির্ম্মল একটা বেদী তৈয়ারি করাইয়াছিল। ইন্দু যখন শয্যা ত্যাগ করিবার অনুমতি পাইল তখন বিনয় তাহাকে সেইখানে লইয়া যাইত। মালতী বিতানের ছায়ায় সাদা পাথরের আসনখানি তখন ঝরা মালতী ফুলে সাজান থাকিত, তাহার উপরে ইন্দুকে বসাইয়া বিনয় নিজে মালতীলতায় —একটা মোটা শিকড়ের উপরে বসিত, কোন কোনদিন নির্ম্মলের মা তাহাদের সঙ্গে আসিতেন, আবার কোন-

এখানে নির্ম্মলের পিতা মাছ ধরিবার অছিলায় ঘাটের পাশে ছিপ ফেলিয়া বসিয়া থাকিতেন। স্বপ্নের মত ছুটির শেষ কয়টা দিন কাটিয়া গেল।

কলেজ খুলিল। বিনয় মেসে চলিয়া গেল, নির্ম্মলের পিতা মাতা অনেক অনুরোধ করিয়াও তাহাকে বাড়ীতে রাখিতে পারিলেন না। বিনয় এখন আর নিত্য আসিত না, দুই এক দিন অন্তর আসিত এবং ইন্দুকে পড়াইতে বসিত, যখন অবসর পাইত তখন সে নির্ম্মলের ছবি দেখিত। একদিন বিকালবেলায় বিনয় আসিয়াছে দেখিয়া নির্ম্মলের পিতা বলিলেন,—"বিনয় তুমি কি ইন্দুকে পড়াবে? তাহলে পুকুরধারে এসো, আমি ইন্দুকে ডাকিয়া পাঠাইতেছি।" বিনয় তখন ইন্দুর সন্ধানে অন্দরে যাইতেছিল, নির্ম্মলের পিতার কথা শুনিয়া সে আর যাইতে পারিল না। নির্ম্মলের বাবা একজন চাকরকে ইন্দুকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন আর নিজে বিনয়কে লইয়া রান্নাঘর পার হইয়া একেবারে পুকুরধারে চলিলেন। সেদিন তিনি বিনয়কে সাদা পাথরের আসনে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিনয় নিরুর কি হয়েছে বাবা?" বিনয়ের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল, সে শুষ্ক মুখে বলিল, —"কি হয়েছে কিছুই তো জানি না।" নির্ম্মলের পিতা বলিলেন—"তুমি জান বাবা, আমার কাছে লুকিয়ো না; ইন্দু আমায় সমস্ত বোলেছে।" "ইন্দু কি বোলেছে তা না জান্‌লে আমি কি করে বোলবো?" "তোমাদের ফেলে গিয়ে নির্ম্মল এক সুন্দরী ব্রাহ্মণের মেয়েকে দেখেছিল। ঠিক কি না?" "আজ্ঞে হাঁ।" "দেখে নির্ম্মল সে মেয়েটীর প্রতি খুব আকৃষ্ট হয়েছিল না?" বিনয় মাথা হেঁট করিয়া বলিল—"আজ্ঞা হাঁ।" "সে মেয়েটীর সঙ্গে নির্ম্মলের বিবাহ দেবার ব্যবস্থা করতে পারো কি?" বিনয় মাথা তুলিয়া বলিল—"অসম্ভব। চক্রবর্ত্তী জেঠা কুলীন, তিনি কখনই আপনাদের মত ঘরে মেয়ের বিয়ে দেবেন না।" "তুমি চেষ্টা কোরে দেখতে পারো? হয়ত পয়সা খরচ কর্‌লে হ'তে পারে?" কিছুতেই নয়, চক্রবর্ত্তী মশায় সেকেলে লোক, তিনি ছেলেকে ইংরেজী লেখাপড়া শেখানেনি, তাঁর ত্রয় ইংরেজী লেখা পড়া শিখলে ছেলে ক্রেচ্ছ হয়ে যাবে। তাঁরা বড় লোক নন কিন্তু তাঁদের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব নেই। সুতরাং পয়সার লোভ দেখালে কিছু হবে বোলে বোধ হয় না।" নির্ম্মলের পিতার মুখ ভার হইল, বিনয় তাহা দেখিয়া বন্ধুর জন্য ভয় পাইল। এই সময়ে বই হাতে করিয়া ইন্দু আসিয়া উপস্থিত হইল, দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া তাহার পিতা সরিয়া গেলেন। বিনয়ের মুখ ভার দেখিয়া ইন্দু ভয় পাইল, সে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কি বলছিলেন?" বিনয় বলিল—"কিছু নয়।" "না আমায় বলুন না, আমার যে ভয় করছে?" "তোমার ভয় কিসে ইন্দু? তোমার কথা তো কিছু হয় নি।" "তবে আমি বুঝতে পেরেছি। দেখুন আমি সে মোহিনীর কথা ভেবে রাখতে পারিনি, মাকে বোলে ফেলেছি।" মুখ ভার করিয়া বিনয় বলিল—"ভাল করনি ইন্দু, এর জন্য হয়ত নির্ম্মলকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে। সে পাথুরে ঘাটায় বিয়ে কোরতে অস্বীকার কোরেছে।" "আমি তো মাকে বোলেছি যে সেই মোহিনীর সঙ্গেই দাদার বিয়ে হওয়া উচিত।" "অসম্ভব ইন্দু, তারা কুলীন, মোহিনীর সঙ্গে নির্ম্মলের বিয়ে একেবারে অসম্ভব। সে কথা যাক্ তুমি পোড়বে এসো।"

বিনয় আসনের এক কোণে সরিয়া বসিল—ইন্দু বই খুলিয়া পড়িল—

"চরণাস্তনিবেশিতাং প্রিয়ায়াঃ
সরসাং পত্র বয়ন্ত রাগলেখাং
প্রথমামিব পল্লবপ্রস্থতিং
হরধন্বন্ত মনোভব ক্ষমন্ত।"

পড়িয়াই বিনয় বলিল—"ইন্দু তোমার পাখানা আসনের উপর তোলনা!" ইন্দু তাহার সুন্দর পাখানি তুলিয়া শ্বেতপাথরের আসনের উপরে রাখিল, কঠিন পাষাণের স্পর্শে ইন্দুর শুভ্র পদতল ঈষৎ রক্তাভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানিও লাল হইয়া উঠিল; দূর হইতে তাহা দেখিয়া ইন্দুর পিতা অন্দরে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"দেখ বিনয়ের সঙ্গে ইন্দুর বিয়ে দিলে কেমন হয়!" ইন্দুর মাতা বইখানা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"ছেলেটী

একটু কালো তা নইলে সকল বিষয়েই সুন্দর।" "দেখ তোমাদের মেয়ে মানুষ জাতের ওই বড় দোষ। রং নিয়ে ধুয়ে খাবে। ভেবে দেখ দেখি কালো রঙে বিনয়ের কি সুন্দর গড়ন, কি সুন্দর স্বভাব। বিনয় যেন সাক্ষাৎ বিনয়। এই তোমার ছেলের রং তো এত সুন্দর কিন্তু বিনয়ের কাছে সে যেন বাঁদরটা। বিনয়টী যে নবীন পুতুল। দেখ গিন্নী আমার বড় সাধ ইন্দুকে বিনয়ের হাতে সঁপে দিই। পুকুরঘাটে মালতীর ফুলের তলায় তুলিতে বলে আছে যেন এলুম। কি সুন্দর দেখাচ্ছে গিন্নী তা তোমায় আর কি বোলবো, মনে হলো ব্রজভূমির কোন এক কুঞ্জে যেন রাধাকৃষ্ণের মিলন যেন এলুম।" "একেবারে হঠাৎ যে কবি হয়ে উঠলে গো?" "তুমিও যদি দেখতে গিন্নী তা হলে তুমিও ঐ কথা বোলতে, দেখ বিলম্ব করে কাজ নেই, আমি বিনয়ের বাপের কাছে সম্বন্ধের প্রস্তাব করে পাঠাই।" "নির্ম্মলের কাছে শুনলুম ওরা যে রকম গোঁড়া হিন্দু, তাতে আমার ভয় হয় ওঁরা কি আমাদের ঘরের মেয়ে নেবেন?" "গিন্নী, ইন্দু আমার রূপসী নয় সে চাঁদের কণা, অমন পটের পুতুল দেখে যে কেউ ফেরাতে পারে তা আমার বিশ্বাস হয় না। দেখ আমি ছপোর স্রোতে আর ইন্দুর মুখখানি দেখিয়ে ভুলিয়ে বিনয়ের বাপের সকল বাধা বিপত্তি ভাসিয়ে দেবো। একটা কাজে বড় বাধা পেয়েছি। নির্ম্মল কিছুতেই পাখুরেঘাটায় বিয়ে কোরবে না। এতদিন কিছু বলেনি। এখন যে কি করি তা বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। বিনয়কে জিজ্ঞাসা করে জানলুম, সে সদানন্দ চক্রবর্ত্তী কোন মতেই আমাদের ঘরে মেয়ে দেবে না।" "দিন কতক যাকনা। এত তাড়াতাড়ি কেন? ততদিন না হয় ইন্দুর বিয়ের সম্বন্ধ কর।। নির্ম্মলের পিতা অন্দর ছাড়িয়া বাহিরে আসিল এবং পত্র লিখিতে বসিল :—

২০৩, চিৎপুর রোড
কলিকাতা।
১৯শে মাঘ ১৩০৭ সাল।

সবিনয় নিবেদন মিদং—

চাক্ষুষ আলাপ হয় নাই বটে কিন্তু ইহার মধ্যেই আপনার পুত্রের সঙ্গে আমার পুত্রের এত অধিক প্রণয় হইয়াছে যে দর্শন মাত্র বাকী রহিল, মনের পরিচয় অনেক দিন হইয়া গিয়াছে।

আর একটা কথা কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। বিনয়কে সময়ে পাঠাইয়া দিয়া—আমার প্রাণসমা কন্যার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। বিনয় না আসিলে ইন্দু বাঁচিত না, বিনয় প্রাণ দিয়া শুশ্রূষা করিয়া মরণের দুয়ার হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে। সেই হইতে আমরা দুই স্বামী-স্ত্রী বুঝিয়াছি যে ইন্দু আমাদের নহে, সে বিনয়ের এখন কেবল আপনার অনুমতি সাপেক্ষ। আদেশ পাইলেই আপনার দুয়ারে দরবার করিতে যাইব। ইতি

ভবদীয় কৃপাকাঙ্ক্ষিণঃ
মুখোপাধ্যায়োপাধিকস্ত গৌরমোহন
দেবশর্ম্মণঃ

পত্রখানি লিখিয়া দুই তিনবার পড়িয়া নির্ম্মলের পিতা তাহা তুলিয়া রাখিলেন এবং একজন কর্ম্মচারীকে ফল কিনিতে পাঠাইলেন। বিনয় তখন নির্ম্মলের সহিত বাহির হইয়া যাইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া গৌরমোহন-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিনয় বাবা আজ ইন্দুকে কি বই পড়াচ্ছিলে?" বিনয় বহু কষ্টে উত্তর দিল "আজ্ঞে মালবিকাগ্নিমিত্র।" গৌরমোহনবাবু বিনয়ের লজ্জিত ভাব লক্ষ্য করিয়াও দেখিলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন —"অত শক্ত বই ইন্দু বুঝতে পারে?" বিনয় বলিল— "বেশ বুঝতে পারে।" নির্ম্মল এই সময় বলিয়া উঠিল,— "ও-বাবা ইন্দি একেবারে পণ্ডিত মশাই হয়ে উঠেছে বাবা, সে আমার চাইতে ভাল বুঝতে পারে।" পুত্রের কথা শুনিয়া পিতার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "হবে না কেন বাবা কেমন মাষ্টারটী তা দেখতে হবে তো? তুই যদি বিনয়ের কাছে সংস্কৃত পড়তিস্—তা হলে কিছু শিখতে পারতিস্!" নির্ম্মল উত্তর দিল না, অল্পক্ষণ পরে দুই বন্ধু বিদায় লইয়া বাহিরে গেল। সেই দিন রাত্রিতে ফলমূলের তত্ত্ব লইয়া এবং গৌরমোহন বাবুর চিঠি লইয়া একজন আমলা বিনয়ের বেশে গেল। বিনয়, নির্ম্মল বা ইন্দু তাহা জানিল না।

বিবাহের প্রস্তাব করিয়াই গৌরমোহন আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন, তিনি মনের চোখে দেখিতে পাইলেন যে

বিনয়কে আমন্ত্রণে পাইয়াছেন। তাহার পর হইতে বিনয়কে নিত্য আসিতে হইত, একদিন তাহাকে আসিতে না পারিলে নির্মল তিরস্কার ভোগ করিত, আর তাহার পরে সৌরমোহন নিজে আসিতে যাইতেন। এইরূপে দুই চারি দিন কাটিয়া গেল। দিন কয়টা সৌরমোহনের পক্ষে বড় আনন্দেই কাটিল, বিনয় বা ইন্দু তাঁহার আনন্দের কারণ বুঝিতে পারিল না। যে আয়না তত্ত্ব লইয়া বিনয়দের বাটী গিয়াছিল তাহার ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া, সৌরমোহন স্থির করিলেন যে বিনয়ের পিতা বিবাহে সম্মত হইয়াছেন, তাঁহার আনন্দের আর সীমা পরিসীমা রহিল না।

বেলা তিনটার সময় অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাস পড়াইতেছিলেন। বিনয় আর নির্মল পাশাপাশি বসিয়াছিল। এই সময়ে একজন চাপরাসি আসিয়া অধ্যাপকের হাতে একখানি পত্র দিল। অধ্যাপক পত্রখানি পড়িয়া বলিলেন—"বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজের অধ্যক্ষ তোমাকে ডাকছেন।" বিনয় বই রাখিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল, সে অধ্যক্ষের ঘরে গিয়া দেখিল যে তাহার পিতা দাঁড়াইয়া আছেন, সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বিনয়ের পিতা হরশঙ্কর অধ্যক্ষকে বলিলেন, "এই আমার ছেলে, একে আমি এখনই নিয়ে যেতে চাই।" অধ্যক্ষ বলিলেন "নিয়ে যান।" হরশঙ্কর বাহির হইলেন, বিনয় তাহার পিছন পিছন বাহির হইল। সিঁড়ির কাছে আসিয়া বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কি তবে বাসায় যাবেন?" হরশঙ্কর বলিলেন "না"। বিনয় আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তবে আমি বইগুলো নিয়ে আসি?" হরশঙ্কর বলিলেন "না"। পিতার মুখের ভঙ্গী দেখিয়া বিনয়ের আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না। কলেজের ফটকের বাহিরে গিয়া সে দেখিল যে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ীর ভিতরে তাহাদের গ্রামের একজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন এবং সেই গাড়ীর কোচোয়ানের পাশে লাঠি হাতে একজন দরওয়ান বসিয়া আছে। বিনয়কে গাড়ীতে উঠাইয়া, বিনয়ের পিতা গাড়োয়ানকে হাবড়া ষ্টেশনে যাইতে বলিলেন। হাবড়া ষ্টেশনে গিয়া বিনয় দেখিল যে তাহাদের জন্য পাঁচটার স্পেশ্যাল প্যাসেঞ্জারে একটা সেকেণ্ডক্লাস কামরা রিজার্ভ করা হইয়াছে। তখন বিনয় সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমি কি আপনার সঙ্গে বাড়ী যাবো?" হরশঙ্কর বলিলেন—"হাঁ"। বিনয় বলিল—"মেসে খবর দিয়ে আসা হয়নি।". "আমি খবর দিয়ে এসেছি।" "কাপড় চোপড়গুলো?" "তোমার নতুন কাপড় জামা জুতো সমস্ত কিনে এনেছি।"

গাড়ী যখন হাবড়া ষ্টেশন ছাড়িল তখন নির্মল বিনয়কে সমস্ত কলেজটা খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। কেহই বিনয়ের সংবাদ দিতে পারিল না, কেবল কলেজের দরোয়ান বলিল যে বিনয় এক বুড়া ভদ্রলোকের সঙ্গে গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে। বিনয়দের মেসে গিয়া সে তাহার কোন সংবাদ পাইল না। তখন সে গাড়ী করিয়া বিনয়ের বন্ধু ও আত্মীয়দের বাড়ী খুঁজিয়া বেড়াইল।

সেদিন বিকাল বেলায় ইন্দুর মা ইন্দুকে ভাল করিয়া সাজাইয়া দিয়াছিল। সে "মালবিকাগ্নিমিত্র" হাতে করিয়া মালতী বিতানের নীচে সাদা পাথরের আসনের উপর বসিয়াছিল। সন্ধ্যা হইয়া গেল, আটটা বাজিয়া গেল, তখনও কাহারও দেখা নাই, লোকের পর লোক গিয়া কাহাকেও খুঁজিয়া পাইল না। তখন ইন্দু মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মা ইন্দুকে শান্ত করিতে গিয়া নিজে কাঁদিয়া ফেলিলেন। রাত্রি দশটার সময় অবসন্নদেহ, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত্ত নির্মল আসিয়া বলিল—"বিনয় কোথায় চলে গেছে তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।" ইন্দু কোথায় গিয়া লুকাইল তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া কেহ খুঁজিয়া পাইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সকাল বেলা উঠিয়াই বিনয় শুনিল দুই দিন পরেই তাহার বিবাহ। বাড়ীর লোক, গ্রামের লোক, স্ত্রী-পুরুষ সকলে আসিয়া একই ছন্দে তাহাকে শুনাইয়া গেল মেয়েটী বড় সুন্দরী। বিনয় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িল। পূজার দালানের উপরে একদল বাজনদার যথাসাধ্য সুর ও তালের সংস্কার সাধন করিতেছিল, সে বাজনাটি বিনয়ের কাণে

বজ্রের মত বাজিল, কিন্তু সে কি করিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। তাহার একদল বাল্যবন্ধু আসিল, তাহারা তাহাকে শুনাইয়া গেল যে বিনয় বিপুল বৈভবের অধিকারী হইবে, শ্বশুরবাড়ীর সহিত রাজার রাজ্য তাহার অধিকারে আসিবে। রাজ্য লাভের কথা শুনিয়া তাহারা যখন বন্ধুর মনে তৃপ্তি দেখিল না, তখন অপ্রস্তুত হইয়া সকলে একে একে উঠিয়া গেল। আর একদল আসিল তাহারা বড়া, তাহারা জানাইলেন যে বিনয় ব্রহ্মের কন্যা বিবাহ করিতে গিয়া অপরিসীম নরকে পড়িতেছিল, অনেক কষ্টে তাহাকে উদ্ধার করা হইয়াছে। যে ঘরে তাহার বিবাহ হইতেছে সে ঘরে হিন্দুধর্ম মূর্তিমানরূপে বিরাজিত; তাহাদের সব সুন্দর; তাহাদের ধর্ম সুন্দর, আচার সুন্দর, ব্যবহার সুন্দর। বিনয় অত্যন্ত বিনয়ের সহিত সকল কথা শুনিয়া গেল, কেবল তাহার মনে সৌন্দর্য্য ও ধর্মের বিরুদ্ধে একটা বিষম বিদ্বেষ জন্মিয়া গেল। তাহার কারণ সে বুঝিতে পারিল না।

বেলা বাড়িয়া গেল, নয়টা দশটার সময় তাহার মাতা তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। বিনয় তখন মাতাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মা! নির্ম্মলকে একটা খবর দেবো?" মা উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন—"দাঁড়া, বাবা কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠাই!" আধ ঘণ্টা পরে মা আসিয়া বলিয়া গেলেন—"কর্ত্তা বলেন নির্ম্মলকে খবর দিতে তাঁর কোনই আপত্তি নেই; বরঞ্চ নির্ম্মল আর অন্যান্য বন্ধুবান্ধবকে যেন টেলিগ্রাম করে নিমন্ত্রণ করা হয়।" বিনয় কেবল নির্ম্মলকে একখানা পত্র লিখিল, টেলিগ্রামের কথা ও টাকাগুলা ফিরাইয়া দিল। সে লিখিল :—

বন্ধু,

কলেজ থেকে বাবা আমাকে নিয়ে এসেছেন। খবর দেবার সময় পাইনি। শুনছি পরশু আমার বিয়ে, বাবা তোমাকে নিমন্ত্রণ কর্‌তে বোলেছেন তাই করছি। কিন্তু তুমি এস না, আমার মাথার দিব্য এস না; অনেক কষ্টে মন বেঁধে আছি তোমায় দেখলে থাকতে পারবো না। নিজে শুনছি মেয়েটী বড় সুন্দরী, তারা সবাই সুন্দর, তাদের সব সুন্দর—কিন্তু আমার মনের ভিতরটা এখন কত কালো তা কেউ দেখছে না। নির্ম্মল, সবাইকে বোলো পরশু আমার বিয়ে, সবাইকে বোলো আমার নাম করে আনন্দ কর্‌তে। কারণ, এখন আমি খাঁচার পাখীর মত বন্দী। নিষ্কলঙ্ক প্রাণে এ আনন্দের উৎসবে আমার যোগ্য আসছে না। কেমন করে আবার তোমার মুখ দেখাবো তা বুঝে উঠতে পারছি না। হয়ত দেখা ও হবে, সেদিন যদি পারি বাকী কথাটা বোলবো। শকুন্তলা আর মালবিকাগ্নিমিত্র বই দুখানা ভুলে তাদিয়ে দিও।

তোমার বন্ধু বিনয়

সেই আনন্দোৎসব শঙ্খ-মুখরিত গৃহে তাহার তরুণ প্রাণের আকুল বেদনা কেহ বুঝিল না, বুঝিল কেবল মা। শুভদিনে পুত্রের মুখে বেদনার কালিমা দেখিয়া মায়ের মনে ব্যথা লাগিল। মা পুত্রকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনো আজকের দিনে মুখখানা অন্ধকার করে রয়েছ কেন বাবা?" বিনয় একবার মায়ের মুখের দিকে চাহিল, সে দেখিল যে ঈশান কোণের মেঘের মত মায়ের চোখের কোণে প্রবল জলের স্রোত লুকাইয়া আছে, তখন চোখ দিয়া জল বাহির হইল। মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া বিনয় কাঁদিয়া ফেলিল, মাও কাঁদিলেন। তাহার মধ্যে দুই একবার শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বিনয় বলিল—"মা আমাকে এমন করে যন্ত্রণা দিও না, যদি অপরাধ করে থাকি শাস্তি দাও, যদি পাপ করে থাকি বল প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছি কিন্তু সারাটী জীবন জলন্ত আগুনের বেড়ার মধ্যে আমায় ফেলে দিও না।" মা বলিলেন—যে কর্ত্তা চলিবার নহেন, তিনি অনেক বুঝাইয়াছেন কিন্তু অপরূপ সুন্দরী কন্যা আর অগাধ অর্থের লোভ তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। তখন বিনয় বলিল—"মা, তবে কেঁদো না, তুমি জান যে, তোমরা যা বোলবে তা আমি অমান্য কোরবো না—তবে আমার মুখের দিকে আর চেয়ো না। যতটুকু পারবো ততটুকু কোরবো। মা অষ্টমীর পাঁঠা কি হাসিমুখে কাঁড়িকাঠে যায়? সেই রকম তোমার ছেলেও হাসিমুখে বিয়ে কোরতে যেতে পারবে না। মা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন, আর তখন হইতে বিনয় মনটাকে পাথরের মত শক্ত করিয়া বসিল। দুইটী

ছিন বিনয়ের পক্ষে দুই বৎসর, দুই দিনের মধ্যে তাহার চেহারা বদলাইয়া গেল। তাহাকে খাইতে দিলে সে খাইত, সাজাইয়া দিলে সাজিত, না বলিলে স্নান করিতে পর্য্যন্ত উঠিত না। বিবাহের দিন আসিল, সানাই বাজিল, ব্যাণ্ড বাজিল, পুতুল নাচিল, কাগজের ফুলের বাগান, কলির মধুর পক্ষী, একটা জীবন্ত হাতী, মোটা-রকম যৌতুক ইত্যাদির সহিত তাহাতে চড়িয়া বিনয় বিবাহ করিতে গেল। যাত্রার সময়ে মাকে বলিয়া গেল, "মা তুমি ভেবো না। আমি অন্যায় কোন কাজ কোরবো না, আমি তোমার ছেলে হয়ে তোমার মনে কষ্ট দেবো না।

যথাসময়ে বিবাহ হইয়া গেল, শুভ-দৃষ্টির সময়ে বিনয় চোখ দুটা বন্ধ করিয়া রহিল, আহারের সময় একটী অন্ন দাঁতে কাটিয়া উঠিল। বাসর ঘরে তাহার যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। কিন্তু সমস্ত পরিহাস, উপহাস ও গঞ্জনা বিনয় নীরবে সহ্য করিয়া গেল। যে যাহা করিতে বলিল সে তাহাই করিল, কেবল তাহার ধর্ম্ম পত্নীর অঙ্গ স্পর্শ করিল না। সারাটা রাত্রি কেহ তাহাকে কথা কহাইতে পারিল না। পল্লীবালারা নাচিয়া গাহিয়া বিনয়কে উৎফুল্ল করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই তাহার মুখে হাসির চিহ্ন পর্য্যন্ত আনিতে পারিল না। রাত্রি শেষে ক্লান্ত হইয়া যখন বাসর শুদ্ধ মেয়ে ঘুমাইয়া পড়িল, তখন বিনয় চেলির উত্তরীয়খানা ফেলিয়া রাখিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তখন প্রচণ্ড শীত সুতরাং আকাশ পরিষ্কার, চারিদিক নিঃশব্দ, এক এক করিয়া অশেষ তারকামালা নিভিয়া গেল, শেষ রাত্রেতে দুই দণ্ডের জন্য ক্ষীণ চন্দ্রকলা ফুটিয়া উঠিল, বিনয় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার হাসি আসিল, স্নান কাল, পাত্র ভুলিয়া বিনয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহার মনে হইল অদৃষ্ট দুয়ারে দাঁড়াইয়া তাহাকে পরিহাস করিতেছে। হাসিয়াই বিনয় লজ্জিত হইল, সে তাড়াতাড়ি চাহিয়া দেখিল তাহার হাসির শব্দে ঘরে কেহ উঠিয়াছে কিনা। সকলেই ঘুমাইতেছিল, কেহই উঠে নাই।

সকাল বেলায় তাহার শীর্ণ ক্লিষ্ট মুখখানা দেখিয়া সকলেই শঙ্কিত হইল। যে যাহা জিজ্ঞাসা করিল কেহই তাহার নিকট উত্তর পাইল না। কেবল হরসুন্দর যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিনয় অসুখ কোরেছে নাকি?" বিনয় তখন ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"না আমি বেশ আছি।" (ক্রমশঃ)

গ্রন্থ আলোচনা

'পল্লী-শ্রী' উপন্যাস।—শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য পাঁচসিকা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এবং অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। এই উপন্যাসখানির মধ্য দিয়া গ্রন্থকার বাংলা দেশের আদর্শ পল্লীচিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ভোলানাথ, পারুল, নবগোপাল প্রভৃতির চরিত্রে একদিকে বাংলার মানসিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবনের ছবি যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, অপর দিকে তেমনি অরুন্ধিনু, অরুন্ধতী প্রভৃতি চরিত্রে দেশীয় জীবনের মহত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্যামাসুন্দরী, সত্যভামার চরিত্রে দেশের সত্যকার দুইটি গৃহিণী-চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। নারী জীবনের স্নেহ দুর্ব্বলতা, বংশগত গর্ব্ব ও মহত্ত্বে চরিত্র দুটি উজ্জ্বল। করিমুদ্দি প্রভৃতি প্রজা সাধারণের চরিত্রেও দেশের প্রজা সাধারণের ও জনশক্তির একটি মনোজ্ঞ ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এতটুকু সদাশয়তা ও আন্তরিক স্নেহ করুণা লইয়া ইহাদের সঙ্গে মিশিলে ইহারা দেশের কার্য্যে ও দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিতে যে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে পারে, ও অতি সহজ স্বাভাবিক ভাবে দেশের এই মরণ-মুখী অবস্থার একটা বিপুল পরিবর্ত্তন আনিতে পারে গ্রন্থকার তাহা সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। হরিতা ও শ্যামল দুটি খুকী খোকার চরিত্রও সুন্দর ফুটিয়াছে।—আজকাল এই ভীষণ জীবন-সমস্যা ও বিক্ষোভের দিনে দেশজীবনের মূল উৎস—পল্লীগুলিকে কি ভাবে উন্নত এবং সংঘবদ্ধ করা যায় তাহা লইয়া নানা সমস্যা ও আলোচনা চলিয়াছে। এ সময়ে 'পল্লী-শ্রী'র মত বই এই সমস্যার অনেকটা সত্য পথ-নির্দ্দেশ করিতে পারিবে। বইখানির প্রথম দু'চার পৃষ্ঠার ভাষা একটু ঘট-ঘট ও আড়ষ্ট হইলেও পরে বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে ভাষা ও ঘটনাস্রোত বহিয়া গিয়াছে। কোথাও ঘটনার আধিক্যতা বা আতিশয্য তথ্যের সমাবেশে গ্রন্থ ভারাক্রান্ত হয় নাই। পল্লী জীবনের চিত্রগুলি ফুটিয়াছে—একেবারে ছবির মতন। বইখানিতে প্রাণে আশা জাগায়—নিরাশার ঘোর কাটাইয়া আবার আলোর জীবনে বাঁপাইয়া পড়িবার সাহস আনে। পল্লী-শ্রীর ছাপা কাগজ সুন্দর—বাঁধাই মনোরম।

সহরে কবি

[শ্রীউমাপ্রসন্ন দে]

আকুল-নয়নে সন্ধ্যা-দুপুরে
বাতায়ন পাশে বসি'—
চঞ্চল-চিত্ত কবি ভাবে কবে
ফাগুন আসিবে হাসি'
উথলি' উঠিবে অন্তরে তার
মধুর কত আশা,
রঙিন্ খেয়াল লুটাবে ভুবনে
ছন্দ-মধুর ভাষা !
সেদিন যখন পুণ্য-লগনে
ফাগুন আসিল ঘরে
কম্পিত-হিয়া কবি নিল তুলি
লেখনী আপন করে ;
যতন-রচিত খাতাখানি রাখি'
টেবিলের মাঝখানে,
চশমা-শোভিত নয়নে চাহিল
সুনীল-আকাশ পানে।
চেয়ে তারপর ধরণীর দিকে
সুধীরে খুলিয়া খাতা
"বসন্ত"—লিখিয়া থামিল ক্ষণিক—
অপলক আঁখি-পাতা !
কি-লিখিবে ওগো কি লিখিবে আর
পায়না কোথাও খুঁজি ;
স্বেদ-জলে হলো সিক্ত কপোল
ভাবের সহিতে যুঝি'।
চারিদিকে চায়, কোথা নাহি হায়,
ব্যাকুল পুলক-সাড়া,
সবই পুরাতন—আগমনী-বাণী
যেমনি কাহারো তাড়া।
নব-সুষমায় রঞ্জিত ধরি
কোথায় অরুণ-আলো ?
খেয়াল-আড়ালে, কলের ধুঁয়ায়
ঢাকিয়া গিয়াছে ভালো !

কোথা বাহিত কোকিল-কাকলী
বধূয়া-আহ্বান-গীতি ?—
রাজ-পথখানি শব্দিত করি
গাড়ী চলে দিবা-রাতি !
কোথা পুষ্পিত সহকার-শাখা,
পক্ক-জামল ভূমি ?—
ক্ষুব্ধ চাহনি—ইট্ 'পরে ইট
উঠিছে আকাশ চুমি !
সঞ্চিত-মধু কোথা মল্লিকা,
গুঞ্জন-রত অলি ?—
কবির ধৈর্য্য টুটাল এবার
মশা ও মাছিতে মিলি !
বহেনা হেথায় অঙ্গ-শীতলি'
মন্দ মলয়-বায় !—
তপ্ত-বাতাস 'ড্রেন'-বাস ল'য়ে
যেয়ে যেয়ে বয়ে যায়।
কোথা চঞ্চল গতি-অবিরল
মুক্ত-সরিৎ-ধারা ?—
ফুল-জল আর সলিল-বিন্দু,
'কলে'র বাঁধন-ছাড়া।
উৎসব-সাজ নাহি—নাহি আজ—
নাহি সঙ্গীত-সুধা ;—
জনতা ছুটিছে উর্দ্ধ-নিশ্বাসে,
দুঃখী হাঁকে 'বড় ক্ষুধা' !
স্খলিত-বসন, আলু-থালু কেশ
তপ্ত হয়েছে নাড়ী—
তবু যে গো কবি পেলনা কোথাও
বাণীর করুণা-বারি !
অপলক চোখে বসি' কবি-বর
সুনিবিড় সাধনায়—
মুখ হ'তে খসি' বর্ষা-দিসার
ভূমিতে লুটায় হায় !

মনোমোহনে অ্যালেকজাণ্ডার

(লেখক—জনৈক দর্শক)

অনেক দিন পরে মনোমোহন রঙ্গালয়ের অভিনয়ে আবার একটু নূতনত্বের সঞ্চার—অর্থাৎ নূতন নাটকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আমরা গেল শনিবারে "অ্যালেক-জাণ্ডারের" অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম এবং বলা বাহুল্য দানীবাবু যেখানে অ্যালেকজাণ্ডারের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, সেখান হইতে আমাদিগকে নিরাশ প্রাণে ফিরিয়া আসিতে হয় নাই।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, এই প্রাচীন বয়সে দানীবাবু যুবক অ্যালেকজাণ্ডারের ভূমিকা লইয়াছেন কেন?—কঠিন প্রশ্ন যদিও এ "কেন"র উত্তর আছে অবশ্য রকম! দানীবাবুর প্রতিভা তো বর্ত্তমানে বাংলার আর কোন অভিনেতার মধ্যে দেখিবার উপায় নাই, অতএব দানীবাবুকে যাঁহারা দেখিতে চান,তাঁহাদিগকে এদিকে নির্ব্বাক হইতেই হইবে! শ্রেষ্ঠ ও প্রতিভাবান অভিনেতাগণকে আমরা এমন স্বাধীনতা চিরকালই দিয়া আসিয়াছি। গিরিশচন্দ্র মৃত্যুর কিছুকাল আগেই রাম ও পশুপতি প্রভৃতির ভূমিকা লইতে সঙ্কুচিত হন নাই। তারাসুন্দরী এই সেদিনে অপরেশচন্দ্রের সামাজিক নাটকে নব-যৌবনার ভূমিকায় অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। স্যার হেনরি আর্ভিং,স্যার কোর্বল্ রবার্টসন এবং সারা বার্ণাড ও এলেন টেরি প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নট-নটীরাও ঠিক এই কাজ করিয়াছেন, অথচ দর্শকদের উপভোগ তো সে-সব ক্ষেত্রে আহত হয় নাই। দানী-বাবুও নাট্য সমাজের এই চিরাচরিত রীতিই পালন করিয়াছেন মাত্র! বিশেষ অ্যালেকজাণ্ডারের ভূমিকায় তাঁহাকে স্থবির বৃদ্ধের মত মোটেই দেখায় নাই, বরং তাঁহার মূর্ত্তি ও ভাবভঙ্গির মধ্যে আমরা বরাবরই শক্তি, বীর্য্য ও বীরত্বেরই চমৎকার প্রকাশ দেখিয়াছি, সেই সঙ্গে দানীবাবুর অপূর্ব্ব গম্ভীর কণ্ঠের আবৃত্তি-কৌশলেও আমরা মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারি নাই। নাট্যকার অ্যালেকজাণ্ডারের চরিত্র যতটুকু দেখাইয়াছেন, দানীবাবুর অভিনয়ে ঠিক ততটুকুই উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য স্থানে স্থানে অভিনয়ের পর্দ্দা আরও চড়িলেই ভালো হইত—যদিও সুর কোথাও অস্বাভাবিক রকম নামিয়া পড়ে নাই।

দানীবাবুর পরে সেলুকাস, দারাবুস, বেসাস্ ও বীর-সিংহের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। নারীদের মধ্যে যাঁহার অভিনয় মন্দ লাগিল না। ভবানীর গান অতি সুন্দর—বাংলা রঙ্গমঞ্চে এই গায়িকার জোড়া নাই। সাজ পোষাক ও দৃশ্যপট দুএক স্থানে অস্বাভাবিক হইলেও, মোটের উপরে নয়নকে আকৃষ্ট করে। নাটক সম্বন্ধেও একথা বলিতে পারি যে, এখনকার বাংলা রঙ্গালয়ে যে সব নূতন নাটকের অভিনয় দেখিতে দর্শকের ভিড় ভাঙ্গিয়া পড়ে, "অ্যালেকজাণ্ডার"ও নাটক হিসাবে তাহাদের অধিকাংশের চেয়ে নিকৃষ্ট নয় এবং স্থানে স্থানে নাট্যকারের লিপিকুশলতা ও চরিত্রাঙ্কণ দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই খুসি হইয়াছি।

কবরী পরীক্ষা শিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু।

(নিরুপমা-বসুমতি হইতে।)

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

২য় বর্ষ] ৪ঠা আশ্বিন শুক্রবার ১৩৩০, ইং ২১শে সেপ্টেম্বর। [১২শ সংখ্যা

কৌন্সিল নির্ব্বাচন

পূর্ব্বে

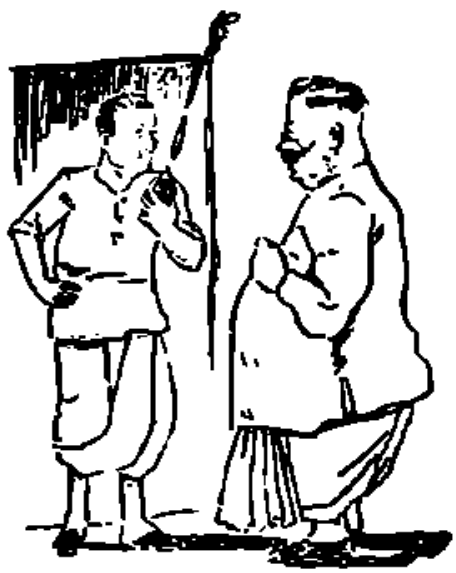

"কি ভায়া! ভাল তো—এবারে আমি কৌন্সিলে যেতে পারলে নূনের টেক্স তুলে দেব—শিক্ষা বিস্তার কোরবো—"

পরে

এখন বাপু আমার সময় নেই—দেখছ পার্লামেন্টের রিপোর্ট পড়ছি—

ভোটার—(মনে মনে) এখন তো তা হবেই, কেল্লা ফতে হয়ে গেছে কি না—

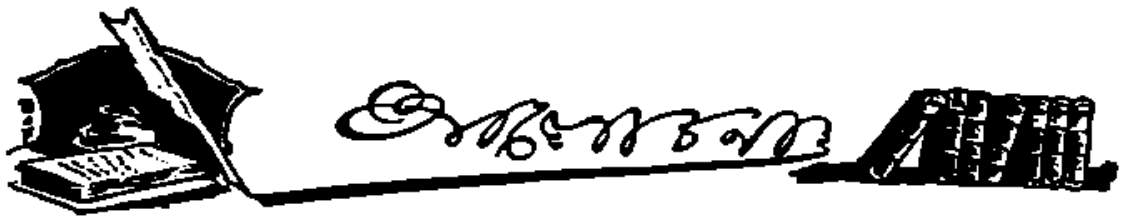

দিল্লী কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন এ সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মহাত্মা গান্ধীর কারাগমনের পর হইতে সমগ্র ভারতব্যাপী দেশ-কর্ম্মের মহা বিশৃঙ্খলা ও ত্রিমিত ভাব আসিয়াছিল। মহাত্মা নিজ ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মক্ষমতায় দেশবাসীর প্রাণে নব অনুভূতি ও প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন, দেশ জীবনের গৌরবময় কর্ম্মকেন্দ্র কংগ্রেসকেও নূতন জীবন দান করিয়াছিলেন। মহাত্মার সময়ে কংগ্রেস যে ভাবে দেশের বিধান নিয়ন্ত্রা হইয়াছিল, মহাত্মার সরিয়া যাইবার পর দেশের মধ্যে কংগ্রেসের আর সে প্রভাব নাই। মহাত্মার আদর্শ প্রাণে ধরিয়া দুঃখ কষ্ট সহিবার লোক দেশে এখনো বিস্তর থাকিলেও দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া আদর্শানুযায়ী কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা দেশের লোক তেমন দেখাইতে পারে নাই। দেশের চারিদিকের এই অবসাদ ও ত্রিমিত ভাবের মধ্যে দেশ কর্ম্মের কেন্দ্র কংগ্রেসের মধ্যেও মতভেদ ও দলভেদ হইল। মহাত্মার কারাগমনের পর কিছুদিন রহিল সারাদেশ একেবারে অন্ধকারে তারপর আরম্ভ হইল দেশকর্ম্মীদের মধ্যে মতভেদ ও দলভেদ। এই দলভেদ ও মতভেদের দ্বন্দ্বে এই দীর্ঘ সময় বৃথাই অতিবাহিত হইয়াছে—কাজ কিছু হয় নাই! দিল্লী কংগ্রেসে কংগ্রেসী দল ও স্বরাজ্য দলের মিলন হইল। উভয় দলই দেশের হিতকামী—কংগ্রেসের ছত্রতলে থাকিয়া দুই দলই মহাত্মার অ-সহযোগ নীতির অনুসরণ করিয়া দেশের কাজ করিতে চাহেন। মহাত্মার প্রভাবে ভারত একটা মহা উচ্চ আদর্শ পাইয়াছিল—এ আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিবার ক্ষমতা মহাত্মার মত লোকের পরিচালন ভিন্ন সম্ভব নহে জানিয়াও এ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতে দেশের অনেকের প্রাণই চাহে নাই। কিন্তু দেশবাসীর কাম্য আজ স্বরাজ—কাজ না করিয়া শুধু আদর্শ ধরিয়া বসিয়া থাকিলে স্বরাজ মিলিবে না। তাই আদর্শকে সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া দিল্লী কংগ্রেস স্বরাজকামী ভারতীয়দের কর্ম্মপন্থা কতকটা নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। যে ভাবে কংগ্রেসে দেশকর্ম্মের পন্থা নির্দ্দেশ করা হইল সেই ভাবে কাজ হইলে আমরা সুখী হইব।

• • • •

কংগ্রেসের পন্থা পরিবর্ত্তন প্রয়াসী দলের নেতা ছিলেন বাংলার চিত্তরঞ্জন। এই পন্থা পরিবর্ত্তনে চিত্তরঞ্জন অসাধারণ কৌশল, কর্ম্মশক্তি, ব্যক্তিত্ব দেখাইয়াছেন—নিজমত প্রভাবে সমগ্রদেশনেতাদের অভিভূত করিয়াছেন। এই ব্যাপারে চিত্তরঞ্জন দেশের ভালমন্দের ভার নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার দায়িত্ব বাড়িয়াছে। সমগ্র ভারত এখন চিত্তরঞ্জনের কর্ম্ম পদ্ধতি সাগ্রহে দেখিবে। দেশের মুক্তি সাধনায় চিত্তরঞ্জনের কৃতিত্ব দেখিবার বিষয় হইবে। কৌন্সিল প্রবেশ লইয়া মূল দ্বন্দ্বের সূচনা হইলেও আমাদের মনে হয় সেইটাই চিত্তরঞ্জনের পরমার্থ নহে। এই যন্ত্র সম্মুখে রাখিয়া সময়োপযোগী সকল পন্থাই তিনি স্বরাজের জন্য গ্রহণ করিবেন। কারণ স্বরাজই তাঁহার কাম্য। দু'দলে ঠিক মনের মিল কত দিনে হইবে তাহা জানি না। তবে ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থ, মান অভিমান ভুলিয়া গিয়া দেশকে মূল লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিয়া যাওয়াই এখন উভয় দলের কর্ত্তব্য। দু'দলেরই নিজ নিজ কর্ম্ম দক্ষতা দেখাইবার প্রয়াস ইহাতে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কংগ্রেস মণ্ডপে দেশ নেতা অনেকেই নিজ আদর্শ দেশের মিলনের কাছে খর্ব্ব রাখিয়াছেন—সেই মিলন অব্যাহত রাখিয়া যাহাতে দেশের কাজ হয়, তাহাই এখন দেশবাসী চাহিতেছে।

• • •

কংগ্রেসে হিন্দু মুসলমানের মিলন লইয়া অনেক কথা হইয়াছে। ভারতের হিন্দু মুসলমান সকল নেতাই এই মিলন চাহিয়াছেন। হিন্দু মুসলমান মিলন ভিন্ন ভারতের স্বরাজ পাওয়ার আশা নাই। ভারত হিন্দু মুসলমান

উভয় জাতিরই দেশ। হিন্দুকে বাদ দিয়া মুসলমান বা মুসলমানকে বর্জ্জন করিয়া হিন্দু এ দেশে নিজ সুবিধা কিছু করিতে পারিবে না—তাহা সম্ভব নয়। অথচ অতি তুচ্ছ সামান্য কারণে এই দু' সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ হয় এবং তাহা লইয়াই অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া দেশের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনে। এখন যেমন হিন্দু মুসলমানে বিবাদ হয়, পূর্ব্বে দেশে এমন বিবাদ হইত না। হিন্দু রাজা মুসলমান রাজার কিম্বা মুসলমান রাজা মুসলমান রাজার বা হিন্দু রাজার হিন্দু রাজার যুদ্ধ হইত—দু'দলেই হিন্দু মুসলমান সৈন্য থাকিত—এমন যুদ্ধ হইত বটে—কিন্তু সমদুর্দ্দশাগ্রস্ত পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে এমন মারামারি কাটাকাটি পূর্ব্বে হইত না। আজ এমন কেন হয় সে সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। দেশবাসী আপন ভালমন্দ বোঝে না—তা দেশের ভালমন্দ বুঝিবে কি। হিন্দু মুসলমান দু' জাতির লোকই অজ্ঞাতাবে, শত অভাবে শীড়িত, অশিক্ষিত—একটু উস্কাইয়া দিলেই ইহারা এ উহার মাথা কাটাইবার জন্য লাঠি তোলে। কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই—ভাল মন্দ বিচার নাই।

* * *

এমন অবস্থা যে শুধু হিন্দু মুসলমানেই ঘটে তা নয়। হিন্দুতে হিন্দুতে, মুসলমানে মুসলমানেও ঘটে। তবে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের জোট এখনো বেশী আছে—দেশে ভাঁড় বৃদ্ধি দিবার লোক নাই অথচ কুচক্রী আছে যথেষ্ট—তাই এমন বিবাদ সহজেই বাধিয়া উঠে। ইহা নিবারণ করিবার জন্য এবং দেশের যে কোনরূপ কার্য্যেই প্রাণ সঞ্চার করিবার জন্য আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিকের দল চাই—আর তাহার উপর দেশপ্রেমিক নেতাও চাই। হিন্দুর জনশক্তি ও মুসলমানের জনশক্তি উভয়কেই আজ জাগাইতে হইবে—জাগাইয়া এক উদ্দেশ্যে দেশকার্য্যে ইহাদের প্রবৃদ্ধ করিতে হইবে। এই শক্তি-দ্বারা জনসঙ্ঘকে পথ দেখাইতে না পারিলে ভারতের কোন কার্য্যই অগ্রসর হইবে না। পরাধীন দেশে নিত্য নূতন নূতন বিপজ্জনক সমস্যা জাগিয়া উঠে। আমাদের দেশেও তাহাই জাগিতেছে। কালের গতিতে ভারতের ভাগ্য-সূর্য্য যদি আবার হাসে তবে এ সব উপদ্রব সহজেই দূর হইবে।

বাসন্তীর শারদীয়া সংখ্যা

চিত্র-বৈভবে উজ্জ্বল, মুখর পরিপুষ্ট

বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের রচনা সম্ভারে গৌরবান্বিত হইয়া বাংলার পাঠকপাঠিকাগণকে নূতন নূতন কার্টুনে (ব্যঙ্গচিত্র) সুসজ্জিত হইয়া অভিবাদন করিবে।

দাম চার আনা

মহালয়ার দিন প্রকাশিত হইবে।

বৃহৎ আকার, সুরঞ্জিত প্রচ্ছদ-পটে সজ্জিত

শোনা যাইতেছে মহাত্মার শান্তির জন্য নোবেল প্রাইজ পাইবেন এবং শীঘ্রই বন্দী-দশা মুক্ত হইবেন। কেহ বলিতেছেন নোবেল প্রাইজ পাইলে আন্তর্জাতিক শক্তি সম্মিলনের চাপে ভারতের আইন তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে কারণ তাহার একটা নৈতিক পরাজয় হইবে। কেহ বলিতেছেন স্বরাজ্য দলের কাউন্সিল প্রবেশের উদ্যোগ পর্ব্বেই আমলাতন্ত্র অবস্থা বেগিয়া মহাত্মাকে ছাড়িয়া দিয়া দেশে আবার নিরুপদ্রব শান্তি আনিয়া সহজভাবে ভারতশাসনের পথ বজায় রাখিবে। অবশ্য এ সবই গুজব! কি ভাবে মহাত্মার মুক্তি হইবে—না বন্দী অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ফেলাই তাহার জীবনের চরম পরিণাম হইবে কে জানে?

তিন বৎসর পরে আবার কাউন্সিল প্রবেশের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। এবারে কাউন্সিল প্রবেশকামীরা নিজ নিজ স্বার্থ সাধন করিবার প্রয়াস যত করেন দেশের স্বার্থ,যে জনসাধারণের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহারা কাউন্সিলে প্রবেশ করেন তাঁহাদের স্বার্থ সুবিধার দিকে তাঁহারা আদৌ দৃষ্টি দেওয়া সঙ্গত বোধ করেন না। যদি দেশীয় কৌন্সিলারগণ দেশের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কৌন্সিলে স্বাধীন সত্য মত প্রকাশ করিতে পারিতেন তবে দেশ-সভার নাম লইয়াই দেশে এত অন্যায় চলিতে পারিত না। দেশের প্রতিনিধি পরিচয়ে যাঁহারা কৌন্সিলের সভ্য পদ পাইয়াছেন তাঁহাদের নির্ভীক প্রতিবাদে দেশে প্রবল আন্দোলন আসিত—জনসাধারণও তাহাদের সত্য অবস্থা কি তাহা বুঝিতে পারিত। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য দেশসভার দেশের স্বার্থ বলিদান যদি দেশের প্রতি-নিধিদের দ্বারেই চলিতে থাকে তবে দেশের পক্ষে এর চেয়ে লজ্জা ও অপমানের বিষয় আর কি হইতে পারে? তাই দেশপ্রেমিক যাঁহারা, সত্যপ্রিয় তেজস্বী যাঁহারা তাঁহাদেরই কৌন্সিলে যাওয়া কর্ত্তব্য এবং দেশবাসীরও তেমনি লোকেকে মনোনীত করা উচিত। ভোটদাতাদেরও কৌন্সিলের স্বরূপ ও নির্ব্বাচনকামীদের সত্য মনোবৃত্তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইয়া ভোট দেওয়া উচিত। তোমার দ্বারে ভোট প্রার্থী হইয়া ও সভ্য পদ পাইয়া পরে তোমার ও দেশের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিবে এমন ব্যাপার আর চলিতে দেওয়া সঙ্গত নহে।

• • • •

অনেক অর্থশালী, দেশত্যাগী সহর বিলাসী বাবুর দল অর্থের প্রভাবে ভোট পাইয়া সভ্যের বলে কৌন্সিলে যাইবার চেষ্টা করিবেন। ঘোর পাশ্চাত্য ভাব-বিলাসী মোটরচারী বাবুও ভোট আদায়ের জন্য দেশ প্রেমিক সাজিয়া খদ্দরের কাপড় পাঞ্জাবী পরিয়া মহাত্মার নাম গাহিয়া লোক ঠকাইয়া ভোট আদায়ের চেষ্টা করিবেন। ভোট ব্যাপারে নানা ফেল চলিবে। কোন সূক্ষ্মদর্শী হাস্যরসিক লোক যদি নির্ব্বাচনকামীদের এই প্রচেষ্টা-গুলিকে ভাষায় সাজাইয়া বাহির করিতে পারেন তবে তাহা পরম উপাদেয় জিনিষ হইবে—ভবিষ্যতে দেশ-বাসীর চোখও তাহাতে অনেক খুলিতে পারে। আমরা ক্রমে যোগ্য ও অযোগ্য নির্ব্বাচনকামীদের পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইব।

• • •

পূর্ব্ব ময়মনসিং জেলার অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে তিনটি ভদ্রলোক কৌন্সিলের প্রতিনিধিপদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইঁহাদের কথা লইয়া অনেক খবরের কাগজে আলোচনাও হইতেছে। প্রতিনিধি তিন জনের মধ্যে একজন ময়মনসিংহের গৌরব ৺ আনন্দমোহন বসুর পুত্র মিঃ এস এম বসু, অপর জন হাইকোর্টের খ্যাতনামা সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত দ্বারিক চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীযুক্তগোপাল চক্রবর্ত্তী—অপর জন হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সহকারী কর্ণধার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার। প্রথম দু'জনার মধ্যে একজনার যোগ্যতা গত তিন বৎসর ধরিয়া বাংলা দেশের কৌন্সিলে প্রমাণিত হইয়া গেছে। কোন যোগ্যতা বা দেশহিতকর কার্য্যের প্রমাণ তিনি দিতে পারেন নাই। অপর জন ধনী পিতার পুত্র—এই মাত্র তাঁহার পরিচয়। তবে দ্বারিক বাবু হাইকোর্টের বড় সরকারী উকীল হইলেও রাজনৈতিক বা দেশহিতকর কার্য্যে তিনি নিজ দক্ষতার কোন পরিচয় দেন নাই। ধনী পিতার পুত্র হইলেই যে যোগ্যতা প্রমাণিত হয় তাহা নহে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন স্বকৃত পুরুষ, দারিদ্র্য ও অভাব অভিযোগের মধ্যেই তাঁহার জন্ম, দেশের জীবন সংগ্রামের জ্বালা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া আজ তিনি নিজ চেষ্টায় ও কর্ম-দক্ষতায় দেশীয় একটা বিরাট সাফল্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হইয়াছেন। হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানী তাঁহারই কর্ম্মদক্ষতায় আজ বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় আসিয়াছে। বিদ্যাসাগর বাণী নীলামে উঠিয়া যখন দেশের উপর একটা বিরাট অপমানভার চাপাইয়াছিল তখন নলিনী বাবুর প্রচেষ্টায়ই তাহা রক্ষা পাইয়াছিল। তিনি গৃহস্থ—নিজ উপার্জ্জনে দেশে বাড়ী ঘর, জমা, জমী করিয়াছেন, দেশের ছেলে দেশের সংস্রব ছাড়েন নাই—দেশের যতটুকু উপকার তাঁহার ক্ষুদ্র সামর্থ্যে কুলায় তাহাই তিনি করি-তেছেন। মাত্র যোগ্যতায় যিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে

প্রভৃত প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছেন, যদি কাউন্সিলে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতেই হয় তবে এরূপ প্রতিনিধি প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য।

• • • •

জনপ্রিয় পাবলিসিটি অফিসার ও শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জে-এন রায় বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া যাইতেছেন। বাংলার সংবাদপত্র গুলির সহিত ইঁহার খনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। আর্গালিষ্ট এসোসিয়েশন শ্রীযুক্ত রায় ও তাঁহার পত্নীকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায়ের মত সুযোগ্য দক্ষ রাজকর্ম্মচারী পাইয়া বরিশাল উপকৃত হইবে। শ্রীযুক্ত রায়ের স্থানে এখন রহিলেন শ্রীযুক্ত কমলচন্দ্র চন্দ্র। কমল বাবুও যোগ্য, মধুর ভাষী। আশা করা যায় শ্রীযুক্ত কমল বাবুর দ্বারা এ বিভাগের উন্নতি হইবে।

• • •

বাঁকুড়ার সুযোগ্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত বাংলার স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের সেক্রেটারী হইয়া আসিতেছেন। জেলার ইনি অনেক জন হিতকর কার্য্য করিতেছিলেন। দেশের লোকে তাহাতে যথেষ্ট উপকৃত হইতেছিল। আশঙ্কা হয় মন্ত্রী মহাশয়ের সুশীতল ছায়াতলে থাকিয়া তাঁহার দেশের উন্নতিকল্পে স্পৃহা একেবারে নির্ব্বাপিত না হইয়া যায়। এভাবে কর্ম্মক্ষম লোককে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনিবারই বা প্রয়োজন কি!

বাসন্তীর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার মহাশয় নানাবিধ কার্য্যে ব্যস্ততা নিবন্ধন বাসন্তীর সম্পাদনভার ত্যাগ করিয়াছেন। বাসন্তীর গ্রাহক অনুগ্রাহক সকলেই বিজয়বাবুর যোগ্যতার কথা অবগত আছেন। বাসন্তী নানা প্রকারেই তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ রহিল। বিজয় বাবুর অতি আদরের বাসন্তী তাঁহার লেখা ছাপিবার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবে না এ বিষয়ে বিজয় বাবু আমাদিগকে স্নেহ প্রতিশ্রুতি দিয়া অধিকতর কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রাখিয়াছেন।

বিচিত্রা

ইবসেনের কথা

[শ্রীখুরসিদ জাঁহা বেগম]

ইবসেনের বিখ্যাত নাটক 'A Dolls' house'র তত্ত্ব কথা এই যে নারী ক্রীতদাসী, পাশবদ্ধ, এবং পুরুষ তাহাদের প্রভু। অনেকে বলেন পুরুষ ধরিবে অস্ত্র, আর নারী ধরিবে সূচ। ইবসেনে দুইটী লাইন আছে 'কোন পুরুষই সে যাহাকে ভালবাসে তার জন্যও নিজ সম্মান বিসর্জ্জন করে না কিন্তু হাজার নারী তেমন করিয়া থেছে।' ইবসেনের পর ব্রাঁয়ো ও ষ্ট্রীণ্ডবর্গ কিন্তু খুব জোর গলায়ই বলিয়া গেছেন যে পারিবারিক জীবনে পুরুষই অনেক সময় নিজ বুদ্ধি বৃত্তিআদি বিসর্জ্জন দিয়া বোকা সাজিতে বাধ্য হয়। বিদ্যুষিনী নারীর কৃত অভিযানের বিরুদ্ধে মুসোলিনি ও লেনিন অনেক খোলা কথা কহিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে ইহাদের আদর্শ বোধ হয় ষ্ট্রীণ্ডবর্গ, ইবসেনের ডলস্ হাউস নহে। ইবসেন মস্ত বড় আর্টিষ্ট—মানবের মনোবৃত্তির অতি সূক্ষ্মতম ও কোমল অংশগুলি লইয়া তিনি যেমন নাড়া-চাড়া করিয়াছেন তেমন আর কেহ বোধ হয় পারেন নাই। তাই প্রকৃতির মূল তত্ত্ব তাঁহার মধ্যে যতটা ফুটিয়াছে সংসারের সত্য অবস্থা ততটা ফোটে নাই। ইবসেন একস্থানে বলিয়াছেন যে একমাত্র চারিত্রিক উৎকর্ষই আমাদের স্বাধীন করতে পারে। বিশ্বাস ও বিবেকপূত একজন বুদ্ধিশালিনী যুবতী কি ভাবে একটা

ভীষণ ট্রাজেডির সৃষ্টি করতে পারে তাহা Hedda Gabler এ ইবসেন দেখাইয়াছেন। When We Dead Awaken যখন ইবসেন লেখেন তখন তাঁহার বয়স পঞ্চান্ন বছর। আর্টিষ্টিক হিসাবে ইহাতে ইবসেনের চরম উৎকর্ষ ফুটিয়াছে। কিন্তু ইহার সমস্তটার ভিতরেই গ্রন্থকারের একটা করুণ আর্ত্তনাদ যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনের প্রান্তে দাঁড়াইয়া গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থাবলীকে দেখিতেছেন মৃত সাগরের ফলের মত। Vanitas, Vanitas, omnia Vanitas। শেষ জীবনে ইবসেন যে সত্যে পৌঁছিয়াছেন আধুনিক জগৎও অনেকটা সেই ভাবেই চলিতেছে। মৃত মানব আশ্রিতে পারে আমার বিশ্বাস ও আশার সাহায্যেই।

'John Journal' হইতে।

জনন নিরোধ

[শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ]

লীডসের মেডিকেল অফিসার ডাঃ জনষ্টন জারভীস তাঁহার ১৯২২ সালের বার্ষিকীতে Birth Control বা জনন নিরোধকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। লীডসে জন্ম সংখ্যা ২১'০৮ হইতে ১৯'২৮ এ পড়িয়া গিয়াছে। ডাক্তার বলিতেছেন এইরূপ অবস্থায়ও লোকে জনন নিরোধের কথা যে কি করিয়া বলে ইহাই আশ্চর্য্য। অযোগ্যদের নিরোধ করিবার সম্বন্ধে কাহারও ভিন্ন মত নাই—কিন্তু যোগ্য সন্তানের জন্মে বাধা দিতে গেলে দেশের ধ্বংস আসিবে নিশ্চয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যদি কোন দিন পতন হয় তবে তাহা অর্থের অভাবে হইবে না—পতন হইবে লোকাভাবে। দেশের যুবক যুবতীগণ কয়েকটি নামের প্রত্যাশী লোকের মোহে পড়িয়া দেশের সর্ব্বনাশ ডাকিতেছে। বেশী লোক ইয়োরোপে বাড়িলে তাহার কোন আশঙ্কার কারণ নাই। কারণ জগতের অন্যান্য দেশ সকল ইওরোপীয়ানদের তাহাদের দেশে বসবাস করিবার জন্য বা তাহাদের দেশের শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ডাকিতেছে।

জগৎ জোড়া ইওরোপীয়ানদের উপনিবেশ বস-বাস ও বাণিজ্যের স্থান। লোকসংখ্যা ইহাদের যত বাড়ে ততই ভাল, ডাক্তারের ইহাই মত।

স্বামী হত্যা

ইজিপ্টের স্বামী যে বিয়ে করেছিলেন একজন ফরাসী নারীকে। শ্রীমতি কামী সম্প্রতি তার এই ইজিপ্সিয়ান স্বামীটীকে পিস্তলের গুলি মেরে হত্যা করেছেন। লণ্ডনে এর বিচার হয়েছে। তার এডোয়ার্ড মার্শেলের মত ব্যারিষ্টার নিয়েছেন স্বামীহন্ত্রীর পক্ষ। আর নিহত স্বামীর সমর্থন করেছেন মিঃ পার্সিভেল ক্লার্ক। কোর্টে সে এক থিয়েটারী কাণ্ড। একে পূবের স্বামী আর পশ্চিমের স্ত্রী—স্বামী অত্যাচারী হবেই। বেচারা স্বামী কুস্তুরের সঙ্গে মেলামিশেছিলেন—এমন সময় ফরাসী প্রিয়া তার বুকে মারলেন পিস্তল। এই সব দেখে শুনেই বুঝি তুর্ক মহিলারা তাদের স্বামী ভাই আত্মীয় স্বজন বিগড়ে যাবে ভয়ে বিলাসিনী রূপ মহিলাদের তুর্কে বাসন আর মাদকতা ছড়িয়ে জগতের বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। প্রাচ্যে এমন সব কাণ্ড এখনো তেমন শোনা যায় না। শ্রীমতী কামী বিচারে খালাস পেয়েছেন। প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে সম্বন্ধের কথাও বিচারে উঠেছিল। শ্রীমতী কামীর অদেশী মহিলা ও পুরুষেরা তার মুক্তিতে আনন্দে জয়ধ্বনি করেছিলেন, হেসেছিলেন, কেঁদেছিলেন আরও অনেক রকমই অভিনয় হয়েছিল। শ্রীমতী কামীও শিউরে উঠেছেন, অশ্রু বিসর্জ্জন করেছেন। ব্যারিষ্টারও নাটকীয় ভাবেই যোকদ্দমা চালিয়েছেন। শেষকালে সকলে ব্রিটিশ আর্টিসের জয় গাইতে গাইতে গোকার্ণা বিহ্বলাকে মোটরে চাপিয়ে প্রস্থান করেছেন।

অভিনয়ের অবনতি

লিভস্ রিপার্টোরি কমিটির সেক্রেটারী ডেনী নিউজে লিখেছেন—আরভিংয়ের বিশেষত্ব, ট্রির বহুমুখীন প্রতিভা ফোর্বস রবার্টসনের প্রতিভা যেমন ছিল এঁদের স্থান আর কেউ অধিকার করতে পারে নি। হেরার, উইন্ডহামের মত অভিনেতাও আর দেখা যায় না। ওয়েষ্ট, ওয়ালারের মত হাস্যরসিক হুটির মত সহজ স্বাভাবিক অভিনেতাও আর নাই। তবে অভিনেতার চেয়ে অভিনেত্রীর অবস্থা আশাপ্রদ। এলেনটেরীর পূর্ণ প্রতিভার সময় ছাড়া কমেডী ও ট্রাজেডীতে সমভাবে সিবিল থর্ণডাইকের মত অভিনয় বোধ হয় আর কেউ করতে পারেন নি। কে কমটনের মত মনোহারী, ইথেল আরভিংয়ের মত ক্ষমতাশালী অভিনেত্রীও বিরল। এ এমনি একটা যুগ যাচ্ছে যে জীবনের কোন বিভাগেই তেমন ক্ষমতাশালী লোক আর বড় দেখা যাচ্ছে না।

কেন্সিংটনের কালোর দশা

সম্প্রতি কেনিয়ার খবরে এক শ্বেতাঙ্গের কীর্তিকথা প্রকাশিত হইয়াছে। সাহেবের এক বালক ভৃত্য ছিল। বলা বাহুল্য ভৃত্যটি নেটিব অর্থাৎ কেনিয়াই তাহার জন্মস্থান। একদিন বালক খেয়ালবশে মনিবের একটি ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বসে। এই অপরাধে শ্বেতাঙ্গ প্রভু বালকটিকে বেত্রাঘাতে আপ্যায়িত করিয়া পরলোকে পাঠাইয়া দেয়। বিচারে সাহেবের দুই বৎসর সরকারী অতিথিশালায় বাস করিবার আদেশ হইয়াছে। কেনিয়ার কারাগার সত্যই শ্বেতাঙ্গের পক্ষে উচ্চশ্রেণীর পান্থ নিবাস তুল্য। কাজ কর্ম কিছুই নাই, অথচ দিব্যি আরামে আহার বিহার ইত্যাদির সর্বপ্রকার সুব্যবস্থাই সরকার শ্বেতাঙ্গ অতিথিগণের জন্য করিয়া রাখিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে আরও একটি মজার খবর বাহির হইয়াছে। জনৈক শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার বালকটির শব পরীক্ষা করিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছে তাহা পড়িলে বিস্ময়ে নির্বাক হইতে হয়। তাহার মতে বালকটির মৃত্যুর কারণ বেত্রাঘাত নয়। সে মরিয়াছে তাহার পেটের জ্বালায়। সেদিন মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত তাহার উদরে কিছুই পড়ে নাই। আর ইহার দরুণ কারণ হইতেছে বালকের দেহত্যাগের বলবতী ইচ্ছা। সে মৃত্যুর পূর্বদিন কাহারও কাহারও কাছে বলিয়াছিল যে তাহার মরিবার ইচ্ছাটা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুরা বলিবে তখন বুঝি আসন্ন অপমৃত্যু বালকের শিয়রে যমদূতরূপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার আবিষ্কার করিয়াছেন—যে বালকটি মৃত্যুর কুহেলিকা ভেদ করিয়া অনাবিল সুখ সম্ভোগের জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। তাই শ্বেতাঙ্গের দুই ঘা কশাঘাতেই শ্রীমান তাহার পরম ঈপ্সিত ধামে চলিয়া গিয়াছে। আহা এমন বান্ধবকে তাহার দুই বৎসরের জন্যইবা শ্রীঘরে পাঠান কেন। কালার পেটে অন্ন নাই—কালার যে মরণই মুক্তির পথ! দুই ঘা কোমল বেত্রাঘাতে যে সুন্দর কালাকে ভবপারের পথ দেখাইয়া দেয়—তাহার জন্য স্বর্গ গমনের ব্যবস্থা করিতে হয়। সে যে কালার রাজদ্বারে শ্মশানে ৮—শাস্ত্র সম্মত বান্ধব প্রধান।

জাঁদরেল বার্ডউড

অষ্ট্রেলিয়ার পণ্যসম্ভার যাহাতে ভারতের বাজারে প্রসার প্রাপ্ত হয় এবং ভারতীয় গৌরী সেনের ভাণ্ডারের যথাযোগ্য অংশ যাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই সুযোগ্য অংশীদারের পকেটস্থ হইতে পারে সেই সাধু উদ্দেশ্যে নাকি শ্রীযুত উইলিয়ম বার্ডউড্ নামক ভারতীয় সমর বিভাগের জাঁদরেল মহোদয় পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার মন্ত্রী প্রধানকে পত্র লিখিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার শুঁটকি মাছ, আমচুড়, মরিয়া বিয়ার প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য পানীয়গুলি একবার ভারতবাসী জিভের অগ্রভাগে ছোঁয়াইলে নাকি আর তাহা ভুলিতে পারিবে না। তাই জাঁদরেল বাহাদুর সেই সকল অমূল্য পণ্যসম্ভার ভারতের বাজারে আমদানী করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এতদিন বিদেশী বণিক সম্প্রদায় এই সাধুকার্যে ভারতের শোণিত আহরণে রত ছিলেন। রসনা, লেখনী এবং জাতিত্বের আবদারই ছিল এতদিন তাহাদের সাফল্যের সহায়। এবার সমর বিভাগের জাঁদরেল আসিয়া বণিক সম্প্রদায়ের অগ্রে দাঁড়াইল। বাস্—সামলাও এখন!

আগামী সপ্তাহ হইতে সুপ্রসিদ্ধ হাস্য-রসিক ও রাজনীতিবিদ্
শ্রীযুক্ত ভবতোষ রায় বি-এল কাউন্সিল-নির্ব্বাচনকামীদের চিত্র
ব্যঙ্গ-ব্যঙ্গ প্রবন্ধে ও কার্টুনে বাসন্তীর পাঠকপাঠিকাদের উপহার দিবেন।

কংগ্রেসে গান্ধিদিবস

মহাত্মা গান্ধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন

অহোরাত্র গান্ধিদিবস বলিয়া কংগ্রেসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পণ্য-বর্জন গৃহীত হইবার পর সমস্ত সভ্য মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে দুই মিনিটকাল দাঁড়াইয়া ছিলেন। এই সময় সমস্ত কংগ্রেস-মণ্ডপ মহাত্মা গান্ধির জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বিদেশী পণ্যবর্জন

কংগ্রেস ডাঃ আনসারী প্রস্তাব করেন—(১) কংগ্রেস পূর্ব্বের ন্যায় জানাইতেছেন যে, দেশে ব্যাপকভাবে হাতেকাটা সূতার খদ্দর প্রস্তুত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। জনসাধারণ এই বিষয় মনোযোগ দিলেই বিদেশী বস্ত্র আমদানী সম্পূর্ণ রহিত হইয়া যাইবে। (২) কংগ্রেস জনসাধারণকে উপদেশ দিতেছেন যে তাহারা যেন দেশে প্রস্তুত বিনিময় দ্রব্যের এবং খদ্দরের সহিত বিলাতী জিনিষ ক্রয় বন্ধ করেন। (৩) যেহেতু বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত এবং যেহেতু ইংলণ্ড তাহাতে বাধা দিতেছে এবং ভারতবাসীগণকে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে অপমান করা হইতেছে এজন্য কংগ্রেস জানাইতেছেন যে ইংলণ্ডজাত দ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জ্জন করার জন্য ইংলণ্ড ও উপনিবেশগুলিতে প্রস্তুত কোন জিনিষ যেন কেনা না হয়। (৪) ২ ও ৩ নং ধারা কার্য্যে কি ভাবে পরিণত করা যায় তৎসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মৌলানা মহম্মদ আলী, শ্রীযুক্ত প্যাটেল, শ্রীযুক্ত সেন, সুভাষচন্দ্র বসু, শেঠ যমুনালাল বাজাজ ডাঃ কিচলু, এন সি কেলকার ও ডাঃ গোপালকৃষ্ণকে লইয়া একটী কমিটী গঠিত হউক।

৮৩নং গ্রে ষ্ট্রীটের বাবু হরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু কোর্টের কাজ হারাইয়া, অধিক খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন; (২) রাজসাহী জেলার বেলকুচিয়া গ্রামের বাবু কিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম, এ, কোন স্থায়ী চাকরি সংগ্রহ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। দুইটী ঘটনাই মর্ম্মন্তুদ; দুইটীই ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকের 'অত্যেকমের' অত্যাচার ও চরম দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এই শিক্ষা যে কতদূর ব্যর্থ, ইহাতে কেবল তাহাই প্রমাণ হয় না, 'তথাকথিত' 'শিক্ষিত' বাঙ্গালী যুবকেরা যে সংসার ও চরিত্রবল এ-অবধি হারাইয়াছে, তাহাও বোঝা যায়!

আমরা প্রায়ই সংবাদ পাই যে, বাঙ্গালী মেয়েরা সংসার ঝঞ্ঝাট, মনোদুঃখ বা হাত-যশ 'অলগ্রহ' হইবার ভয়ে, কলসের আগুন ঘাসাইয়া বা আফিং খাইয়া, আত্মহত্যা করিতেছে। আমরা বাঙ্গালী মেয়েদের এই শোচনীয় মানসিক দৌর্ব্বল্যের জন্যই এতদিন হা-হুতাশ করিতাম। এখন আবার বাঙ্গালী যুবকেরাও চাকরী না পাইয়া আত্মহত্যা করিতে আরম্ভ করিল। দেশের চিন্তাশীল সমাজসেবকেরা কথাটা এখনও ভাবিয়া দেখুন কিছুদিনের জন্য বড় বড় সভার 'বাব চাপ্' দিয়া রাখিয়া, এই ছোট খাট সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করুন।

—আনন্দবাজার

কলিকাতার চর্ম্ম কবি মহাবল্লাহ আবদুল হাকেমের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি পরলোকগত নবাব বাহাদুর আবদুলগণি খাঁর পুত্র। বহু পরিবার মধ্যে নবাবজাদা তাঁহার বন্ধু-বান্ধবকে তাঁহার কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছিলেন, সেই সময় হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। কবির বয়সই মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতার মুসলমান সমাজে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এবং প্রাচ্যবিদ্যায় তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল।

—হিন্দুস্থান

পূজোর আগে

শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়ের

দু'খানি নূতন উপন্যাস

হাসি—১।০ পাঁচসিকা লক্ষ্মী—৸০ বার আনা

না কিন্‌লে, আপনার পূজোর বাজার অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

কল্লোল পাবলিশিং

১০।২, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

ও

অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়ে পাবেন।

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানীর

মেসিনে প্রস্তুত

চন্দন, রয়েলবকুল, মাল্ট ও ভেলভেট সাবান

ব্যবহার করুণ। টেলিফোন, ২৬৯৬

নেমকহালাল

সেই স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যখন তাঁরা বাঙালী জোড়া লাগাইবার জন্য সেনানায়কগণের মিলিত আহ্বানে গোটা সেনটার একটা পবিত্র সেনাসম্বোধের অমৃত ঘন্টা নাদিয়া আসিল, গঙ্গারাম বাবু তখন পূর্ব্ববঙ্গ সেক্রেটারিয়েট বড় বাবু। সমুচ্চ শিলং শৈলশিখরে ত্রিবসন্তের রাজত্বে সস্ত্রীক গঙ্গারামবাবু, মুষ্টিমেয় বাঙালী সংসর্গে ধান্যহীন কানন্ত জন্তু বিশেষের মত বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে সরকারী কার্য্য ইমানদারীতে বাহাল ছিলেন।

গঙ্গারাম বাড়ুয্যে অনেক পরোপকারপরায়ণ পিতৃবন্ধুর সৌজন্যে এনট্রান্স ক্লাশ অবধি বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দুস্তর জ্ঞানতরঙ্গিণীর প্রবেশিকা তোরণে বার কয়েক হুচোট খাইয়া, অগত্যা তিনি মনের ক্ষোভে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত অসহযোগ করিতে বাধ্য হয়েন। কিন্তু প্রতিভারূপ অগ্নি স্ফুলিঙ্গ কখনও ছাই চাপা পড়িয়া থাকে না। তাই কথিত মুরুব্বিরই তদ্বিরে শিক্ষানবীশরূপে সরকারী দপ্তরখানার প্রবেশের পর হইতেই গঙ্গারামবাবুর অসাধারণ প্রতিভাও ক্রমশঃ বিকাশ পাইতে লাগিল।

ভূলোকের অসাধ্য কর্ম্ম বা অবক্তব্য ভাষা নাই। কাজই দুর্জ্জনেরা বলিত যে তিলের সর্ব্বগাত্র ব্যাপিয়া যে পরম পদার্থ বিরাজ করিয়া থাকে, তাহাই নাকি গঙ্গারামবাবুর প্রতিভা বিকাশেরও একমাত্র সহায়। কিন্তু সে বিষয়ের কোনও আইনসঙ্গত প্রমাণ আমাদিগের চক্ষে পড়ে নাই। তবে তিনি যে স্বীয় প্রভু, উপপ্রভু, এবং দূর প্রভুদিগের প্রতিকথায় সাষ্টাঙ্গ করিয়া সেলাম এবং হামেসাই Yes Sir বলিতেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। মনিবের আরদালীকে দেখিলে যে কথিত আরদালী পুরুষ তাঁহাকে অভিবাদন করিবার পূর্ব্বেই গঙ্গারাম সবিনয় সেলাম বশতঃ প্রত্যভিবাদন করিয়া বসিতেন, তাহাও নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। পরন্তু, প্রভুর প্রিয় সারমেয় নন্দন "টমী" নামধেয় অতি রোষপরবশ জীব বিশেষের শ্রীমুখের সঙ্গে গঙ্গারামবাবুর অবলৌঠের বিলসনমাধুরী দর্শন করে নাই—শিলং সহরে এমন অভাগা কেহ আছে বলিয়া ও আমরা জানি না।

যাহা হউক, গঙ্গারামবাবু স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা-সাহায্যে যখন মাসিক মঙ্গলগ পঞ্চশত মুদ্রা গৃহে আনিতে ছিলেন—সেই সময়ই পোড়া বাঙালীও বিলাতী পণ্য বর্জ্জন করিয়া বসিল। ইহাতে যে গঙ্গারামবাবুকে কি এক বিষম বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, তাহাই বিবৃত করিতেছি—আপনারা অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন।

গঙ্গারামবাবুর সহধর্ম্মিণী ছিলেন বাঙালার অপ্রতিহত প্রতাপ সেনানায়ক শ্রীযুক্ত বিভূতিসেনের চট্টরাজের জোষ্ঠা কন্যা—শ্রীমতী ঘৃষিকা দেবী। স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইতেই তিনি শিলং সহরের চাকুরীয়া বঙ্গবাসীর অন্তরমহলে বিষম আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিলেন। প্রতিদিন, বিকেল বেলায় নারী সমিতির অধিবেশন হইতে লাগিল। কুলকামিনীগণ অনেকেই সেই কু-রুচিময় সাদা ধপ্‌ধপে শাঁখা পরিয়া বিলাতি চক্‌চকে চিরুণ চুড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এতাবে, ঘিহি নক্সাদার শাড়ী, সংস্কৃতের সাদা, আস্থির ব্লাউজ সকল ছাড়িয়া মা-লক্ষ্মীরা যখন 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ই গ্লাদার সঙ্গে মাথায় তুলিয়া লইলেন'—তখন শিলংএর বাবু মহলে সবিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। বলা বাহুল্য আমাদিগের গঙ্গারামবাবুর পক্ষে সেই চাঞ্চল্যের ভাবটা কটিতি প্রবল আতঙ্কে পরিণত হইয়া গেল!

কথাটা সাহেবের কাণে যাইতেও বিলম্ব হইল না। কারণ, ঈষাপরায়ণ লোকে যে গঙ্গারামবাবুর পশ্চাতে লাগিয়াই রহিয়াছিল! একদিন কথায় কথায় সাহেব গঙ্গারামবাবুকে বলিলেন,—

"আচ্ছা গঙ্গারাম! তুমার ইস্ত্রিরী নাকি স্বদেশিনী হইয়াছেন?"

গঙ্গারামবাবুর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। হায়, হায়, যে কথাটা শুনিবার ভয়ে আজকাল টিফিনের সময় আর তিনি সাহেবকে সেলাম পৌঁছাইয়া যান না, আজ কিনা সাহেব সেই ভীষণ প্রসঙ্গেরই অবতারণা করিয়া ফেলিলেন। ভয়ে ভয়ে বেচারা ইমানদার গঙ্গারাম বলিলেন,—

"তা Sir, আমার বিশেষ দোষ অর্থাৎ Sir, আমি

হিন্দু না হ'লে Sir, এমন wifeকে Sir, divorce অর্থাৎ—"

"তা তুমি বরং খৃষ্টানই হও না কেন? সরকারের নেমক খেয়ে এমন নেমকহারামী করার চেয়ে বরং তাও ভাল।" বলিয়া সাহেব মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

গঙ্গারামের খৃষ্টান হইতে কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু আফিসে সাহেবকে তিনি যেমন ভয় করিতেন, তেমন গৃহেও গৃহিণীকে কথঞ্চিৎ বিভীষিকার চক্ষেই তিনি দেখিয়া থাকিতেন। কাজেই কি বলিয়া যে এযাত্রা সাহেবের হাতে রেহাই পাইতে পারেন, তাহার কোন পথ গঙ্গারাম সহসা খুঁজিয়া পাইলেন না। যাহা হউক, আরও দুই চারি কথায় সাহেব নেমকের হালিসখানা ভাল করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়া ভবিষ্যদ্বাণী, কম্পমান গঙ্গারামকে বিদায় করিয়া দিলেন। তাহার পরই একলা নির্জ্জন কামরায়, মনের আনন্দে খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া সাহেব টেবিলের উপর হইতে অর্দ্ধ টাঙ্কুয়ার রাঙ্গা সরবত উদরস্থ করিয়া স্বীয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

যথাসময়ে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গঙ্গারামবাবু গৃহিণীকে সবিনয়ে নিবেদন করিলেন যে তিনি সরকারের নেমক হালাল ভৃত্য—গৃহিণী তাহার স্বদেশী আন্দোলনের বহর প্রকাশিত না করিলে, পরকালে এই বেইমানীর দরুণই তাঁহাকে অনন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

যুথিকাদেবী গঙ্গারামের সকল কথাগুলিই শুনিয়া গেলেন—একটু হাসিলেন—পরে নিরুত্তরে চলিয়া গেলেন।

কথঞ্চিৎ আশ্বস্তচিত্তে গঙ্গারাম হাত মুখ ধুইয়া জলযোগান্তে আফিসের কাজে মনোযোগ দিলেন। তিনি আফিসের অনেক কাজ বাড়ীতে লইয়া আসিতেন।

পরদিন যথাসময়ে আহারাদি সমাপন করিয়া গঙ্গারাম আফিসের কাপড় পরিবার জন্য পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, আনকোরা বোম্বাই মিলের ধুতি, এণ্ডির চাদর, মুগার পাঞ্জাবী এবং পকেটস্থ প্রয়োজনীয় পাদুকা প্রভৃতি তাঁহার আফিসের পরিচ্ছদরূপে সাজান রহিয়াছে। হতভম্ব গঙ্গারাম বহু একটা কিছু ধারণাই করিতে পারিলেন না। অমনি তিনি চীৎকার করিয়া কালিচরণ নামক ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার আফিসের কাপড়?"

ভৃত্য অঙ্গুলি নির্দ্দেশে স্বযেশজাত পরিচ্ছদগুলি দেখাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। বাধা দিয়া গঙ্গারাম আবার জিজ্ঞাসিলেন—"আমার নিত্যিকার কোট পাটলুন কাপড় চোপড় কৈ? এগুলি কে আন্‌লে?"

"আজ্ঞে সেগুলি কাল রাত্তিরে পোড়াইয়া ফেলিয়াছি, আর এগুলি আমিই এনেছি।" বলিয়া কালিচরণ অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

অত্যন্ত ক্রোধের সহিত গঙ্গারাম গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"বেইমান!"

"গাল দেবেন না বাবু—আমি বেইমান নই।"

"তা হ'লে আমার বিনা হুকুমে কেন এ সব করেছিস্?" "মনিবের হুকুমে করেছি।"

"মনিব কে?" "যিনি মাইনে দেন।"

"তবেরে পাজী আমি মাইনে দি না?" "না।"

"কে তবে মাসে মাসে তোর মাইনে দেয়? আর নিত্যি যে তিন বেলা গিলছিস, তাই বা যুগিয়ে আসছে কে?"

"আজ্ঞে মাইনেও দেন যে—খেতেও দেন তিনি—তাঁর হুকুমে কাজ করলে কি বেইমানী হয়?" বলিয়া কালিচরণ চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু গঙ্গারামের তখন হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। আফিসের বেলা বহিয়া যাইতেছে, আফিসের কাপড় চোপড় ভস্মীভূত করা হইয়া গেছে—এই মহাসঙ্কটে পড়িলে কাহার না কাণ্ডজ্ঞান লোপ হয়? তাই বিষম ক্রোধে গঙ্গারামবাবু "তবেরে পাজি ছুঁচো—বত বড় মুখ তত বড় কথা!" বলিয়া সদ্য ক্রীত নাগরাই জোড়া কালিচরণের পৃষ্ঠে ব্যবহার করিবার উদ্যোগ করিলেন।

সহসা যুথিকা দেবী আসিয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—

"ওকে তাড়া কচ্ছ কেন? ও ত মিথ্যা কথা বলেনি।"

"মিথ্যা কথা বলেনি কি? ও আমার চাকর নয়?" বলিয়া বিস্মিত গঙ্গারাম গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। স্থির গম্ভীর কণ্ঠে গৃহিণী বলিলেন,—

"অবশ্য তোমারই চাকর! কিন্তু তোমার নীতি অনুসারে নয়। কেননা, আমি ওর মাইনেও দিই, খাবারও দিই।"

"তুমি হাতে ধরে দেও—কিন্তু সে ত আমারই—টাকা?"

"নিশ্চয়। আর যা সাহেব হাতে ধরে তোমাদের দেন, তা কার টাকা?"

বজ্রমুষ্টির মত গঙ্গারামের মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল,—

"দেশের"

সম্পূর্ণ সাফল্য জনিত আত্মপ্রসাদের সঙ্গে যুথিকা বলিল—"তাহ'লে, তোমরাও দেশেরই চাকর—আর দেশের ইচ্ছা পালন না ক'রে দেশের খাজাঞ্চিখর আফিসে কাজ করা নেমক-হালালী নয়—বেইমানী!"

সেই দিন থেকে পূর্ণ তিন মাস কাল শুনেছি গঙ্গারাম বাবু বাড়ির্কের ব্যাখরাখে ঘুমিয়া বিজন-প্রপাতের উপর বসিয়া থাকিতেন। শ্রীহরিপ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

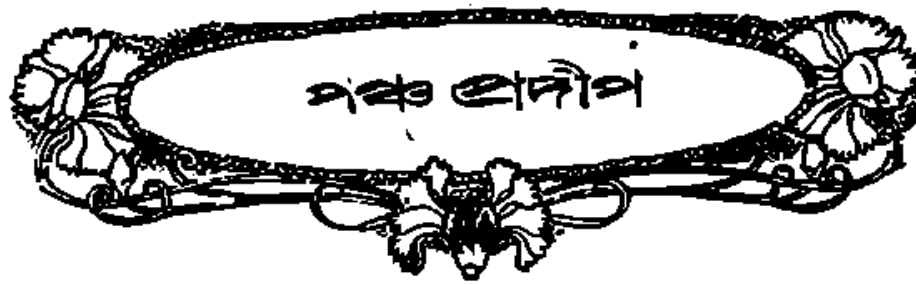

অভিভাষণ

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

সাহিত্য-সাধনার তিন তিন মার্গ আছে। একটি হচ্ছে কর্ম-কাণ্ড। সভাসমিতির সভাপতিত্ব ক'রে ধন্যবাদ জানানো, প্রস্তাবলী সম্পাদন করা, সংবাদপত্র পরিচালনা করা—এগুলি হ'ল কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। এই মার্গের যাঁরা পথিক তাঁরা জানেন কেমন ক'রে স্বচ্ছন্দে সাহিত্য-সংসারের কাজ চালাতে হয়। তার পরের মার্গ হচ্ছে জ্ঞানকাণ্ড। যেমন ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা। এর দ্বারাও সাহিত্যিক সভা জমিয়ে তুলে কীর্তি খ্যাতি হাততালি লাভ করা যায়।

আমি বাল্যকাল হ'তে এই উচ্চ মার্গ থেকেই ভ্রষ্ট; এখন বাকী রইল এক মার্গ, সেটি হচ্ছে রসমার্গ। এই মার্গ অবলম্বন ক'রে রস-সাহিত্যের আলোচনা, আমি পারি বা না পারি, ক'রে যে এসেছি, সে কথা আর গোপন রইল না। বহুকাল পূর্বে নির্জনে বিরলপথে এই রসাভিসারে বা'র হ'য়েছিলুম—দূরে বংশীধ্বনি শুনতে পেয়ে। কিন্তু এই অভিসারপথ যে নিকটের লোকনিন্দা ও লাঞ্ছনার দ্বারা দুর্গম, তা, যাঁরা রসচর্চা করেছেন তাঁরাই জানেন।

ঘরের সীমা হ'তে, প্রয়োজনের শাসন থেকে, অনেক দূরে বের করে নিয়ে যায় যে তান, সেই তান কাণে এসে পৌঁচেছিল, তাই নিকটের বাধা সত্ত্বেও বাহির হ'তে হ'য়েছিল। তাই আজ এত বয়স পর্য্যন্ত বংশীধ্বনি ও পঞ্চম সুই-ই শুনে এসেছি। যে পথে চলেছিলাম, তা হাট-বাটের পথ নয়। তাই আমি নিয়মের রাজ্যের ব্যবস্থা ভাল বুঝিনে। রসমার্গের পথিককে পথে পথে নিয়ম লঙ্ঘন করে চলতে হয়, সেই জন্য অভ্যাসটা আমার অনিয়মজাগত। তাই নিজের ক্ষেত্রে আমাকে টেনে আনলে আমি কর্মের সৌষ্ঠব রক্ষা করতে পারিনে।

তবে কেন সভাপতির পদ গ্রহণ ক'রতে রাজী হওয়া! এর প্রথম কারণ হ'চ্ছে যে, যিনি আমাকে এইপদে আহ্বান করেন, তিনি আমার সম্মানার্হ, তাঁর নিমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি নি।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে, বাংলার বাইরে বাঙালীর আহ্বান যখন আমার কাছে পৌঁছিল, তখন আমি সে আমন্ত্রণ বাড়ীর চালে অস্বীকার করতে পারি নি। এই ডাক শুনে আমার মন কি বলেছিল, আজকের অভিভাষণে সেই কথাটাই সবিস্তারে জানাব।

আজ যেমন বসন্ত উৎসবের দিনে দক্ষিণ সমীরণের অভ্যর্থনায় বিশ্ব—প্রফুটিত পুলকিত হয়ে উঠেছে, ধরণীর বক্ষে নবকিসলয়ের উৎস উৎসারিত হয়েছে, আজকের সাহিত্য-সম্মিলনের উৎসবে তেমনই একটি বসন্তেরই ডাক আছে। এ ডাক আজকের ডাক নয়।

কতকাল হল একদা একটি প্রাণ-সমীরণের হিল্লোল বঙ্গদেশের চিত্তের উপর দিয়ে ব'য়ে গেল, আর দেখতে দেখতে সাহিত্যের সুপ্তিত দলগুলি বাধাবন্ধ বিদীর্ণ করে বিকশিত হ'য়ে উঠল। বাধাও ছিল বিস্তর। ইংরাজী সাহিত্যের রসমত্ততায় নূতন মাতাল ইংরাজী শিক্ষিত ছাত্রেরা সেদিন মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করেছিল। আবার সংস্কৃত সাহিত্যের ঐশ্বর্যগর্বে গর্বিত সংস্কৃত পণ্ডিতেরাও মাতৃভাষাকে অবহেলা করিতে ত্রুটি করেন নি। কিন্তু বহুকালের উপেক্ষিত ভিখারীর মেয়ে যেমন বাহিরের সমস্ত আকিঞ্চনতা সত্ত্বেও হঠাৎ একদিন নিজের অন্তর হ'তে উন্মোষিত যৌবনের পরিপূর্ণতায় অপরূপ গৌরবে বিশ্বের সৌন্দর্য্যালোকে আপন আসন অধিকার করে, অনাদৃত বাঙ্গালা ভাষা তেমনি ক'রে একদিন সহসা কোন্ ভাবাবেগের ঔৎসুক্যে আপন বহুদিনের হীনতার ধূলি ঝাপিয়ে দিয়ে মহিমান্বিত হয়ে উঠল। তার সেদিনকার বৈদগ্ধবিহ্বল ভাবযৌবনের স্বরূপটিকেই আজকের নিমন্ত্রণ আমার স্মৃতিমন্থিরে বহন ক'রে এনেছে।

মানুষের পরিচয় তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন সে যথার্থ-

ভাবে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু প্রকাশ ত একা নিজের মধ্যে হতে পারে না। প্রকাশ হ'চ্ছে নিজের সঙ্গে অন্য সকলের সত্য সম্বন্ধে। ঐক্য একের মধ্যে নয়, অনেকের মধ্যে সম্বন্ধের ঐক্যই ঐক্য। সেই ঐক্যের যাথার্থ্য ও সত্যতা নিয়েই, কি ব্যক্তিবিশেষের, কি সমষ্টিবিশেষের, যথার্থ পরিচয়। এই ঐক্যকে ব্যাপক ক'রে গভীর ক'রে পেলেই আমাদের সার্থকতা।

ভূ-বিবরণের অর্থগত বাংলা, তার মধ্যে কোন গভীর ঐক্যকে পাই না, কেন না বাঙ্গালা দেশ কেবল জড় পদার্থ নয়, তা চিন্ময়ও বটে। তা' যে কেবল বিশ্বপ্রকৃতিতে আছে তা নয়, তার চেয়ে সত্যরূপে আমাদের চিল্লোকে আছে। মনে রাখতে হবে যে, অনেক পশুপক্ষীও বাংলার মাটিতে জন্মেছে, অথচ বঙ্গের বেঙ্গল টাইগারের হৃদয়ের মধ্যে বাঙ্গালীর সঙ্গে একাত্মিকতার বোধ, আত্মীয়তার রসযুক্ত নয় বলেই বাঙ্গালীকে ভক্ষণ করতে তার যেমন আনন্দ তেমন আর কিছুতেই নয়। কোনো সাধারণ ভূখণ্ডে জন্মলাভ নামক ব্যাপারের মধ্য দিয়েই কোনো মানুষের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না।

তারপর মানুষ জাতিগত ঐক্যের মধ্য দিয়েও আপন পরিচয়কে ব্যক্ত করতে চেয়েছে। যেসব মানুষ স্বনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় বিধিবিধানের যোগে এমন একটি রাজতন্ত্র রচনা করে, যার দ্বারা পররাজ্যের সঙ্গে স্বরাজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে এবং সেই স্বরাজসীমার শাসন ও পরস্পর সহকারিতার দ্বারা নিজেদের সার্বজনীন স্বার্থকে নিরবে বিস্তৃত ও বিস্তীর্ণ করতে পারে, তারাই হ'ল এক নেশন। তাদের মধ্যে অন্য যত রকম ভেদ থাক তাতে কিছুই আসে যায় না। বাঙ্গালাকে নেশন বলা যায় না বাঙ্গালী এখনও আপন রাষ্ট্রীয় ভাগ্যবিধাতা হয়ে ওঠে নি। অপরদিকে সামাজিক ধর্মসম্প্রদায়-গত ঐক্যের মধ্যেও বিশেষ দেশের অধিবাসী আত্মপরিচয় দিতে পারে; যেমন বলতে পারে আমরা হিন্দু, বা মুসলমান। কিন্তু বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধেও বাংলার অনৈক্য রয়েছে। তেমনি বর্ণভেদ হিসাবে যে জাতি, সেখানেও বাঙ্গলার ভেদের অন্ত নেই। তার পরে বিজ্ঞানবাদ অনুসারে বংশগত যে জাতি, তার নির্ণয় করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা মানুষের দৈর্ঘ্য, বর্ণ, নাকের উচ্চতা, মাথার খেঁড় প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্যের মাপ-জোখ ক'রে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। সে হিসাবে আমরা বাঙ্গালীরা যে কোন্ বংশে জন্মেছি, পণ্ডিতের মত নিয়ে তা জানতে গেলে দিশেহারা হয়ে যেতে হবে।

জন্মলাভের দ্বারা আমরা একটা প্রকাশ লাভ করি। এই প্রকাশের পূর্ণতা জীবনের পূর্ণতা। রোগতাপ দুর্বলতা অনশন প্রভৃতি বাধা কাটিয়ে যতই সম্পূর্ণরূপে জীবনধর্ম পালন ক'রতে পারি, ততই আমার জৈব-ব্যক্তিত্বের বিকাশ। আমার এই জৈব-প্রকাশের আধার হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি।

কিন্তু জলস্থল আকাশ-আলোকের সম্বন্ধসূত্রে বিশ্ব-লোকে আমাদের যে প্রকাশ, সেই ত আমাদের একমাত্র প্রকাশ নয়। আমরা মানুষের চিত্তলোকেও জন্মগ্রহণ করেছি। সেই সার্বজনীন চিত্তলোকের সঙ্গে সম্বন্ধযোগ ব্যক্তিগত চিত্তের পূর্ণতা দ্বারা আমাদের চিন্ময় প্রকাশ পূর্ণ হয়। এই চিন্ময় প্রকাশের বাহন হ'চ্ছে ভাষা। ভাষা না থাকলে পরস্পরের সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্বন্ধ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হ'ত।

তাই বলচি বাঙালী বাংলা দেশে জন্মেছে বলেই যে বাঙ্গালী, তা নয়, বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে মানুষের চিত্তলোকে ঘাতায়াতের বিশেষ অধিকার পেয়েছে বলেই সে বাঙ্গালী। ভাষা আত্মীয়তার আধার, তা মানুষের জৈব-প্রকৃতির চেয়ে অন্তরতর। আজকের দিনে মাতৃ-ভাষার গৌরববোধ বাঙ্গালীর পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হয়েছে, কারণ ভাষার মধ্য দিয়ে তাদের পরস্পরের পরিচয় সাধন হতে পেয়েছে এবং অপরকেও তারা আপনার যথার্থ পরিচয় দান করতে পারছে।

মানুষের প্রকাশের দুই পিঠ আছে। এক পিঠে তার আত্মানুভূতি; আর এক পিঠে অন্য সকলের কাছে আপনাকে প্রকাশ করা। সে যদি অগোচর হয়, তবে সে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে যায়। যদি নিজের কাছেই তার প্রকাশ ক্ষীণ হ'ল, তবে সে অন্যের কাছেও নিজেকে গোচর করতে পারল না। যেখানে তার অগোচরতা সেখানেই সে ক্ষুদ্র হয়ে রইল আর যেখানে সে আপনাকে প্রকাশ করতে পারল সেখানেই তার মাহাত্ম্য পরিস্ফুট হ'ল

এই পরিচয়ের সফলতা করতে হলে ভাষা সবল ও সতেজ হওয়া চাই। ভাষা যদি অস্বচ্ছ হয়, দরিদ্র হয়, জড়তাগ্রস্ত হয়, তা হলে মনোবিশ্বে মানুষের যে প্রকাশ, তা অসম্পূর্ণ হয়। বাংলা ভাষা একসময়ে গেঁয়ো রকমের ছিল। তার সহযোগে তত্ত্বকথা ও গভীরভাব প্রকাশ করার অনেক বাধা ছিল। তাই বাঙ্গালীকে সে দিন সকলে গ্রাম্য বলে জেনেছিল। তাই যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় চর্চা করেছিলেন এবং সংস্কৃত শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে বিশ্বসত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁরা মাতৃভাষায় একান্ত আবদ্ধ-চিত্তের সম্মান করতে পারেন নি। বাংলার পাঁচালী সাহিত্য ও পল্লীর কথা তাঁদের কাছে নগণ্য ছিল। অনাদরের ফল কি হয়? অনাদৃত মানুষ নিজেকে

অনাদরণীয় ব'লে বিশ্বাস করে, মনে করে স্বভাবতই সে জ্যোতিহীন। কিন্তু একথাটা ত গভীরভাবে সত্য নয়; আত্মপ্রকাশের অভাবেই তার আত্মবিস্মৃতি। যখন সে আপনাকে প্রকাশ করবার উপযুক্ত উপলক্ষ পায়, তখন সে আর আপনার কাছে আপনি প্রচ্ছন্ন থাকে না। উপযুক্ত আধারটি না পেলে প্রতীচ্য আপনার শিক্ষা সম্বন্ধে আপনি অন্ধ থাকে। অতএব, যে হেতু মানুষের আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন হচ্ছে তার ভাষা, তাই তার সকলের চেয়ে বড় কাজ—ভাষার দৈন্য দূর করে আপনার যথার্থ পরিচয় লাভ করা এবং সেই পূর্ণ পরিচয়টি বিশ্বের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করা। আমার মনে পড়ে আমাদের বাল্যকালে বাংলাদেশে একদিন ভাবের তাপস বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ এক উদ্বোধনমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তাতে হঠাৎ যেন বহুদিনের কৃষ্ণপক্ষ তার কাল পৃষ্ঠা উলটিয়ে দিয়ে শুক্লপক্ষরূপে আবির্ভূত হল। তখন যে সম্পদ আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছিল শুধু তার জন্যেই যে আমাদের আনন্দ ছিল তা নয়। কিন্তু হঠাৎ সম্মুখে দেখা গেল, একটি অপরিসীম আশার ক্ষেত্র বিস্তারিত। কি যে হবে, কত যে পাব, ভাবী কাল যে কোন অভাবনীয়কে বহন করে আনবে সেই ঔৎসুক্যে মন ভরে উঠল।

এই যে মনে অনুভূতি জাগে, যে সৌভাগ্যের বুঝি কোথাও শেষ নেই, এই যে হৃৎস্পন্দনের মধ্যে আগন্তুক অসীমের পদশব্দ শুনতে পাওয়া যায়, এতেই সৃষ্টিকার্য্য অগ্রসর হয়। সকল বিভাগেই এই ব্যাপারটি ঘটে থাকে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একদিন বাঙালীর এবং ভারতবাসীর আশা সঙ্কীর্ণ সীমায় বদ্ধ ছিল। তাই কংগ্রেস মনে করেছিল যে যতটুকু ইংরাজ হাতে তুলে দেবে সেই প্রসাদটুকু লাভ করেই ধন্য হওয়া যাবে। কিন্তু এই সীমাবদ্ধ আশা যে দিন ঘুচে গেল, সেদিন মনে হ'ল যে আমার আপনার মধ্যে যে শক্তি আছে তার দ্বারাই দেশের সকল সম্পদকে আবাহন করে আনতে পারব। এইরূপ অসীম আশার দ্বারাই অসাধ্য সাধন হয়। আশাকে নিষ্ফল বন্ধ ক'রলে কোনো বড় কাজ হয় না। বাঙালী কোথায় এই অসীমতার পরিচয় পেয়েছে? পরিচয় সেখানেই, যেখানে নিজের জগৎকে নিজে সৃষ্টি ক'রে তার মধ্যে বিরাজ ক'রতে পেরেছে। মানুষ নিজের জগতে বিহার ক'রতে না পারলে, পরান্নভোজী, পরাবসথধারী হ'লে তার আর দুঃখের অন্ত থাকে না। তাইতো কথা আছে 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।' আমার যা' ধর্ম তাই আমার সৃষ্টির মূলশক্তি, আমি স্বয়ং আমার আশ্রয়স্থল তৈরী ক'রে তার মধ্যে বিরাজ ক'রব। প্রত্যেক জাতির স্বকীয় সৃষ্টি তার স্বকীয় প্রকৃতি অনুসারে বিচিত্র আকার ধারণ করে থাকে। সে রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে আপন জগৎকে বিশেষভাবে রচনা করে' তাতে বসবাস করার অধিকার লাভ ক'রে থাকে। বাঙালী জাতি তার আনন্দময় সত্তাকে প্রকাশ করবার একমাত্র ক্ষেত্র লাভ করেছে বাংলাভাষার মধ্যে। সেই ভাষাতে একদা এমন এক শক্তির সঞ্চার হয়েছিল, যাতে ক'রে সে নানা রচনারূপের মধ্যে যেন অনাবৃত হ'য়ে উঠেছিল; বীজ যেমন আপন প্রাণশক্তির উদ্বেলতায় নিজের আবরণ বিদীর্ণ ক'রে অঙ্কুরকে উদ্ভিন্ন করে তেমনই আর কি। যদি তার এই শক্তি নিতান্ত ক্ষীণ হ'ত তবে তার সাহিত্য ভাল ক'রে আত্মসমর্থন করতে পারত না। বিদেশ থেকে সঞ্চার স্রোতের মত আগত ভাবধারা তাকে ঘুরে ঘুরে দিত।

এমন বিলুপ্তির পরিচয় আমরা অন্যত্র পেয়েছি। ভারতবর্ষের অন্য অনেক জায়গায় ইংরাজী-চর্চ্চা খুব প্রবল। সেখানে ইংরাজী ভাষায় স্বজাতীয়ের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে পত্র ব্যবহার হ'য়ে থাকে। এমন দৈন্য-দশা যে, পিতাপুত্রের পরস্পরের মধ্যে শুধু ভাবের নয় সামান্য সংবাদের আদানপ্রদানও বিদেশী ভাষার সহায়তা ঘটে। রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভের আগ্রহ প্রকাশ ক'রে যে মুখে বলে বন্দেমাতরম্ সেই মুখেই মাতৃভক্ত পরম অধিকার যে মাতৃভাষা তার অসম্মান করতে মনে কোনো আক্ষেপ বোধ করে না।

বাংলা দেশেও যে এই আত্মাবমাননার লক্ষণ একেবারে নেই তা বলতে পারিনে। তবে কিনা এ সম্বন্ধে বাঙালীর মনে একটা লজ্জার বোধ জন্মেছে। আজকের দিনে বাঙালীর ডাকঘরের রাস্তায় বাংলা চিঠির ভীড় সব চেয়ে বেশী।

বাস্তবিক মাতৃভাষার প্রতি যদি সম্মান-বোধ জন্মে থাকে, তবে স্বদেশীকে আত্মীয়কে ইংরাজি লেখার মত কুকীর্ত্তি কেউ কর্ত্তে পারে না। আমার নিজের একটা গৌরবের কথা এই যে, দেশের বড় বড় ইংরাজীওয়ালারা আমাকে ইংরাজীতে চিঠি পত্র লিখতে সাহস করেন না।

এক সময়ে বাংলাদেশে এমন হয়েছিল যে, ইংরাজি কাব্য লিখতে লোকের আগ্রহের সীমা ছিল না। তখন ইংরাজি রচনা ইংরাজি বক্তৃতা অসাধারণ গৌরবের বিষয় ছিল। আজকাল আবার বাংলাদেশে তারই পাল্টা ব্যাপার ঘটছে। এখন কেউ কেউ আক্ষেপ ক'রে থাকেন যে, মাদ্রাজীরা বাঙালীদের চেয়ে ভালো ইংরাজী বলতে পারে। এই অপবাদ যেন আমাদের মাথার মুকুট হ'য়ে থাকে।

আজকে প্রবাসের এই বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন হঠাৎ আত্মপ্রকাশের জন্য উৎসুক হয়েছে, এই আগ্রহের কারণ বাঙালী আপন প্রাণ দিয়ে একটি প্রাণবান্ সাহিত্যকে

প'ড়ে তুলেছে। সেখানে বাংলার শুধু ভৌগলিক অধিকার, সেখানে সে মানচিত্রের সীমাপরিধিকে ছাড়াতে পারে না। সেখানে তার দেশ বিধাতার সৃষ্ট দেশ; সম্পূর্ণ তার স্বদেশ নয়। কিন্তু ভাষাবস্তুরূপকে আশ্রয় ক'রে যে মানস-দেশে তার চিত্ত বিরাজ করে, সেই দেশ তার ভূ-সীমানার দ্বারা বাধাগ্রস্ত নয়, সেই দেশ তার স্বজাতির সৃষ্ট দেশ। আজ বাঙালী সেই দেশটিকে নদী প্রান্তর পর্ব্বত অতিক্রম ক'রে সুদূর প্রসারিতরূপে দেখ্‌তে পাচ্ছে, তাই বাংলার সীমার মধ্যে থেকে বাংলার সীমার বাহিরে সে আপন চিত্তের অধিকারকে উপলব্ধি ক'রচে।

ইতিহাস প'ড়লে জানা যায় যে, ইংলণ্ডে ও স্কটলণ্ডে এক সময়ে বিরোধের অন্ত ছিল না। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কেমন ক'রে হয়েছিল? শুধু কোন একজন স্কটল্যাণ্ডের রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে তা হয়নি। আসলে যখন চসার প্রভৃতি কবিদের সময়ে ইংরাজি ভাষা-সাহিত্য সম্পদ্‌শালী হ'য়ে উঠল, তখন তার প্রভাব বিস্তৃত হ'য়ে স্কটলণ্ডকে আকৃষ্ট ক'রেছিল। সে ভাষা আপন ঐশ্বর্য্যের শক্তিতে স্কটলণ্ডের বরমাল্য অধিকার ক'রে নিয়েছিল। এমনি ক'রেই দুই বিরোধী জাতি ভাষার ক্ষেত্রে একত্র মিলিত হ'ল, জ্ঞানের ভাবের একই পথে সহযাত্রী হ'য়ে আত্মীয়তার বন্ধনকে অন্তরে স্বীকার করায়, তাদের বাহিরের ভেদ দূর হ'ল, দূর প্রদেশবাসী বাঙালী যে বাংলা-ভাষাকে আঁকড়ে থাকতে চাচ্ছে, প্রবাসের ভাষাকে যে স্বীকার ক'রে নিতে ইচ্ছে ক'রচে না, তারও কারণ এই যে, সাহিত্যসম্পদ্‌শালী বাংলাভাষার শক্তি তার মনকে জিতে নিয়েচে। এই ধরেই সে যত ঘুরেই যাক্, আপন ভাষার আপন গৌরববোধের সূত্রে বাংলার বাঙালীর সঙ্গে তার যোগ সুগভীর হ'য়ে রয়েচে। এই যোগকে ছেদন ক'রতে তার ব্যথা বোধ হয়, এ'কে উপলব্ধি ক'রতে তার আনন্দ।

বাল্যকালে এমন আলোচনাও আমি শুনেচি যে, বাঙালী যে বঙ্গভাষার চর্চ্চায় মন দিয়েছে, এতে ভারতীয় ঐক্যের অন্তরায় সৃষ্টি হ'চ্চে। কারণ, ভাষার শক্তি বাড়তে থাকলে তার দৃঢ় বন্ধনকে শিথিল করা কঠিন হয়। তখনকার দিনে বঙ্গসাহিত্যে যদি উৎকর্ষ লাভ না ক'রত তবে আজকে হয় তো তার প্রতি মমতা ছেড়ে দিয়ে আমরা নির্ব্বিকার চিত্তে কোনো একটি সাধারণ ভাষা গ্রহণ ক'রে ব'সতাম। কিন্তু ভাষা জিনিষের জীবন-ধর্ম্ম আছে। তাকে ছাঁচে ঢেলে কলে ফেলে ফরমাসে গড়া যায় না। তার নিয়মকে স্বীকার ক'রে নিয়ে তবেই তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়, তার বিরুদ্ধগামী হ'লে সে বন্ধ্যা হয়। একদিন মহা-ফ্রেডরিকের সময় ফ্রান্সের ভাষার প্রতি আর্ম্মাণীর লোলুপতা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু সে টিকল না। কেন না ফ্রান্সের প্রকৃতি থেকে ফ্রান্সের ভাষাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে তাতে প্রাণের কাজ চালানো যায় না। সিংহের চামড়া নিয়ে আসন বা সুরসজ্জা ক'রতে পারি, কিন্তু সিংহের সঙ্গে চামড়া বদল ক'রতে পারি না।

আমাদের স্বীকার ক'রতেই হবে যে, আমরা যেমন মাতৃক্রোড়ে জন্মেছি, তেমনই মাতৃভাষার ক্রোড়ে আমাদের জন্ম; এই উভয় জননীই আমাদের পক্ষে সত্য ও অপরিহার্য্য।

মাতৃভাষায় আমাদের আপন ব্যবহারের অতীত আর একটি বড় সার্থকতা আছে। আমার ভাষা যখন আমার নিজের মনোভাবের প্রকাশে বাহন হয়, তখনই অন্য ভাষার মর্ম্মগত ভাবের সঙ্গে আমার সহজ ও সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হ'তে পারে। আমি যখন বাল্যকালে ইস্কুল পালিয়েছি, কিন্তু বুড়ো বয়সে সেই ইস্কুল আবার আমাকে ফিরিয়ে এনেচে। আমি তাই ছেলে পড়িয়ে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমার বিদ্যালয়ে নানা শ্রেণীর ছাত্র এসেছে, তার মধ্যে ইংরেজী-শেখা বাঙালী ছেলেও কখনো কখনো আমরা পেয়েছি। আমি দেখেছি তাদেরই ইংরেজী শেখানো সব চেয়ে কঠিন ব্যাপার। যে বাঙালীর ছেলে বাংলা জানে না, তাকে ইংরেজী শেখাই কি অবলম্বন ক'রে? ভিক্ষুকের সঙ্গে দাতার যে সম্বন্ধ, তা পরস্পরের আন্তরিক মিলনের সম্বন্ধ নয়। ভাষা শিক্ষার বেইটে যদি ঘটে, অর্থাৎ একদিকে শূন্য ঝুলি আর একদিকে দানের অন্ন, তা হ'লে গ্রহীতাকে একেবারে গোড়া থেকে সুরু ক'রতে হয়। কিন্তু এই ভিক্ষাবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত উপজীবিকাতে কখনো কল্যাণ হয় না। নিজের ভাষা থেকে দান নিয়ে আর প্রতিদানে অন্য ভাষাকে আয়ত্ত করাই সহজ।

সুতরাং প্রত্যেক দেশ যখন তার স্বকীয় ভাষাতে পূর্ণতা লাভ ক'রবে, তখনই অন্য দেশের ভাষার সঙ্গে তার সত্যসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবে। ভাষার এই সহযোগিতায় প্রত্যেক জাতির সাহিত্য উজ্জ্বলতর হ'য়ে প্রকাশমান হ'বার সুযোগ পায়। যে নদী আমার গ্রামের কাছ দিয়ে বহমান, তাতে যেমন গ্রামের এপারে ওপারে খেয়া পারাপার চলে, তেমনি আবার তাতে পণ্যদ্রব্য বহন ক'রে বিদেশের সঙ্গে কারবার হ'তে পারে। কেন না সেই বহমান নদীর সঙ্গে অন্যান্য নানা নদীর সম্বন্ধ সহজ।

য়ুরোপে একসময়ে লাটিন ভাষা জ্ঞানচর্চ্চার একমাত্র সাধারণ ভাষা ছিল। যতদিন তা' ছিল ততদিন য়ুরোপের ঐক্য ছিল বাহ্য আর অগভীর। কিন্তু আজকের দিনে য়ুরোপে নানা বিদ্যাধারার সম্মিলনের দ্বারা যে বহুত্ব লাভ

করেছে, সেটি আজ পর্য্যন্ত অন্য কোনো মহাদেশে ঘটেনি। এই ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় বিদ্যার নিরন্তর সচল সম্মিলন কেবল-মাত্র য়ুরোপের নানা দেশের নানা ভাষার যোগেই ঘটেছে, এক ভাষার দ্বারা কখনো ঘট্‌তে পারত না। আজকের দিনে য়ুরোপ রাষ্ট্রীয় অ-সাম্যের অন্ত নেই, কিন্তু তার বিদ্যার সাম্য আজও প্রবল। এই জ্ঞান সম্মিলনের উজ্জ্বল তার দিগ্‌বিদিক্ অভিভূত হ'য়ে গেছে। সেই মহাযজ্ঞে দেওয়ালি-উৎসবের যে বিরাট আয়োজন হয়েছে, তা সমাধা ক'রতে সেখানকার প্রত্যেক দেশ তার দীপশিখাটি জ্বালিয়ে এনেছে। যেখানে যথার্থ মিলন সেখানেই যথার্থই শক্তি। আজকের দিনে য়ুরোপের যথার্থ শক্তি তার জ্ঞান-সমবায়ে।

আমাদের দেশেও সেই কথাটি মনে রাখ্‌তে হবে। ভারতবর্ষে আজকাল পরস্পরের ভাবের আদান প্রদানের ভাষা হয়েছে ইংরাজী ভাষা। কিন্তু একটি ভাষাকেও ভারতব্যাপী মিলনের বাহন করবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু এতে ক'রে যথার্থ সমবয়ে হতে পারে না—হয় তো একাকারত্ব হ'তে পারে, কিন্তু একত্ব হ'তে পারে না। কারণ এই একাকারত্ব কৃত্রিম ও অগভীর—এ শুধু বাইরে থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা মিলনের প্রয়াস মাত্র। যেখানে হৃদয়ের বিনিময় হয়, সেখানে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য থাকলেই তবে যথার্থ মিলন হ'তে পারে। কিন্তু যদি বাহ্য বন্ধন পাশের দ্বারা মানুষকে মিলিত ক'রতে বাধ্য করা যায়, তবে তার পরিণাম হয়, পরম শত্রুতা। কারণ সে মিলন শৃঙ্খলের মিলন, অথবা শৃঙ্খলার মিলন মাত্র।

রাশিয়া তার অধিকৃত ছোট ছোট দেশের ভাষাকে মেরে ফেলে ভাষার অধিকারকৃত করবার চেষ্টা করেছিল, বেলজিয়াম ফ্লেমিশ্‌দের ভাষা তোলাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু ভাষার অধিকার যে ভৌগোলিক অধিকারের চেয়ে বড় তাই এখানে জবরদস্তি খাটে না। বেলজিয়াম ফ্লেমিশ্‌দের অনৈক্য সইতে পারে নি, তাই রাষ্ট্রীয় ঐক্য-বন্ধনের তাদের বাঁধতে চেয়েছে। কিন্তু সে ঐক্য অগভীর বলে তা স্থায়ী ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে না। সাম্রাজ্য বন্ধনের দোহাই দিয়ে যে ঐক্য সাধনের চেষ্টা তা বিষম বিড়ম্বনা। আজ য়ুরোপের বড় বড় ব্যবসাদারী নেশনরা আপন অধীন গণবর্গকে এক জোয়ালে জুড়ে' দিয়ে বিষম কশাঘাত ক'রে তার ইম্পীরিয়ালিস্‌দের রথ চালিয়ে দিয়েছে। রথের বাহন যে ঘোড়াগুলি, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো আত্মীয়তা নেই। কিন্তু সারথির তাতে আসে যায় না। তার মন রয়েছে এগিয়ে চলার দিকে, তাই সে রথের ঘোড়াটাকে ক'ষে বেঁধে, টেনে-হিঁচ্‌ড়ে প্রাণপণে চাবকাচ্ছে। নইলে তার গতিবেগ যে থেমে যায়। এমন বাহ্য সাম্যকে যারা চায়, তারা ভাষা-বৈচিত্র্যের উপর ঈশ্বরোদ্যম চালিয়ে দিয়ে আপন রাজরথের পথ সমতল ক'রতে চায়। কিন্তু পাঁচটি বিভিন্ন ফুলকে ফুটে বলা পাকালেই তাকে শতদল বলা যেতে পারে না। অরণ্যের বিভিন্ন পত্রপুষ্পের মধ্যে যে ঐক্য আছে তা হ'ল বসন্তের ঐক্য। কারণ বসন্তসমাগমে কাননের সমীরণে তাদের সকলেরই মঞ্জরী মুকুলিত হয়ে ওঠে। তাদের বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে বসন্তের একই বাণীর চলাচলের পথ, সেখানেই তারা এক ও মিলিত। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অবরদস্ত লোকেরা বলে থাকে যে, মানুষকে বড় রকমের বাঁধনে বেঁধেছেঁদে মেরে কেটেকুটে প্রয়োজন সাধন করতে হ'বে—এমন দড়াদড়ি দিয়ে বাঁধলেই না কি ঐক্য সাধিত হতে পারে! অদ্বৈতের মধ্যে যে পরমমুক্ত শিব রয়েছেন তাঁকে তারা চায় না। তারা বেঁধেছেঁদে দ্বৈতকে বদ্ধাবস্থা ক'রে যে অদ্বৈতের ভাণ তাকেই যেনে থাকে। কিন্তু যাঁরা যথার্থ অদ্বৈতকে অন্তরে লাভ করেছেন তাঁরা তো তাকে বাইরে খোঁজেন না। বাইরের যে এক, তা হচ্ছে প্রলয়, তাই একাকারত্ব; আর অন্তরের যে এক, তা হ'ল সৃষ্টি, তাই ঐক্য। একটা হল পঙ্কত্ব, আর একটা হল পঙ্কাব্জত্ব।

আজকের এই সাহিত্য-সম্মিলনে বাংলাদেশের প্রতি-বেশী অনেক বন্ধুও সমাগত হয়েছেন। তাঁরা যদি এই সম্মিলনে সমাগত হ'য়ে নিরন্ধ্রপের গৌরবদাহে মনের মধ্যে কোন বাধাবোধ না ক'রে থাকেন, তবে তাতে অনেক কাজ হয়েছে। আমরা যেন বাঙালীর স্বাজাত্য অভি-মানের অতিমাত্রার বিলয় হচ্ছে বিঘ্ন না বাধাই। কৃষ্ণ তাঁর আপন আতিমাত্যের অভিমানেই শিবকে রাগিয়ে দিয়েছিলেন।

যে দেশে হিন্দী ভাষার প্রচলন, সে দেশে প্রবাসী বাঙালী বাংলা ভাষার ক্ষেত্র তৈরী করেছে, এতে বাঙালী-দের এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এই উত্তরভারতে কাশীতে তাঁরা কি পেলেন, দেখলেন, আত্মীয়দের সহযোগিতায় কি লাভ ক'রলেন তা আমাদের জানাতে হবে। আমরা দূরে থাকা বাস করি, তারা এখানকার এ'সবের সঙ্গে পরিচিত নই; উত্তর ভারতের লোককে আমরা মানচিত্র বা থেকেটিয়ারের দরবেশে দেখেছি। বাঙালী যখন আপন ভাষার মধ্য দিয়ে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় বিস্তার ক'রে সৌহার্দ্যের পথ মুক্ত করবেন, তাতে কল্যাণ হবে। ভালবাসার সাধনার একটা প্রধান সোপান হ'চ্ছে জ্ঞানের সাধনা।

পরস্পরের পরিচয়ের অভাবই মানুষের প্রভেদকে বড় ক'রে তোলে। যখন অন্তরের পরিচয় না হয়, তখন বাইরের অনৈক্যই চোখে পড়ে, আর তাতে পদে পদে অবজ্ঞার সঞ্চার হ'য়ে থাকে। আজ বাংলা ভাষাকে অবলম্বন ক'রে উত্তরভারতের সঙ্গে সেই আন্তরিক পরিচয়ের

প্রবাহ বাংলার অভিমুখে ধাবিত হোক্। এখানকার সাহিত্যিকেরা আধুনিক ও প্রাচীন উত্তর ভারতীয় সাহিত্যের যে শ্রেষ্ঠ-সম্পদ, যা' সকলের শ্রদ্ধা উৎপাদন করবার যোগ্য, তা সংগ্রহ করে ঘরে বাংলাদেশে পাঠাবেন, এমনি ভাবে ভাষার মধ্য দিয়ে বাংলার সঙ্গে উত্তর ভারতের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হ'বে।

আমি হিন্দী জানি না, কিন্তু আমাদের আশ্রমের একটি বন্ধুর কাছ থেকে প্রথমে আমি প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের আশ্চর্য্য রত্নসমূহের কিছু কিছু পরিচয় লাভ ক'রেছি। প্রাচীন হিন্দী কবিদের এমন সকল গান তাঁর কাছে শুনেছি যা শুনে মনে হয়, সেগুলি যেন আধুনিক যুগের। তার মানে হচ্ছে যে কাব্য সত্য তা চিরকালই আধুনিক। আমি বুঝলুম, যে হিন্দী ভাষার ক্ষেত্রে ভাবের এমন সোণার ফসল ফলেছে, সে ভাষা যদি কিছুদিন অকৃষ্ট হয়ে পড়ে থাকে, তবু তার স্বাভাবিক উর্ব্বরতা হারাতে পারে না; সেখানে আবার চাষের সুদিন আসবে এবং পৌষমাসে নবান্ন উৎসব ঘটবে। এমনি ক'রে এক সময়ে আমার বন্ধুর সাহায্যে এ দেশের ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার যোগ স্থাপিত হ'য়েছিল। উত্তর পশ্চিমের সঙ্গে সেই শ্রদ্ধার সম্বন্ধটি যেন আমাদের সাধনার বিষয় হয়।

আজ বসন্ত সমাগমে অরণ্যের পাতায় পাতায় পুলকের সঞ্চার হ'য়েছে। গাছের যা শুকনো পাতা ছিল তা' ঝরে গেল, এমন দিনে যারা হিসাবের নীরস পাতা উল্টাতে ব্যস্ত আছে, তারা এই দেশব্যাপী বসন্ত উৎসবের ছন্দে যোগ দিতে পারল না। তারা পিছনে প'ড়ে রইল। দেশে আজ যে পোলিটীকাল উদ্দীপনার সঞ্চার হ'য়েছে তার ফলই ফলুক "এক বাজে।" এর সমস্ত লাভ লোকসানের হিসাবের চেয়ে অনেক বড় কথা হ'য়ে গেছে, সেই সুগভীর আত্মিক-প্রেরণার মধ্যে যার প্রভাবে এই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এমন অপরূপ বিকাশ হ'য়েছে। গাছের যে স্বাভাবিক প্রাণশক্তি ফিরা আছে, তা অগোচরে কাজ করে ব'লে ব্যস্তবাগীশ লোকেরা তার চেয়ে দাওয়াই-খানার অনেকটাক কোম্পানিকে ঢের বড় ব'লে মনে করে —এমন কি তার জন্যে যারা বিসর্জ্জন ক'রতে রাজি হয়। সম্মানের জন্যে মানুষ শিরোপা প্রার্থনা করে, এবং তার প্রয়োজনও থাকতে পারে, কিন্তু শিরোপা দ্বারা মানুষের মাথা বড় হয় না। আসল গৌরবের বার্ত্তা মতিষ্কেই আছে, শিরোপায় নেই, প্রাণের সুষিরে আছে, দোকানের কারখানা ঘরে নেই। বসন্ত বাংলার চিত্ত-উপবনে প্রাণ-দেবতার দাক্ষিণ্য নিয়ে এসে পৌঁচেছে, এ হ'ল একেবারে ভিতরকার খবর, খবরের কাগজের খবর নয়; এর ঘোষণার ভার কবিদের উপর। আমি আজ সেই কবির কর্ত্তব্য ক'রতে এসেছি—আমি বলতে এসেচি, অহল্যা-পাষাণীর উপর রামচন্দ্রের পদস্পর্শ ঘটেছে—এই খবর দেখা গেছে বাংলা সাহিত্যে, এইটেই আমাদের সকলের চেয়ে বড় আশার কথা। আজ বাংলা হ'তে দূরেও বাঙালী-দের কর্ম্মক্ষেত্রে সেই আশা ও পুলকের সঞ্চার হোক। খুব বেশি দিনের কথা নয়, বড় জোর ষাট বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্য কথায় ছন্দে-গানে-ভাবে শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছে। এই শক্তির এইখানেই শেষ নয়। আমাদের মনে আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার হোক্ আমরা এই শক্তিকে চিরজীবিনী করি যেখানেই মানবশক্তি ভাষায় ও সাহিত্যে প্রকাশমান হ'য়েছে, সেইখানেই মানুষ অমরতা লাভ করেছে ও সর্ব্ব মানব-সভায় আপন আসন ও বরমাল্য পেয়েছে।

অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বেই মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেখানকার অধ্যাপক ডাক্তার অটো আমাকে লিখেছেন যে, তাঁরা শান্তিনিকেতনে বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা করার জন্য একজন অধ্যাপককে পাঠাতে চান। তিনি এখান থেকে শিক্ষালাভ ক'রে ফিরে গেলে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার 'চেয়ার' সৃষ্টি করা হবে। এই ইচ্ছা দশ বছর আগে কোনো বিদেশীর মনে জাগে নি।

আজ বঙ্গবাণীর উৎস খুলে গেল। যারা তার ধারার সন্ধানে ছুটে এল, তাদের পরিবেশনের ভার আমাদের উপর রয়েছে। আমাদের আশা ও সাহস থাকলে ব্যাপারটি নিশ্চয়ই ঘটতে পারবে। আমরা সকলে মিলিত হ'য়ে সেই ভাবী কালের জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকব। অধ্যবসায়ে বাংলা যদি বিশেষ গৌরব অর্জ্জন করে, সে কি সমগ্র ভারতবর্ষের সামগ্রী হবে না? গাছের যে শাখাতেই ফুল ফুটুক্ সে কি সকল গাছের নয়? অরণ্যের যে বনস্পতিটি ফুলেফলে ভরে উঠল, যদি তারই উদ্দেশে মধুকরেরা ছুটে আসে, তবে সমগ্র অরণ্য তাদের সমাদরে বরণ ক'রে নয়। আজ বাংলার প্রাঙ্গণেই যদি অতিথিদের সমাগম হ'য়ে থাকে, তবে তাতে ক্ষতি কি? তাঁরা যে ভারতবর্ষেরই ক্ষেত্রে এসে মিলিত হয়েছেন, ভারতবাসীদের তা মানতে হবে। বঙ্গসাহিত্য আজ পরম শ্রদ্ধায় সেই মধুব্রতদের আহ্বান করুক্।

—বঙ্গসাহিত্য।

আধুনিক সাহিত্যে পরকীয়া ও পুনর্ভূবাদ

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

সকল নায়িকার মধ্যে পরকীয়া নায়িকাই যে শ্রেষ্ঠ তাহা উজ্জয়িনীর পাটলীপুত্র নগরীর গণিকা মণ্ডলীর অনুরোধে বাৎস্যায়ন নামধেয় কামসূত্রকার দ্বাবিংশ শতাব্দী পূর্বে প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন সুতরাং যে দেশে কামশাস্ত্র, তরুণবিনোদ, অনঙ্গরঙ্গ প্রভৃতি বিজ্ঞান সম্মত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে সে দেশে স্বিয়াভিন্না নায়িকা মণ্ডলীর পুনর্বিচার অনাবশ্যক। পরকীয়া নায়িকার শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। বিংশতি শতাব্দী পূর্বেও কামসূত্রকার পরকীয়া প্রকরণে এই শব্দটির যে ব্যাপ্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহের সামান্য কারণ আছে। পরকীয়া এবং পুনর্ভূতে যে প্রভেদ আছে তাহা বাৎস্যায়ন স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করেন নাই অথচ পুনর্ভূর কর্ত্তব্য কামসূত্রে সিশিষ্টরূপে উল্লিখিত আছে। রসশাস্ত্রে প্রতিপাদয়িতা কবিগণ আদিরস কাব্যের মর্য্যাদা অনুসারে বিভিন্ন মাত্রায় প্রয়োগ করিয়াছেন এবং চিকিৎসকের ঔষধের মাত্রার মত কবি-প্রযুক্ত আদিরসের মাত্রা কবির কাব্যকলা-কুশলতা নির্দ্দেশ করিয়াছে। রস শব্দ শব্দশক্তির প্রাচুর্যের জন্য বহুঅর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কোষকার বলিয়াছেন, "রসোগন্ধে রসোম্বাদে তিক্তাদৌ বিষরাগয়োঃ। শৃঙ্গারাদৌ দ্রবেবীর্যে দেহধাত্বম্বু পারদে।" ইতি বিশ্বে।

সাহিত্যে রসের পরিমাণ বা প্রকারভেদ কবির উপরে নির্ভর করে কারণ গদ্য বা পদ্য উভয় প্রকারের কথা সাহিত্য রচয়িতাই কবি আখ্যায় অভিহিত হইতেন, কিন্তু বর্ত্তমানকালে গৌড়ীয় ভাষা সাহিত্যে গদ্যকার শব্দই প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে সুতরাং সেই আখ্যাই গ্রহণ করিলাম। অতি প্রাচীনকাল হইতে পরকীয়ার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হইয়াছে, ধর্ম্মপ্রবণতা ও ভাবপ্রবণতার মাত্রানুসারে আমাদের দেশে কালভেদে পরকীয়া ভাবের প্রকাশ বা প্রচ্ছন্নের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। যুগে যুগে শিল্পের উন্নতি ও অবনতির ন্যায় মানবের চিন্তাশক্তির উন্নতি বা অবনতি তাৎকালীন সাহিত্যে রেখাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। প্রয়োজন অনুসারে বীররস একযুগের সাহিত্যে অপর সমস্ত রসকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, পরযুগে পরলোকতত্ত্ব ঐহিক কাম্যবস্তুকে ভাবসাগরে নিমগ্ন করিয়া দার্শনিক কুটিলতার আবরণ পরিত্যাগ করিয়াও সেই যুগের সাহিত্যে প্রতিপাদ্য বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব সাধন করিয়া গিয়াছে। তৃতীয় যুগে ভাবপ্রবুদ্ধ স্নিগ্ধ ভক্তিপ্রণোদিত অশ্রুধারা পুরুষের আসন অধিকার করিয়া মানুষের পবিত্রনাম ইতিহাসের পত্রে প্রবল রেখাঙ্কিত করিয়া গিয়াছে। চতুর্থ যুগে লালসার লোলজিহ্বা পুরুষ ও মাতৃত্বকে বিস্মৃতির অতল সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিয়া কবির মধুর কাকলীতে যৌনপ্রেমের ঘাতুর্য্য মণ্ডিত সঙ্গিতধারায় অনন্তরতি শুদ্ধ করিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে ইহাই তাহার বিশ্ব বিশ্রুত সাহিত্য পাপের একমাত্র ইতিহাস।

কোন্ যুগের সাহিত্য শ্রেষ্ঠ তাহা সাহিত্যসেবীর রুচি বিচার ও রুচিবিকৃতির উপর নির্ভর করে। বিশ্ববিদিত বেদান্তের বিশ্ববিজ্ঞানের পরিকল্পনা সুদূর প্রতীচ্যকেও মোহিত করিয়াছে। যে সমস্ত লুপ্তনামবিগতস্মৃতি বীর জন্মভূমির সহিত মাতৃত্বের একত্ব প্রতিপাদন করিয়া গোত্রাস্কবিষ্ণুদেবতার রক্ষার্থে হাসিমুখে আত্মবলি দিয়াছিল ভারতের লুপ্ত ইতিহাসের জীর্ণ পৃষ্ঠা এখনো কবিশিরোমণি রূপে সেই নামমালা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। অসীম অনন্তের দুরূহ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বগীতির সুমধুর তানলহরী শ্রুতিগত মনে করিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়াছিল তাঁহারাও ভাবপ্রবণ সাহিত্যের স্তরে স্তরে গীতকীর্ত্তি অমর করিয়া রাখিয়াছেন। সরসকাব্যকুঞ্জে কঙ্কণনূপুর ধ্বনির অন্তরালে যে অস্ফুট পদধ্বনি উদ্ভিন্না নায়িকার উদ্দেশে চন্দ্রালোকের অর্দ্ধদীপ্ত বনপথে প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করিত তাহার অস্পষ্ট পদাক্ষরেখা যুগে যুগে প্রেমভক্তিস্নেহের আবরণে ভগবৎপদাঙ্করেখা অনুসরণ করিয়াছে। বীররস ভাবরস ও দর্শনের সীমা অতিক্রম করিয়া সে ধ্বনি যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রেমের পিপাসিদিগকে তৃপ্ত করিয়াছে। বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য পরিত্যাগ করিয়া চিরদিনই জনসমাজ

মানবকল্পনাপ্রসূত এই স্বপ্নরাজি সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। সেই জন্যই সাহিত্যসেবী মাত্রেই কবি, রচনা মাত্রেই কাব্য, কাব্যকলাকুশলতাই কবির মর্য্যাদা আর জনসংঘের চিত্তবিনোদনই কবির ধর্ম্ম।

মানবচিত্তবিমোহিনী যে শক্তি কবি অর্জ্জন করেন তাহা স্বোপার্জ্জিত, উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জ্জিত নহে। যুগধর্ম্মে কলাকুশলতার কোন্ প্রকরণ জনসংঘের চিত্তাকর্ষণ করিবে তাহা কবিকুলের বিচার্য্য; তাহা তাঁহার মানসিক শক্তির পরিচায়ক এবং তাঁহার কাব্যকলাকুশলতার পরিজ্ঞাপক। জনসংঘের কোন্ আকাঙ্ক্ষা কলুষিত কোন্ আকাঙ্ক্ষা বা পবিত্র সকল সময়ে সে বিচারশক্তি জনসংঘের থাকে না। মূঢ় মানসিক শক্তি বিশিষ্ট কবি কেবল সময়োপযোগী রচনায় সর্ব্বদা প্রবৃত্ত হন না, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের উপর লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা কাব্যালোচনা করিয়াছেন সাহিত্যের চিরন্তন মার্গে তাঁহাদের পদরেখা চিরস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান জনসমাজ পবিত্র বা কলুষিত প্রকৃতিপ্রস্ত কিনা, সময়োপযোগী রচনা কবিকুলের একমাত্র উদ্দিষ্ট বস্তু কিনা যুগভেদে মতভেদে তাহার পার্থক্য ঘটিয়াছে কিন্তু রচনা রীতির বৈশিষ্ট্য সর্ব্বত্র সমানভাবে বিদগ্ধসমাজে আদৃত হইয়াছে। যে শাস্ত্রকার প্রবৃত্তি দমনে অসমর্থা নারীর ধর্ম্মশাস্ত্রে পুনর্ভূ নামাঙ্কন করিয়াও তাহার গর্ভজাত পুত্রকে পবিত্র পুত্রত্ব পদ প্রদান করিয়াছেন পুনরুক্তে সেই শাস্ত্রকারই সেই পুত্রকে হীন জারজ আখ্যা প্রদান করিতে বিরত হন নাই। রসবিদ্ প্রশংসিত পরকীয়া নায়িকা কাব্যে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে গোমুত্র মিশ্রিত দুগ্ধের উপমা লাভ করিয়া হেয় হইয়াছে। সুতরাং পরকীয়া ও পুনর্ভূর ঔচিত্য বিচার প্রতিযুগে জনসমাজের প্রবৃত্তি ও লালসার উপর নির্ভর করে এবং কাব্যকলায় সেই বিচারের স্থান কবিকুলের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অন্তরালে অবস্থান লাভ করিয়াছে।

দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ও অনধিগম্য লাভের লালসা বন্য হইতে কলাস্ত পর্য্যন্ত জনসমাজের প্রতিস্তরে ইতিহাসের প্রতিযুগে বিকশিত হইয়াছে। আকাঙ্ক্ষা ও লালসা মাত্রাভেদে ও আকারভেদে প্রতি কবির প্রতি কাব্যের প্রতিপাদ্য বস্তু। তাহার মাত্রা, তাহার আকার ঔচিত্য বিচারের উপর নির্ভর করে। বর্ত্তমান যুগে সে বিচারের আবশ্যকতা আছে কিনা তাহারই আলোচনা আবশ্যক। রচনা কেবল সময়োপযোগী হওয়া আবশ্যক কিনা, রচয়িতার ভবিষ্যৎ দৃষ্টির আবশ্যক কিনা সে ঔচিত্য বিচার কবিমণ্ডলীর কর্ত্তব্য; সে কর্ত্তব্য কর্ত্তব্যানুরোধে আমাদের দেশে প্রতিপালিত হইয়াছে কিনা তাহার বিচারকও জনসমাজ। ঔচিত্য বিচার করিতে হইলে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যুগের প্রয়োজন স্মৃতিপথে রাখিয়া তবে বিচারকের আসন গ্রহণ করা উচিত। বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজনীয়তা কি? রসসিক্ত রসসাহিত্যে কামনা প্রলুব্ধ চিত্তের প্রসাধন না পাশ্চাত্যভাবপ্রণোদিত দেশীয় সমাজের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন? বঙ্গদেশীয় হিন্দুসমাজ এখনও উভয় পন্থার মধ্যবর্ত্তী কিন্তু মধ্যস্থান অদ্যাপি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। উভয় দিকে চরম পন্থীদিগের মধ্যে বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে পক্ষপাত পথিকের অভাব নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা রীতিনীতি ও ভাব উনবিংশ শতাব্দী হইতে আমাদের সমাজে যে বিদ্রোহ-বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার গতি এখনও স্থির হয় নাই। একদিকে বিশিষ্টভাবে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন চরমপন্থীর প্রকাশ্য সমাজদ্রোহ অপরদিকে অন্তর্মনস্ক মৃদুপ্রতিশীল অথচ প্রকাশ্যে দ্বিতিশীল চরমপন্থী হিন্দুর খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশশতাব্দীর সমাজশাসনের অভিনয়, প্রতিদিন প্রতি পদবিক্ষেপে আমাদিগের নয়নগোচর হইতেছে। যে সমাজকে সহস্র সহস্র বর্ষের বিদেশীয় আচরণ, আচারে ব্যবহারে ও চিন্তায় ধরিয়াকারে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই, সে সমাজকে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মূঢ় বন্ধন ও শাসন কাব্যের বহুসীমার মধ্যে সংবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, সে সমাজকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য চিন্তার স্রোত মুক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্য ভাবানুপ্রাণিত শিক্ষিত ও বিদগ্ধসমাজে প্রাচীনশিক্ষা ও রীতিনীতির প্রতি যে অবজ্ঞাসূচক পরিহাসের ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, প্রকৃত শিক্ষার বিস্তারের সহিত তাহার হ্রাস সাহিত্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। যে সমাজশাসনের দৃঢ়বদ্ধ গণ্ডী একদিন খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল ও সনাতনধর্ম্মের অধিষ্ঠানের উপকরণ করিয়াছিল, যে সমাজশাসনে

স্বাধীনচিন্তা প্রকাশের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল সেই সমাজশাসন নগরে ও পল্লীতে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমরা প্রাচীন পরিত্যাগ করিয়াছি কিন্তু নবীন গঠন করি নাই অথবা অবলম্বন করি নাই, মৃতবন্ধ অশ্বের ন্যায় আমাদিগের সামাজিক গতি অসংযত ও অপ্রতিহত। এই উদ্দাম স্বেচ্ছাচারের ভাব সাহিত্যের রীতি অনুসারে সাময়িক সাহিত্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে ভারতবর্ষে স্বাধীন চিন্তাশক্তির নবউন্মেষের যুগের পরিচয় যুগসাহিত্যে লিপিবদ্ধ থাকিবে; তাহা নিরাকরণীয় নহে।

আমরা কোন্ পথ অবলম্বন করিব তাহা স্থির করি নাই, যে স্বেচ্ছাচার ও ভবিষ্যৎ চিন্তার অভাব বিংশতি শতাব্দীর প্রথম পাদের যুগসাহিত্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহার অস্তিত্বই স্বেচ্ছাচারের প্রকৃষ্ট প্রমাণ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্বৈরাচার বা স্বেচ্ছাচার হিতকর কিনা? তাহা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের প্রকৃষ্ট মার্গ কিনা? তাহা বিচার করিয়া সে মার্গ বা সে বিচার পদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই। ভবিষ্যৎ প্রগতি সম্বন্ধে ভারতের ইতিহাসের প্রতিযুগে মতদ্বৈধ ছিল এখনও অবশ্যম্ভাবী। দেশে দেশে যাহা প্রচলিত, যাহা সেই যুগের অবলম্বিত আচাররূপে সমাজে সম্মানিত সমাজের অধিকাংশ লোকের পক্ষে তাহা অবলম্বন অনিবার্য্য। যে সকল দেশে কৌলিক প্রথা ছিল না, বয়ঃক্রমের কুলমর্য্যাদার পরিবর্ত্তে ধনমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এখনও আছে সে সকল দেশের সামাজিক অভিব্যক্তিও অতিধীর, চঞ্চল গতিশীল নহে। সুতরাং আমরা যে পন্থা অবলম্বন করিব সে মার্গ চিরক্ষুণ্ণ বা নবক্ষুণ্ণ তাহা জনসংঘের মতের উপরে নির্ভর করে।

সকল দেশে সকল সমাজে সভ্য বা অসভ্য মানব সমাজবদ্ধ, আত্মরক্ষা বা সঞ্চিতধনরক্ষা মানবকে সমাজবদ্ধ হইতে বাধ্য করিয়াছে এবং সমাজবদ্ধ মানবের একমাত্র দৃঢ় বন্ধন আত্মত্যাগ। আত্মত্যাগ ব্যতীত কোনদিন কোনও দেশে সমাজবন্ধন স্থায়ী হয় নাই। বিবাহ এই সমাজ বন্ধনের ফল। বিধাতার সৃষ্ট পশুসমাজে বিবাহ বন্ধন চিরস্থায়ী নহে কিন্তু মানব সমাজে অতি প্রাচীন কালেও নরনারী বিবাহবন্ধনের মর্য্যাদা বুঝিয়াছিল। দেশ ভেদে ও কালভেদে সে বিবাহবন্ধনের মাত্রার তারতম্য ঘটিয়াছে—ভারতবর্ষেও ঘটিয়াছে। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ও নিবন্ধ তাহার প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। সমাজ বন্ধনের শিথিলতা নিবারণ করিবার জন্য মানব সর্ব্বদা বিবাহের বন্ধন দৃঢ় করিবার চেষ্টাই পাইয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত শিথিল বিবাহের দেশে সে বন্ধন দৃঢ় করিবার প্রচেষ্টা দুর্ব্বল হয় নাই। মলয়ালম প্রদেশে নায়র সমাজে যে শিথিল বিবাহবন্ধন প্রচলিত আছে, নায়র কুমারীগণের স্বেচ্ছানুমোদিত শিথিল বিবাহ বন্ধন ও অবাধ অসংযত যৌনসম্মিলনপ্রবাহ রোধ করিবার জন্য নায়র সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই এক সময়ে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন; রাজাদেশে লিপিবদ্ধ ব্রাহ্মবিবাহবিধি বা পার্শিবিবাহ বিধির ন্যায় নায়র বিবাহ বিধিও সেই চেষ্টার ফল। রাজবিধির বিধানানুসারে নায়র যুবা এখন প্রকাশ্যে পিতৃত্ব স্বীকার করিতে পারে। এই সকল রাজবিধি সামাজিক চেষ্টা ও আন্দোলনের ফল, তাহা চিন্তাশক্তির পরিচয় ও সমাজ শাসনের অস্তিত্বের নিদর্শন।

আমাদের দেশে এই খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর চতুর্থপাদে যে চিন্তা প্রবাহের রেখা সাহিত্যের ইতিহাসে অঙ্কিত হইয়া যাইতেছে তাহা কি সুচিন্তিত সমাজ সংস্কার পদ্ধতির বা জনসংঘের অনুমোদিত মতের পরিচায়ক? যাঁহারা এখনও হিন্দু সমাজের যেকোনও যাঁহাদিগের অনুমোদন ব্যতীত হিন্দুর সামাজিক কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তাঁহাদিগের মত যুগসাহিত্যে প্রকটিত হয় নাই। চরমপন্থীরা বলিতে পারেন যে, সে মত অশিক্ষিত প্রবুদ্ধ স্থিতিশীল সম্প্রদায়ের মত, কিন্তু সমাজ সেই সম্প্রদায় লইয়া গঠিত। স্বাধীন

চিন্তাশীল কোনও লেখক বা ব্যক্তি তাঁহাদিগের মতের বিরুদ্ধে এই বিপ্লববাদের যুগেও প্রায়বিস্তৃত হিন্দু সমাজের গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান করিতে অসমর্থ।

যুগ সাহিত্যে যে সমাজবিরুদ্ধ প্রেমাভিনয়ের বিকাশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহা হিন্দু সমাজের অনুমোদিত নহে। পরকীয়া বা পুনর্ভূ কোন দিন বঙ্গদেশীয় হিন্দু সমাজে গৃহীত হইবে কি না তাহা বিচার সাপেক্ষ! সে বিচারের অপেক্ষা সাহিত্যসেবীর পক্ষে কর্ত্তব্য কি না তাহাও বিচারসহ। উভয় পক্ষের চরম পন্থীরা বলিতে পারেন যে সমাজের পথে পরিবর্ত্তন হইবে বা হইবে না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে বিচার হয় নাই এবং সে বিচার নিতান্ত আবশ্যক। মনু বা যাজ্ঞবল্ক্যের বর্ণ বিভাগ থাকিবে কি না, তাহা থাকা উচিত কি না অথবা তাহার আস্তিত্ব সম্ভব কি না সে কথা ভবিষ্যতের হস্তনিহিত। অতীত বা বর্ত্তমান সে গতি নির্দ্দেশের শক্তি রাখে না। কিন্তু বর্ত্তমান সর্ব্বদা সর্ব্বত্র যুগসাহিত্যে ভবিষ্যৎ বিচার করিয়া বর্ত্তমানের পথ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা প্রচলিতসমাজমতের বিরুদ্ধবাদীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু প্রবল বা দুর্ব্বল বিরুদ্ধবাদ সত্ত্বেও জন সঙ্ঘের অধিকাংশের মতই সমাজের মত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে এবং ইতিহাসের পত্রে পত্রে, প্রতি দেশে সে সামাজিক মতের রেখা ভূচরূপে অঙ্কিত। পুনর্ভূ একদিন সমাজে প্রচলিত ছিল। পুনর্ভূ নারিরা বিধবা বিবাহের অন্তরালে অথবা বিবাহ বন্ধনের অভাবে সমাজের গোচরে প্রকাশ্যভাবে গৃহীত হইবে কি না তাহা সমাজের বিচারের বস্তু। সমাজ সে বিচার করিয়াছেন কি না তাহা প্রকাশ নাই। প্রচ্ছন্না পরকীয়া লোভনীয়া হইলেও প্রকাশ্যে গ্রহনীয়া কি না সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। প্রকাশ্যে তাহাকে গ্রহণ করিলে বিবাহ বন্ধন অনাবশ্যক হইয়া উঠে। অপ্রচ্ছন্না পরকীয়া প্রায় সামাজ শ্রেণীভুক্তা সুতরাং তাহার বিচার বা গ্রহণের প্রস্তাব দেশের ও দশের বিচার করা উচিত। এই ঔচিত্য বিচার কেবল উচ্ছৃঙ্খল কথাসাহিত্য দমনের জন্য আবশ্যক নহে সমাজ শাসনের জন্য এবং লোক শিক্ষার জন্য ও আবশ্যক। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সাহিত্য ভবিষ্যতের পথনির্দ্দেশক। আধুনিক গৌড়ীয় সাহিত্যের প্রারম্ভের যুগে আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজ সেই পথেই চলিয়াছে। এ পথে সমাজ মার্গ বিচ্যুতি মার্জ্জনীয়। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব প্রতিভা বিকশিত যুগে দুইটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে যে চিন্তা স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহার গতি মন্দ হইলেও রুদ্ধ হয় নাই। দ্বিতীয় স্তরের চিন্তাস্রোত যে ভাববিপর্য্যয়ের সূচনা করিয়াছে, তাহার গতি ভীতিপ্রদ, তাহা বহু প্রাচীন নিদর্শন ও সৃষ্ট বস্তু ধ্বংস করিয়াছে – কিন্তু নূতন গঠন করিয়াছে কি! প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবের সংঘর্ষে সাহিত্য ও সমাজে যে প্রলয়ের প্রারম্ভ দেখা দিয়াছে তাহার অবাধ গতি সাহিত্য বা জাতীয়তার অস্তিব্যক্তির পথে শুভ ফলপ্রদ নহে।

আমি কি করিব—আমি কোথায় যাইব—তাহা স্থির করিবার শক্তি আমার থাকিলেও সকল সময়ে আমি তাহা স্থির করিতে পারি কি? পদে পদে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, সমাজশাসন, লোকলজ্জা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি আমাকে আমার নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে বিচলিত করিয়া দেয়। তাহার মূল কারণ মানবসমাজবন্ধনের মূলমন্ত্র। স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগ ব্যতীত যে সমাজ বন্ধন অসম্ভব মানবমনে অন্তর্নিহিত সেই প্রকৃত ঊত্তরাধিকারগত ভাব, যে কার্য্যে আত্মপ্রসাদ বা চিত্ত প্রসাদ লাভ করি, সেই কার্য্যে আসিয়া বাধা দেয়। ব্যক্তিগত আত্মপ্রসাদ ও চিত্তপ্রসাদ সমাজবদ্ধ মানবের পক্ষে সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু তাহা এতই লোভনীয় ও চিত্তাকর্ষক যে সে লোভ সম্বরণ করা সর্ব্বদা মানবের পক্ষে সম্ভব নহে। ভবিষ্যতের উপর দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া সে লোভের প্রলয় মেঘরা কাব্যকলাকুশল কবির কর্ত্তব্য কি?

লণ্ড-ভণ্ড

[শ্রীস্নেহশীলা (বসু) চৌধুরী]

মিঃ চৌধুরী স্তব্ধকণ্ঠে কহিলেন—বেশ করলে বউমা। এইবার, ও যাক্ বাঙ্গালা কাগজের আফিসে, গিয়ে হৈ চৈ করুক, কাল থেকে আর মুখ দেখাতেই পারব না। যে দেখবে, যে শুনবে—সে-ই বলবে—কেন ছাড়া হ'ল? সাহেবরা শুনলে ত আগুন হ'য়ে উঠবে।

সুমতি কাঁচিখানা রাখিয়া কি একটা লেখা পড়িতেছিল, অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল—বাবা, সাহেবরা ঢের বেশী ক্ষমাশীল—আগুনও হবে না, আপনার ক্ষতিও করবে না।

নাঃ! করবে না! তুমি ত সব জান? কিসে বুঝলে করবে না?

কেন বাবা? তাদের আচরণ দেখলে কি তাই বোধ হয় না। আপনিই ত এক সময় কত কাণ্ড করেছেন, ক'জনে মিলে সাহেবদের তাড়াতে কি কম চেষ্টাটাই করেছিলেন? তাও ভুলে যখন আপনাদেরই বড় বড় চাকরী দিয়ে বসিয়ে রেখেছে, তাদের ক্ষমাগুণ যে অনেক বেশী, তা কি আজও বুঝতে পারলেন না! তাদের জন্য ভাববেন না বাবা, তারা যদি এ খবর পায় যে একজন অনেরিটিয়ারকে সম্মন পেয়েও আপনি ধরিয়ে দেন নি, ছেড়ে দিয়েছেন,—ক্ষমাও না করে যদি, উপেক্ষাই করবে-বাবা—এ নিয়ে তারা মাথা ঘামাবে না। তারা আপনাদের বড় জোর উপেক্ষাই করবে, আর কিছু না।—সুমতি কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া যেন লজ্জিত হইয়াই চলিয়া গেল।

মিঃ চৌধুরি কি ভাবিতেছিলেন, বলা যায় না। মিনিট পাঁচেক পরেই বিকাশ ঘরে ঢুকিয়া বলিল—বাবা এখানে বসে যে?

বস বিকাশ! বিকাশ, যৌবা রাজ্যের বাঙ্গালা কাগজগুলো পড়েন, সেটা কি ভালো?

বিকাশ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—আমি বারণ করি, শোনে না।

মিঃ চৌধুরি গম্ভীরভাবে বলিলেন—হুঁ। কাগজ আনে কে? জমাদার?

বিকাশ বলিল—সেই আনে।

আচ্ছা, তাকে আমি বারণ করছি। তুমিও দেখো—বুঝলে?

বিকাশ বেখিবে প্রতিশ্রুতি দিতেই মিঃ চৌধুরি উঠিয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন। সুমতি যদি কেবলমাত্র পুত্র-বধূ হইত, মিঃ চৌধুরি তাহার যে কি শাস্তিবিধান করিতেন বলা যায়, কিন্তু সুমতি ছিল এই বাড়ীর গৃহিণী, সুমতি ছাড়া বিকাশকে কল্পনা করাও যেমন অসাধ্য ছিল, মিঃ চৌধুরীরও সেবাপরায়ণা হাস্যময়ী এই পুত্র বধূটিই অনেক খানিই ছিল। তাই সুমতি অতি অল্পেই নিস্তার পাইল।

বাঙ্গালা কাগজ বন্ধ হইল, কিন্তু সুমতি যে তাহা লক্ষ্য করিয়াছে এমন বোধ হইল না। প্রকৃতপক্ষে সে কোন দিনই বাঙ্গালা সংবাদপত্র পড়িবার অবকাশ পাইত না। জমাদার প্রত্যহ দুই তিনখানি কাগজ আনিয়া তাহার টেবিলের উপর রাখিয়া যাইত, ভৃত্য যথাসময়ে ঝাড় মোছ করিতে আসিয়া সেগুলিকে নীচের গুদাম ঘরে জমা করিয়া আসিত।

প্রথম দুই তিনদিন মিঃ চৌধুরী কিঞ্চিৎ অস্বস্তিতেই কাটাইয়াছিলেন, কিন্তু সুমতির কোনরূপ ভাবান্তর না দেখিয়া আবার তাঁহার পূর্বভাব ফিরিয়া আসিল।

এই সময়েই একদিন, পৌষের প্রভাতে 'হনার্স লিষ্টে' মিঃ চৌধুরী সি-আই-ই ও তদীয় পুত্র বিকাশ রায় বাহাদুর উপাধি ভূষিত হইলেন, জানা গেল

সুমতি বিকাশকে বলিল—কিগো রায় বাহাদুর?

বিকাশ তাহার কেশের গুচ্ছের মধ্যে হস্ত চালনা করিয়া বলিল—রায় বাহাদুরনী! হুকুম কর?

সুমতি হাসিয়া বলিল—আমি কেন রায় বাহাদুরনী হতে যাব। খটা নিজের ব্যবহারের জন্য তা জান? পার্শোন্যাল ইউজ, সেখাই আছে।

মিঃ চৌধুরী পুত্রকে ডাকিয়া নিভৃতে কহিলেন—একটা গার্ডেন পার্টি দেব, মনে করছি;

বিকাশ সোৎসাহে কহিল—কবে ?

মিঃ চৌধুরী বলিলেন—আসছে হপ্তায় হতে পারে। লাট সাহেবও ততদিন এসে পড়বেন।

বিকাশ সুমতিকে বলিল—শুনেছ, বাবা তোমায় বলেছেন একটা গার্ডেন পার্টি দেওয়া হবে।

সুমতি ব্যস্ত ছিল। 'বেশ' বলিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

রাত্রে নবীন রায় বাহাদুর পত্নীর কণ্ঠ ষ্টেইন করিয়া কহিল—দেখ, বাবা বলছিলেন, কনকটে আগের দিনই আনিয়ে নিতে হবে। সে থাকলে অনেক কাজ করতে পারবে। তাই বাবা বলছিলেন, তুমি তাকে একখানা চিঠি লিখে দিও, যাতে সে আসছে বৃহস্পতিবারে এসে পড়ে।

সুমতি বলিল—কেন তুমি ?

নবীন রায় বাহাদুর কহিল—আমি একলা পারবো কেন ? যেমন তেমন গার্ডেন পার্টি নয়, স্বয়ং লাট সাহেব থাকবেন, সব বড় বড় সাহেব মেম আসবেন, আমি একলা কতদিক সামলাব ?

লিখতে হয় তুমি লিখো, আমাকে কেন ?

আচ্ছা গো আচ্ছা। আমিই লিখবো এখন। তোমারও অনেক কাজ আছে সেদিন—বুঝলে ?

সুমতি সাড়া দিল না। বিকাশ সাদরে তাহাকে বুকের কাছে টানিতে গেল, সুমতি অন্যদিকে মুখ করিয়া বলিল—অনেক রাত হয়েছে—বড্ড ঘুম পেয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আজ সেই দিন। আজ স্বয়ং বঙ্গের লাটজী মিঃ চৌধুরী সি-আই-ই'র গৃহে অপরাহ্ন-ভোজনে উপস্থিত হইবেন, বঙ্গের বহু বিখ্যাত ইংরেজ নর-নারী উপস্থিত থাকিয়া যাহাতে উহার "আমোদটা" সম্পূর্ণ ও মনোরম হয় তাহার চেষ্টা করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আজ সেই দিন। দু দশজন বাঙ্গালীও সস্ত্রীক আসিবেন সন্দেহ নাই। মিঃ চৌধুরীর গৃহটি আজ প্রভাত হইতে সুসজ্জিত পতাকায়, পত্র পুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। সামনের বাগানটিরই বা কি শোভা। কন্ট্রাক্টর হোয়াইট সন্স ফটকের পার্শ্বে দুদিনের জন্য কাঠ ফলক বসাইয়া দিয়াছে "ডেকরেসানস্ বাই হোয়াইট সন্স, চৌরঙ্গী কলিকাতা।"

বিকাশের নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই, বেচারা একেলা —সব দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। যদিও আধুনিক প্রথায় সমস্তায়োজন হইতে সব ইংরাজ খানসামা, সমস্তই ঠিকাদারীতে চলিয়া যায়, তবুও গৃহস্বামীর যে সব দিকে সুনজর রাখা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, ইহা বোধ করি সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য ! পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, সুমতি স্ত্রীলোক, সমস্ত দায়ীত্ব রায় বাহাদুরের স্কন্ধে। গত দুইদিন বিকাশ বাড়ীতে কেবল নামমাত্র আহারাদি করিয়াছে, রাত্রেও সে যখন শয্যাশ্রয় লইয়াছে, তখন সুমতি গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন, দুইদিন দুইরাত্রি সাক্ষাৎ হয় নাই বলিলেও চলে। যদিও বা দু'একবার হইয়াছে, সে ক্ষণিকের জন্য, তার ভোজন-কক্ষে, পিতার সমক্ষে।

আজও বিকাশ সেই প্রত্যূষে দুই পেয়ালা চা, গোটা দুই ডিম ও একটুকরা রুটী খাইয়া বাহির হইয়াছে, এখনো ফিরে নাই। ব্রেকফাষ্টটি কোন রেষ্টুরাঁয় করিয়া লইবে, বলিয়াই গিয়াছে। মিঃ চৌধুরীও বাহিরে গিয়াছিলেন, তিনি অবশ্য বাড়ীতেই ব্রেক ফাষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন,বেলা আন্দাজ দুইটার সময় ফিরিয়া প্রথমেই সন্ধান লইয়া জানিলেন, বিকাশ তখনো ফিরে নাই। মিঃ চৌধুরী এই সংবাদে যে অত্যন্ত ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, তাহা না বলিলেও চলে। সময় আসন্ন, সাড়ে তিনটায় সম্ভ্রান্ত অতিথিগণ উপস্থিত হইবেন, সাড়ে দুইটা হইয়া গেল, এখনও তাহার দেখা নাই। ছেলে ছোকরাদের দায়ীত্ব জ্ঞান এমনই বটে !

কিন্তু সে যে কোথায় গিয়াছে তাহাও জানা নাই। নতুবা ফোন্ করিয়াই হোক্ বা লোকের দ্বারায় হোক্ খোঁজ লওয়া চলিতে পারিত, মোটরও গৃহে নাই, তিনিও সঙ্গে গিয়াছেন ! হঠাৎ মিঃ চৌধুরীর মনে একটা কথা বিদ্যুতের মত খেলিয়ে গেল। সুমতি বিকাশকে পথে এই সবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলে নাই ত ? আশ্চর্য্য নয়, সে যে মেয়ে, সব পারে ! আবার তখনি মনে হইল সে না, বিকাশ এত কাঁচা ছেলে নয়,সে ও-সবে ভুলিয়া এত মান মর্য্যাদা সব হারাইবে না, কখনই না ! তাহাকে রায়

বাহাদুর করার উদ্দেশ্যেই তাই। বাঙ্গালা কাগজগুলা ত এত গালাগালি দিল, কিন্তু বলিতেও ত কসুর করিল না, কিন্তু কৈ এতবড় পাখা চাপ্‌টি ধরিতে পারিল? ওরে হতভাগারা, তোদের সব কটাকে একহাটে বেচিয়া আর একহাটে কিনিতে পারে! তাই যদি না পারিবে, তবে আর কিসের কৃতীত্ব!

সে ত হইল, কিন্তু বিকাশের ব্যাপার কি? পথে বিপদ আপদ হইল নাকি? নাঃ তাহা হইলে এতক্ষণ খবর আসিত। তবে কি—সত্যই—? বিকাশটা, সত্য কথা বলিতে কি, একটু—, আর বৌমা-টি হচ্ছেন বেশ অবয়বতী। ফলে যা হয়—তাই। তাই বলিয়া আজ, আজ, না বিকাশ এতবড় বিশ্বাসঘাতক হইবে না।

মিঃ চৌধুরী উত্তেজিত ভাবে বাগানের মধ্যেই পাদ-চারণা করিতেছিলেন, আর মুহুর্মুহু ঘড়ি দেখিতেছিলেন, আড়াইটা বাজিয়া গেল, মিঃ চৌধুরী অস্থির বোধ করিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহার জানা ছিল, পেলিটি ঠিক সময়েই আসিয়া হাজির হইবে, কনসার্টওয়ালারাও অগ্রিম লইয়াছে দেশী সানাইওয়ালারাও বায়না লইয়া রসিদ লিখিয়া দিয়াছে, সময়মত আসিবেই—কিন্তু মিঃ চৌধুরীর মনে হইতেছিল, বুঝি কেহ আসিবে না। সুমতি বিকাশকে উত্তেজিত করিয়া সমস্ত বন্ধ করিয়া ফেলিয়া পরিয়া পড়িয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধের দেহের রক্ত মাথায় চড়িয়া গেল।

ঠিক এই সময়েই ভেঁপু বাজাইয়া বিকাশের মটরগাড়ী ফটকে ঢুকিল। মিঃ চৌধুরী সহর্ষ চীৎকার করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন—সব ঠিক বিকাশ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমার এত দেরী কেন—বাবা?

ফটোগ্রাফারের ওখানে দেরী হ'য়ে গেল। তাদের বাড়ীতে বিপদ...

আমি জানি। ওসব বাঙ্গালী বেটাদের কর্ম্মই ঐ। সেইকালেই তোমায় বলেছিলুম, সাহেব বাড়ীতে বলে এস। তাহলে ওটা হবে না?

বিকাশ বলিল—না হয়েছে। তাঁরাই আসবেন।

মিঃ চৌধুরী বলিলেন—ঠিক ত? আর বৌমা কোথা গেলেন?

বিকাশ সবিস্ময়ে বলিল—কে—সুমতি?

মিঃ চৌধুরী উত্তর দিতে পারিলেন না। বিকাশ সন্দিগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসিল—সুমতি কোথা?

তোমার সঙ্গে যান নি?

আমার সঙ্গে! কৈ না!

সে কি! মিঃ চৌধুরী নিকটস্থ চেয়ার খানিতে বসিয়া পড়িলেন। বিকাশ লাফাইয়া লাফাইয়া উপরে আসিয়া সমস্ত ঘর খুঁজিল—সুমতি নাই। চাকর বাকরকে প্রশ্ন করিয়াও সদুত্তর পাইল না। সকলেই বলিল, তাহাদের ধারণা, বৌমা তাহাদের সঙ্গেই বাহির হইয়াছেন।

বিকাশের পা টলিতে লাগিল, কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। গুর্খা দারবানটিকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা বাদ করিতেছে, মিঃ চৌধুরী ঘিতলে আসিয়া বলিলেন—কাল তোমার সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তা হ'য়েছিল কি, কোথাও যাবার কথা টথা।

কিছু না। আমি যখন কাল বিছানায় এসেছি সে তখনই ছিল না।

তাইত—বিকাশ!

হঠাৎ বিকাশ বিছানার উপর কি একটা কাগজের মত দেখিয়া ছুটিয়া তুলিয়া পড়িতে লাগিল, মিঃ চৌধুরী জিজ্ঞাসিলেন—চিঠি না-কি, বিকাশ? বৌমার?

না। বলিয়া বিকাশ পড়িতে লাগিল এবং পড়া শেষ করিয়া ধপাস করিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িল। মিঃ চৌধুরী পত্রখানা লইয়া পড়িলেন।

বলিলেন—বৌমার ভাই দেখছি! তাই ত বলি ছোকরা এল না কেন? "স্বদেশীতে জীবন দিতে" যাচ্ছেন। নন্‌সেন্স!

বিকাশ বিস্ফারিত নয়নদ্বয় তুলিয়া পিতার মুখের পরে স্থাপিত করিতেই চৌধুরী বলিলেন—জানেন, দুদিন একটু আটকে রাখবে—বৈ ত নয়, একটু না হয়, কষ্টই হবে, নামটা ত বেরিয়ে যাবে, দু' দিন ঘুরেই আসা যাক্—ষ্টুপিড্ ছোকরা!

সুমতি ভাই বলিয়াই হোক, অথবা সেই গৌরবর্ণ ক্ষীণ পুষ্ট কনকের স্নেহ প্রীতি স্মরণ করিয়াই হোক, বিকাশ

অত্যন্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল, একটিও কথা না বলিয়াই বাহিরে আসিল। অমাদার বারান্দার প্রভুর আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছিল, বিকাশ তাহারই উদ্দেশে কহিল—আর্ডি মোটর মাঙ্গাও।

মিঃ চৌধুরী ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তিনটা বাজিতে দশ মিনিট আছে; উদ্বেগাকুল কণ্ঠে কহিলেন তুমি এখন আবার বেরুবে নাকি বিকাশ?

বিকাশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

মিঃ চৌধুরী বলিলেন—এখন না বেরুলে...কোথায় যাবে তুমি?

আগে লালবাজার যাব, সম্ভবতঃ কনকদের সেখানেই সুমতি গেছে। সেখান থেকে তাকে সঙ্গে করেই ফিরব।

জমাদার সেলাম করিয়া জানাইল, মোটর প্রস্তুত, বিকাশ ছুটিয়া গাড়ীতে উঠিবে, মিঃ চৌধুরী তাহার হাতটি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—বাবা, আধঘণ্টা মাত্র...

বিকাশ বলিল—সুমতিকে পাই ত দশ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়ব আমি।

মোটর নক্ষত্রবেগে বাহির হইয়া গেল।

মিঃ চৌধুরী কাতর অবসন্নের মত বসিয়া পড়িলেন। পেন্সিটি মোটর চড়িয়া হাজির হইল; দেশী সানাই ওয়ালারাও আটপৌরে পোষাক ছাড়িয়া সাজ-গোজ করিয়া দেখা দিল, ফটোগ্রাফার বাবু ট্যাক্সি হইতে নামিয়া জিনিষ পত্র লইয়া স্থান নির্দ্দেশে লাগিয়া গেলেন—তিনটা পঁচিশ মিনিটের সময় একসঙ্গে অনেকগুলি মোটর-গাড়ী মিঃ চৌধুরীর ফটকের সামনে দাঁড়াইল। ক্রমে সপত্নিক বঙ্গেশ্বরও হাসিমুখে মিঃ চৌধুরীর করমর্দ্দন করিয়া উদ্যানমধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

কনসার্ট আরম্ভ হইল; প্রথমে বিলাতি গৎ বাজাইয়া তাহারা এদেশীয় গৎ ধরিল। স্বয়ং বঙ্গেশ্বর লাঠির উপরে চুপিচি বসাইয়া তালে তালে পা ঠুকিতে লাগিলেন। বাগানটি গম্ গম্ করিতে লাগিল। একখানির পর আর একখানি দেশী গৎ সুরু হইল, হঠাৎ ভূত দেখার মত বাদ্যগণের অঙ্গুলি বন্ধ হইয়া গেল, অতিথিগণ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, ধ্বজা পতাকা হস্তে মূর্ত্তিমান বিদ্রোহের মত দীর্ঘ দীর্ঘ একদল বালক ফটকে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যস্থলে এক সৌরাষ্ট্রী যুবতী!

বঙ্গেশ্বরের পা টলিয়া গেল, মিঃ চৌধুরী মৃতকল্পের মত বসিয়া রহিলেন।

যুবতি মিঃ চৌধুরীর সম্মুখীন হইয়া কহিল—আমার স্বামী?

উত্তর না পাইয়া যুবতী পুনশ্চ কহিল—আমার স্বামী?

মিঃ চৌধুরী রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—এখানে তোমাদের কি দরকার?

আমার স্বামী! তাঁর কাছে বিদায় নিতে এসেছি। তিনি কোথায়?

পুলিসের বড় সাহেবও উপস্থিত ছিলেন, তিনি বঙ্গেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া বোধ করি আদেশ প্রার্থনাই করিতেছিলেন, বঙ্গেশ্বর নীরব, তিনি একবার নবাগত যুবতীটির পানে একবার মিঃ চৌধুরীর পানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। পুলিস সাহেবের ইচ্ছা, এখনি বাহিরের কনেষ্টবল দুইজনের দ্বারা এই ক'টা বিদ্রোহীকে বন্দী করা, কিন্তু স্বয়ং লাটসাহেব উপস্থিত, তাঁহার সম্মুখে আপন ইচ্ছায় কোন কাজ করা সম্ভব নয়, তবে বাহির হইলে, পথে তাঁহার অপ্রতিহত প্রতাপ! উহারা বাহির হোক, তখন বুঝিবে।

সুমতি বলিল—আমার একটি ভাইকে নিয়ে গেছে তারা, তাই এতগুলি ভাই পেয়েছি। আমার স্বামী এলে বলবেন যে..

বিকাশ দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, অনেককে ডিঙাইয়া, লাফাইয়া সুমতির সামনে আসিয়া বলিল—এই যে সুমতি, সুমতি। কনক...

সুমতি ফটক নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—যে কনক কোথায় জানি নে, এতগুলি কনক আমার সঙ্গে এসেছে। তোমার কাছেই বিদায় নিতে এসেছি। চল্লুম...

চল, আমিও যাই।

বাঙ্গচিত্রের ছবির মত তাহারা অদৃশ্য হইতেই, একজন বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার বঙ্গেশ্বরের কাণে কাণে কহিলেন—পুত্র এবং পুত্রবধূ।

প্রবল প্রতাপান্বিত পুলিসের সাহেবটি বাহিরে আসিয়া কনেষ্টবলদ্বয়কে কহিলেন—পাকড়ো!

পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল—না। যেতে দাও।

পুলিস সাহেব মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, স্বয়ং মহামান্য বঙ্গেশ্বর।

কিন্তু লাটসাহেব আর ফিরিলেন না, মোটরে উঠিলেন।

পেন্সিটির সরবরাহকারগণ কনসার্ট পার্টিকে কিঞ্চিৎ-মাত্রায় ভাগ দিয়া, বাকীটা সেইখানে বসিয়াই ছুরী কাঁটা চামচ সাহায্যে সদ্ব্যবহার করিতে ভুলিল না।

বঙ্গেশ্বর ক্ষমাশীল, মিঃ চৌধুরীর অতবড় চাকরীটা বজায়ই রহিল।

ব্যতিক্রম

(উপন্যাস)

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ]

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ফুলশয্যার পরে বিনয় কোন বাধা বিঘ্ন না মানিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। সে যে মেসে থাকিত সে মেস্ ছাড়িয়া দিল। কলেজে গিয়া দেখিল, নির্ম্মল আসে নাই। কোন্‌দিন কখন্ নির্ম্মল আসিয়া পড়ে, সেই ভয়ে সে সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিত। দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, নির্ম্মল আসিল না, কলেজ হইতে তাহার নাম কাটা গেল। বিনয় কলিকাতায় বড় সাবধানে চলিত, সে ভুলিয়াও জোড়াসাঁকোর দিকে যাইত না, কাহারও সহিত আলাপ করিত না। দেখিতে দেখিতে গ্রীষ্মের ছুটী আসিয়া গেল। কলেজ বন্ধ হইল কিন্তু বিনয় দেশে গেল না, সে ছুটীর অবসরে এক ছাত্র পড়াইতে আরম্ভ করিল।

বিনয় সকাল বেলা উঠিয়া পড়াইতে যাইত আর বেলা দশটার সময় ফিরিত। বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সে একদিন বাসায় ফিরিয়া দেখিল যে একখানা পত্র পড়িয়া আছে, তাহা দেখিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল, কারণ পত্রখানা নির্ম্মলের লেখা। পত্রে লেখা ছিল :—

বিনু, আমি বড় বিপদে পড়েছি, তুমি ভিন্ন আমার বন্ধু আর কেহ নাই। বিকেল বেলায় একবার বিডন স্কোয়ারে বেড়াতে যাই, তা ছাড়া সারা দিন-রাত্রি আমি বন্দী। যেমন করে পার আমার সঙ্গে একবার দেখা কোরো। অনেক চেষ্টা করে তোমার ঠিকানা পেয়েছি।

নির্ম্মল

চিঠিখানি পড়িয়া বিনয় বিপদেই পড়িল কারণ সে স্থির করিয়াছিল যে নির্ম্মলের সঙ্গে আর দেখা করিবে না; দেখা হইলেও দূরে দূরে থাকিবে। অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে দেখা করাই স্থির করিল এবং টোলের ছাত্রদের মত চটি জুতা পায়ে দিয়া আর গায়ে একখানা মোটা চাদর জড়াইয়া মেস্ হইতে বাহির হইয়া গেল। ভয়ানক গরম, বেলা যখন পাঁচটা তখনও ভীষণ রৌদ্র, বিনয় বিডন স্কোয়ারে পৌঁছিয়া একটা ছোট গাছের ছায়ায় আশ্রয় লইল। ঘণ্টা বাজিল, তখনও কেহ আসিল না, যখন সাতটা বাজে-বাজে তখন দূরে নির্ম্মলকে দেখিয়া বিনয় চমকিয়া উঠিল। নির্ম্মলের সে সুবর্ণ গৌরকান্তি মলিন হইয়া গিয়াছে, তাহার বলিষ্ঠ দেহ এত ক্ষীণ হইয়াছে যে তাহাকে চিনিতে পারা যায় না, নির্ম্মল চির-রুগ্নের মত একখানা লাঠিতে ভর দিয়া চলিতেছে আর চারিদিকে তাহার দৃষ্টি তাহাকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। বিনয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া নির্ম্মলকে আনিয়া বসাইল। নির্ম্মল হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—"বিনু আমাকে বাঁচাও। আমাদের সংসারের উপর দিয়ে শনির দৃষ্টি বয়ে গেছে, বাবা পাগল হয়েছেন, ইন্দুকে জোর কোরে একটা বাঁদরের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন, সে রোজ মদ খেয়ে আসে। আমি বিয়ে কোরতে চাইনে বলে আমার এই শাস্তি, পড়া বন্ধ, বেরুন বন্ধ, আমি বন্দী। বিনু আমি পালিয়ে যাবো, আমাকে কোন রকম করে কোলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারিস্?" বিনয় এতক্ষণ পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল—"পালিয়ে কোথায় যাবি? কতদিন থাকবি?" নির্ম্মল বলিল—"দেখ আমি আর আসতে চাই না, যে রকম করে হোক দিন চলে যাবে। নিত্য মরণকে ডাকি, মাও ডাকেন, মরণ তো আসে না।" "বাবা কি এতদূর পাগল হয়ে গেছেন?" "তোর বিয়ের পর থেকে তিনি একেবারে উন্মাদ, তা নইলে ইন্দিকে এমন কোরে সাগরের জলে ফেলে দিতে পারতেন না।" "তুই কি করে পালাবি, তোর সঙ্গে পাহারা আছে তো?" "তার জন্যে ভাবনা কি, লোক কেবল দুয়োরে বসে থাকে। চলনা আমরা বেড়া ডিঙিয়ে চলে যাই? তুই যদি কোন রকমে আমাকে কিছু টাকা দিয়ে কোথাও পাঠিয়ে দিতে পারিস তাহলে আমি আমার নিজের পথ নিজে চিনে নেবো।" "তুই আমার ঠিকানা জানলি কি করে?" "অনেক কষ্টে

বাহাদুরকে ভাকিয়ে তোর টিকানা জেনে নিয়েছি, হাতে টাকা ছিল না, ইন্দির হাতের একগাছা চুড়ী তাকে বক্‌সিস দিতে গিয়েছিলুম, কিন্তু সে তা নেয় নি।" "দেখ নির্ম্মল, আমাকে একটা দিন সময় দে, আমি টাকার জোগাড় করে দেখি, কাল তোকে এখানে খবর দেবো। তুই যদি সত্যি পালাতে চাস, তা হলে বেশী লাফালাফি করিস্ নে।"

নির্ম্মল উঠিয়া গেল, বিনয়ও আস্তে আস্তে অন্য পথে মেসে ফিরিয়া আসিল। বিনয় সে মাসে শিক্ষকতা করিয়া ৩০৲ টাকা পাইয়াছিল তাহার উপর তার পিতা এক মাসের খরচ পাঠাইয়াছিলেন, এই ৯০৲ টাকা সম্বল করিয়া সে নির্ম্মলের সহিত কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। রাত্রিতে বিনয় তাহার পিতাকে পত্র লিখিল, যে সে এক বন্ধুর সহিত বিদেশে যাইতেছে, সুতরাং সে তাঁহার আদেশমত শ্বশুরালয়ে যাইতে পারিবে না। বিনয় আর একখানা পত্র লিখিল তাহার ছাত্রের পিতাকে, তাঁহাকে জানাইল যে তাহার শরীর অসুস্থ হইয়াছে বলিয়া সে কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে।

পরের দিন অসীম সাহসে ভর করিয়া দুই বন্ধু বাহির হইয়া পড়িল, নির্ম্মলকে বিজন ষ্টোয়ার হইতে আনিয়া বিনয় তখনই যাত্রা করিল। নির্ম্মল মেসে আসিয়া মাথা মুড়াইল, গেরুয়া কাপড় পরিল এবং ব্রহ্মচারী সাজিয়া তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিল, বিনয় টোপের ছাতের বেশে আর এক কামরায় গিয়া উঠিল।

গাড়ী বর্দ্ধমান ছাড়িয়া গেলে দুই বন্ধু একত্র হইল। তখন নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল—"কতদূর টিকিট কিনেছিস্ ভাই?" বিনয় বলিল—"মোগলসরাই পর্য্যন্ত।" "কখন পৌঁছবে?" "কাল সন্ধ্যাবেলা।" দুই বন্ধুতে মন খুলিয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময়ে দুর্গাপুর ষ্টেশনে এক বিশালকায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সন্ন্যাসী উঠিলেন। গাড়ীতে তেমন ভিড় ছিল না, নবাগত তাঁহার জিনিষপত্র সাজাইয়া একখানি বেঞ্চি দখল করিয়া বসিলেন। তাহার পরে তাঁহার নির্ম্মলের দিকে নজর পড়িল। তিনি নির্ম্মলের গেরুয়া কাপড় দেখিয়া ফুল হাত দুখানি উঠাইয়া একটা প্রণাম করিলেন; তাঁহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবাজি! কতদূর যাওয়া হবে? আমি অতি দীনহীন। নাম শ্রীপরেশচন্দ্র দাস, শ্রীশ্রী৺বিশ্বেশ্বর দর্শনে যাত্রা করেছি। পথে আপনার দর্শন। বাবাজী তামাক ইচ্ছে করেন কি?" মুক্তি পাইয়া নির্ম্মলের মনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছিল, সে পরেশবাবুর কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিল। সে তামাক খাইতে জানিত না, সুতরাং দুঃখিত হইয়া বলিল—"না আমি তামাক খাই না।" পরেশবাবু ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবুও, না-হয় বড় তামাক?" অর্থ বুঝিতে না পারিয়া নির্ম্মল বলিল—"না তাও খাই না।" পরেশবাবু বলিলেন—"বাবা ছলনা কোরছেন? বাবা বিশ্বেশ্বরের নাম করে বেরিয়ে যখন পথেই শ্রীচরণ পেয়েছি তখন আর ছাড়ছিনি বাবা।" নির্ম্মল মহা বিপদে পড়িল, গাড়ীর এক কোণে বসিয়া নির্ম্মলের অবস্থা দেখিয়া বিনয় বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেছিল, সে বলিয়া উঠিল—"পরেশবাবু, বাবাজী নতুন সংসার ত্যাগ করে এসেছেন কিনা, এখনও বড়-তামাক ছোট-তামাক অভ্যাস হয় নি।" পরেশবাবু অমনি বলিয়া উঠিলেন—"বটে বটে; বাবা বিশ্বেশ্বরের কি দয়া? বাবা এ নতুন ছিলিম, নতুন সাজি, তাজা মাল বাবা, একবার শ্রীবদনে অর্পণ কোরলে পরেশচন্দ্র একবারে সশরীরে কৈলাসে যাবে বাবা। ওস্তাদ পরেশচন্দ্র বাবাজীর চরণ যুগল হস্তীদন্ত বিনিন্দিত হাত দুখানি দিয়া জড়াইয়া ধরিলেন। নির্ম্মল কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠিল। অনেক কষ্টে ভক্ত পরেশচন্দ্রকে বড়-তামাক সেবনের অনুমতি দিয়া নির্ম্মল রক্ষা পাইল। পরেশচন্দ্রের কল্যাণে কুণ্ডলাকৃতি গঞ্জিকাধূমপূর্ণ কামরায় বসিয়া বড়ই আনন্দে দুই বন্ধু রাত্রি কাটাইয়া দিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সমস্ত দিন ভক্তি ও সেবায় বাবাজীকে পরম পরিতুষ্ট করিয়া পরেশবাবু বাবাজীর প্রধান চেলা হইয়া দাঁড়াইল। কেবল দুই রকম তামাকের বিষয় তাহার একটু ক্ষোভ রহিয়া গেল, কিন্তু সে নির্ম্মলকে জানাইয়া রাখিল, "ওটা ক্রমশঃ হয়ে যাবে।' সন্ধ্যাবেলা মোগলসরাই ষ্টেশনে

নামিয়া পরেশচন্দ্র নিজেই বাবাজীর টিকিট কিনিতে গেল. সে ধরিয়া লইয়াছিল, যে বিনয় বাবাজীর প্রথম চেলা। গাড়ী বদলাইবার সময় যেটুকু অবসর পাইল দুই বন্ধুতে তাহার মধ্যে স্থির করিয়া লইল যে উপস্থিত আশ্রম কোনমতেই পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ভক্ত পরেশচন্দ্র নির্ম্মলানন্দ স্বামী ও তাহার চেলাকে সন্ধ্যার পরে কাশীতে বাঙ্গালীটোলায় এক বাসাতে লইয়া গেল, এবং নিজের ঘরচে যথারীতি তাহাদের সেবা করিয়া তুষ্ট করিল।

প্রকাল বেলায় ভক্তের ভক্তি ও সেবার মাত্রা বাড়িয়া গেল, পরেশচন্দ্র একখানি মৃগচর্ম্ম ও একটা কমণ্ডলু কিনিয়া আনিল, এবং নির্ম্মলানন্দ স্বামীকে বাসার বারাণ্ডায় বসাইয়া রীতিমত মজলিস সুরু করিয়া দিল। কাশীতে যে-সন্ন্যাসী ভিক্ষা করে না, তাঁহার প্রতিপত্তি অতি সুলভ। দেখিতে দেখিতে লোক জমিয়া গেল, কেহ ভক্ত, কেহ বা জিজ্ঞাসু, কেহ বা মজা দেখিতে আসিল। এই ভিড়ের মধ্যে নির্ম্মল ও বিনয়কে রাখিয়া পরেশচন্দ্র নিজের কাজ করিতে গেল। বিনয় তাহার পরিচয় লইয়া জানিয়াছিল যে সে নদীয়া জেলার একজন জমীদারের গোমস্তা। তাহার মনিব কাশী আসিবে, সেইজন্য সে বাড়ীভাড়া করিতে আসিয়াছে।

বেলা বারোটা আন্দাজ পরেশচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, যে লোকের ভিড় তখন অনেক কমিয়াছে। সে তখন বাকী লোক তাড়াইয়া বাড়ীর দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল এবং বাবাজীদের সেবা করাইয়া স্বয়ং প্রসাদ পাইল। তখন শুরুর সেবন করিতে করিতে পরেশচন্দ্র নির্ম্মলকে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন বাবা, সেবার ত্রুটী হয়নি তো? দেখুন, কেমন আসর জমিয়ে দিয়েছি? যতদিন ইচ্ছে সুখে স্বচ্ছন্দে বাবা বিশ্বনাথের রাজধানীতে বাস করুন, একটী পয়সা খরচ লাগবে না। এখন কেবল একটা অঙ্ক বাকী। সেটা আজ সন্ধ্যাবেলায় হয়ে যাবে। দেখুন বাবা, আমি কিন্তু আপনার নাকে চশমা দেখেই চিনেছি, চোখে যখন চশমা আঁটা, তখন নিশ্চয়ই বাবা কলেজে, পড়া। এখন অধীন একটু বিপদে পড়েছে, গিন্নী-মা বলে দেছেন তাল দেখে একটী বাড়ীভাড়া কর্‌তে; বাড়ী তো দশ বিশটা দেখে এলুম কিন্তু কোন্‌খানে বাড়ী ভাড়া করি? শিকরোলে, সাহেবী-পল্লীতে অনেক বাড়ী আছে, সেখানে গিন্নী-মা যাবেন না। সহরের মধ্যে অনেক বাড়ী আছে। এখন বড় রাস্তার উপরে বাড়ী নিই, না বাঙ্গালীটোলার মধ্যে বাড়ী নেবো? বাবা সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ, বাবা বিশ্বনাথ যখন পথে বাবার সাক্ষাৎ মিলিয়ে দিয়েছেন তখন বাবার হুকুম ভিন্ন পরেশচন্দ্র কোন কর্ম্ম কোরছে না।" অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নির্ম্মল বলিল—"পরেশবাবু, আপনাদের গিন্নী-মা কি শুধু তীর্থ করতে আসছেন?" সাহস পাইয়া নির্ম্মলের পায়ের উপরে মাথা রাখিয়া পরেশবাবু বলিলেন—"বাবা সাক্ষাৎ বিশ্বনাথের অবতার, আমার মনের কথাটি ঠিক ধরেছেন। গিন্নীমা বড় ভক্ত বাবা, তাঁর ভক্তির ধারাটা, তিনি এলেই বুঝতে পারবেন বাবা, রাবড়ী আর বরফিতে দুবেলা ঘর ভরে যাবে। বাবা আর কতটুকু খাবেন, বাবার তো বাবু-আহার, এই পরেশচন্দ্রই পেন্নামগুলো পাবে। দেখুন বাবা, গিন্নীমা তীর্থও কোরবেন আবার হাওয়াও বদলাবেন। এখন কি করা যায়।" নির্ম্মল বলিল—"তা হলে বাঙ্গালীটোলার ভেতরেই বাড়ী নিন, সব কাজই হবে।" পরেশচন্দ্র কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাহার তৈল-সিঞ্চিত বিশাল মস্তকখানি আবার নির্ম্মলের পায়ের উপরে রাখিল।

বিকাল বেলাই পরেশবাবু বাড়ী ভাড়া করিয়া আসিলেন, বাড়ীটী গঙ্গার কাছে আবার দশাশ্বমেধ ঘাটেরও কাছে, নতুন বাড়ী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ফিরিয়া আসিয়াই পরেশবাবু ধরিয়া বসিলেন যে স্বামীজীকে নতুন বাড়ীতে যাইতে হইবে। "বাবাকে না নিয়ে গেলে গিন্নীমা আমাকে আর আস্ত রাখবেন না।" নির্ম্মল কিন্তু বাঁকিয়া বসিল, সে কোন মতেই যাইতে চাহিল না। পরেশবাবু স্বামীজিকে ছাড়িয়া চেলাজিকে ধরিলেন, বিনয় বলিল—"পরেশবাবু স্বয়ং স্বামীজি যখন অমত করছেন তখন আমি আর কি বলবো? তবে দেখুন গিন্নীমা এসে পৌঁছুন, তারপর সবাই মিলে ধরে পড়া যাবে।" পরেশবাবু অগত্যা তাহাতে রাজি হইলেন। তিনি তখন বলিয়া বসিলেন —"দেখুন বাবা এখানে যখন থাকা হচ্ছে তখন আর একটু আসর জমকাল দরকার।" নির্ম্মল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"আবার কি?" "সন্ধ্যা বেলায় একটু

পূজা পাঠ করা দরকার তা নইলে মায়ীদের তৃপ্তি হবে না। দেখুন বাবা, এই আমাদের হিন্দুধর্মটা একেবারে উচ্ছন্ন গেছেন। যা থাকবার এই মায়ীদের মধ্যে, একটা কিছু পাট না করলে মায়ীদের মন উঠবে না!" পাঠের নাম শুনিয়া নির্ম্মলের মুখ শুকাইয়া গেল, তাহা দেখিয়া বিনয় বহুকষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিল। নির্ম্মল অনেক কষ্টে সামলাইয়া বলিল—"দেখুন পরেশবাবু, আমার আর ও-সব ভাল লাগে না, এখন আমি ও সকল কাজ শিষ্যদের হাতে সমর্পণ করেছি।" আপনি একখানা বই এনে দিন, আমার শিষ্যই পাঠ করবে। পরেশবাবু সানন্দে বই আনিতে গেলেন, সেই অবসরে নির্ম্মল বলিল—"বিনু, ছোলটা আর একটু বোয়লে গেল, তা নইলে ভাল দেখাচ্ছে না, পাঠ-টাট তুই কর্ ভাই, আমিতো নাগরী অক্ষরই চিনি না।" বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—"আবার কি ছোল বসলাবো?" "আমার মত মাথাটা কামিয়ে ফেল আর গেরুয়া কাপড় পর।" "দূর পাগল, চেলার কি মাথা কামায়? তবে কাপড় দুখানা কালই রঙিয়ে ফেলছি।" এই সময়ে পরেশবাবু ফিরিয়া আসিলেন। সন্ধ্যাবেলায় একখানা জলচৌকির উপরে মৃগচর্ম্ম পাতা নির্ম্মল তাহার উপরে বসিল, তাহার পায়ের তলায় সারি সারি ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া বিনয় একখানি আসনে বসিয়া শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। ধূপ ও ধূনার গন্ধে ছোট বাড়ীটার উঠান ভরিয়া উঠিল। শ্রোতারও অভাব ছিল না, তাহার মধ্যে শতকরা নব্বইজন স্ত্রীলোক। বিনয়ের কণ্ঠটী মধুর; সে ভাল সংস্কৃত জানিত, সুতরাং পড়া না থাকিলেও টীকার সাহায্যে শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে তাহার বিশেষ কষ্ট হইল না। বিনয় উৎসাহের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার মধুর কণ্ঠে ভাগবৎ পাঠ শুনিয়া দুই চারি জন বৃদ্ধ সত্য সত্যই মুগ্ধ হইলেন, বাকীরা বুঝিল না, তাহারাও অনর্থক কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। নির্ম্মলের সম্মুখে টাকা পয়সা পড়িতে আরম্ভ হইল। রাত্রি নয়টার সময় যখন পাঠ শেষ হইল তখন পরেশচন্দ্র আসিয়া বিনয়ের কাণের কাছে কহিল—"ছোট বাবাজী একেবারে খাটি কেলাস পসার।"

আসর ভাঙ্গিলে পরেশবাবু নির্ম্মলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজী একটু অঙ্গ-রাগ।" নির্ম্মল ভয় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সে আবার কি পরেশবাবু?" "এই একটুকু হস্ত-সেবা পদ-সেবা, মহারাজের অনেক পরিশ্রম হয়েছে কিনা?" "আমার তো হাত পা টেপানো অভ্যাস নাই পরেশবাবু।" "তা কি হয়? মহারাজ, একটু মোকান-দারি চাই বই কি, তা নইলে এমন কাট কেলাস পসার একদম মাটী।" তাহার পরে পরেশবাবু স্বেদসিক্ত মুগচর্ম্ম-খানি নির্ম্মলের কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন—"বাবাজী। আপনার সেবার জন্য একটী দাসী"—নির্ম্মল আর বাকীটা শুনিল না। সে ঘরের ভিতর পলাইয়া গিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। বিনয় হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। পরেশ-বাবু বলিলেন—"কলেজে পড়া বাবাজী কি না" এখনও ভাল পোক্ত-হননি, বুঝলেন ছোট বাবাজী! আসর জমকাতে হলে সবই চাই, ক্রমশঃ হবে ক্রমশঃ হবে।" বিনয় অনেক কষ্টে হাসি সামলাইয়া বলিল—"হবে বই কি। আপনি যখন বোলছেন তখন ক্রমশঃ হবে।" পরেশবাবু বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সকাল বেলায় উঠিয়া বিনয় মুখখানা ভার করিয়া বসিয়া রহিল। অবসর বুঝিয়া, নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, "বিনু! কি হয়েছে রে?" বিনয় বলিল—"নিজের ফাঁদে নিজেই পা দিয়েছি রে, এখন চল সরে পড়ি।" "সরে পড়বার মত কি হলো?" "পরেশটা আমার এই মস্ত বাড়ীর গোমস্তা, আজ সকাল বেলায় কথায় কথায় পরিচয় নিয়ে জানলুম"। "তুই তো বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ী যাস্‌নি?" "না, কেবল সেই বিয়ের রাত্রেই যা গিয়েছিলুম তার পর আর কখনও যাই নি।" "তবে তো তোকে কেউ চেনে না, তুই ছোট বাবাজী সেজে থেকে যা না?" "বাবাকে কিন্তু খবর দিয়েছি ভাই।" "তা দিলেই বা?" আজ একখানা চিঠি লিখে যে—যে তুই কাশী ছেড়ে নড়বি চড়বি?" "তার পর?" "শ্বশুর কন্যাটী যদি চিনে ফেলেন তা হচ্ছে তো? সে তার আমার। তুই আজ মাথাটা উড়ে কামান করে আয় দেখি?" "দেখ্ ভাই, আমার

কিন্তু ভয় হ'চ্ছে। বাবা নিশ্চয় লিখবেন যে আমি কাশীতে আছি বা ছিলুম। বিদেশে এত কাছে আছি শুনলে এরা ধরবার চেষ্টা করবে। আমি চলি পালাই ভাই?" "তুই যেমন পাগল? দিব্যি আরামে আছি, বোধ হয় তোর শাশুড়ী এলে সেবার যাত্রা আবার বাড়বে। পালাতে কতক্ষণ? গৌরমোহন মুখুয্যে জেলের ভেতর থেকে যখন পালিয়ে এসেছে তখন আর এখান থেকে পালাতে আর কত দেরী লাগবে? বিনয় কিন্তু সেই হইতে ভয় পাইল। সে মাথার সম্মুখটা কামাইয়া আসিল, চুলগুলি ছোট করিয়া কাটিল, গেরুয়া রঙের কাপড় পড়িল এবং নির্ম্মলাকে স্বামীজী বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। নির্ম্মল কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিনয়কে বিনু বলিয়া ডাকিয়া ফেলিত! আর বিনয় শিহরিয়া উঠিত।

স্বামী নির্ম্মলানন্দের কাশী প্রাপ্তির ছয় দিন পরে পরেশবাবু স্বামীজীর অনুমতি লইয়া মহাসমারোহে গিন্নীমাকে আনিতে গেলেন। সেদিন আর সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার দেখা পাওয়া গেল না। বিনয় ভয়ে ভয়ে সেদিন বাড়ীর বাহির হইল না। সন্ধ্যাবেলা নির্ম্মলানন্দকে মৃগচর্ম্মের উপরে বসাইয়া বিনয় যখন পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হঠাৎ একটা পরিচিত গলার আওয়াজ তাহার কানে যাওয়ায় সে একেবারে চমকিয়া উঠিল। সে ফিরিয়া দেখিল যে তাহার পিছনেই তাহার শাশুড়ী দাঁড়াইয়া আছে। তিনি বলিতেছেন—"আহা কার বাছারে? কোন্ হতভাগীকে কাঁদিয়ে এসেছিস্ বাবা?" বিনয় একটু সামলাইয়া দেখিল যে তাঁহার দৃষ্টিটা তখন নির্ম্মলের উপর। বাড়ীর লোকে তাড়াতাড়ি একখানা কম্বল বিছাইয়া দিল। বিনয়ের শাশুড়ী তাঁহার দুই কন্যা লইয়া তাহার উপরে বসিলেন। বহুকষ্টে চিত্ত সংযত করিয়া বিনয় পাঠে মন দিল। পাঠ করিতে করিতে বিনয় শুনিল তাহার শাশুড়ী ভবসুন্দরী বলিতেছেন—"আহা ছেলেটীও বেশ! দেখ সারদা, পরেশ ঠিক বলেছে, এদের কাশীই আমাদের বাড়ী উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে।" বিনয় যাহা বলিতেছিল তাহা তাহার মুখে আটকিয়া তাহার গলা শুকাইয়া গেল, বইখানা হাত হইতে পড়িয়া গেল। আসনে বসিয়া নির্ম্মল তাহা দেখিতে পাইল, সে বিনয়কে আশ্বাস দিবার জন্য বলিল—"এখন বন্ধ করোনা, এই সব মায়ীরা এসেছেন, আর একটু পাঠ কর।" বিনয় শুষ্ক কম্পিত কণ্ঠে পাঠ করিতে আরম্ভ করিল এবং বহুকষ্টে যে অধ্যায়টী আরম্ভ করিয়াছিল তাহা শেষ করিয়া বইখানি মুড়িয়া রাখিল।

বেশীর ভাগ লোক চলিয়া গেলে ভবসুন্দরী গলায় কাপড় দিয়া বিনয়কে প্রণাম করিয়া তাহার পায়ের কাছে একটী মোহর রাখিলেন, বিনয় আর একবার শিহরিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে সে বলিল, আমরা সন্ন্যাসী কামিনী কাঞ্চন স্পর্শ করা আমাদের নিষেধ। মোহরটা আপনি তুলে নেন।" ভবসুন্দরী প্রসন্না হইয়া মোহরটা তুলিয়া লইলেন। তখন নির্ম্মলের অন্তরালে শুরু পরেশচন্দ্র হাত কামড়াইতেছিল আর নির্ম্মলকে বলিতেছিল—"বাবাজী সব মাটী; ছোট বাবাজীটা এখন বাঁচা? রোজ একখান মোহর আসতো, রোজ একখান মোহর আসতো!" নির্ম্মল হাসি সামলাইতে না পারিয়া মুখের ভিতর খানিকটা কাপড় পুরিয়া দিল। এই অবসরে ভবসুন্দরী বলিলেন—"বাবা, আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিতেই হবে। পরেশ আমার ছেলের মত, আমি তার মুখে সব শুনেছি। কাল থেকে আপনাদের আমাদের ওখানে ভেরা নিতে হবে, তা নইলে আমি ধরা দিয়ে পোড়বো।" বিনয় কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল—"সে কথা আমি কি জানি মা? গুরু যা আদেশ করবেন তাই আমি কোরবো।" শিষ্যের উত্তর শুনিয়া ভবসুন্দরী সন্তুষ্ট মনে বলিলেন—তাই হবে বাবা, স্বামীজীকে তো নিয়ে যাবই; তোমাকেও কিন্তু যেতে হবে।" তখন বিনয়ের স্ত্রী অন্নদাসুন্দরী তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে বলিতেছিল—"দেখ দিদি! চেনা চেনা মুখখানা যেন চেনা চেনা?" সারদাসুন্দরী বলিল—"কোথায় আবার দেখলি? হয়ত আমাদের বাড়ী ভিক্ষে করতে এসেছিল। বিনসে যা কালো, মাগো!" বিনয় আর দাঁড়াইল না, সে ছুটিয়া বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল।

সে যখন ফিরিয়া আসিল তখন শুরু পরেশচন্দ্রের সহায়তায় ভবসুন্দরী নির্ম্মলকে জয় করিয়াছেন। সকাল বেলায় শ্বশুরমুখে উঠিয়া যাইতে হইবে শুনিয়া বিনয়ের

আঘাত বাজ পড়িল। শাশুড়ী চলিয়া যাইবার পরে সে নির্ম্মলকে ধরিয়া বসিল। বিনয় বলিল—"নির্ম্মল তুই যা, আমি যাবো না।" নির্ম্মল বলিল—"তা কি হয়? কথা দিয়েছি যখন তখন যেতেই হবে।" বিনয় বলিল—"আমি ওদের বাড়ী কিছুতে যেতে পারবো না। টাকা কড়ি রইলো তুই সচ্ছন্দে ওদের বাড়ী গিয়া থাক্, আমি চল্লুম। ওদের বাড়ী গিয়ে বাস করতে, ওদের অন্ন মুখে তুলতে আমার ঘৃণা বোধ হয়ে আসে। নিরু, আমি চল্লুম।" নির্ম্মল তাড়াতাড়ি বিনয়ের হাত ধরিয়া ফেলিল, বিনয় অগত্যা বসিল। তখন নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল—"কি পাগলামো করছিস্ বিনু?" বিনয় বলিল—"নিরু, তুই বুঝতে পারছিস্ না, অন্ন-জন্মান্তরের সঞ্চিত শত্রুতা না থাকলে কখনও এমন হয়? ওদের দেখলে আমার অঙ্গ জ্বলে যায়! আমি কি করে ওদের বাড়ী গিয়ে বাস কোরবো। পাছে শ্বশুর বাড়ী যেতে হয়, সেই জন্য বার কাছে অবধি যাইনি। পাছে আবার ওদের সুন্দর মুখ দেখতে হয় সেই ভয়ে—তোর সঙ্গে চলে এসেছি। ওরা যে কালী আসবে তা কি জানি? তাহলে তোকে নিয়ে অন্য জায়গায় যেতুম। নির্ম্মল বলিল, "আজ রাত্রিতে কোন মতেই তোর যাওয়া হতে পারে না। যা হয় দুদিন পরে হবে। দুদিন ওখানে গিয়ে থেকে দেখতে যে। বিনু অদৃষ্টের হাত ছাড়িয়া কোথায় যাবি ভাই?" বিনয় কাঁদিয়া ফেলিল।

বন্যার কান্না

[শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

আজ কয়েক বৎসর যাবৎ বন্যার উৎপাতে আমাদের সবিশেষ ক্ষতি হইতেছে—কিন্তু তাহার প্রতিকারার্থ আমরা কি করিতেছি—কেবল রিলীফ-ফণ্ড খুলিতেছি। রিলীফ-ফণ্ডের অবশ্যই সার্থকতা আছে—কিন্তু তাহাতে একটা স্থায়ী প্রতিকার সম্ভব নয়। গত বৎসর উত্তর বঙ্গের বন্যার সময় প্রফুল্লচন্দ্র বরাভয়কর মেলিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন বলিয়া কেবল তাঁহার ব্যক্তিত্বের মাহাত্ম্যে সেই ভীষণ পীড়ন অনেকটা শান্ত হইয়াছিল। এ বৎসর আবার বিহার, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ যুক্তপ্রদেশ ও বঙ্গের অনেকস্থান হইতে বন্যা পীড়িতের আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে একরূপ উদাসীন বলিলেই হয়—সমুদ্রে পাত্তার্ঘ্যবৎ তাঁহাদের প্রদত্ত যৎকিঞ্চিৎ সাহায্যের যৎকিঞ্চিৎ অংশ, তাঁহাদের নিম্ন কর্ম্মচারীগণের হাত এড়াইয়া যায়। পীড়িতগণের নিকট পৌঁছায় তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় না। পূর্ব্বে বৎসর বৎসর এত বন্যা হইত না। অনেকে বলেন এবং তাহা একেবারে অসম্ভবও নয়—যে রেলওয়ে, প্রসারে জল নিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া নাকি এই উৎপাত ক্রমশঃই বিস্তৃত হইতেছে—যদি তাহাই হয় তবে সে সম্বন্ধে কোন প্রতিবিধান করা হয় না কেন? দেশ হিতৈষী-পরিবৃত কাউন্সিলে যদি দেশ বাসীর প্রাণ-রক্ষণার্থ এরূপ একটা কার্য্য সংঘটিত না হয় তবে কৃপা ভোট দিয়া ঐ কাউন্সিলের মেম্বরদের রাহাখরচ বাবদ টাকা পাওয়াইয়া দিতে সাহায্য করা কি অন্যায়? সেণ্ট-ষ্টেটসম্যান রিভ্যুয়ে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবু লিখিয়াছেন যে ইউনাইটেড ষ্টেটসের অনেক ষ্টেটে এইরূপ প্লাবন হয় বলিয়া সেখানকার গভর্ণমেণ্ট বন্যানিবারণার্থ অনেকরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন—ভারত গভর্ণমেণ্ট ঐ সকল স্থান হইতে তৎসংক্রান্ত কাগজপত্র আনাইয়া এদেশে ঐ সকল উপায় অবলম্বন করেন না কেন? প্রজার প্রাণরক্ষা কি রাজার কর্ত্তব্য নহে কেবলমাত্র ট্যাক্স আদায়ই কি রাজা প্রজার সম্বন্ধ? আমরা না হয় ঘোরতর অদৃষ্টবাদী—বন্যায় মরিতে মরিতেও বলি "ভগবানের মার" এরূপ কোন উপায় অবলম্বিত না হইলে দেশ অচিরে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইবে। কারণ চাঁদা তুলিয়া প্রতিবৎসর এই দুর্দ্দৈব ঘটনাকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়—নূতন নির্ব্বাচন-নিকটবর্ত্তী যদি ভোট দিতেই হয় তবে এখন লোকেদের দেওয়া উচিত যাহারা এই সম্বন্ধে প্রকৃতপ্রস্তাবে কিছু করিতে সক্ষম।

বর্ণ-বৈষম্য

কেনিয়া প্রশ্ন সমাধানের পরে পরেই ভারতের বাহিরে ভারতবাসীদের পরমর্য্যাদা নিঃসন্দেহে দ্বিধীকৃত হইয়া গিয়াছে। শ্বেতবর্ণদিগের নিকট ভারতবাসীদের অবনত মস্তকে থাকিতেই হইবে। আর্য্যাবর্ত্ত শেষ হইয়াছে এখন আর বৃথা স্তোকবাক্যে ভারতবাসীদের ভুলাইবার কোন আবশ্যকতা নাই তাই ব্রিটিশ সিংহ আজ দন্ত্যু-বিকাশ করিতেছেন।

এত বড় দুর্ভাগ্যের মধ্যেও একটী সুফল ফলিয়াছে শাস্ত্রী, মিসেস এ্যানি বেসাণ্ট প্রভৃতির মোহনিদ্রা টুটিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। রিফর্ম লাভ্যুর প্রলোভনে যাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন আজ আবার তাঁহাদের মোহাবেশ যদি সত্যই কাটিয়া যায় তবে সেটা আনন্দের বিষয়। সম্প্রতি গোখেল হলে এই কেনিয়া সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহাতে বিবিধ মতাবলম্বী রাজনৈতিকগণ সমবেত হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ গ্রহণ করিয়াছেন।

১ম—বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশীরূপে ভারতবাসীগণকে তুল্যাধিকার না দেওয়া কার্য্যও এদেশবাসীগণ আগামী কাউন্সিল নির্ব্বাচনে—যাঁহারা বর্ণ বৈষম্য দূর করিতে প্রাণপণ প্রয়াস করিবেন কেবল তাঁহাদিগকেই ভোট দিবেন।

২য়—আগামী ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে ভারতবাসীগণ কোন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবেন না - যেহেতু নির্ব্বাচিত বা গভর্ণমেণ্ট মনোনীত প্রতিনিধি অন্য দেশস্থ শ্বেতকায়গণের সমতুল্য মর্য্যাদাবিশিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, এবং ঐ কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষীয়গণ কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইবে না।

এইপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মদনমোহন প্রসাদ আগামী বৃটিশ এম্পায়ার প্রদর্শনী বয়কট করিবার জন্য বিবিধ যুক্তি সহকারে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। তাহাতে এই প্রদর্শনীর অসারতা ও অনর্থক অপব্যয়ের কথা উল্লেখ করেন। বাঙ্গলার রাজনৈতিকগণ এখনও এসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত না করিয়া বড়ই কর্ত্তব্য হীনতার পরিচয় দিতেছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও দাশমহাশয়ের দল আত্ম-বিরোধে এতই ব্যতিব্যস্ত যে কেনিয়ার অপমান কোন দলেরই ভ্রূকুঞ্চন উদ্রেক করিতে পারে নাই। সম্পাদক সঙ্ঘ (Journalists Associaoitn) ও একরূপ নীরব কারণ বোধ হয় কতকগুলি নামজাদা সংবাদপত্র প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন বসাইয়া অর্থসাহায্যে দেশের স্বার্থ ভুলিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি আমরা এ বিষয়ে উক্ত সমিতির মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছি। তারপর বেঙ্গল কেমিক্যাল, মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানী প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ দেশীয় অনুষ্ঠানগুলিও উক্ত প্রদর্শনীতে ষ্টল লইয়াছেন ও অন্যান্য অনেকে লইতেছেন—এখনও যদি কংগ্রেসের বা সংবাদপত্রের অভিমত স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত না হয় তবে পরে চীৎকার করিলে কোন ফল হইবে না—তাই আমাদের শেষ অনুরোধ বাঙ্গলার জনগণ সত্বেজে অভিমত ব্যক্ত করুন, পরে ব্যবসায়ীদের স্বার্থপর বলিয়া অকারণ নিন্দা করিলে তাহা নিজেদের মূঢ়তার পরিচায়ক হইবে মাত্র।

প্রসঙ্গক্রমে শুনিলাম আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় উক্ত প্রদর্শনীর বৈজ্ঞানিক দ্রব্যাদির অংশের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন ও বেঙ্গল কেমিক্যালের সুযোগ্য কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত রাজশেখর বাবু মহাশয় উক্ত বিভাগের অন্যতম সেক্রেটারী—কেনিয়ার অপমানের পরও এই পদ গ্রহণে তাঁহাদের সত্যই আসক্তি আছে কি না তাহা জনসাধারণ জানিতে উৎসুক। দেশবাসীর হৃদয়ে আচার্য্য-দেবের যে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি আছে—এই সরকারী সম্মানে তাহা বাড়িবে কি কমিবে তাহা এখনও বুঝা বিশেষ কঠিন নহে।

লর্ড উইলিংডনের এতদিন পরে জ্ঞানোদয় হইয়াছে দেখিয়া আমরা পরম সুখী হইয়াছি। কয়েকের লয়েল মেমোরিয়াল স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ প্রসঙ্গে ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—"প্রথমেই আমি তোমাদের একটী বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি—কারণ তোমাদের অনেকেই ভারতবর্ষে বা প্রাচ্যদেশে জীবনের অধিকাংশ যাপন করিবে—মানুষের বর্ণ তাহাকে মনুষ্যত্ব দান করে না—এই কথাটী সর্ব্বদাই স্মরণ করিবে। মানুষের অন্তরস্থ চরিত্র ও স্বভাবই তাহাকে প্রতিষ্ঠা দান করে। রাজনিতিক প্রতিষ্ঠানের দায়ীত্বসম্পন্ন পদে অধিরূঢ় থাকিয়া আমি এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে যদি আমার স্বজাতীয়গণ পূর্ব্বে ইহা বুঝিতেন এবং বর্ণ-বৈষম্য সমস্যা একটু ধীরভাবে সমাধান করিতেন তবে আজ আমাদের এত কষ্ট ও এত বিপদের মধ্যে রাজ্যশাসন করিতে হইত না।

এখনও যে ইংরাজেরা ইহা বুঝেন নাই তাহা সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর মামলায় প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। বড় দুঃখের বিষয় যে হাইকোর্টের বারে এমন একজন ও ভারতীয় ব্যারিষ্টার ছিলেন না যিনি জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষার্থে বিনা স্বার্থে এই মামলায় পক্ষসমর্থন করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

টেলিফোন আবিষ্কারকের গল্প

[লেখক—শ্রীবরেন্দ্রনারায়ণ বসু]

১০ই মার্চ্চ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে "মিঃ ওয়াটসন তোমার আমার বিশেষ দরকার নীচে একবার এদিকে এস" ইহাই সর্ব্বপ্রথম টেলিফোনে বলা হইয়াছিল।

কপর্দ্দক শূন্য আবিষ্কার কর্ত্তা আলেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেল ও তাহার বন্ধু ওয়াটসন দুইজনে মাসের পর মাস ইহা লইয়া চেষ্টা করিতেছিল।

সেই সময়ে কিছু দিনের মধ্যে ফিলাডেলফিয়ায় এক প্রদর্শনী খোলা হয়, বেল তাহার টেলিফোন সেখানে প্রদর্শন করিবার জন্য পাঠাইয়া দিল, কিন্তু অর্থের অভাবে সে নিজে আর সেখানে যাইতে পারিল না।

মিস্ হুবার্ট নামে একটী সুন্দরী কিশোরীর সহিত বেলের প্রণয় হইয়াছিল। হুবার্টের পিতা ফিলেডেলফিয়ার প্রদর্শনীর কোন কাজে নিযুক্ত ছিল। একদিন হুবার্ট বেলকে আসিয়া ধরিয়া বলিল যে তাহাকে তাহার সঙ্গে ফিলেডেলফিয়ায় যাইতে হইবে। বেল মহা বিপদে পড়িয়া নিজের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার কথা জানাইয়া বলিল যে তার এমন পোষাক পরিচ্ছদ নাই যে সে তার সঙ্গে যাইতে পারে।

বালিকা বেলের দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল। বেল আর থাকিতে পারিল না। বলিল, চল আমি যাইব এবং তৎক্ষণাৎ সেই অবস্থাতেই এক কাপড়ে বিনা টিকিটে ট্রেণে যাইয়া উঠিল।

যথাসময়ে তাহারা ফিলেডেলফিয়ায় আসিয়া পৌছিল। তখন সেখানে খুব ভীড়। প্রদর্শনী ছয় সপ্তাহের জন্য খোলা থাকিবে, জগতের সকল দিক হইতেই লোক আসিতেছে কিন্তু কেহই অতবড় প্রদর্শনীর মধ্যে একটী ছোট টেবিলে বেলের টেলিফোনের ব্যাপার করিল না। হুবার্ট তার বাপকে ধরিয়া পড়িল যে জনকয়েক বৈজ্ঞানিককে ডাকিয়া আনিয়া টেলিফোনের ব্যাপার তাহাদিগকে দেখান হউক।

সে বিষয় চেষ্টা করা হইল। প্রদর্শনীর সকল বিভাগ পরিদর্শন করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ ক্লান্ত অবস্থায় বেলের টেবিলের নিকট আসিয়া দাঁড়াইতেই—বেল আগ্রহের সহিত তাহার টেলিফোনের ব্যাপার তাহাদের বুঝাইতে লাগিল কিন্তু তখন তাহারা বিশ্রাম করিতে পারিলেই অধিক সুবিধা বোধ করিতে পারিত—রিসিভার কাণে তুলিয়া টেলিফোনের ব্যাপার পরীক্ষা করিবার ইচ্ছাও সময় ছিল না। বৈজ্ঞানিকেরা চলিয়া গেল।

বেল আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। খুবই বিমর্ষ ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে একজন সম্ভ্রান্ত ও সৌম্যদর্শন লোক একটী মহিলার সহিত টেলিফোনের টেবিলের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে বেলকে দেখিতে পাইয়া ভদ্রলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—নমস্কার মিঃ বেল কেমন আছ? আমায় চিনিতে পার কি?

বেল হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। কারণ আগন্তুক বড় সামান্য লোক নহে—ব্রাজিলের সম্রাট! কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার সহিত বেলের পরিচয় হইয়াছিল।

বেল তাহার টেলিফোনের ব্যাপার সম্রাটকে পরিষ্কার রূপে বুঝাইতে লাগিল, সম্রাটও মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন। বেল টেলিফোনের রিসিভার তাঁহার কাণে তুলিয়া দিয়া এক দূরে অপর প্রান্তে কথা কহিবার জন্য পাঠাইয়া দিল।

সম্রাট আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন "ও ভগবান, এযে কথা কয়!"

ইতিমধ্যে সম্রাটের পশ্চাতে আরও অনেক বড় বড় লোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে জন কয়েক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও তখনকার কালের শ্রেষ্ঠ ইলেকট্রিসিয়ান লর্ড কেলভিন ও উপস্থিত ছিলেন। সম্রাটের পরই তিনি রিসিভার কাণে দিয়া কথা শুনিতে পাইয়া বলিলেন—"হাঁ সত্যই ইহা খুব আশ্চর্য্যজনক, আমেরিকায় ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিলাম।"

ইহার পর বেলের আর কষ্ট রহিল না। অর্থ ও যশ নবীন আবিষ্কারকের যথেষ্টই হইয়াছিল, কিশোরী হুবার্টকে বিবাহ করিয়া বেল তাহার ভালবাসার পুরস্কার দিয়াছিল।

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেলের মৃত্যু হইয়াছে।

Printed by Bijoy Krishna Dass at the Lakshmibilas Press,
14, Jagannath Dutta Lane, Calcutta.

প্রতীক্ষা